পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন (১৯৪৭-১৯৭১): আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

(Political Transition in East Pakistan (1947-1971): Role of Regional Leaders)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রাণা রাজ্জাক

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পিএইচ.ডি গবেষক

খাদিজা খাতুন

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজি: নং:-৩২/২০১৮-২০১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন (১৯৪৭-১৯৭১): আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

(Political Transition in East Pakistan (1947-1971): Role of Regional Leaders)

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত **“পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন (১৯৪৭-১৯৭১) : আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা”** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোথাও পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য অথবা অন্য কোন সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দাখিল করিনি এবং আমার জানামতে, ইতিপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

খাদিজা খাতুন
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজি নং- ৩২/২০১৮-১৯
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, খাদিজা খাতুন কর্তৃক উপস্থাপিত **"পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন (১৯৪৭-১৯৭১) : আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা"** শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি গবেষকের একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেনি। অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য দাখিল করার অনুমতি প্রদান করছি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ করছি।

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

ড. রাণা রাজ্জাক

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

ও

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস কালপর্বে ১৯৪৭-১৯৭১ সাল মধ্যবর্তী পর্যায়টি সর্বাপেক্ষা আলোচিত রাজনৈতিক অধ্যায়। "পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন (১৯৪৭-১৯৭১) : আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে সম্পাদন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয়ের ওপর গবেষণা মূলত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের (১৯৪৭-১৯৭১) আলোকে জাতীয় ও আঞ্চলিক ইতিহাস পর্যালোচনা প্রয়াস। এ লক্ষ্যে গবেষণায় প্রতিফলিত হয়েছে কিভাবে ১৯৪৭ সালের ব্যাপক একটি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সূচনা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয় এবং এ সূত্র ধরে পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ধারাবাহিক আবর্তনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে বর্তমান বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক নেতৃত্বের সংশ্লিষ্টতা কালানুক্রমিকভাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের (১৯৪৭-১৯৭১) সূচনা পর্বের আলোচনায় ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান আন্দোলনের স্বরূপ উম্মোচন করা হয়েছে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি তথাকথিত 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র ওপরে ভিত্তি করে পাকিস্তান আন্দোলনে সমবেত হলেও ধর্ম এ আন্দোলনের মূল এবং একমাত্র ভিত্তি ছিল না যে কারণে অতিদ্রুত পাকিস্তান ভেঙ্গে যায়। পাকিস্তান আন্দোলনে কিভাবে ধর্ম সম্প্রদায়িক চেতনাকে ব্যবহার করা হয়েছে তা গবেষণায় উঠে এসেছে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর বিশ্বের সদ্য স্বাধীন অন্যান্য দেশের ন্যায় পাকিস্তানে উপনিবেশ পরবর্তী জাতিরাষ্ট্রের দাবি থেকে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্থান দেখানো হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলের চরিত্র বৈশিষ্ট্য আলোচনায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সামগ্রিক বৈষম্য ও প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং পটপরিবর্তন সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

মুসলিম লীগের দল এবং সরকার হিসেবে বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকার অভাবে পটপরিবর্তনের নতুন ফলাফল হিসেবে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র কর্মসূচিভিত্তিক দল 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' (১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ) প্রতিষ্ঠা এবং স্বতন্ত্র দলীয় আদর্শের মূল্যায়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে প্রগতিশীল আদর্শের উদ্ভব ও বিকাশের ধারাবাহিক পর্যায় চিহ্নিতকরণ সহজ হয়েছে। প্রগতিশীলতার চর্চা, অসাম্প্রদায়িকতার বিস্তার এবং স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনে বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক নেতৃত্বের স্বতন্ত্র ভূমিকা উঠে এসেছে। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান তৈরি হয়েছে যা সুস্পষ্ট পটপরিবর্তন হিসেবে বিবেচ্য। প্রাক পাকিস্তান পর্বে সৃষ্ট বাংলা ভাষা সাংস্কৃতিক চেতনার প্রকাশ প্রসঙ্গে ভাষা আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় মূল্যায়নে কিভাবে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ লাভ করে তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর মানস সংকট এবং তাদের ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা গবেষণায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া ভাষা আন্দোলনের

মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির গোড়াপত্তন ও বিকাশ দেখানো হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সম্পূর্ণ ভিন্ন অনুসঙ্গ যুক্তরাজনীতি তথা যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং ভাঙ্গনে রাজনৈতিক চিত্রের সরাসরি পালাবদল গবেষণাকর্মে স্থান পেয়েছে। যুক্তরাজনীতির ভাঙ্গন পরবর্তী প্রাদেশিকতা প্রসঙ্গ পাকিস্তানের রাজনীতিতে জোরালো হয়ে উঠলে রাজনীতি ভিন্ন ধারায় চালিত হতে থাকে। এসময়কালে নতুন পটপরিবর্তন সৃষ্টি হয় কমিউনিস্ট আদর্শের বিস্তারের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের সংশ্লিষ্টতা ও স্ব স্ব অবস্থান গবেষণাকর্মে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি ও আওয়ামী লীগের ভাঙ্গন সমীক্ষায় বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক নেতৃত্বের সংশ্লিষ্টতা মূল্যায়ন করে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় গবেষণাকর্মে স্পষ্ট করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পর্যায়ের (১৯৪৭-১৯৭১) অধিকাংশ সময় সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উল্লিখিত হয়েছে। এক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের দিকনির্দেশনাকারী ভূমিকার স্বতন্ত্র মূল্যায়ন দেখানো হয়েছে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কিভাবে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন সর্বজনীনতা লাভ করেছে তার বিশ্লেষণ প্রদত্ত গবেষণায় আলোকপাত করা হয়েছে। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের পর্যায়ে রাজনৈতিক সংকট তথা স্থায়ী রাজনৈতিক ধারার অভাব এবং পরবর্তীতে রাজনৈতিকভাবে স্থায়ী আদর্শের প্রতিষ্ঠার বিষয়সমূহ যথাসম্ভব বিশ্লেষণ করে গবেষণাকর্মে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে স্থায়ী ধারা তৈরিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ঘৃণ্য প্রচেষ্টার প্রতিবাদে সৃষ্ট স্বতন্ত্র ধারা মূল্যায়ন করে গবেষণাকর্মের সফল প্রচেষ্টা তথা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস কালানুক্রমিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যার অকুণ্ঠ ও সার্বক্ষণিক পরিশ্রমে এই গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে, তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. রাণা রাজ্জাক। তার সবিশেষ উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতার ফলে আমার এ গবেষণাকর্মটি সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আমার অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপি পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং পরিমার্জনে আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার অস্পষ্ট ধারণাকে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ করেছেন। তার প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।

ইতিহাস বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই ড. কাজী শহীদুল্লাহ, ড. আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল, ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক এম এ কাউসার, ড. এস এম রেজাউল করিম, সহযোগী অধ্যাপক মৃত্তিকা সহিতা, সহযোগী অধ্যাপক লুকনা ইয়াসমিন, সহকারী অধ্যাপক শহীদুল হাসান প্রমুখ শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দকে যারা আমাকে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা ও সুপরামর্শ প্রদান করেছেন। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সভাপতি ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন এর প্রতি যিনি গবেষণা সম্পাদনে বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের উৎসের সন্ধান দিয়ে এবং নিজের সংগৃহীত গ্রন্থ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অত্র বিভাগের শিক্ষক এম এ কাউসার এর প্রতি যিনি গবেষণার প্রয়োজনে যেকোন সময় তার সাথে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করার সুযোগ প্রদান করেছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাতে চাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের সদ্য প্রয়াত শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোঃ ফারুক হোসাইন এর প্রতি যিনি আমাকে সবসময় গবেষণা কাজে সুপরামর্শ ও প্রেরণা দিয়েছেন এবং তার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত সকল প্রকার তথ্য এবং ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস), রাজশাহী-এ সংরক্ষিত তথ্য ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. আরিফা সুলতানা এর প্রতি যার কাছ থেকে গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্য পেয়েছি। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ইতিহাস বিভাগের সিনিয়র আপু ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. চাঁদ সুলতানা কাওছার এর প্রতি যিনি আমার গবেষণা সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার সহযোগিতা করেছেন।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাদের প্রতি যাদের ব্যস্ততা সত্ত্বেও মূল্যবান সময় ব্যয় করে গবেষণাকর্মের সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকের সাক্ষাৎকার নিতে পারিনি কারণ অনেকেই তাদের অপারগতা প্রকাশ করেছেন। তবে বেশ কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভব হয়েছে এ পর্যায়ে নাসরিন আহমাদ (বেগম বদরুন্নেসা আহমদের কন্যা), রাশেদা আমিন (সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা), খালেদা খানম (প্রাক্তন হুইপ, জাতীয় সংসদ), মোস্তফা ফরিদ আহমেদ চৌধুরী (উপজেলা চেয়ারম্যান, যশোর), আলী কদর শামসুজ্জামান (মশিউর রহমানের ভাতিজা), মাশকুর রহমান টুটুল (মশিউর রহমানের পুত্র), অ্যাডভোকেট আবু সেলিম রানা

(রওশন আলীর পুত্র), আমিরুল ইসলাম রন্টু (ষাটের দশকের ছাত্র ইউনিয়ন নেতা, যশোর), মো: সাইফুল ইসলাম স্বপন (শামসুল হকের ভাতিজা), জাহিদ খান (হাতেম আলী খানের নাতি), তাহমিনা খান (হাতেম আলী খানের নাতনী) এবং জুলফিকার খান (হাতেম আলী খানের ভাতিজা) তাদের ব্যস্ততা সত্ত্বেও সময় দিয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন। মওলানা ভাসানী সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন সৈয়দ ইরফানুল বারী যিনি মওলানা ভাসানী রিসার্চ সেন্টারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া মওলানা ভাসানীর নিকট আত্মীয়দের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি মওলানা ভাসানীর ৩৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে অংশগ্রহণকারী আলোচক বৃন্দকে যাদের তথ্যভিত্তিক বক্তৃতা গবেষণাকর্মের উৎস হিসেবে কাজ করেছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আবুল মনসুর আহমদের ১১৩তম জন্মবার্ষিকীতে অংশগ্রহণকারী আলোচক বৃন্দের প্রতি যাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লাভ করতে পেরেছি।

আমার গবেষণা কাজের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির মাইক্রোফ্লিম শাখা, জার্নাল শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরি, বেগম পত্রিকা অফিসের সংগ্রহ ও পাঠাগার, টাঙ্গাইল জেলা লাইব্রেরি, ময়মনসিংহ জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যশোর জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। এ সকল গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান রিনা রাণী সরকার ও আলেয়া বেগম-কে যারা গবেষণার প্রয়োজনে লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত তথ্য সংগ্রহে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেছেন।

গবেষণাকর্মটি যাদের সহযোগিতা ছাড়া কঠিন হত তাদের মধ্যে জাতীয় আরকাইভস এর উপ-পরিচালক তাহমিনা আক্তার এবং গবেষণা কর্মকর্তা মোঃ ইলিয়াস মিয়াসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন। গবেষণাকর্মের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য তারা বিভিন্ন সময় আমাকে সংরক্ষিত রেকর্ড ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার প্রাক্তন কর্মস্থল বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ এর সহকর্মীদের প্রতি এবং বিশেষ করে গ্রন্থাগারিক আঞ্জুমান আরা বেগমকে যিনি কলেজ লাইব্রেরি ব্যবহার এবং দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে তথ্য সংগ্রহে আমাকে সহায়তা করেছেন।

গবেষণাকর্মে আরো তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভবপর হতো যদি দেশের বাহিরে গ্রন্থাগার এবং আরকাইভ-এ কাজ করা যেত কিন্তু দুর্ভাগ্য যে প্রাথমিক উৎস্য সংগ্রহের উপযুক্ত সময়ে তথা ২০২০ এবং ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারী এবং তৎপরবর্তীকালে বিদ্যমান নিয়ম-নীতি, বাধ্যবাধকতার কারণে তথ্য সংগ্রহের কাজ যথার্থভাবে করা যায়নি। তাছাড়া অভিসন্দর্ভটি জমা দেওয়ার সময় নির্ধারিত থাকার কারণে যতটা তথ্য উপাত্ত পাওয়া সম্ভব হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই অভিসন্দর্ভ লেখার কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। ইচ্ছা রইলো আমি নিকট ভবিষ্যতে সে সব গ্রন্থাগার এবং আরকাইভস পরিদর্শন করে সংরক্ষিত তথ্য সংগ্রহ করবো এবং অভিসন্দর্ভ সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করবো। আমার জ্ঞানমতে আমি এই অভিসন্দর্ভের প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ করেছি এবং প্রয়োজন মতো সেসব এখানে তুলে ধরেছি। ইতিহাস বিভাগে দু'টি সেমিনার উপস্থাপন করেছি সেখান থেকেও জ্ঞানগর্ভ, মতামত ও নির্দেশনা পেয়েছি। সেমিনারে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্যবিদ্যা বিভাগে অধ্যয়নরত আমার সম্পর্কীয় ভাগ্নি বৈশালী চৌধুরী অত্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ করেছে।

আমি কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি আমার আব্বা, ও সদ্য প্রয়াত মা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, ভাই-বোনদের প্রতি। বিশেষ করে স্মরণ করছি আমার মাকে যিনি আমাকে সবসময় উৎসাহ ও সাহস দিতেন। তিনি বেঁচে থাকলে অপরিসীম খুশি হতেন। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার ভাই মোঃ কুদ্দুস সালামের প্রতি, যিনি গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে বিরামহীনভাবে তাগিদ দিয়েছেন। আমি হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা বোধ করছি আমার অনাগত সন্তানের প্রতি যাকে হারানোর ব্যাথা ভোলার অবিরাম চেষ্টা থেকে গবেষণা কাজে মনোযোগী হই। তাছাড়া বিশেষভাবে ঋণী আমার দুই সন্তানের প্রতি যাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া সময়ের সরাসরি ফসল এই গবেষণাকর্মটি। আমি অবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার জীবন সহযাত্রী মোঃ নাহিদ হাসানকে যার সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ছাড়া এ গবেষণাকর্ম সুসম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

সর্বোপরি আমার এই পিএইচ.ডি গবেষণাকর্ম সম্পাদনে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খাদিজা খাতুন

Abbreviations

APWA : All Pakistan Women's Association.
BBC : British Broadcasting Corporation.
BD : Basic Democracy
BLF : Bangladesh Liberation Force
CENTO : Central Treaty Organization
CIE : Companions of the Indian Empire
CPB : Communist Party of Bangladesh.
CPI : Communist Party of India.
COP (কপ) : Combined Opposition Party.
CIA : Central Intelligence Agency
CSP : Civil Service of Pakistan
CSW : Commission on the Status of Women
DAC (ডাক) : Democratic Action Committee
DUCSU (ডাকসু): Dhaka University Central Student's Union
DIB : District Intelligence Branch
EBDO (এবডো): Elective Bodies Disqualification Order
EPR : East Pakistan Rifles
FAO : Food and Agriculture Organization
GOB : Government of Bangladesh
GPO : General Post Office
LFO (এলএফও): Legal Framework Order
MBE : Member of British Empire
MLA : Member of the Legislative Assembly
MNA : Member of National Assembly
MP : Member of Parliament
NAP (ন্যাপ) : National Awami Party

NDF	: National Democratic Front
PODO	: Public Office Disqualification Order.
PDP	: Pakistan Democratic Party
SEATO	: South East Asia Treaty Organization
PTI	: Primary Training Institute
PDM	: Pakistan Democratic Movement
RSP	: Revolutionary Socialist Party
VP	: Vice President

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
ঘোষণাপত্র		i
প্রত্যয়নপত্র		ii
সারসংক্ষেপ		iii-iv
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		v-vii
শব্দ সংক্ষেপ		viii- ix
ভূমিকা		১-৭
গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা		৮-১৬
প্রথম অধ্যায় :	পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন (১৯৪৭-১৯৭১)	১৭-১২৬
১.১	ভারত বিভাগ (১৯৪৭) ও পটপরিবর্তনের সূচনা	
১.২	মুসলিম লীগ শাসনের রাজনৈতিক চালচিত্র	
১.৩	আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম (১৯৪৯) ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি	
১.৪	পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা (১৯৪৭-১৯৭১)	
১.৫	ভাষাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাজনীতি ও ভাষা আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৫২)	
১.৬	যুক্ত রাজনৈতিক ধারায় যুক্তফ্রন্ট গঠন (১৯৫৪)	
১.৭	পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসন ও গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা (১৯৫৮-১৯৭১)	
১.৮	স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতি (১৯৬৬-১৯৭০)	
১.৯	স্বায়ত্তশাসনের রাজনীতিতে ছয়দফা ও এগারো দফা (১৯৬৬-১৯৬৯)	
১.১০	নির্বাচন (১৯৭০) এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পূর্ণতা অর্জন	
১.১১	সর্বজনীন রাজনীতি ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা (১৯৭১)	
দ্বিতীয় অধ্যায় :	বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চল	১২৭-২২৪
২.১	শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)	
২.২	আনোয়ারা খাতুন (১৯১৯-১৯৮৮)	
২.৩	বদরুন্নেসা আহমদ (১৯২৪-১৯৭৪)	
২.৪	নূরজাহান মুরশিদ (১৯২৪-২০০৩)	
তৃতীয় অধ্যায় :	বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল	২২৫-৩০৫
৩.১	মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)	
৩.২	আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)	
৩.৩	শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫)	
৩.৪	হাতেম আলী খান (১৯০৪-১৯৭৭)	
চতুর্থ অধ্যায় :	বৃহত্তর যশোর অঞ্চল	৩০৬-৩৪১
৪.১	মশিউর রহমান (১৯১৭-১৯৭১)	
৪.২	রওশন আলী (১৯২১-১৯৯৪)	
পঞ্চম অধ্যায় :	বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চল	৩৪২-৩৭৫
৫.১	তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (১৯১১-১৯৬৯)	
৫.২	সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)	
ষষ্ঠ অধ্যায় :	অন্যান্য অঞ্চল (রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম)	৩৭৬-৩৯৪
উপসংহার		৩৯৫-৩৯৮
তথ্যসূত্র		৩৯৯-৪১১
পরিশিষ্ট		৪১২-৪৫৪
ছবি কথা বলে		

ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সময়কালটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। "পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন (১৯৪৭-১৯৭১) : আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির নির্ধারিত সময়কালের ভূখণ্ডটি বর্তমানে বাংলাদেশ নামে পরিচিত। প্রশাসনিক সুবিধার্থে ১৯০৫ সালে বৃহৎ প্রদেশ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বিভক্ত করে 'পূর্ববাংলা ও আসাম' প্রদেশ গঠন করা হয়। নবগঠিত পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ থেকে আসাম অংশটি পৃথক করলে যে অঞ্চল অবশিষ্ট থাকে তাকেই পূর্ববাংলা বলে অভিহিত করা হতো। এটি বৃহৎ বাংলার পূর্বাংশ বলে একে পূর্ববাংলা নামকরণ করা হয়। ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করতে সম্মত হলে 'ভারত স্বাধীনতা আইন-১৯৪৭' অনুযায়ী ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হয়ে পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশ ও বাংলার পূর্বাংশ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়। বলা হয়ে থাকে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র মুসলমানেরা আযানের ধ্বনি দিয়ে এ নতুন জাতি ও রাষ্ট্রের জন্মকে স্বাগত জানিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ৬-৭ জুলাই আসাম প্রদেশের সিলেট জেলায় অনুষ্ঠিত গণভোটের ফলাফলে সিলেট পূর্ববাংলার সাথে যুক্ত হয়। উল্লেখ্য, পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের ক্ষেত্রে কোন প্রাকৃতিক সীমারেখা অনুসরণ করা হয়নি। কংগ্রেস থেকে সরদার বল্লভভাই প্যাটেল (১৮৭৫-১৯৫০), ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ (১৮৮৪-১৯৬৩) ও মুসলিম লীগ থেকে লিয়াকত আলী খান (১৮৯৬-১৯৫১), সরদার আবদুর রব নিশতার (১৮৯৯-১৯৫৮) এবং স্যার সিরিল র‌্যাডক্লিফকে (Cyril Radcliffe) (১৮৯৯-১৯৭৭) চেয়ারম্যান করে মোট পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে সীমানা কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব অংশ আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত হয়। তবে দেশভাগের পরেও প্রায় এক দশক সরকারি কাগজপত্রে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামকরণে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটির অধিকৃত অঞ্চলটি সাধারণভাবে পূর্ববাংলা হিসেবেই উল্লেখিত হয়েছে। যদিও পূর্ববাংলা নামের পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তান নামের যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা-নেতৃত্বের বাইরে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে পূর্ব পাকিস্তান শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক ইত্তেহাদ* এর সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) এবং তমদ্দুন মজলিস সম্পাদক আবুল কাশেম (১৯২০-১৯৮১) ভাষা বিষয়ক প্রস্তাবে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা, আদালত ও অফিসের ভাষা হবে বাংলা এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে বাংলা ও উর্দু। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি নাইমউদ্দিন আহমদকে (১৯২৪-১৯৬৭) আহবায়ক করে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠন করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের সময় সংগঠনের নামকরণ করা হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী

মুসলিম লীগ'। ১৯৫৫ সালের ২২ অক্টোবর যখন মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয় তখনও দলের নাম 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদে দেওয়া ভাষণে 'পূর্ববাংলা' শব্দের পক্ষে বক্তৃতা করেন কিন্তু তার দলের নামে জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তান ব্যবহার করা হয়। আওয়ামী লীগের নামের আগে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে পূর্ববাংলা নামকরণের ব্যাপারে তেমন কোনো জোরালো বক্তব্য কেউ কখনো প্রদান করেননি। পরবর্তীতেও পূর্ববাংলা অংশের মানুষ তাদের জীবনযাত্রাসহ প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দের ব্যবহার করেছেন। দেশভাগের পর থেকেই মূলত এ অঞ্চলের মানুষ অধিকার আদায় তথা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় থেকেই 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম ব্যবহার করতে থাকে এবং এ নামের সফল পরিসমাপ্তির মাধ্যমে 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের সংবিধান প্রণীত হলে পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় চারটি প্রদেশ (পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান) বিলুপ্ত করে 'পশ্চিম পাকিস্তান' নামকরণ করে এক ইউনিট গঠন করা হয় এবং দাপ্তরিকভাবে পূর্বাঞ্চলীয় অংশটির নাম পূর্ব পাকিস্তান করা হয়। মূলত ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ (খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ নিয়ে যে অঞ্চল গঠিত হয় সেটাই পূর্ব পাকিস্তান) অংশ ১৯৭১ সালের আগ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান হিসেবেই ইতিহাসের অংশ হয়। বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের ইতিহাসের ধারায় (১৯৪৭-১৯৭১) সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে সাংবিধানিকভাবে 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া দেশভাগের পর থেকেই পাকিস্তানের ইতিহাস পর্যালোচনায় পূর্ব ও পশ্চিম অংশের বহুমুখী প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। বর্তমান বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায় আবর্তিত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে। উল্লেখ্য, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের বহুমুখী শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সামগ্রিক প্রতিবাদ, প্রতিরোধের ফসল। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক পর্যায় চিহ্নিতকরণে প্রদত্ত গবেষণার শিরোনামে ব্যবহার করা হয়েছে 'পূর্ব পাকিস্তান'। পাশাপাশি ঘটনার ধারাবাহিকতায় 'পূর্ববাংলা' নামটিও গবেষণা অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন চিহ্নিত করতে বর্তমান বাংলাদেশকে বৃহত্তর ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, যশোর অঞ্চলে বিভক্ত করে আঞ্চলিক রাজনীতি বিশ্লেষিত হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের বাকি অঞ্চল নিয়ে আলাদা একটি অধ্যায় সংযুক্ত আছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে (১৯৪৭-১৯৭১) উল্লিখিত অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে তাদের জন্মস্থান অনুযায়ী (কিছু ব্যতিক্রম) অঞ্চলে বা জেলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থীতা বণ্টন বা নির্বাচনী অঞ্চল নির্ধারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জন্মস্থানকেই প্রাধিকার দেওয়া হয়। যদিও একাধিক প্রার্থীতার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের জনপ্রিয়তার ও কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। বেশিরভাগ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর নিজ অঞ্চলভুক্ত এম এল এ হিসেবে নির্বাচিত হন। তাছাড়া প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতা-নেতৃত্ব নিজ অঞ্চল থেকে প্রাথমিক রাজনৈতিক জীবন শুরু করে ধীরে ধীরে জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্বে আসীন হন।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের গঠন কাঠামোকে যৌক্তিক কাঠামো প্রদানের লক্ষ্যে ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতীত মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন (১৯৪৭-১৯৭১) সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পটপরিবর্তন চিহ্নিত করতে মুসলিম লীগের দল এবং সরকার হিসেবে দলটির নেতৃবৃন্দের কর্মকাণ্ডের ও নীতির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে পাশাপাশি মুসলিম লীগ ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের জন্ম এবং বিকাশের পর্যায়ে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানের নেতা-নেতৃত্বসহ সকল মানুষ মুসলিম লীগের ধর্মীয় আদর্শের অন্ধভক্ত হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান বা সমর্থন করে। কিন্তু খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে আলাদা রাজনৈতিক আদর্শভিত্তিক রাজনীতি এবং দল গঠিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলন কোন ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না এ কথা ঠিক কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে (Two Nation Theory) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পায়। এ আন্দোলন স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্যকে নির্ভর করেই পরিচালিত হয়। ১৯৪৭ সাল পরবর্তী রাজনৈতিক এই পরিবর্তনটা ব্যাপক একটি পটপরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এক্ষেত্রে বড় প্রমাণ ছিল- নতুন গঠিত দল আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্পূর্ণ ভিন্ন লক্ষ্য ও কর্মসূচিভিত্তিক রাজনৈতিক পথচলা। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে রাজনীতিতে নতুন এবং সক্রিয় কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষভাবে উল্লিখিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির (১৯৪৭-১৯৭১) কালানুক্রমিক ধারায় কমিউনিস্ট রাজনীতির অনুপ্রবেশ ও এর প্রভাব অত্যাবশ্যকীয় একটি বিষয়। এই অধ্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পর্যায়গুলো যথাসম্ভব বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া কমিউনিস্ট আদর্শ কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণের সূচনা করেছে তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রাদেশিকতা প্রসঙ্গে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হলে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি বাদ দিয়ে সংখ্যা সাম্যনীতি গ্রহণ করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে দুই ইউনিট হিসেবে গণ্য করা হয়। মওলানা ভাসানী ও কমিউনিস্টরা সংখ্যা সাম্যনীতির ঘোর বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে সোহ্‌রাওয়ার্দী এ নীতির জোরালো প্রবক্তা হয়ে পক্ষাবলম্বন করেন। আলাদা প্রদেশ আলাদা ভাষা সংস্কৃতি হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের দাবিও ভিন্ন ছিল। রাজনীতিতে নতুন সূচক প্রাদেশিকতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি ভিন্নধারায় চালিত হতে থাকে, যাকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

দেশভাগের পর পাকিস্তানে ভাষা নিয়ে নতুন পটপরিবর্তন শুরু হয়। ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে মুসলিম লীগের মুসলিম ও 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সন্ধিহান করে তোলে। মূলত ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে। তাছাড়া রাজনীতিতে নতুন মাত্রা তথা ছাত্রসমাজ প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। মুসলিম লীগের ধর্মান্ধ রাজনৈতিক আদর্শের পরিবর্তে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি নির্ভর ভাষা বা

জাতি ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রসার হয়। তাছাড়া ভাষা আন্দোলন সকল মতাদর্শী রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ তথা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বামপন্থি আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে, যাকে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হিসেবে মূল্যায়ন করা যায়। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ কখনও কল্পনা করতে পারেনি যে, দেশভাগের একেবারে শুরুতে উর্দু ভাষা নিয়ে বিতর্ক শুরু হবে। ভাষা, সংস্কৃতিসহ ভৌগোলিক ইত্যাদি সূচকের ভিত্তিতে দুই অঞ্চলের পার্থক্যটা ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের আগে থেকেই ছিল। তবে ভারত ভাগের পর এটা পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে 'তারা', 'আমরা' এমন একটি বিভাজন দেখা দেয় এবং এসকল বিষয়গুলো ক্রমান্বয়ে প্রকট হতে থাকে এবং স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া এসময় উপনিবেশ পরবর্তী জাতিরাষ্ট্রের দাবি বিশ্বের সকল দেশে লক্ষ্য করা যায়। ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান থাকায় একীভূত পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা স্থায়ী করা সম্ভব ছিলনা। পাকিস্তান বহুজাতিক রাষ্ট্র হওয়ায় 'পাকিস্তানি' জাতি সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ ছিলনা। তাছাড়া পাকিস্তানে প্রথম থেকেই জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে পাঞ্জাবিদের আধিপত্য পাকিস্তানি জাতি গঠনে সহায়ক ছিলনা। পাঞ্জাবিরাই পাকিস্তানের রাজনীতি ও অর্থনীতির চালিকা শক্তি ছিল অথচ বাঙালি মুসলমানেরা যখন পাকিস্তান গঠনে তাদের সর্বাত্মক সমর্থন প্রয়োগ করে তখনো পাঞ্জাবসহ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জনসাধারণ পরিস্থিতি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলো। পূর্ব পাকিস্তানের মতো পশ্চিম পাকিস্তানের তিনটি প্রদেশ পাঞ্জাবিদের শাসন-শোষণের স্বীকার ছিল। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেও একই অবস্থা বজায় থাকায় একক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়নি।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শী দল এবং নেতৃত্বের যৌথ প্রয়াসে যুক্তফ্রন্ট নামক রাজনৈতিক জোট গঠন এবং পরবর্তীতে ভাঙ্গনের আলোকে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে। সামরিক শাসনে প্রদত্ত নেতা-নেত্রীর স্ব স্ব অবস্থান বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং আঞ্চলিক নেতৃত্বের ভূমিকা মূল্যায়ন করা বর্তমান গবেষণা কর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। তাছাড়া স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিটি পর্যায়ের আন্দোলনের মাধ্যমে কিভাবে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং এই পটপরিবর্তনে প্রদত্ত আঞ্চলিক নেতৃত্বের অবস্থান এবং ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ পটপরিবর্তন সেটি প্রমাণের সাথে সাথে এ স্বাধীনতা অর্জনে পথনির্দেশকের ভূমিকা পালনকারী বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে- এ গবেষণা অভিসন্দর্ভে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চল ও আঞ্চলিক নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সময়কালে বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চল সবসময়ই সরব অবস্থানে ছিল। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের পূর্ব অংশের প্রশাসনিক ইউনিট ছিল ঢাকা। যার কারণে ঢাকা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু। এ অঞ্চলের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ তৎকালীন (১৯৪৭-১৯৭১) রাজনীতিতে নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি

করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের প্রধান নেতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। গবেষণা অভিসন্দর্ভে তাকে আঞ্চলিক পর্যায়ে মূল্যায়ন করলেও তিনি ছিলেন জাতীয় পর্যায়ের নেতা। তার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে আলোচনায় তিনি কিভাবে স্কুল জীবন থেকে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হলেন এবং আঞ্চলিক রাজনীতি থেকে জাতীয় পর্যায়ের নেতা তথা স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হয়ে উঠলেন তার কালানুক্রমিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা, ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জের রাজনীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাঙালি জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান বাল্যকাল থেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার ভূমিকা সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে গবেষণা অভিসন্দর্ভে। পাকিস্তান আন্দোলনে তার ভূমিকা, 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠায় তার অবস্থান বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের সবটুকু অংশ ব্যাপিত করেছেন 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র বিকাশ তথা একটা দলীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠায়। এ রাজনৈতিক দলের সকল সংকটকালীন সময়ে শক্ত ভূমিকা পালনের মাধ্যমে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রধান চালিকা হিসেবে কাজ করেছেন। সর্বোপরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তিনি অতুলনীয় ভূমিকা রেখেছেন।

ঢাকা অঞ্চলের একজন উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক নেতৃত্ব আনোয়ারা খাতুন। তিনি বাংলাদেশের স্বতন্ত্র আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দল 'আওয়ামী লীগ' গঠন এবং প্রসারে সরাসরি ভূমিকা পালন করেছেন। দেশ বিভাগপূর্বকাল থেকেই আনোয়ারা খাতুন রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় তথা আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ, ভাষা আন্দোলনের সকল পর্যায়ে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন। নারী কল্যাণ ও জাগরণেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিসভার দুই নারী সদস্য বেগম বদরুন্নেসা আহমদ ও নূরজাহান মুরশিদ। যদিও তারা বৃহত্তর ঢাকা আঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেননি; তথাপিও তাদের রাজনৈতিক জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত হয়েছে ঢাকা অঞ্চলে। বাংলাদেশের রাজনীতির প্রতিটি পর্যায়ে এ দু'জন নারী নেত্রী সোচ্চার ছিলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনীতির মাধ্যমে তারা দুজনই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং ভাষা আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সামরিক সরকারের দমন-নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলন তথা ছয়দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ভূমিকা, ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সদস্য নির্বাচিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়েছেন। তাছাড়া বেগম বদরুন্নেসা আহমদ ও নূরজাহান মুরশিদ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে দেশের ভেতরে এবং বাহিরে বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিসভায় বেগম বদরুন্নেসা আহমদ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এবং নূরজাহান মুরশিদ স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও সুফিয়া কামাল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সাংবাদিকতা জগতের অগ্রদূত তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে বৃহত্তর বরিশাল

অঞ্চলের একজন নেতা হিসেবে গবেষণা অভিসন্দর্ভে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তার সম্পাদনায় প্রকাশিত *ইত্তেফাক* পত্রিকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির ক্ষেত্রে কীভাবে সাংস্কৃতিক ধারায় পটপরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ভিন্ন কর্মসূচি ও আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে মানিক মিয়া দলীয় কোনো পদ গ্রহণ না করেও সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছেন। তার জীবন ও তৎকালীন রাজনীতিতে *ইত্তেফাক* পত্রিকার ভূমিকা তৃতীয় অধ্যায়ে সুনির্দিষ্টভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের আরেক নেত্রী বেগম সুফিয়া কামাল। যদিও তিনি কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত তথাপিও পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় (১৯৪৭-১৯৭১) তার অবদান মূল্যায়ন আবশ্যক। সুফিয়া কামালের প্রাথমিক জীবন আলোচনায় বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের আঞ্চলিক রাজনীতি উল্লেখ করা হয়েছে। বরিশাল অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করলেও জীবনের বেশিরভাগ সময় ঢাকায় অবস্থান করায় তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ঢাকা অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম একজন সফল আঞ্চলিক নারী নেত্রী হিসেবে বিবেচ্য।

বৃহত্তর যশোর অঞ্চলের আঞ্চলিক রাজনীতি এবং অত্র অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য দুইজন আঞ্চলিক নেতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। যশোরের আঞ্চলিক রাজনীতির কর্ণধার ছিলেন মশিউর রহমান এবং রওশন আলী। ভারত বিভাগ পরবর্তীকালের প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রদত্ত দুই নেতার কী ভূমিকা ছিল তা এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। মশিউর রহমান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের পর এ দলে যোগদান করেন এবং যশোর অঞ্চলে দলীয় সাংগঠনিক বিকাশ সাধন করেন। অত্র অঞ্চলে ভাষা আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। মশিউর রহমান প্রথমে আঞ্চলিক নেতা হিসেবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলেও তিনি ছিলেন জাতীয় পর্যায়ের প্রথম সারির নেতা। ছয়দফা আন্দোলন, সামরিক শাসন বিরোধী প্রতিটি আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া মশিউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের একজন শহীদ সাংসদ। এ অধ্যায়ে অত্র অঞ্চলের আরেক উল্লেখযোগ্য নেতা রওশন আলীর আওয়ামী মুসলিম লীগে অবদান, ভাষা আন্দোলন, ছয়দফা আন্দোলনসহ মুক্তিযুদ্ধে বহুমুখী অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল বৃহত্তর ময়মনসিংহের আঞ্চলিক রাজনীতি এবং অত্র অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও কর্ম সম্পর্কে। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের দাবি আদায়ে কাজ করেছেন। তাছাড়া তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি। তার প্রাথমিক জীবন থেকে শুরু করে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আলোকে তার ভূমিকা ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে তার অবদান, ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা, সামরিক শাসনের

ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে তার অবস্থান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার সংশ্লিষ্টতা তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের বাম রাজনীতির ধারায় তার মতাদর্শ সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের অন্যতম একজন নেতা আবুল মনসুর আহমদ। তার জীবনের প্রত্যেক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আলোকে অত্র অঞ্চলের রাজনীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আবুল মনসুর আহমদের আঞ্চলিক রাজনৈতিক জীবন এবং পরবর্তীতে জাতীয় রাজনীতিতে তথা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ভূমিকা পৃথকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। অত্র অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত টাঙ্গাইলও রাজনৈতিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এ অঞ্চলের সর্বজনীন নেতা শামসুল হক। তার নাতিদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় গবেষণা অভিসন্দর্ভে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে তৎকালীন শক্তিশালী দল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রকৃত পটপরিবর্তনের সূচনা করেন। তিনি 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠনে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। প্রতিষ্ঠাকালে তিনি 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র সম্পাদক ছিলেন। তাছাড়া ভাষা আন্দোলনে শামসুল হক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মওলানা ভাসানীর বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে খ্যাত হাতেম আলী খান টাঙ্গাইলের আঞ্চলিক রাজনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একজন নেতৃত্ব। জীবনের শুরুতে কৃষক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট থাকলেও তার অঞ্চলে আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনীতির বিকাশ সাধনে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। তাছাড়া অত্র অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবেও হাতেম আলী খানের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে প্রদত্ত অধ্যায়ে।

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলের রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে উপর্যুপরি অধ্যায়ে আলোচনা আছে তথাপিও অন্যান্য অঞ্চল ও আঞ্চলিক নেতানেতৃত্বের ভূমিকা যথাসম্ভব ষষ্ঠ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর্যায়ে ভূমিকা পালনকারী উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বের জন্মস্থানুযায়ী ভূমিকা এ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উপর্যুক্ত অধ্যায়সমূহের আলোচনার ভিত্তিতে উপসংহার সংযুক্ত করে গবেষণাকর্মটি শেষ হয়েছে। অর্থাৎ সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে উপসংহার অংশে প্রদত্ত গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বা সিদ্ধান্ত চিহ্নিত করে গবেষণা অভিসন্দর্ভের সফল প্রচেষ্টা সম্পাদিত হয়েছে। তাছাড়া গবেষণা অভিসন্দর্ভের একেবারে শেষাংশে গবেষণায় ব্যবহৃত ভিন্ন ভিন্ন উৎস, গ্রন্থপঞ্জি, পরিশিষ্ট ও ছবি সংযোজন করা হয়েছে।

গবেষণা সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা

১৯৪৭-১৯৭১ সাল মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি সম্পর্কিত বেশ কিছু গবেষণা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- একাডেমিক গ্রন্থ, স্মৃতিচারণমূলক রচনা ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির (১৯৪৭-১৯৭১) ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় নিয়ে গবেষণা হয়েছে। আহমেদ কামাল রচিত *'State Against The Nation, The Decline of the Muslim League in Pre-independence Bangladesh, 1947-1954'* (Australian National University) শীর্ষক একটি মৌলিক গবেষণা। এ গবেষণাকর্মে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই প্রদত্ত সময়কালের ঘটনাবলী দ্বারা পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পূর্ববাংলার বৈষম্যগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভে যে দলের নেতৃত্বে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির দাবিতে আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলো, মাত্র ২৩ বছর ৭ মাসের মধ্যে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্ববাংলায় সেই দলের অস্তিত্ব সংকটে পড়ার মূল কারণ কী, সে বিষয়ে তিনি গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছেন। কোন অবস্থার প্রেক্ষাপটে পূর্ববাংলার মানুষের আশাভঙ্গ হলো এবং শোষণ ও বঞ্চনা বোধ করলো, কী কারণে মুসলিম লীগ তথা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও তাদের সহযোগীদের প্রতি পূর্ববাংলার মানুষ এত দ্রুত তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল, এ বিষয়ে বিভিন্ন দিক তার গবেষণায় উঠে এসেছে। দেশ ভাগের (১৯৪৭) পর পূর্ববাংলায় খাদ্য ঘাটতি, খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি পরিস্থিতি পূর্ববাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। খাদ্য সংকটকে কেন্দ্র করে কৃষি ও কৃষক সম্প্রদায়ের সংকট, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, বিরোধী দলীয় রাজনৈতিকদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক টানাপোড়েন সম্পর্কে গবেষক অত্যন্ত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করেছেন। তবে পূর্ববাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যা পূর্ববাংলার মানুষের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব গঠন করতে মূল উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল সে সকল বিষয় গবেষণায় অনুপস্থিত রয়েছে।

লেলিন আজাদ, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ* শীর্ষক পিএইচ.ডি গবেষণাকর্মটি ১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পাদিত হয়। এখানে গবেষক ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদন পদ্ধতি ও সামাজিক শ্রেণি-বিভাজনের প্রকৃতি উৎঘাটন করেছেন। তাছাড়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের বিকাশধারা পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষক রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোচনা করলেও রাজনৈতিক তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর বেশি জোর দিয়েছেন। এখানে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক নেতাকর্মীদের ভূমিকা গুরুত্ব পায়নি।

বাংলাদেশের রাজনীতি, ১৯৫৩-১৯৬৬ শীর্ষক পিএইচ.ডি গবেষণাকর্মটি মোঃ খায়রুল আহসান কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০০৫ সালে সম্পাদন করা হয়। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের

রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে বোঝার জন্য গবেষণাটি যথেষ্ট সহায়ক। গবেষক এখানে ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনে ভিন্ন ভিন্ন দলের ভূমিকা এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাছাড়া রাজনৈতিক ঘটনা বর্ণনায় সামরিক শাসনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে অনুপস্থিত এবং আঞ্চলিক নেতা-কর্মীদের ভূমিকা ও তুলনামূলক আলোচনা করা হয়নি। একটি অঞ্চল বা দেশের রাজনীতি বোঝা বা বিশ্লেষণের জন্য রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সূচকগুলো ধারাবাহিকভাবে চিহ্নিত করা আবশ্যক। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে এ গবেষণাকর্মটিতে পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির সামগ্রিক বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট পর্যালোচনা পরিলক্ষিত হয় না।

গবেষক মোস্তারী আহমেদ *"বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এর ভূমিকা"* শীর্ষক এম ফিল ২০০৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পাদিত হয়। অভিসন্দর্ভের শুরুতেই গবেষণার তাত্ত্বিক বিন্যাস দেখানো হয়েছে। এর পরেই গবেষক পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের সামগ্রিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন। অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে আগরতলা মামলা দায়ের এবং অভিযোগ গঠন নিয়ে প্রামাণিক তথ্য উপস্থাপনসহ এ মামলা পরিচালনার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকার যে ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং বিচারকাজ পরিচালনা করে সে বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। আগরতলা মামলার অভিযোগ খণ্ডনের নানা দিক তুলে ধরেছেন গবেষণায়। আগরতলা মামলার পেছনে আইয়ুব সরকারের কী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এবং মামলার সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পৃক্ততার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে গবেষক আগরতলা মামলার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের স্বরূপ উম্মোচন করেছেন। গবেষণার শেষ অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আগরতলা মামলার ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। এ মামলার উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক গুরুত্ব ও ফলাফল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে কতটা গুরুত্ব বহন করে সেটা তুলে ধরা প্রয়োজন যেটা আমি আমার বর্তমান এই গবেষণায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

এ টি এম আতিকুর রহমান *"পূর্ববাংলার বাম রাজনীতি : ১৯৪৭-১৯৭১"* শিরোনামে তার পিএইচ.ডি ২০০৮ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্পাদন করেন। এ গবেষণাকর্মে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনাসমূহে বামপন্থিদের সংশ্লিষ্টতার আলোকে ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে বাম রাজনীতির প্রভাব এবং সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়নি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থিদের স্বতন্ত্র ভূমিকা মূল্যায়ন অনুপস্থিত। তাছাড়া বাম রাজনীতি বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কৌশল ও সংকটগুলো সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়নি যা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বোঝার জন্য আবশ্যক একটি বিষয়। ১৯৪৭-১৯৭১ সাল মধ্যবর্তী সময়ে রাজনৈতিক কৌশলগত অবস্থা এবং পরবর্তী রাজনীতিতে এর প্রভাব জানতে বামপন্থিদের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য-উপাত্তভিত্তিক গবেষণা প্রয়োজন। আমার এই অভিসন্দর্ভে বিষয়টি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

মোঃ হাবিবউল্লাহ বাহার কর্তৃক *"পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য ১৯৪৭-১৯৬৯ : পার্লামেন্টের ভাষ্য"* শীর্ষক পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৪ সালে সম্পাদিত হয়। পূর্ববাংলার আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়ে আইন সভায় যে সকল বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে মূলত তার ওপর ভিত্তি করে গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভে গবেষক পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্যের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। দুই অঞ্চলের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য, সম্পদের অসম বন্টন, মাথাপিছু ভূমির মালিকানা বৈষম্য, কর্মসংস্থান ও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যনীতি, সামরিক ব্যয় বরাদ্দ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে পূর্ববাংলার প্রতি বিমাতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা, বিদেশি সাহায্য, ঋণদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতির বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন। তবে গবেষক ঐতিহাসিকভাবে বিরাজমান এ অঞ্চলের মানুষের ভাষা, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম, জীবনমান, মূল্যবোধ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ঐতিহ্য ইত্যাদি পূর্ববাংলার মানুষকে কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি জনগোষ্ঠী থেকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে সেসব বিষয়ে গবেষক কোন বিশ্লেষণ করেননি। যদিও প্রদত্ত গবেষণাকর্মটি বৈষম্যের ব্যাপকতা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে এবং গবেষক আইন সভার বিতর্ককে ভিত্তি করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন কিন্তু অন্যান্য প্রাথমিক উৎস অব্যবহৃত রয়েছে। জাতিগত ও ভাষাগত পার্থক্য পূর্ববাংলার মানুষের স্বতন্ত্রতা এবং রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের উপাদান হিসেবে কাজ করেছে সে বিষয়ের প্রতিও আলোকপাত করা প্রয়োজন।

গবেষক মোশাররফ হোসেন *"১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা"*, এম.ফিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪। এই অভিসন্দর্ভটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আইনগত কাঠামো আদেশ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে নির্বাচন ব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তেহার ও প্রচারণা কার্যক্রম সম্পর্কে এবং এ নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। গবেষক তার গবেষণায় গণমাধ্যম ও ১৯৭০ সালের নির্বাচন নিয়ে তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট পর্যায় তথা ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে ঘিরেই তার গবেষণা পরিচালিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাস কালপর্বের (১৯৪৭-১৯৭১) সামগ্রিক বিষয় ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন চিহ্নিত করা হলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক গবেষণা ক্ষেত্র সমৃদ্ধ হবে। আমার গবেষণাকর্মে এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের এবং আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা যা এ গবেষণা অভিসন্দর্ভে অনেকটাই উপেক্ষিত সে বিষয়ে মনোনিবেশ করা হয়েছে।

মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সিকদার, *"বাংলাদেশের বাম রাজনীতি ১৯৪৭-১৯৭১"*, পিএইচ.ডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬। এ গবেষণাকর্ম পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। গবেষক প্রদত্ত গবেষণায় উপমহাদেশে বাম রাজনীতির উত্থান ও বিকাশ, পূর্ববাংলায় বাম মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব, ষাটের দশকের স্বাধিকার আন্দোলনসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনসহ অন্যান্য আন্দোলন যেমন- ছয়দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান,

সত্তরের নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাম রাজনীতির ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া গবেষক বাংলাদেশে বামপন্থিদের রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণ, সীমাবদ্ধতা ও পরিণতি তুলে ধরেছেন। গবেষক বাংলাদেশের বাম রাজনীতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে গিয়ে অন্যান্য মতাদর্শী রাজনীতি বা রাজনৈতিক রূপান্তর চিহ্নিত করেননি। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ (১৯৪৭-১৯৭১) এ পর্বের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক কালক্রম চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বর্তমান বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অনুষঙ্গ চিহ্নিত করে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপট ও ফলাফল আলোচনার দাবিদার।

"পূর্ব বাংলার আর্থ সামাজিক জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৪৭-১৯৭১)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পূর্ববাংলার রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ সময়কালের উপর রচিত একটি মৌলিক গবেষণা। মোঃ আবদুর রহিম কর্তৃক ২০১৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি গবেষণাটি সম্পাদিত হয়। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে ঘটনাবহুল সময়ে এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। গবেষক পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ভূগোল ও জাতি গঠন আলোচনায় এ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, জলবায়ুসহ অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক অবয়ব, মানসিক গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য উপস্থাপন করেছেন। পূর্ববাংলায় পেশাভিত্তিক সমাজ কাঠামো বর্ণনায় ধর্ম, সমাজ ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। তাছাড়া পূর্ববাংলার রাজনীতি ও রাজনৈতিক ঘটনা বর্ণনায় সমগ্র পাকিস্তানের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্ববাংলার (পূর্ব পাকিস্তানের) রাজনীতির আদর্শিক পরিবর্তন সুনির্দিষ্টভাবে ইঙ্গিতসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনীতি গবেষণাযোগ্য বিষয়। এ গবেষণায় গবেষক পূর্ববাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক সাংস্কৃতিক চর্চা এবং এটা কিভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিস্তার করে তার মূল্যায়ন করেছেন। রাজনৈতিক আলোচনার পাশাপাশি পূর্ববাংলার সমাজ এবং অর্থনীতি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে গবেষণা অভিসন্দর্ভে। কিন্তু পূর্ববাংলার রাজনীতি (১৯৪৭-১৯৭১) আঞ্চলিক ধারায় বিশ্লেষণ আবশ্যক যা আমার বর্তমান এই অভিসন্দর্ভে আলোচনা ও পর্যালোচনা করার প্রচেষ্টা নিয়েছি।

"পূর্ব বাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলন (১৯০১-১৯৭১)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মোছাঃ রূপালী খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০২০ সালে সম্পাদন করেন। পূর্ববাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি একটি বিশদ বর্ণনামূলক গবেষণা অভিসন্দর্ভ যেখানে পূর্ববাংলার নারী শিক্ষা প্রসার এবং এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। গবেষক উনিশ ও বিশ শতকে পূর্ববাংলায় নারী জাগরণ ও আন্দোলনে নারীদের সাফল্য বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বাঙালি নারীর চেতনা এবং বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে যা পূর্ববাংলার নারী সমাজের সামগ্রিক চিত্র জানার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হিসেবে বিবেচ্য। তবে পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ববাংলা) নারী সমাজ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালের রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে যে অগ্রগামী ভূমিকা রেখেছেন তা গবেষণায় তুলে ধরা হয়নি। এক্ষেত্রে অঞ্চল ভিত্তিক নারী নেতৃত্বের ভূমিকা গবেষণাযোগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এ বিষয়টি আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

“বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারী ১৯৫২-১৯৭১” শীর্ষক এম.ফিল গবেষণা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২০। গবেষক শান্তা পত্রনবীশ প্রথম অধ্যায়ে সংজ্ঞা ও তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখানো হয়েছে। তবে ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সময়ে আন্দোলনে নারীর অঞ্চল ভিত্তিক কর্মসূচি বা কার্যক্রম গবেষণায় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং তৎকালীন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনে নারীর অংশগ্রহণ ও কার্যক্রম এ গবেষণাকর্মটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্যায়ে পূর্ববাংলার প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক সংগঠন ও মুক্তিযুদ্ধকালে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সাথে নারীর সম্পৃক্ততা যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। পূর্ববাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) রাজনৈতিক যুগসন্ধিক্ষণে পথ-নির্দেশকের ভূমিকা পালনকারী নারীদের নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যা আমার এই গবেষণা কর্মে তুলে ধরার প্রয়াস থাকবে।

Dominique Lapierre & Larry Collins, *Freedom at Midnight*, William Collins, UK, 1975, অনুবাদ রবিশেখর সেনগুপ্ত, দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০২০ সালে প্রকাশিত হয়। এটি ভারত স্বাধীনতা আন্দোলন এবং দেশভাগের ঘটনা সম্পর্কে নন-ফিকশন গ্রন্থ। এখানে ব্রিটিশ শাসনের শেষ বছরের (১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮) রাজনৈতিক ঘটনা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ভারতীয় রাজকুমারদের আভিজাত্যপূর্ণ জীবনধারার বর্ণনা এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রতি দেশীয় রাজ্যের রাজাদের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থে ধর্মের ভিত্তিতে কিভাবে ব্রিটিশ ভারত (ভারত ও পাকিস্তান) বিভক্ত হলো তার বিশ্লেষণ রয়েছে। ভারত বিভাজনকালে ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মের ভিত্তিতে যে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে তার তথ্য উপাত্তভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান ক্রোধ এবং তাদের সাম্প্রদায়িক নেতাদের দ্বারা কিভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন তার বর্ণনা রয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় এবং দাঙ্গা পরবর্তীকালে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ ত্যাগ করে যার যার নির্দিষ্ট ধর্মীয়গোষ্ঠী এবং স্থান অনুযায়ী অবস্থান নেয়-সে বিষয়টা দেখানো হয়েছে। তাছাড়া ধর্মীয় চরমপন্থিদের দ্বারা সংঘটিত ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আলোচনা রয়েছে। এ গ্রন্থে ভারত বিভাগ পরিকল্পনার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রিয়্যার অ্যাডমিরাল লুই মাউন্টব্যাটেনের ভারত বিভাগ পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাঞ্জাব, বাংলা এবং কাশ্মীরের বিভক্তিকরণের বিষয় এবং সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান সিরিল র‍্যাডক্লিফের ভারত বিভাগ পরিকল্পনার মানচিত্র তৈরির বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। এ আলোচনার পাশাপাশি তৎকালীন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর রাজনৈতিক ভূমিকা, রাজনৈতিক বাস্তবতায় তার অসহায়ত্ব ও বিষণ্ণতা এবং পরিস্থিতি বিচারে গান্ধীর নীরব ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়সহ মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। তৎকালীন রাজনীতি বিচারে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জওহরলাল নেহেরু, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জীবন এবং রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা

পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে আভাস পাওয়া যায় ১৯৪৭ স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতি কোন পথে ধাবিত হতে পারে এবং পূর্ব পাকিস্তানে কি ধরণের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে, যার ফলস্বরূপ ভাষা আন্দোলনে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ও অবশেষে পশ্চিম পাকিস্তান হতে পৃথক হওয়ার প্রয়াস দেখা যায়।

অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫* (বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ১৯৮২, ঢাকা)। এটি স্মৃতিচারণমূলক একটি গ্রন্থ। লেখক অলি আহাদ স্মৃতিচারণের মাধ্যমে ত্রিশ বছরের জাতীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি, রাজনৈতিক নেতা-নেতৃত্বের ভিন্ন ভিন্ন কর্মকাণ্ড, পাকিস্তানি সামরিক সরকারের তৎপরতা, মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন অবস্থার ঘটনাক্রমিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটি থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগসহ অন্যান্য দলের গঠন প্রক্রিয়া ও ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দলীয় নেতাদের মত-অমত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা, আওয়ামী লীগ-ভারত সরকারের সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি, তৎকালীন ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলের প্রতি আওয়ামী লীগের মনোভাব ইত্যাদি বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য জানা যায়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি (১৯৪৭-১৯৭১) সময়কালের ঘটনা জানতে গ্রন্থটি বহুমুখী গুরুত্ব বহন করলেও পূর্ব পাকিস্তানের ধারাবাহিক রাজনৈতিক ঘটনার আলোকে আঞ্চলিক রাজনীতি ও নেতৃত্বের মূল্যায়ন অপরিহার্য। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি মূল্যবান তথ্য ও লেখকের বিশ্লেষণ যেকোনো পাঠককে ঘটনাপ্রবাহ বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন* (দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯)। এ গ্রন্থে নারীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের স্বরূপ উন্মোচনসহ নারী জাগরণ ও নারীদের রাজনৈতিক সচেতনতা তুলে ধরেছেন। লেখকের অপর গ্রন্থ মুক্তিযুদ্ধে নারী, (প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১)। মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারীর বহুমূখী অবদানকে উপজীব্য করে গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে। গ্রন্থটিতে লেখক নারী আন্দোলনের তত্ত্বগত কাঠামো বর্ণনার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা আলোকপাত করেছেন। প্রদত্ত গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, সশস্ত্র ও গেরিলাযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধার মা এবং যুদ্ধাহত হিসেবে নারীর ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নারী সমাজের সামগ্রিক রাজনীতির বিষয় আঞ্চলিক পর্যায়ভিত্তিক উপস্থাপন না হওয়ায়, সেটা আমি আমার এই অভিসন্দর্ভে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস ১৯৪৯-১৯৭১* (সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩)। এ গ্রন্থে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন, সাংগঠনিক বিকাশ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রতিটা রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় আওয়ামী লীগের ভূমিকা তথা সংশ্লিষ্টতা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আওয়ামী লীগের সামগ্রিক রাজনৈতিক ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি প্রশংসার দাবিদার। তবে এ গ্রন্থে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের আওয়ামী লীগের নেতা নেতৃত্ব এবং আঞ্চলিক রাজনীতি সম্পর্কে ধারাবাহিক ইতিহাস উপস্থাপন করা হয়নি। বাংলাদেশের সামগ্রিক ইতিহাস মূল্যায়ন করতে প্রতিষ্ঠাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের

আঞ্চলিক রাজনীতি ও নেতৃত্বের ভূমিকা বা অবদান জানা আবশ্যক। বর্তমান এ অভিসন্দর্ভে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে এ গ্রন্থটিতে বর্ণিত সমসাময়িক রাজনৈতিক দল, কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত বিশেষ ভূমিকা রাখে।

আয়শা খানম সম্পাদনায় *মুক্তিযুদ্ধ দিনের স্মৃতি* (বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ২০০১)। গ্রন্থটিতে একশত তেতাল্লিশ জন নারী মুক্তিযোদ্ধা ও সংগঠকদের ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান মূল্যায়নে এটি একটি মৌলিক গ্রন্থ। স্মৃতিচারণায় প্রত্যেক নারী মুক্তিযোদ্ধার বর্ণনা এবং সংশ্লিষ্টতা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। তবে মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য বাঙালি নারীর গৌরবাত্মক রাজনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থের শিরোনাম বাস্তবতায় আলোকপাত করা হয়নি যা আমার বর্তমান এই অভিসন্দর্ভটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, (খোশরোজ কিতাব মহল, (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯) ঢাকা, ২০০২)। এ আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটি বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের সরাসরি উৎস হিসেবে কাজ করেছে। গ্রন্থটিতে আবুল মনসুর আহমদ তার জীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয় বর্ণনা করেছেন। ঘটনাক্রমিক বর্ণনার আলোকে বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের রাজনীতি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছেন। আবুল মনসুর আহমদের আঞ্চলিক রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতির সকল বিষয় এখানে পাওয়া যায়। তার জীবনের সামগ্রিক বর্ণনাসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের স্থানীয় ইতিহাস তথা বাংলাদেশের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে গ্রন্থটির কোনো বিকল্প নেই।

Joya Chatterji, *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1932–1947*, (Cambridge University Press, India, 2002) জয়া চ্যাটার্জী লিখিত *বাঙলা ভাগ হলো, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭* (অনুবাদ আবু জাফর) (দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৩)। এ গ্রন্থের লক্ষ্য হিসেবে ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'ভদ্রলোক রাজনীতির প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ও 'জাতীয়তাবাদ' থেকে 'সাম্প্রদায়িকতা'র ধারায় বাহ্যত তাদের স্থান বদলের বিশ্লেষণ করা এ গ্রন্থের মূল লক্ষ্য।' গ্রন্থে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আদর্শিকভাবে, সত্যিকার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ নয়, সাম্প্রদায়িকও নয় তেমনি এ জাতীয়তাবাদের কোন দার্শনিক ভিত্তিও সুদৃঢ় নয় বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারা পরিচালিত হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে জাগ্রত করার জন্য। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক দল ও আদর্শসমূহ একটি সম্প্রদায়কে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক ইউনিট হিসেবে অভিহিত করে, অন্য সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে এর ছিল চিরবৈরী সম্পর্ক। গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে মফস্বলে প্রথমে মুসলমানদের পিছিয়ে থাকা এবং পরবর্তীতে কিভাবে উত্থান হয়েছে। এ উত্থান বাংলার রাজনীতিতে কী কী গুরুত্ব বহন করে তা আলোচনা করা হয়েছে। বেঙ্গল কংগ্রেস, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এর ক্ষয়িষ্ণু ভূমিকা, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে এর পরিবর্তনশীল সম্পর্ক, দলের মধ্যে সৃষ্ট 'বাম' ও 'ডান' ধারা এর গ্রুপিং এবং সংকীর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেঙ্গল

কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। হিন্দু স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ় ডানপন্থিরা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ফলে দলে ব্যাপক পরিবর্তন সূচীত হয়। পরিবর্তিত ধ্যান-ধারণা কিভাবে একটি নতুন 'হিন্দু' রাজনৈতিক পরিচিতি সৃষ্টিতে সাহায্য করে তা তুলে ধরা হয়েছে। হিন্দুরা নিজেদের সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ভদ্রলোকেরা স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক আশা আকাঙ্খা ও রাজনৈতিক দুঃখ-কষ্টের প্রতি কিভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল এবং এই প্রয়াস বাংলায় কিভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্রমবর্ধমান ইন্ধন যুগিয়েছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাকে ভাগ করার জন্য তথাকথিত ভদ্রলোকেরা কিভাবে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন পরিচালনা করে এবং লক্ষ্য অর্জনে কিভাবে বেঙ্গল কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাকে নিয়োজিত করে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উঠে এসেছে। এরই পরবর্তী ঘটনাবলী পূর্ব পাকিস্তানে কি ধরণের রূপ নেয় সে বিষয়টি আমার অভিসন্দর্ভে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

সর্বপরি জয়া চ্যাটার্জীর এ গ্রন্থে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদের মধ্যকার জটিল সম্পর্কের ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। মূলত লেখক ভারত বিভক্ত হওয়ার পিছনে মুসলিম লীগের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কংগ্রেসের ঔদাসিন্য আর এ দু'দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের পারস্পরিক অবিশ্বাসকে দায়ী করার যে প্রবণতা তা উল্লেখ করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন উপরিউক্ত কারণের প্রেক্ষাপটে সংখ্যাগরিষ্ঠ উদীয়মান মুসলিম সমাজের হাতে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ক্ষমতাসীন হিন্দু ভদ্রলোক সমাজের বাংলা ভাগের সুতীব্র ইচ্ছার ইতিহাস। লেখক বাংলা ভাগের অন্তরালে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দায় অনুসন্ধান করেছেন। সাধারণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয় এমন অনেক রূঢ় সত্য তুলে এনে দেখিয়েছেন কিভাবে স্থিতাবস্থার আবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন আচ করতে পেরে ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা ভাগ করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কুক্ষিগত করতে চেয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ। মূলত জয়া চ্যাটার্জীর "বাঙলা ভাগ হল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭" গ্রন্থের মাধ্যমে প্রচলিত ধারার ঊর্ধ্বে একটি বস্তুনিষ্ঠ ধারায় থেকে ভিন্ন ধারায় ১৯৪৭ এর ভারত বিভাগ মূল্যায়ন করেছেন।

কর্ণেল শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা* (প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২)। গ্রন্থটির মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় আগরতলা মামলা সম্পর্কে সত্য ও বস্তুনিষ্ট ইতিহাস জানা যায়। এ গ্রন্থের দালিলিক তথ্য বাংলাদেশের ইতিহাসকে নতুনভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আগরতলা মামলাকে মিথ্যা হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে তার বিরুদ্ধে লেখক কর্ণেল শওকত আলী (আগরতলা মামলার এজাহারভুক্ত আসামী) যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকা অংশে লেখক উল্লেখ করেছেন, "ঐতিহাসিক আগরতলা মামলাকে এখনো মিথ্যা মামলা বলে যারা উল্লেখ করেন, তারা নিজেদের অজান্তে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য অভিযুক্তকে অসম্মান করেন। ... জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আমরা যারা মামলাটিতে অভিযুক্ত ছিলাম, 'ষড়যন্ত্র' শব্দটি তাদের জন্য খুবই পীড়াদায়ক। কারণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে আমরা বঙ্গবন্ধুর সম্মতি নিয়ে একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠন করেছিলাম। আমরা ষড়যন্ত্রকারী ছিলাম

না।" আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সামগ্রিক দিকের (গ্রেফতার, জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচারকার্য) বর্ণনাসহ গ্রন্থটিতে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালির অবস্থান, সামরিক শাসক আইয়ুব খানের শাসনের বৈশিষ্ট্য, বঙ্গবন্ধুর ছয়দফা কর্মসূচির বিস্তারিত মূল্যায়নসহ শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের বেশকিছু তথ্যনির্ভর আলোচনা গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের রাজনীতি ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আরও বিস্তারিত তথ্যের প্রয়োজন আছে, যা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরিসর ও জটিল বিষয়গুলো তুলে ধরতে সাহায্য করবে।

Yasmin Khan, *The Great Partition The Making of India and Pakistan,* (Penguin Group, India, 2013) ইয়াসমিন খান রচিত, *দি গ্রেট পার্টিশন*, *দি মেকিং অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান*, (ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন, ২০১৭)। গ্রন্থটি ১৯৪৭ সালের দেশভাগের বুদ্ধিদীপ্ত ও সময়োপযোগী বিশ্লেষণ। দেশভাগ ভারত ও পাকিস্তানের জনগণকে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় উভয় স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়। যার প্রমাণ হয় ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের মুক্তি এবং পাকিস্তানে মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে। এভাবে গ্রন্থটিতে ভারত বিভাগের প্রেক্ষাপট, বিভাগ পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং উদ্বাস্তু সমস্যার বিশ্লেষণ রয়েছে। তাছাড়া দেশভাগ বৃহত্তর রাজনীতির সাথে সাধারণ জীবনের যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। দেশ বিভাজন প্রক্রিয়ার প্রভাব সাধারণ জনগণের মধ্যে কিভাবে বিস্তার করেছিল এবং এর প্রতিক্রিয়া দীর্ঘদিন পরও কি রূপে তা অনুভূত হয় লেখক তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। মূলত গ্রন্থকার বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে দেশভাগের ইতিহাস উপস্থাপন করার উপর বেশি জোর দিয়েছেন।

মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ উত্থান পর্ব ১৯৪৮-১৯৭০* (প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬)। গ্রন্থটিতে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনা অর্থাৎ ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসের (১৯৪৭-১৯৭০) বিশ্লেষণধর্মী তথ্য গ্রন্থটিতে সন্নিবেশ করা হয়েছে। ছাত্রলীগের জন্ম, আওয়ামী মুসলিম লীগের সৃষ্টি এবং দলীয় টানাপোড়েন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ভাঙ্গন, সামরিক শাসনের ব্যাপকতা, ছয়দফা আন্দোলনের পক্ষ বিপক্ষের রাজনীতি, আগরতলা মামলা এবং সত্তর সালের নির্বাচনের কালানুক্রমিক ইতিহাস এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে উপরিউক্ত রাজনৈতিক ঘটনার আলোকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া স্বতন্ত্রভাবে এখানে উপস্থাপন করা হয়নি। আমার বর্তমান গবেষণাকর্মে উল্লিখিত বিষয়টি আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন (১৯৪৭-১৯৭১)

১.১ ভারত বিভাগ (১৯৪৭) ও পটপরিবর্তনের সূচনা

১.২ মুসলিম লীগ শাসনের রাজনৈতিক চালচিত্র

১.৩ আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম (১৯৪৯) ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি

১.৪ পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা (১৯৪৭-১৯৭১)

১.৫ ভাষাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাজনীতি ও ভাষা আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৫২)

১.৬ যুক্ত রাজনৈতিক ধারায় যুক্তফ্রন্ট গঠন (১৯৫৪)

১.৭ পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসন ও গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা (১৯৫৮-১৯৭১)

১.৮ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতি (১৯৬৬-১৯৭০)

১.৯ স্বায়ত্তশাসনের রাজনীতিতে ছয়দফা ও এগারো দফা (১৯৬৬-১৯৬৯)

১.১০ নির্বাচন (১৯৭০) এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পূর্ণতা অর্জন

১.১১ সর্বজনীন রাজনীতি ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা (১৯৭১)

১.১ ভারত বিভাগ (১৯৪৭) ও পটপরিবর্তনের সূচনা

ভারতীয় উপমহাদেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির (১৬০০) আগমনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়াপত্তন হয়।[১] পরবর্তীতে দেওয়ানী লাভ (১৭৬৪) ও দ্বৈত শাসনের (১৭৬৫) মাধ্যমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ দেশ শাসনের আইনগত ভিত্তি পায়।[২] তবে উপমহাদেশে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত হয় সিপাহী বিদ্রোহে (১৮৫৭) ভারতীয়দের পরাজয়ের মাধ্যমে।[৩] পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসনাধীনে উপমহাদেশে শাসনতান্ত্রিক বিভিন্ন সংস্কার সাধিত হয়।[৪] শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রশ্নে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে উভয় সম্প্রদায় নিজ জাতিগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত ছিল।[৫] ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক দলিল।[৬] কিন্তু এই আইন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) কিংবা মুসলিম লীগ (১৯০৬) এ দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়নি।[৭] ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর যে সব প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল সেখানে তাদের কার্যকলাপ মুসলমানদেরকে যথেষ্ট আহত করে। তারা বুঝেছিল যে, সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা কংগ্রেস ও হিন্দুদের শাসনাধীনে কখনো বাস্তব রূপ নিবে না। তাছাড়া শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের দম্ভোক্তি মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) কে আহত করে ফলে তিনি রাজনীতিতে নতুন কৌশল অবলম্বন করে।[৮] তিনি পূর্ণশক্তি নিয়ে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র ভিত্তিতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি উপস্থাপন করেন এবং ১৯৩৯ সালে তিনি তার বিতর্কিত ও বহুল আলোচিত 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' ঘোষণা করেন। জিন্নাহর 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' ছিল সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের পরিকল্পিত উদ্যোগ। এ তত্ত্বের সূত্র ধরেই জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে, জাতির যে কোন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভারতের মুসলমানগণ একটি পৃথক জাতি, তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়। অতএব তাদের স্বতন্ত্র বাসভূমি থাকা প্রয়োজন।[৯] অতঃপর ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লীগের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য দলীয় অধিবেশন আহবান করা হয়। অধিবেশনে ২২ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' বিষদভাবে ব্যক্ত করেন। সেই সাথে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রথমবারের মতো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেন। 'লাহোর প্রস্তাব' নামে ইতিহাস খ্যাত এই সাংবিধানিক প্রস্তাবাবলী ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ অধিবেশনে গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় :

> 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, নিম্নরূপ মৌলিক নীতিগুলি অন্তর্ভুক্ত করা না হলে কোনো সাংবিধানিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকর করা যাবে না বা মুসলমানদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যথা: ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে এমনভাবে চিহ্নিত করে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে যাতে ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলির সমন্বয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করা যায়। যেখানে প্রত্যেকটি ইউনিট হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত।'[১০]

প্রস্তাবটির খসড়া তৈরি করেন সিকান্দার হায়াত খান (১৮৯২-১৯৪২) যা সামান্য সংশোধনীসহ উপস্থাপন করেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) এবং সেটাকে সমর্থন করেন চৌধুরী খালিকুজ্জামান (১৮৮৯-১৯৭৩)।[১১] লাহোর প্রস্তাবের প্রতি হিন্দু ও কংগ্রেস নেতাদের প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই নেতিবাচক। কিন্তু মুসলিম স্বাতন্ত্রবোধের এই চূড়ান্ত উত্থানকে মুসলমান সম্প্রদায় অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়।[১২] লাহোর প্রস্তাব ছিল বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম আনুষ্ঠানিক বহিঃপ্রকাশ। ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে এ অঞ্চলে কার্যত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। লাহোর প্রস্তাবের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ভাবনার ধারাবাহিকতায় দেশ বিভাগের পূর্বে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এ প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent States) প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা নিয়ে পরবর্তীতে রাজনীতিবিদদের মধ্যে ভিন্নমত দেখা যায়।[১৩] ১৯৪৬ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতের সকল প্রদেশে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের (১৯৪৬ সালের ৭-৯ এপ্রিল) উপস্থিতিতে দিল্লিতে কনভেনশন আহবান করেন। এ কনভেনশনে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের বহুমাত্রিক রাষ্ট্র ধারণার পরিবর্তে ভারতের দুই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কনভেনশনের এই প্রস্তাবে 'a sovereign independent state' লাহোর প্রস্তাবের 'Independent States' এর মৌলিক পরিবর্তন সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) প্রতিবাদ জানালে জিন্নাহর পক্ষ থেকে প্রথমে বলা হয় যে, লাহোর প্রস্তাবে 'Independent States' ছিল মুদ্রণজনিত ভুল।[১৪] পরে ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন এক পাকিস্তান রাষ্ট্র নয় বরং ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি মাত্র গণপরিষদের দাবি করা হয়েছে। এরই মাধ্যমে জিন্নাহর পাকিস্তান আন্দোলন কেন্দ্রিক রাষ্ট্র ধারণা অর্থাৎ ভারতের দুই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে এক ও অভিন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মতবাদ প্রকাশিত হয়। আবুল হাশিমের প্রতিবাদের মাধ্যমে কার্যত বাঙালিদের বহুমাত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণা পুনর্ব্যক্ত হয়।[১৫] লাহোর প্রস্তাবে শুধু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' প্রতিষ্ঠার কথাই বলা হয়নি, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব এ দুটি অঞ্চল, যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাও চিহ্নিত করা হয়। প্রস্তাবের শেষ অংশে উভয় অঞ্চলের পৃথকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণের কথা বলা হয়। অতীতে ভারতকে বিভক্ত করে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনো প্রস্তাব বা পরিকল্পনায় বাংলার প্রসঙ্গ যেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল, সেখানে হাজার মাইলের অধিক দূরত্বে অবস্থিত ভারতের ভূখণ্ড দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র ভাষা-সংস্কৃতি, ইতিহাসের অধিকারী দুটি পৃথক অঞ্চল নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন বিষয়টি অবাস্তব ছিল। লাহোর প্রস্তাবে যদি এমন রাষ্ট্র কাঠামো স্পষ্ট থাকত তাহলে বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে আপসহীন ফজলুল হকের নিকট তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হত না। এ সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[১৬] 'ক্রিপস মিশন' (১৯৪২) ব্যর্থ হওয়ার পর সমগ্র ভারতব্যাপী তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।[১৭] এরই মধ্যে ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে উইন্সটন চার্চিলের (১৮৭৪-১৯৬৫) রক্ষণশীল দলের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং শ্রমিক দল নির্বাচনে জয়লাভ করে

সরকার গঠন করে। নির্বাচিত সরকার উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, ভারতবর্ষে তাদের পক্ষে বেশি দিন শাসন করা সম্ভব নয়। ১৯৪৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এটলি (১৮৮৩-১৯৬৭) ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের পর ১৯৪৬ সালের ১৫ মার্চ ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান তথা ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য একটি 'মন্ত্রিমিশন' ভারতে পাঠাবেন। ভারত সচিব লর্ড প্যাথিক লরেন্স (১৮৭১-১৯৬১), বাণিজ্য বোর্ড সভাপতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস (১৮৮৯-১৯৫২), নৌ-বিভাগের প্রথম লর্ড এ. ভি অ্যালেকজান্ডার (১৮৮৫-১৯৬৫) এই তিনজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত 'মন্ত্রিমিশন' ১৯৪৬ সালের ২০ মার্চ ভারতে গমন করেন। এ মিশন প্রায় দুই মাস ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা, সমঝোতা ও মীমাংসার চেষ্টা করে ১৯৪৬ সালের ১৬ মে শাসনতান্ত্রিক সুপারিশ পেশ করে। এ পরিকল্পনার মধ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলই নিজেদের মতো করে স্বার্থ খুঁজতে থাকে।[১৮]

১৯৪৬ সালের ২৪ মে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি স্বাধীন, অখণ্ড ও গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিমিশনের গণপরিষদ সম্পর্কিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলরগণ গোপন বৈঠক (৬ জুন ১৯৪৬) করে এবং ২৫ জুন ১৯৪৬ মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ছয়টি সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ (বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান) নিয়ে একটা গ্রুপ গঠনের দাবি নিয়ে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করে গণপরিষদে যোগ দিতে সম্মত হয়।[১৯] মোটামুটি সমঝোতার পরিস্থিতিতে নিখিল ভারত কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪) ১৯৪৬ সালের ১০ জুলাই ভারতের বোম্বে শহরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একটি ঘোষণা প্রদান করেন যা ছিল বিবেচনাহীন।[২০] তিনি বলেছিলেন যে, কংগ্রেস গণপরিষদ কেবলমাত্র অংশগ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে এবং যেটা সর্বোৎকৃষ্ট মনে করে সে মোতাবেক ক্যাবিনেট মিশন প্লানকে পরিবর্তন বা সংশোধন করার ব্যাপারে স্বাধীন মনে করে। তারা যেকোনো বিষয় নির্ধারণ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ও নিঃশর্তভাবে স্বাধীন। এ ঘোষণায় মুসলিম লীগ নেতৃত্ব শঙ্কিত হয়ে ওঠে। মন্ত্রিমিশনের সুপারিশসহ হিন্দু-মুসলিম অধিকাংশ মহলের প্রচেষ্টায় অখণ্ড সর্বভারতীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনা ব্যর্থতার দিকে ধাবিত হয়। জওহরলাল নেহেরুর মন্তব্যের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৬ সালের ২৭-২৯ জুলাই ভারতের বোম্বে শহরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশনে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা সম্পর্কিত পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করে।[২১] মুসলিম লীগ কাউন্সিল প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণা করা হয় এবং খাজা নাজিমুদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪), চৌধুরী খালিকুজ্জামান (১৮৮৯-১৯৭৩), ও নওয়াব মোহাম্মদ ইসমাইল খানের (১৮৮৪-১৯৫৮) সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।[২২] এসময় খাজা নাজিমুদ্দিন ইংরেজ সরকার বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ডাকের ভয়ে এবং 'স্যার' উপাধি বর্জনের নির্দেশে বিচলিত হয়ে কলকাতা মুসলিম ইন্সটিটিউটের সভায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইংরেজদের

বিরুদ্ধে নয় বরং তা হিন্দুর বিরুদ্ধে। যদিও ১৯৪৬ সালের ২ আগস্ট মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বে শহরে অনুষ্ঠিত সভায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের কর্মসূচি সম্পর্কে বলা হয় যে, ভারতীয় মুসলমানরা ১৬ আগস্ট সকল কাজ-কর্ম বন্ধ রাখবে ও পূর্ণ হরতাল পালন করবে। খাজা নাজিমুদ্দিনের মতো শীর্ষস্থানীয় মুসলিম লীগ নেতার সাম্প্রদায়িক মন্তব্যে কলকাতার সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা দাঙ্গা প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। এভাবে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে তৎকালীন পরিস্থিতিতে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার মাধ্যমে যে আশা জেগেছিল তা ক্ষণিকেই শেষ হয়ে যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা চরমভাবে বিশৃঙ্খলিত হয় ও অনিশ্চিত গন্তব্যে যাত্রা শুরু করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ বিধ্বস্ত হয়ে ওঠে। পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘর বাড়ি সহায় সম্বল ত্যাগ করে ভিনদেশী হয় এবং লক্ষ্যহীন ভবিষ্যতে পাড়ি জমায়।

১৯৪৬ সালের ২২ জুলাই ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল (১৮৮৩-১৯৫০) কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও জওহরলাল নেহেরুকে প্রস্তাব জানান এবং পত্রের মাধ্যমে সহযোগিতা কামনা করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ লর্ড ওয়াভেলকে ১৬ জুন ১৯৪৬ সালে মন্ত্রিমিশন ও ভাইসরয় প্রদত্ত যুক্ত ঘোষণা সম্পর্কে অবগত করেন, কিন্তু লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৬ সালের ১২ আগস্ট নেহেরুকে অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের দায়িত্ব প্রদান করেন। নেহেরু ২ সেপ্টেম্বর ১২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে কেন্দ্রে একদলীয় সরকার গঠনের প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা উৎসাহিত হয়। ১৯৪৬ সালের ২৪ আগস্ট কেন্দ্রে একদলীয় কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে লর্ড ওয়াভেল ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ প্রদান করেন এবং ২৫ আগস্ট রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা কবলিত কলকাতা গমন করেন। এসময় বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে সোহ্‌রাওয়ার্দী-ওয়াভেল, সোহ্‌রাওয়ার্দী-জিন্নাহ, সোহ্‌রাওয়ার্দী-ওয়াভেল, জিন্নাহ-ওয়াভেল, গান্ধী-জিন্নাহ-ভূপাল নওয়াব, গান্ধী-জিন্নাহ, জিন্নাহ-নেহেরু, জিন্নাহ-ওয়াভেল এর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা হয়। সকল সমঝোতা আলোচনা শেষে ১৯৪৬ সালের ১৩ অক্টোবর মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদানের প্রস্তাব গ্রহণ করে।[২৩] এসকল আলোচনা এবং মুসলিম লীগের সরকারে যোগদান প্রক্রিয়ায় হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর (১৮৯৩-১৯৬৩) একক কৃতিত্ব ছিল।[২৪] শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের একটি সূচনা হলেও মুসলিম লীগ ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬ অনুষ্ঠিত ভারতীয় গণপরিষদে যোগদান করা থেকে বিরত থাকে। এসময় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে।[২৫]

সাম্প্রদায়িক অবস্থার মারাত্মক অবনতি হলে ব্রিটিশ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ সালে ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এ লক্ষ্যে ২২ মার্চ লর্ড ওয়াভেলের স্থানে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে (১৯০০-১৯৭৯) ভারতের বড়লাট নিযুক্ত করা হয়।[২৬] তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। মাউন্টব্যাটেন যখন ভাইসরয় হয়ে ভারতে আসেন তখন এখানকার রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অবস্থা ছিল ভীষণ জটিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতপার্থক্যের ফলে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত তখন অকেজো, দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ঘটছিল মারাত্মক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। ফলে তখন

এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের অখণ্ডতা আর কোনোক্রমেই রক্ষা করা সম্ভব নয়। মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় হয়ে আসার এক সপ্তাহের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কলকাতায় ৯৯ জন এবং বোম্বেতে ৪১ জন নিহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তিনি পুলিশ কর্মকর্তাদের ডেকে পাঠালে তারা স্পষ্টভাবে বলে দেন যে, তারা উদ্ভূত পরিস্থিতির কোনো সমাধান করতে পারবে না। তাই তিনি ২ এপ্রিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কোনো পথ তিনি পাচ্ছেন না। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, তিনি যদি দ্রুত কাজ সমাধান করতে না পারেন তাহলে সমগ্র ভারতবর্ষে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে।[২৭] মাউন্টব্যাটেন তার কাজের ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ও জওহরলাল নেহেরুর (১৮৮৯-১৯৬৪) সহযোগিতা পেয়েছিলেন।[২৮] কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন ভারতে তার কাজ যে কতখানি অসম্ভব হবে তা তিনি জিন্নাহর সাথে দেখা হওয়ার পর বুঝতে পেরেছিলেন। ভারত বিভাগ পরিকল্পনায় জিন্নাহর অদম্য ইচ্ছা শক্তির কাছে মাউন্টব্যাটেন আত্মসমর্পন করেই ভারত বিভাগের লক্ষ্যে এগিয়ে যান।[২৯] কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পরিকল্পিতভাবে লর্ড ওয়াভেলকে সরিয়ে জওহরলাল নেহেরু পছন্দমতো মাউন্টব্যাটেনকে বড়লাট নিয়োগ করাতে ব্রিটেনের শ্রমিক দলকে রাজি করায়, ফলে জিন্নাহ মনস্থির করেছিলেন যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোন সমাধান হবে না প্রয়োজনে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ বিভাগ করতে হবে।[৩০] ১১ এপ্রিল মাউন্টব্যাটেন তার চিফ অব স্টাফ লর্ড ইসমেকে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দিলে ২ মে ভারত বিভাগের খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করে লন্ডনে মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। এই খসড়ায় ভারত ও পাকিস্তানে যোগ না দিয়ে যেকোনো প্রদেশের একক স্বাধীনতা লাভের ব্যবস্থা ছিল। যদি এটিই চূড়ান্ত হত তাহলে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা সৃষ্টি করা সম্ভব হত। কিন্তু খসড়া প্রকাশ করার আগে মাউন্টব্যাটেন জওহরলাল নেহেরুকে দেখালে ব্যাপকভাবে বিরক্ত হন এবং নেহেরুর ইচ্ছামত ভারত বিভাগের পুরানো পরিকল্পনা পরিবর্তন করে নতুন খসড়া তৈরি করা হয়। এ পরিকল্পনার কপি নিয়ে মাউন্টব্যাটেন নিজে লন্ডনে গিয়ে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করেন। দেশের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট দূর করে ভারতীয় জনগণের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে ভারত বিভাগ করার উদ্দেশ্যেই মাউন্টব্যাটেন তার পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। ৩ জুন ১৯৪৭ মাউন্টব্যাটেন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী একযোগে ঘোষণা করেন ভারত বিভাগের প্লান বা মাউন্টব্যাটেন প্লান।[৩১] এ প্লানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ:

মাউন্টব্যাটেন প্লানে ভারতের জন্য সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত গণপরিষদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। ভারতের জন্য সংবিধান প্রণয়নের কোনো প্রচেষ্টা ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করবে না। এমনকি অখণ্ড ভারতবর্ষ সৃষ্টির লক্ষ্যে ভারতবর্ষে বিদ্যমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো প্রকার আলোচনার উদ্যোগও ব্রিটিশ সরকার নিতে পারবে না।

ইতিমধ্যে গঠিত গণপরিষদের প্রণীত কোন সংবিধান গ্রহণ করতে অনাগ্রহী হলে তা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। ভারতের যেকোনো অংশের জনগণ এরূপ অনিচ্ছুক হলে তাদের জন্য ভিন্নরূপে গণপরিষদ গঠন করা যাবে। বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করা হয়:

বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের আইনসভার সদস্যবৃন্দ তাদের প্রদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। কোন প্রদেশের মুসলমান কিংবা অমুসলমান সদস্যদের যেকোন একজন সদস্যও যদি যৌথ অধিবেশনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহলে উক্ত প্রদেশের সকল সদস্য একটি যৌথ অধিবেশনে বসবেন। এই অধিবেশনে অখণ্ড প্রদেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে উক্ত অখণ্ড প্রদেশটি বর্তমান গণপরিষদে যোগ দেবে, না কি নতুন গণপরিষদ গঠন করবে সে সম্পর্কে উক্ত যৌথ অধিবেসনেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এই যৌথ অধিবেসনে অখণ্ড প্রদেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা হলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের প্রতিনিধিরা এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের প্রতিনিধিরা দুই অংশে বিভক্ত হয়ে অধিবেশনে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন যে সংশ্লিষ্ট প্রদেশ বিভক্ত হবে কি-না। যেকোন প্রদেশ বিভক্তির স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে উক্ত প্রদেশ দ্বিধা বিভক্ত হবে এবং বর্তমান গণপরিষদে যোগ দেবে, না এর নিজের অংশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নতুন গণপরিষদ গঠন করবে সে সম্পর্কে উক্ত অধিবেশনেই সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যদি কোন প্রদেশ বিভক্তির পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে উক্ত প্রদেশের মুসলমান ও অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল চিহ্নিত করার লক্ষ্যে একটি সীমানা কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

বাংলা প্রদেশ বিভক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে আসামের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা সিলেট বাংলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সঙ্গে যুক্ত হবে কি-না এ প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। আসামের অবশিষ্ট অংশ বর্তমান গণপরিষদে যোগদান করবে।

সিন্ধু আইনসভা বর্তমান গণপরিষদে যোগদান করবে না-কি নিজস্ব অন্য কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তা এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে ঠিক করবে।

পাঞ্জাব প্রদেশ ভাগ হলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বর্তমান গণপরিষদে যোগদান করা জটিল হবে; তাই উক্ত প্রদেশ নিজস্ব অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে কি-না সে লক্ষ্যে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। বেলুচিস্তানকেও নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

যখন উপরিউক্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন হবে তখন ঠিক করা সম্ভব হবে যে, কোন এক বা একাধিক শাসন কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

প্রদেশ বিভক্ত ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত প্রশাসনিক সমস্যাসমূহ বিভিন্ন উত্তরাধিকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে এবং এ কর্তৃপক্ষ ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে।

মাউন্টব্যাটেন প্লান শুধুমাত্র ব্রিটিশ ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। দেশীয় রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের পূর্ব ঘোষিত নীতি বলবৎ থাকবে।

মাউন্টব্যাটেন প্লানে বলা হয় যে, এ প্লানের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক বা দুই উত্তরাধিকারী কর্তৃপক্ষের কাছে ডোমিনিয়নের ভিত্তিতে যতদ্রুত সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্রিটিশ আইনসভা আইন প্রণয়ন করবেন।

ভারতের কোন অংশ বা প্রদেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত হবে কি-না সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার উক্ত অংশ বা প্রদেশের গণপরিষদের হাতে থাকবে।[৩২]

মাউন্টব্যাটেন তার পরিকল্পনা প্রকাশের পূর্বে বাংলার বিষয়টি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বকে অবগত করেন। বাংলার ভবিষ্যৎ প্রশ্ন আলোচনার জন্য তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মূখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনার পরপরই দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোহ্‌রাওয়ার্দী 'স্বাধীন বাংলা' পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।[৩৩] এই পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল, বাংলায় এক নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হবে যার প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান। মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মুসলমান ও পঞ্চাশভাগ অমুসলমান থাকবেন। এরপর প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসারি ভোটে পরিষদ নির্বাচিত হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম থাকবে না ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগদান করবে সে বিষয়ে উক্ত পরিষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।[৩৪]

স্বাধীন বাংলার এ উদ্যেক্তাদের মধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪), ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শরৎচন্দ্র বসু (১৮৮৯-১৯৫০), বঙ্গীয় কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেতা কিরণ শংকর রায় (১৮৯১-১৯৪৯) প্রমুখ অন্যতম ছিলেন। এছাড়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রধান সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ (১৮৯৩-১৯৭৬) এ উদ্যোগের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন।[৩৫] ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধী (১৮৭৯-১৯৪৮) তখন এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং সে সময় তিনি কলকাতাতেই অবস্থান করছিলেন। তাই অখণ্ড বাংলার বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং সমর্থন আদায়ের জন্য ৯ মে থেকে ১২ মে ১৯৪৭ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাশিম, ফজলুর রহমান (১৯০৫-১৯৬৬), বগুড়ার মোহাম্মদ আলী (১৯০৯-১৯৬৩) এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী পৃথকভাবে গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[৩৬] গান্ধী প্রথমে শর্তসাপেক্ষে বাংলাকে যুক্ত রাখার পরিকল্পনায় সমর্থন দেন, তবে তাকে সমর্থন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়। পরবর্তীতে গান্ধী স্বীকার করেন যে, ওয়ার্কিং কমিটিতে তার সহকর্মীরা শরৎ চন্দ্রের উদ্যোগে সমর্থন জানানোর জন্য তাকে কৈফিয়ত তলব করেন।[৩৭] যে কারণে প্রাজ্ঞ রাজনীতিক গান্ধী স্বাধীন অখণ্ড বাংলার বিষয়টি সুচতুরভাবে এড়িয়ে গেলে উদ্যোক্তারা হতাশ হন। তবে শরৎচন্দ্র বসুকে একটি চিঠি লিখে আশ্বাস দেন যে, তিনি কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটিতে তাদের প্রস্তাব পৌঁছে দেবেন।[৩৮] গান্ধীর কাছে সুস্পষ্ট কোন আশ্বাস না পেয়ে ১৯৪৭ সালের ১২ মে শরৎচন্দ্র বসু শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কর্তৃক ঘোষিত নীতিমালার অনুরূপ স্বাধীন বাংলা সংক্রান্ত ছয়দফা ভিত্তিক একটি নীতিমালা ঘোষণা করেন। বাঙালি হিন্দু-মুসলিম নেতারা শরৎচন্দ্র বসু ও সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রদত্ত প্রস্তাবসমূহ নিয়ে ১২ মে থেকে ২০ মে পর্যন্ত বিস্তর আলোচনা করেন। এসব আলোচনায় মূখ্যমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল হাশিম (প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক), দুই মন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ও ঢাকার ফজলুর রহমান (১৯০৫-১৯৬৬), ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শরৎচন্দ্র বসু, বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতা কিরণ শংকর রায়, সত্যরঞ্জন বকসি (১৮৯৭-১৯৮৩) প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে ২০ মে প্রস্তাবিত অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার এক শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর খসড়া রচনা করেন যা 'সোহরাওয়ার্দী-বসু-রায় ফর্মুলা' নামে পরিচিত।[৩৯] এই খসড়া চুক্তিটির শর্তসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

বাংলা হবে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভারতের অন্য অংশের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী হবে তা এই স্বাধীন রাষ্ট্র স্থির করবে।

হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংখ্যা বণ্টন করে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার আইন পরিষদ গঠিত হবে। জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দু তফসিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে আসন সংখ্যা বণ্টন করা হবে অথবা তারা যেভাবে মেনে নেন সেভাবে আসন সংখ্যা নির্ধারণ হবে।

স্বাধীন বাংলার এরূপ পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকার মেনে নিলে বাংলা ভাগ করা হবে না। এরূপ ঘোষণা দিলে বাংলার বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং পরিবর্তে একটি অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। এই অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী পদ বাদে বাকী সদস্যদের হিন্দু (তফসিলিসহ) ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমান বন্টন হবে। এই মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন একজন হিন্দু।

নতুন সংবিধান অনুযায়ী আইন পরিষদ ও মন্ত্রিসভা গঠন না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ ও সেনাবাহিনীসহ সকল চাকরি বাঙালিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং চাকরীতে সমান সংখ্যক বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম নিয়োগ করা হবে।

বাংলার ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য যে গণপরিষদ গঠিত হবে সেই গণপরিষদে মোট ৩০ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। এর মধ্যে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য থাকবেন। বর্তমান আইন সভার হিন্দু ও মুসলমান সদস্যগণই উক্ত গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন করবেন। গণপরিষদের সদস্য নির্বাচনকালে বর্তমান আইনসভার ইউরোপীয় সদস্যগণের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।[৪০]

স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবিত এই খসড়াটি প্রকাশিত হবার পর বাঙালি সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একটি গ্রুপ প্রকাশ্যে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রস্তাবের বিরোধিতা শুরু করে।[৪১] এই গ্রুপে ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), নূরুল আমীন (১৮৯৩-১৯৭৪), হামিদুল হক চৌধুরী (১৯০১-১৯৯২) প্রমুখ।[৪২] অন্যদিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও 'যুক্ত বাংলা' প্রশ্নে বিপাকে পড়ে। বাংলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের (১৮৭৫-১৯৫০) সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তিনি 'যুক্ত বাংলার' বিরোধিতা করেন।[৪৩] ফলে শেষ পর্যন্ত যুক্তবাংলা পরিকল্পনার প্রতি শরৎ বসু এবং কিরণ শংকর রায় ব্যতীত কোন হিন্দু নেতার সমর্থন থাকল না।[৪৪] তাছাড়া কংগ্রেস হাইকমান্ডের বিশেষ করে জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪) ও সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের (১৮৭৫-১৯৫০) প্রতিক্রিয়া আদৌ সহায়ক ছিলনা। অখণ্ড স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনাকে 'একটি ফাঁদ' হিসেবে আখ্যায়িত করে প্যাটেল বাংলার কতিপয় প্রখ্যাত হিন্দু ও কংগ্রেস নেতাকে এ ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য সতর্ক করে দিয়ে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 'বাংলার অমুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে বাংলাকে অবশ্যই বিভক্ত করতে হবে।'[৪৫] নেহেরু এ সম্পর্কে আরো সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করেন, "বিরাজমান অবস্থায় বাংলার স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ দাঁড়াবে এখানে মুসলিম লীগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এর অর্থ হবে কার্যত সমগ্র বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যদিও এর প্রবক্তারা তা বলছে না।"[৪৬] মূলত কংগ্রেস হাইকমান্ডের বিশ্বাস ছিল বাংলার বিভক্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে না, কেননা কি অর্থনৈতিক কি ভূ-রাজনৈতিক কোন দিক বিবেচনায় এককভাবে পূর্ববাংলার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

মাউন্টব্যাটেন তার রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, নেহেরু মনে করেন বর্তমানে ভাগ করা হলেও কয়েক বছরের মধ্যে পূর্ববাংলা হিন্দুস্তানের মধ্যে চলে আসবে।[৪৭] এমতাবস্থায় কেবল মুসলিম লীগ আন্দোলন করে বাংলা বিভাগ রোধ করতে পারত। কিন্তু কেন্দ্রীয় লীগ হাই কমাণ্ড বাংলা প্রশ্নে এক নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করতে থাকে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলার ভবিষ্যৎ বিষয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের পরিকল্পনার প্রতি মৌন সমর্থন দিলেও কেন্দ্রীয় লীগের একটি গ্রুপ বাংলা প্রাদেশিক লীগের মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), খাজা নাজিমুদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪) গ্রুপকে স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা বানচাল করার প্ররোচনা দিতে থাকে।[৪৮] অন্যদিকে মুসলিম লীগ হাইকমান্ডের সাথে পরিকল্পনাটি নিয়ে আলোচনার জন্য ২৭ মে ১৯৪৭ শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী দিল্লী গমন করেন।[৪৯] কিন্তু ২৮ মে তার অনুপস্থিতির সুযোগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অস্থায়ী সেক্রেটারি হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী (১৯০৬-১৯৬৬) মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আহবান করেন।[৫০] উক্ত বৈঠকে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনাকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করে।[৫১] ওয়ার্কিং কমিটি হিন্দু নেতাদের সাথে বাংলার রাজনৈতিক সমস্যাবলী আলোচনার জন্য ইতিপূর্বে নিযুক্ত সাব-কমিটিকেও প্রত্যাহার করে নেয় এবং মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। উপরন্তু উক্ত বৈঠকে ভারতের মুসলমানদের পক্ষ থেকে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আলোচনা চালানোর অধিকার কেবলমাত্র জিন্নাহর রয়েছে এবং বাংলার মুসলমানরা তার সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত সমাধান হিসেবে মেনে নিবে বলে একমত হয়। ফলে আবুল হাশিম ও হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর পক্ষে পরিকল্পনাটি নিয়ে আর বিশেষ কোন উদ্যোগ গ্রহণের প্রচেষ্টা কার্যত মূল্যহীন হয়ে পড়ে।[৫২]

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের এরূপ নীতির কথা বুঝতে পেরে লর্ড মাউন্টব্যাটেন তার ৩ জুনের পরিকল্পনায় ঘোষণা করেন যে, কেবল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্যমত স্থাপিত হলেই তিনি বঙ্গভঙ্গ রোধ করবেন, অন্যথায় নয়। এভাবে বাংলা বিভক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৮ জুলাই ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীনতা আইনে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে পশ্চিম বাংলাকে ভারতের অন্তর্ভূক্ত এবং পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের অংশ বলে ঘোষণা করে। এভাবেই অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয়।[৫৩] এক্ষেত্রে অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ব্যর্থতার কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত কারণগুলো বিবেচ্য ছিল।

প্রথমত: কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বেশির ভাগ কেন্দ্রীয় হাই কমান্ড অখণ্ড বাংলাকে কখনই সমর্থন করতে পারেনি। সংগঠন দুটির বাংলা শাখায় যারা কেন্দ্রীয় হাই কমান্ডের অনুসারী ছিলেন তারা প্রথম দিকে অখণ্ড বাংলার দাবি সমর্থন করলেও শেষাবধি বেশির ভাগ হাই কমান্ডের ভয়ে এর চরম বিরোধিতা করেন।

দ্বিতীয়ত: দীর্ঘ ১০ বছর ধরে (১৯৩৭ থেকে) বাংলার ক্ষমতায় মুসলমান সরকার অধিষ্টিত থাকায় বাঙালি হিন্দু রাজনীতিবিদদের মনে একটি আতঙ্ক সৃষ্টি হয় যে, অখণ্ড বাংলা হলে হিন্দুরা কখনও ক্ষমতায় যেতে পারবে না। সুতরাং অখণ্ড বাংলা সমর্থন করেননি।

তৃতীয়ত: বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বসতি এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে, পূর্ববাংলায় মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পশ্চিম বাংলায় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্বভাবতই একটা বিভক্তি যেন ঐতিহাসিক ভাবেই হয়েছিল। বাংলার সকল মিল-

কলকারখানা এবং কলকাতা শহর পশ্চিম বাংলার সীমানায় ছিল। স্বভাবতই বাংলা বিভক্ত হলে পশ্চিম বাংলার ক্ষতি ছিল না; বরং সেখানে হিন্দুদের পক্ষে চিরকাল প্রাদেশিক সরকার গঠন সম্ভবপর। সুতরাং হিন্দু নেতৃবৃন্দ বাংলা বিভক্তির বিপক্ষে কথা বলেনি।

চতুর্থতঃ সময়ের স্বল্পতাও একটি কারণ ছিল। ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে অখণ্ড বাংলার বিষয় উত্থাপিত হয়। দেশ বিভাগের ঘটনা ঘটে আগস্টে। সুতরাং দুই বা তিন মাসের মধ্যে একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল না। সিলেটের মতো বাংলা বিভক্তির প্রশ্নে গণভোট করা যেত। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার দ্রুত ভারতবর্ষ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে গুরুত্ব দেয়।

পঞ্চমতঃ মুসলিম লীগ কিংবা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় হাইকমান্ডে বাংলার উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব ছিল না। ফলে ভারতের পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমান ও উত্তর ভারতের হিন্দু নেতৃত্ব তাদের নিজ নিজ স্বার্থে বাংলা বিভাগের বিষয়টি বিবেচনা করেন। বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা ভারতের হিন্দু পুঁজিপতি গোষ্ঠীর জন্য মাথা ব্যাথার কারণ ছিল। গোটা বাংলা ও সারা ভারতের পুঁজি সংগঠক হিসেবে ইঙ্গ-মার্কিন ও মাড়োয়ারী গোষ্ঠী বিরামহীন গতিতে কাজ করেছে তৎকালীন কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে। সুতরাং বাংলা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে ইঙ্গ-মার্কিন মাড়োয়ারী পুঁজি বাঙালিদের হাতে যাবে এটা প্রায় নিশ্চিতভাবেই অবাঙালি দেশি বিদেশি পুঁজি সংগঠকরা বুঝতে পারে এবং সে কারণেই তারা বাংলাকে ভারতের দুই অংশের পরাধীন ভূমিতে রূপান্তরিত করার পদক্ষেপ নেয়।[৫৪]

মূলত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সদিচ্ছার অভাবে অখণ্ড বাংলা প্রয়াস ব্যর্থ হয়। অতঃপর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা গ্রহণ করলে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ববাংলা পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে এবং অপরপক্ষে পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম বাংলা ভারতে যোগদানের অনুকূলে মত ব্যক্ত করে। আসামের সিলেট জেলা পূর্ববাংলার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার অনুকূলে ভোট দেয়। সিন্ধু প্রদেশের আইনসভা পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের জনগণ গণভোটে পাকিস্তানে যোগদানের অনুকূলে ভোট দেয়। মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুসারে ভারত বিভাগ ও শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' (The Indian Independence Act, 1947) পাস হয়।[৫৫]

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে পাকিস্তানের জন্ম হয়। এসময় পূর্ববঙ্গের ১৫টি জেলা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান নামক প্রদেশটি গঠিত হয়।[৫৬] বাংলা প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হয় যেটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এ দ্বিখণ্ডিত প্রদেশের পূর্বাংশ 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে পরিচিত হয়।[৫৭] পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের মানুষ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালকে পাকিস্তান আমল হিসেবেই উল্লেখ করে থাকে।[৫৮] তবে আইনগতভাবে ১৯৫৫ সালে এর নাম পূর্ববাংলা থেকে পরিবর্তিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান হয় এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধানে এটি গৃহীত হয়। এ সময় পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে চারটি প্রদেশ যথা : পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, খয়েরপুর ও জুনাগড় রাজ্য এবং কিছু উপজাতি এলাকা ছিল। ১৯৫৫ সালে পশ্চিমাংশের সবগুলো প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য এক ইউনিটে

এনে একটি প্রদেশ করে এবং তার নামকরণ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান।[৫৯] এই নতুন রাষ্ট্র তার জন্মলগ্ন থেকেই অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়। কারণ পাকিস্তানের দুই অংশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে কেবলমাত্র ধর্মীয় মিল ছাড়া নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি, ভূ-প্রকৃতি, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত কোন সাদৃশ্য ছিল না। ধর্মপালনের ক্ষেত্রেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈপরীত্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা ইসলামের সুফিবাদী তথা সহনশীল ও মানবতাবাদী মতাদর্শী ছিল। অন্যদিকে ভারতের অন্য অঞ্চলের মুসলমানরা ভিন্ন আদর্শ তথা ওহাবি বা তথাকথিত বিশুদ্ধ ইসলামপন্থি ছিল। অভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পূর্ববাংলার মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করে। তবে পারস্পরিক জাতিসত্তা ও স্বার্থের ভিন্নতা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে স্বাতন্ত্রবোধের প্রকাশ হয়েছিল যা পরবর্তীতে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে রূপ নেয়। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি তথাকথিত 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের ওপরে ভিত্তি করে পাকিস্তান আন্দোলন করে। এ কারণেই অধিকাংশ লেখক-গবেষক পাকিস্তান আন্দোলনের মূল ভিত্তি হিসেবে ধর্ম সাম্প্রদায়িক চেতনাকে চিহ্নিত করেন। পাকিস্তান আন্দোলনে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে। আন্দোলনের মূল ভিত্তি ধর্ম ছিল এ কারণেই এত দ্রুত পাকিস্তান ভেঙ্গে যায়। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জানতেন যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন বিভিন্ন অমিল ছিল তেমনি করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে বৈচিত্রতা ও ভিন্নতা রয়েছে। বিশেষ করে পূর্ববাংলার মুসলমানদের সাথে বাংলার বাহিরের অবাঙালি মুসলমানদের মধ্যে প্রকাশ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলা অঞ্চলের হিন্দু জমিদার-মহাজনদের শোষণ-নির্যাতন ও নিয়ন্ত্রণ থেকে সার্বিক মুক্তির সংগ্রামে বাংলার মুসলমান কৃষক-প্রজা সম্প্রদায়ের জন্য এ অঞ্চলের বাহিরের সমধর্মী সম্প্রদায়ের সমর্থন সহায়ক হিসেবে কাজ করে। মূলত ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর রাজনীতি প্রাদেশিকতার পরিবর্তে সর্বভারতীয় রূপ ধারণ করলে স্ব স্ব ধর্ম ভিত্তিক ঐক্য ও পারস্পরিক সমর্থন-সহযোগিতা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদাহরণ জিন্নাহর উপস্থাপিত 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব'। এটি ছিল সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভারতীয় মুসলমানদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' সর্বজনীন কোন বিশ্বাস বা তত্ত্ব নয় তবে পাকিস্তান আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ওপর প্রযোজ্য হয়ে ওঠে। এ তত্ত্বের মূল লক্ষ্য পাকিস্তান আন্দোলন ছিল বলেই পাকিস্তান অর্জনের সাথে সাথেই 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র আবেদন নিঃশেষ হতে শুরু করে।[৬০] 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র উদ্ভাবক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর গণপরিষদের প্রথম নীতি নির্ধারণী বৈঠকে এ তত্ত্বের পরিসমাপ্তি করে বলেন যে, আজ থেকে নাগরিক হিসেবে সকলেই পাকিস্তানি, কেউ মুসলমান বা হিন্দু থাকবে না।[৬১] দেশবিভাগ পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতায় ধর্মভিত্তিক ঐক্য অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং এর স্থলে ভাষা ও অঞ্চলভিত্তিক বাঙালি মুসলমানদের সর্বজনীন জাতিসত্তা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ধর্মভিত্তিক বিভক্ত পাকিস্তানে বিদ্যমান বৈসাদৃশ্য ও অনৈক্য তৎকালীন রাজনীতির মূল চালিকা হয়ে দেখা দেয়।[৬২] নবগঠিত পাকিস্তানের দুই অংশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতেও ছিল ভারসাম্যের অভাব। এমনি পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের মধ্যে সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বোধের প্রয়োজনীয়তা ছিল। পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্য প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রক্ষমতায় দুই অংশের জনগণের সমানুপাতিক অংশগ্রহণ। কিন্তু নবগঠিত পকিস্তান রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকরা অর্থাৎ মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ সমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র

পরিচালনায় ব্যর্থ হয়। দেশ বিভাগের আগে পূর্ববাংলায় হিন্দু জমিদার-মহাজনদের শোষণ চলছিল সেখানে নতুন শোষক উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্তানি, বিশেষ করে পাঞ্জাবিদের (সবচেয়ে বেশি জন অধ্যুষিত প্রদেশ) শাসন-শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পায়।[৬৩] বাংলা অঞ্চল পাকিস্তান আন্দোলনের মূলকেন্দ্র হলেও মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ক্রমান্বয়ে ভারত ও পাঞ্জাবের মুসলিম ভূস্বামী, উঠতি মুসলিম ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও আমলাদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান অর্জিত হবার পর এই শ্রেণিটিই দেশের ক্ষমতাসীন এলিট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৬৪] সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ইতিহাসে ভারত বিভাগ তথা ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পর্যায়। পাকিস্তানের মানুষ পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে আপাতদৃষ্টিতে রাজনৈতিক টানাপোড়েন থেকে মুক্তি পেলেও ১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়। কারণ মাত্র চব্বিশ বছরের ব্যবধানে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়। তাই গবেষণা অভিসন্দর্ভের সূচনাকাল হিসেবে ১৯৪৭ সালকে সূচনা এবং ১৯৭১ সালকে প্রান্তিক হিসেবে ধরা হয়েছে। প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল মধ্যবর্তী সময়কালের রাজনৈতিক ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন চিহ্নিত করা হবে।[৬৫]

১.২ মুসলিম লীগ শাসনের রাজনৈতিক চালচিত্র :

ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও বিভিন্ন কারণে এতে মুসলমানদের স্বার্থ অবহেলিত হতে থাকে। তাই মুসলমানরা প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেসে সম্পৃক্ত থাকলেও দ্রুতই তারা নিজেদের দাবি দাওয়া উত্থাপন এবং রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ১৯০৬ সালে নওয়াবদের বাগান বাড়ি ঢাকার শাহবাগে স্বতন্ত্র মুসলিম সংগঠন 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই মুসলিম লীগের রাজনীতি মুসলিম অভিজাত শ্রেণি দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচন ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের আগ পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সংগঠনহীন একটি মুসলিম আভিজাত্যের সমিতি বা ক্লাবে পরিণত ছিল।[৬৬] ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের অভিজাত গঠনতন্ত্র সংশোধন করে পেঁটি বুঁর্জোয়া ও কৃষকদের জন্য সংগঠনের দার উন্মুক্ত করা হয় তা সত্ত্বেও কৃষকরা কখনও মুসলিম লীগে দলে দলে যোগ দেয়নি কিন্তু পেঁটি বুর্জোয়াদের সমাগম স্বাধীনতার দাবির সঙ্গে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবিকে প্রভাবান্বিত করে। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের দলীয় কার্যক্রম বিশেষভাবে দায়ী ছিল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যখন স্পষ্টত এই মনোভাব দেখান যে, তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগাভাগিতে উৎসাহী নয় এবং কংগ্রেসের বুদ্ধিজীবীরা মুসলমানদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি অগ্রাহ্য করলেন তখনই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি একটি চূড়ান্ত দাবি হিসেবে উত্থাপিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলন ছিল মুসলমান বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের নিম্নমানের প্রতিফলন। মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্রের ধারণার প্রতি এরা আকৃষ্ট হয়েছিলো কারণ সেখানে অমুসলমানদের সঙ্গে কোন প্রতিযোগিতা থাকবেনা এবং হিন্দু বাণিজ্যের অবর্তমানে উন্নতি সাধন করা যাবে। 'পাকিস্তান দীর্ঘজীবী হোক' স্লোগানের সত্যিকার অভিপ্রায় ছিল স্বাধীন ব্যবসা দীর্ঘজীবী হোক। পরবর্তীকালে পাকিস্তানে যে অর্থনৈতিক কাঠামো

গড়ে উঠেছিল তা মুসলমান মধ্যবিত্তদের এই নীতির যৌক্তিক পরিণতি। বাংলার কৃষক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্যে তাদের সমস্যার সমাধান দেখেছিল। কেননা সেখানে অধিকাংশ জমিদার ছিল হিন্দু এবং সমগ্র ব্যবসা বাণিজ্য ছিল হিন্দুদের হাতে।[৬৭] বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বে ন্যায্য অংশীদারিত্ব ছিল না। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি ও ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্ববর্তী এক দশক থেকেই মুসলিম লীগের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে যাকে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক বিকাশে স্বর্ণযুগ হিসেবে অভিহিত করা যায়।[৬৮] যে আদর্শ উদ্দেশ্যে এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল তা দেশ বিভাগ পরবর্তীকালে ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়।[৬৯] অতএব ১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে পটপরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। ব্রিটিশ শক্তির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তী তিন দশক পূর্ববাংলায় এই সংগঠনের কার্যক্রম ও তৎপরতা ছিল অত্যন্ত সীমিত। সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ছিল সামন্ত ভূস্বামী, অভিজাত শ্রেণি, বিভিন্ন অঞ্চলের পীর, উলেমা এবং জোতদারগণ। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের এক বিরাট অংশ আধুনিকতা বিরোধী, পাশ্চাত্য বিমূখ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। আধুনিক গণতন্ত্র, রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সম্পর্কে তারা ছিল অজ্ঞ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দলটি পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগকে এর অঙ্গ সংগঠন হিসেবেই মূল্যায়ন করতে থাকে।[৭০] পূর্ববাংলার বেশিরভাগ মানুষ স্বল্পশিক্ষিত এবং দরিদ্র ছিল। তাছাড়া তৎকালীন জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ ছিল ধর্মান্তরিত (বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম) মুসলিম এবং হিন্দু। সর্বসাধারণের মধ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করার মত কোন নেতাও গড়ে ওঠেনি। সর্বপরি পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কারণেই ১৯৩৭ সালের আগ পর্যন্ত পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের সাংগঠনিক বিস্তার হয়নি।[৭১] মুসলিম লীগ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হলেও পূর্ববাংলায় এ দলের দীর্ঘকাল কোন গণভিত্তি তৈরি হয়নি।[৭২]

১৯৩৪ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করে মুসলিম কনফারেন্স ও মুসলিম লীগের মধ্যে শক্তিশালী ঐক্য গড়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ভিত্তিতে ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচন থেকে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের গণসমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৭৩] যদিও বাংলায় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের নামে পুনর্গঠিত বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় শক্তিশালী অবস্থায় ছিল।[৭৪] এই সময়ে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ছিলেন মওলানা আকরম খাঁ, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এ কে ফজলুল হক এর মুসলিম লীগ রাজনীতিতে যোগদান। পূর্ববাংলার মানুষের অধিকার ও দাবি দাওয়ার প্রশ্নে সোচ্চার ও প্রতিবাদী ফজলুল হক-ই হলেন এই অঞ্চলের প্রথম সর্বভারতীয় বাঙালি মুসলমান রাজনৈতিক নেতা।[৭৫] তার মুসলিম লীগে যোগদানের মধ্য দিয়ে সত্যিকার অর্থে পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগ রাজনীতির প্রসার ঘটতে থাকে। একদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের তীব্র প্রতিক্রিয়া অন্যদিকে হিন্দু জমিদার শ্রেণির শোষণ ও অত্যাচার, উপরন্তু ফজলুল হকের মুসলিম লীগ রাজনীতিতে আস্থা, এই তিনটি কারণে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ মুসলিম লীগ সংগঠনে তাদের আর্থ-সামাজিক মুক্তির প্রত্যাশায়

শামিল হয়েছিল। তবে ১৯৪০ এর দশকের শুরু থেকে বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃত্বে দ্বিধা বিভক্তি দেখা দেয়।[৭৬] ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি মুসলিম লীগের বর্তমান অবস্থা বর্ণনায় মন্তব্য করেছিলেন এভাবে,

> "মুসলিম লীগ তিন স্থানে বন্ধক রয়েছে, স্যার সলিমুল্লাহর সময় থেকে নেতৃত্ব বন্ধক আছে আহসান মঞ্জিলে; প্রচার বন্ধক রয়েছে দৈনিক আজাদ এর মালিকের কাছে আর আর্থিক বন্ধক রয়েছে ইস্পাহানীর নিকটে। আমি চেষ্টা করবো ঐ বন্ধকসমূহ থেকে মুসলিম লীগকে মুক্ত করতে এবং বাংলার মধ্যবিত্তকে তার যোগ্য স্থানে বসাতে।"[৭৭]

তবে ১৯৪৪ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় মুসলিম লীগ পূর্ববাংলায় জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। এই পরিস্থিতিতে আবুল হাশিম সমর্থিত অংশটি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে চলে আসে। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পর আবুল হাশিম মুসলিম লীগের আমূল সংস্কার সাধন করেন। তিনি প্রথমে নিজ উদ্যোগে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় দপ্তর ও স্থায়ী তহবিল পুনর্গঠন করেন। প্রকৃত বাস্তবতায় পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ের সংগঠন পুনর্বিন্যাসে মনোনিবেশ করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি উচু স্তরের কর্মীর পরিবর্তে সার্বক্ষণিক কর্মী সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেন। আবুল হাশিমের বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সংস্কারের এই উদ্যোগ থেকে মূলত মুসলিম লীগের মধ্যে প্রগতিশীল অংশের প্রকৃত প্রকাশ শুরু হয়। এ অংশের মাধ্যমেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে পটপরিবর্তন তথা ভিন্ন ধারার সূচনা হয়।[৭৮] প্রগতিশীল ও আধুনিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী এই অংশটির শক্তিশালী হয়ে উঠার পটভূমিতে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বঙ্গীয় মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০) বাতিল, বাংলার মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের প্রতি অনীহা, অবিশ্বাস এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অব্যাহত ক্ষমতা ধরে রাখার কৌশলের পটভূমিতে বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃত্ব সরাসরি বিভক্ত হয়ে পড়ে। আবুল হাশিমের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা অংশই পরবর্তীতে মুসলিম লীগ ভিন্ন স্বতন্ত্র আদর্শের অনুসারী হয়। আবুল হাশিমের গড়ে তোলা কর্মীশিবির পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগকে জনসাধারণের সংগঠনে পরিণত করেন।[৭৯] যে কারণে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ জনগণ পাকিস্তান আন্দোলন তথা মুসলিম লীগের পক্ষে সর্বাত্মকভাবে কাজ করেন। পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে পাকিস্তান আন্দোলন ছিল আমজনতার (কৃষক-প্রজা) মুক্তির আন্দোলন, যদিও ধর্মবিশ্বাসে তারা মুসলমান ছিলেন। বাংলার রাজনীতি সাম্প্রদায়িক ধারায় বিভক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলার বিশেষ আর্থ-সামাজিক বিভাজন এবং জমিদারি-মহাজনি ব্যবস্থা দায়ী ছিল। জমিদার-মহাজনদের শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুসলমান কৃষক-প্রজা তথা সর্বসাধারণ তাদের মুক্তির আশায় পাকিস্তান আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়। এই আন্দোলনকে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সোপান হিসেবে মনে করে। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদেরও দায়বদ্ধতা ছিল। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম দলের জন্য যে খসড়া ম্যানিফেস্টো তৈরি করেছিলেন সেখানে জমিদারি ব্যবস্থা বাতিলের স্পষ্ট অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় সোহ্রাওয়ার্দী, আবুল হাশিমসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে জনগণকে অবহিত করেন।

তারা জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন যে, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, পাকিস্তানে তাদের সব দু:খ-দুর্দশার অবসান এবং তাদের ইচ্ছা মাফিক রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। এসময় তারা 'পাকিস্তান' বলতে কয়টি রাষ্ট্র হবে, পূর্বাঞ্চলে আলাদা রাষ্ট্র হবে কিনা (লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী) সুনির্দিষ্টভাবে তখন পূর্ববাংলার নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেননি। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের নেতৃত্বের একটি অংশ তথা সোহ্‌রাওয়ার্দী-আবুল হাশিম বা প্রগতিশীল গ্রুপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া পূর্বাঞ্চলে পরিকল্পিত রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রদান আবশ্যক হয়নি কারণ এ অঞ্চলের মানুষ আর্থ-সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে পাকিস্তান আন্দোলনে সমর্থন ও যোগদান করেছিল। এ প্রগতিশীল আধুনিক গ্রুপই ভিন্ন রাজনৈতিক ধারা প্রতিষ্ঠা তথা আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন।[৮০] তাছাড়া মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কৌশলপূর্ণ প্রচারণা ও প্রচণ্ড ধর্মীয় আবেগের বশবর্তী হয়ে বাংলার সাধারণ বাঙালি মুসলমান সমাজ পাকিস্তান আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে এটা অনস্বীকার্য যে, পাকিস্তান আন্দোলন ও বাস্তবায়নে পূর্ববাংলার মানুষের অবদান ছিল। অন্যভাবে বলা যায় যে, মুসলিম লীগের সৃষ্ট ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা মারাত্মক অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে বাঙালি মুসলমান সমাজ পাকিস্তান আন্দোলনে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল মাত্র।[৮১]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই কোটারিভিত্তিক নেতৃত্ব তৈরির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরি ছিল। অর্থাৎ পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণের উপযোগী সামন্ত, ভূস্বামী সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী এলিট শ্রেণিসমৃদ্ধ মুহাজির, আমলাবর্গ এবং সেনাবাহিনী সবকিছুই মজুদ ছিল দেশের পশ্চিমাঞ্চলে। এই সুবিধাবাদী শ্রেণি নিজেদের শ্রেণিগত স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে প্রথম থেকেই শক্তিশালী কেন্দ্রভিত্তিক পাকিস্তানের স্লোগান তুলে পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের কাঁচামালের যোগানদার ও পণ্যসামগ্রির বাজার হিসেবে ব্যবহারের পথ প্রশস্ত করে।[৮২] মুসলিম লীগ সরকার শাসন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ঔপনিবেশিক ধারা অনুসরণ করে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেগম শায়েস্তা একরামুল্লাহ পূর্ববাংলার প্রতিনিধি হিসেবে পাকিস্তান গণপরিষদে বক্তব্য দিতে গিয়ে অভিযোগ করেন যে, বাঙালিদের মধ্যে দ্রুত পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে।[৮৩] মুসলিম লীগের ত্যাগী, পরীক্ষিত নেতা-কর্মী যাদের অধিকাংশ সোহ্‌রাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের সরকার ও দলে কোথাও কোন স্থান হয়নি। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে করণীয় স্থির করার জন্য টাঙ্গাইল ও নারায়নগঞ্জে প্রগতিশীল মুসলিম লীগ কর্মীদের দুটি সভা ডাকা হয়েছিল। যে আশা আকাঙ্খা নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালিরা সর্বাত্নক সমর্থন প্রদান ও সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিল। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান তাদের সেই প্রত্যাশিত রাষ্ট্র ছিল না। শুরুতেই বাঙালিদের ওপর নেমে আসে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ, আঞ্চলিক বৈষম্য ও জাতিগত নিপীড়ন। সকল দিক থেকে বৈপরীত্য থাকায় শুধুমাত্র ধর্মীয় ঐক্যবোধ থেকে একীভূত রাষ্ট্রগঠন অসম্ভব ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নিলে তাদের বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষী ঔপনিবেশিক মানসিকতার চরম প্রকাশ ঘটে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় শুধুমাত্র ধর্ম ঐক্যবদ্ধতার ক্ষেত্রে শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে না। লাহোর প্রস্তাবের (১৯৪০) উপস্থাপক এ কে ফজলুল হক এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের সাফল্যের মূল ব্যক্তি হোসেন শহীদ

সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তান সৃষ্টির পর কেন্দ্রীয় সরকারের রোষাণলে পড়েন। পরিকল্পিতভাবে ১৯৪৬ সালের নতুন মন্ত্রিসভা থেকে বাঙালিদের বাদ দেওয়া হয়। নিজেদের নেতৃত্বকে পকেটস্থ করার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। কেন্দ্রের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত আকরম খাঁ হন দলের সভাপতি। সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তানের গণপরিষদে মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য হওয়া সত্ত্বেও সরকার তার প্রতি কট্টর আচরণ করে। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে পেশাগত কারণে সোহ্‌রাওয়ার্দী ঢাকায় এলে তাকে জোর করে স্টিমারে তুলে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া দুই বাংলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রতি হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে তাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগের গণমুখী চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যায়। দলটি সরকারের কর্মকাণ্ডের সমর্থন ও ব্যক্তি স্বার্থের প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পটভূমি সূচিত হয়।[৮৪]

মুসলীম লীগ দেশ ভাগের পর থেকেই দেশ পরিচালনায় একের পর এক অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক পথ বেছে নেয়।[৮৫] ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী খুররম খান পন্নীর (১৯২১-১৯৯৭) ভরাডুবির কারণে ১১৭টি আসনের মধ্যে ৩৮টি শূন্য হলেও এসব শূন্য আসনে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত করা হয়। টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫) বিপুল ভোটে বিজয়ী হলেও তাকে আইন পরিষদে বসতে দেওয়া হয়নি বরং নির্বাচন নাকচ করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।[৮৬] তাছাড়া ১৯৪৭-৫৮ সাল মধ্যবর্তী সময়ে পাকিস্তানের আটজন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একমাত্র হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ছাড়া বাকী সবাই ছিলেন অবাঙালি স্বার্থের প্রতিনিধি।[৮৭] মুসলিম লীগ সরকার ও দল হিসেবে সম্পূর্ণরূপে পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এসময় মুসলিম লীগ ভিন্ন মতাদর্শী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপর দমন নিপীড়ন শুরু করে। কোন রাজনৈতিক দলের গঠন বা কার্যক্রমকে দেশদ্রোহী আচরণ বলে আখ্যা দেয়।[৮৮]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সমগ্র দেশের মানুষের জন্য সুষম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা, একটি কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন প্রভৃতির কোনটিই করা সম্ভব হয়নি। পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক তথা জাতিসত্তাগত মুক্তির যে প্রত্যাশা গড়ে উঠেছিল তা বিবেচনায় ১৯৪৭ সালে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় ছিল। বস্তুত মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মধ্যে আধুনিক জীবনবোধ, দর্শনের অভাব, ধর্মান্ধতা, সংস্কার বিমুখ ভাবনার প্রাধান্য থাকায় একদিকে নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নস্যাৎ হয়ে যায়, অন্যদিকে নতুন রাষ্ট্রকে পথ নির্দেশনা প্রদানে ব্যর্থ হয়।[৮৯] অথচ সামগ্রিক জীবন মানের পরিবর্তনের অন্বেষায় পূর্ববাংলার মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনে নিয়োজিত হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ নেতৃত্ব কোন বাস্তব ও কার্যকরী অর্থনৈতিক কর্মসূচি প্রদানে ব্যর্থ হয়। ১৯৪৮ সালে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে কোন সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক বা উন্নয়ন কর্মসূচি ঘোষিত হয়নি।[৯০]

পাকিস্তান আমলে সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। প্রাদেশিক সরকারের হাতে মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। স্টেট ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রায় সকল ব্যাংক ও ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, বীমা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি মিশন সমূহের প্রধান কার্যালয়

ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে কখনো মূলধন গড়ে উঠতে পারেনি।[৯১] ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে শিল্প কারখানার সংখ্যা প্রায় সমান অবস্থায় ছিল। অথচ দেশ ভাগের দুই-তিন বছরের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি ঘটে। আমদানি-রপ্তানি, শুল্ক, আমদানি নিয়ন্ত্রণ লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রেও কৌশল আরোপ করে পাকিস্তান সরকার। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য করা হত।[৯২] তাছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্যে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে রফতানি বেশি হলেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানি হত যৎসামান্য। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আব্দুল কাদির স্বীকার করেন যে, 'এই দুই প্রদেশের অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির ক্ষেত্রে খানিকটা বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।' এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানও স্বীকারোক্তি প্রদান করেন যে, 'অতীতে পূর্ব পাকিস্তান তাদের ন্যায্য হিস্যা বুঝে পায়নি।'[৯৩] ১৯৪৭-১৯৬৬ পর্যন্ত সময়কাল যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল ৪৯২৪.১ মিলিয়ন টাকা, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি ছিল ১৬,৬৩৪.৬ মিলিয়ন। স্বভাবতই পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বাণিজ্য ঘাটতি পূরণ করা হত। অন্যদিকে ১৯৪৭-১৯৭০ সাল পর্যন্ত আমদানি ব্যয়ও ছিল অসম। পশ্চিম পাকিস্তান যেখানে ব্যয় করে ৯৩১২ মিলিয়ন ডলার, পূর্ব পাকিস্তানে সেখানে ব্যয় করে ৪২১৭ মিলিয়ন ডলার। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি আয় ছিল ৫৩৭০ মিলিয়ন ডলার। আর পশ্চিমের মোট রপ্তানি আয় ছিল ৪৪৪০ মিলিয়ন ডলার। পাকিস্তান শাসনামলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য লাভ করে পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক দাতা দেশসমূহ এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ পাকিস্তানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে নগদ পণ্যের মাধ্যমে এ সাহায্য প্রদান করে। সকল সাহায্যের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় হত কিন্তু সম্পূর্ণ ঋণ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পরিশোধ করা হত। পূর্ব পাকিস্তানে চব্বিশ বছরে মোট বৈদেশিক সাহায্যের বরাদ্দ দেওয়া হয় ২০৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পাকিস্তানের মোট বৈদেশিক সাহায্যের মাত্র ২৫ ভাগ। শুধু জনসংখ্যার দিক বিবেচনা করলেই পূর্ব পাকিস্তানের মোট আর্থিক সাহায্যের ৫৬ ভাগ প্রাপ্য ছিল।[৯৪] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম এক দশকের মোট রাজস্ব ও সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বিশ্লেষণ করলে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটি বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়।

সারণী-১

অর্থবছর	মোট রাজস্বের পরিমাণ	সামরিক খাতে ব্যয়
১৯৪৭-৪৮	১৯৯ মিলিয়ন টাকা	১৫৪ মিলিয়ন টাকা
১৯৪৮-৪৯	৬৬৮	৪৬২
১৯৪৯-৫০	৮৮৫	৬২৫
১৯৫০-৫১	১২৭৯	৬৫০
১৯৫১-৫২	১৪৪৮	৭৭৯
১৯৫২-৫৩	১৩৩৪	৭৮৩
১৯৫৩-৫৪	১১১১	৬৫৩
১৯৫৪-৫৫	১১৭৩	৬৩৫
১৯৫৫-৫৬	১৪৩৬	৯১৭
১৯৫৬-৫৭	১৩৪১	৮০১
১৯৫৭-৫৮	১৫২৫	৮৫৪

উৎস্যঃ A.M.A Muhit, *Bangladesh: Emergence of a Nation,* The University Press Limited, Dhaka, 1978, p-106-107

শিল্প বাণিজ্যে অনগ্রসর পূর্ব পাকিস্তান শিল্প-জাত সামগ্রীর জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। উন্নয়ন, আমদানি, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ইত্যাদি খাতের সিংহভাগ অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়। পাকিস্তানের প্রথম দশ বছরে আমদানি খাতে উভয় অংশের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ লক্ষ্য করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

সারণী-২

অর্থবছর	পূর্ববাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৭-৪৮	৪০ মিলিয়ন টাকা	৩১৮ মিলিয়ন টাকা
১৯৪৮-৪৯	২৮২	১১৭৭
১৯৪৯-৫০	৩৮৫	৯১২
১৯৫০-৫১	৪৫৩	১১৬৭
১৯৫১-৫২	৭৬৩	১৪৭৪
১৯৫২-৫৩	৩৬৬	১০১৭
১৯৫৩-৫৪	২৯৪	৮২৪
১৯৫৪-৫৫	৩২০	৭৮৩
১৯৫৫-৫৬	৩৬১	৯৬৪
১৯৫৬-৫৭	৮১৮	১৫১৬
১৯৫৭-৫৮	৭৩৫	১৩১৪

উৎস্যঃ A.M.A Muhit, *Bangladesh: Emergence of a Nation,* The University Press Limited, Dhaka, 1978, P.106-107

উপরের পরিসংখ্যানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকে পূর্ববাংলাকে অর্থনৈতিক শোষণের মাত্রা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হতো পূর্ববাংলা থেকে। উপরন্তু তৎকালীন বিশ্ব বাজারে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদার কারণে পাকিস্তানের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ছিল পাট রপ্তানি। আর এই পাটের শতকরা একশভাগ উৎপন্ন হতো পূর্ব পাকিস্তানে। প্রসঙ্গত পাকিস্তানের প্রথম দশ বছরে রপ্তানি খাত থেকে আয়ের একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হলো।[৯৫]

সারণী-৩

অর্থবছর	পূর্ববাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৭-৪৮	২৭২ মিলিয়ন টাকা	৪৪৪ মিলিয়ন টাকা
১৯৪৮-৪৯	১৩২৮	৫৪২
১৯৪৯-৫০	৬৮৩	৫৩৫
১৯৫০-৫১	১২১১	১৩৪২
১৯৫১-৫২	১০৮৭	৯২২
১৯৫২-৫৩	৬৪২	৮৬৭
১৯৫৩-৫৪	৬৪৫	৬৪১
১৯৫৪-৫৫	৭৩২	৪৯১
১৯৫৫-৫৬	১০৪১	৭৪২
১৯৫৬-৫৭	৯০৯	৬৯৮
১৯৫৭-৫৮	৯৮৮	৪৩৪

উৎস্যঃ A.M.A Muhit, *Bangladesh: Emergence of a Nation,* The University Press Limited, Dhaka, 1978, p-108-109

পাকিস্তানের দুই অংশের মাঝে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য ও পূর্ববাংলাকে শোষণের আর একটি দিক হলো অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রথম দশ বছরে দুই অংশের মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যের একটি পরিসংখ্যান

উপস্থাপন খুবই প্রণিধানযোগ্য। এই পরিসংখ্যান থেকে পূর্ববাংলাকে একচেটিয়াভাবে শোষণের প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করা যাবে।[৯৬]

সারণী-৪

অর্থবছর	পূর্ববাংলা থেকে পাকিস্তানে রপ্তানি	পাকিস্তান থেকে পূর্ববাংলায় আমদানি
১৯৪৭-৪৮	১৯ মিলিয়ন টাকার দ্রব্য	১৪০ মিলিয়ন টাকার দ্রব্য
১৯৪৮-৪৯	৫০	২৩৫
১৯৪৯-৫০	৬২	২৭২
১৯৫০-৫১	NA	NA
১৯৫১-৫২	১৪১	২১৮
১৯৫২-৫৩	১৫১	৩৮৭
১৯৫৩-৫৪	১৯৮	৩০৫
১৯৫৪-৫৫	২৩৮	৩৩৪
১৯৫৫-৫৬	২৪৪	৫৩২
১৯৫৬-৫৭	২৬৯	৭০১
১৯৫৭-৫৮	২৮৯	৬৮৬

উৎস্যঃ ড. হারুন অর রশীদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি, সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৫৯

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের তালিকায় প্রশাসনও বাদ পড়েনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক শাসকগোষ্ঠি নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী, দেশ-রক্ষা বাহিনী সমূহের সদর দপ্তর, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কার্যালয় দেশের পশ্চিম অংশে স্থাপন করে।[৯৭] রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সর্বত্রই ছিল অবাঙালি মুসলমান বা পাকিস্তানিদের প্রাধান্য। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বাঙালিকে সর্বদা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব পর্যালোচনা করলে অনুধাবন করা যায় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদ সমূহে পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য কতখানি একচেটিয়া ছিল।[৯৮]

সারণী-৫

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব

শতকরা হার : ১৯৫৫ সাল

পদ	মোট সংখ্যা	পশ্চিম পাকিস্তানি	মোট সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তানি (%)
সচিব	১৯	১৯	০০	০০
যুগ্ম সচিব	৪১	৩৮	০৩	৭.৩
উপ সচিব	১৩৩	১২৩	১০	৭.৫
সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা	৫৪৮	৫১০	৩৮	৭.০
মোট	৭৪১	৬৯০	৫১	৬.৯

উৎস্যঃ *পাকিস্তান অবজারভার*, ১৯ জুন, ঢাকা, ১৯৬৮

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীর চাকরিতেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য বিরাজমান ছিল। নিম্নের সারণীতে প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন পদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তার সংখ্যা ও হার থেকে বৈষম্য অনুধাবন করা যাবে।[৯৯]

সারণী-৬

বছর : ১৯৫৬

পদবী	পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তানি অফিসার সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তানিদের শতকরা হার
লে: জেনারেল	০৩	০০	০০
মেজর জেনারেল	২০	০০	০০
ব্রিগেডিয়ার	৩৪	০১	২.৮৫
কর্ণেল	৪৯	০১	২.০০
লে: কর্ণেল	১৯৮	০২	১.৩৩
মেজর	৫৯০	১০	১.৬৬
সেনাবাহিনীতে মোট	৮৯৪	১৪	১.৫৬
নৌবাহিনীতে মোট	৫৯৩	০৭	১.১৬
বিমানবাহিনীতে মোট	৬৪০	৬০	৮.৫৭

উৎস্যঃ Verinder Grover (ed.), *Encyclopaedia of SAARC Nation Bangladesh*, Deep and Deep Publication, New Delhi, 1997, p. 19

শিক্ষা ক্ষেত্রে বাঙালিদের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক চক্র বাঙালিদের অশিক্ষিত রেখে তাদের শাসন ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত এবং চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিল। পাকিস্তান সরকার প্রতিবছর শিক্ষাখাতে বরাদ্দ প্রদানে উভয় অংশের মধ্যে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করত। এ অঞ্চলের প্রতি শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণের একটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো। ১৯৪৭-১৯৬৮ পর্যন্ত সময়কালের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির একটি তুলনামুলক চিত্র।[১০০]

সারণী-৭

প্রতিষ্ঠান	পশ্চিম পাকিস্তান			পূর্ব পাকিস্তান		
	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৮-৬৯	বৃদ্ধি	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৮-৬৯	বৃদ্ধি
প্রাইমারি স্কুল	৮৪১৩	৩৯৪১৮	+৩৬৯%	২৯৬৬৩	২৮৩০৮	জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও ১৪৫৫ টি কমেছে
সেকেন্ডারি স্কুল	২৫৯৮	৪৪৭২	+১৭৬%	৩৪৮১	৩৯৬৪	(-৪.৬%)
বিভিন্ন শ্রেণির কলেজ	৪০	২৭১	+৬৭৫%	৫০	১৬২	+১১.৫%
মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং	৪	১৭	+৪২৫%	৩	৯	+৩২০%
কৃষি কলেজ	২	৬		১	৪	+৩০০%
বিশ্ববিদ্যালয়	৬৫৪ জন শিক্ষার্থী	১৮৭০৮ জন শিক্ষার্থী		১৬২০ জন শিক্ষার্থী	৮৮৩১ জন শিক্ষার্থী	

উৎস্যঃ *Bangladesh Documents, Vol.1*, Delhi Ministry of External Affairs, Government of India, 1971, P-19

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই প্রকৃত অর্থে সামগ্রিক শোষণ শুরু হয়। মুসলিম লীগ সরকারের একচেটিয়া শাসনের প্রতিবাদ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক চিত্র পরিবর্তন হতে শুরু করে। বস্তুতপক্ষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানিদের চরম শোষণ, অত্যাচার, মুসলিম লীগ নেতৃত্বের দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতা, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মারাত্মক স্থবিরতা, ধর্মান্ধতা, পূর্ববাংলার রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের ভারতের চর হিসেবে আখ্যায়িত করা ইত্যাদি কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন রাজনৈতিক মহলে হতাশা বিরাজ করতে থাকে। প্রধানত এই পটভূমিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির প্রতি বাঙালিদের মোহভঙ্গের পালা শুরু হয়। যে আবেগ, আশা আর স্বপ্ন নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের অলীক স্বপ্ন কঠিন বাস্তবতার আঘাতে চূর্নবিচুর্ণ হতে থাকে। এই অঞ্চলের মানুষ অচিরেই বুঝতে পারলো যে, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন শোষণের জন্য একটি ঔপনিবেশিক ক্ষেত্র মাত্র।[১০১]

১.৩ আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম (১৯৪৯) ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি :

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের জন্ম ও উত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক।[১০২] ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে করাচিতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী দলকে অসাম্প্রদায়িক করার প্রস্তাব উপস্থাপন করলে কাউন্সিলরদের বিরোধিতায় বাতিল হয়ে যায়। এভাবে মুসলিম লীগ কাউন্সিলররা রক্ষণশীল চরিত্র বজায় রাখে এবং দলের মধ্যে দুই ধারার সৃষ্টি করে।[১০৩] বিশ শতকের চল্লিশের দশকে এভাবেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অভ্যন্তরীণভাবে স্পষ্টত দ্বি-ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক ধারায় খাজা নাজিমুদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪) ও মওলানা আকরম খাঁ, অন্য ধারায় সোহ্‌রাওয়ার্দী ও হাশিম নেতৃত্ব দেন। এ বিভক্তি ছিল মূলত মধ্যবিত্ত এবং অভিজাত জমিদারি স্বার্থ দ্বন্দ্ব।[১০৪] প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান (১৮৯৫-১৯৫১), গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) প্রথম ধারার সমর্থন করেন। ফলে দ্বিতীয় ধারার সমর্থকরা দলে

কোণঠাসা হয়ে পড়েন।[১০৫] ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের অন্তঃর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নেয়। এসময় পূর্ববাংলা মুসলিম লীগের কর্মীদের দলকে গণমুখী করার দাবি মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণে শুধু ব্যর্থ হয়নি বরং তারা তাদের পাল্টা উদ্যোগকে অবমূল্যায়ন করে। ফলে তারা আলাদা রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নিতে শুরু করে। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন প্রক্রিয়া শুরু হলে মুসলিম লীগের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং সরকার নতুন দলের কর্মীদের হয়রানি ও গ্রেপ্তার শুরু করে।[১০৬] চৌধুরী খালিকুজ্জামান মুসলিম লীগের সভাপতি হওয়ার পর পূর্ববাংলার মুসলিম লীগ কার্যক্রম নিয়ে সবসময় চিন্তিত ছিলেন এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[১০৭] সোহ্‌রাওয়ার্দীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মওলানা ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬), শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫) ও শেখ মুজিবুর রহমানকে (১৯২০-১৯৭৫) বিশেষ ক্ষমতা অধ্যাদেশে জননিরাপত্তা আইন অনুযায়ী বারবার গ্রেফতার করা হয়।[১০৮] মুসলিম লীগ সরকার ও দল হিসেবে দেশ পরিচালনায় চরম বৈষম্য, ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতির সূচনা, বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, নেতা-নেতৃত্বের প্রতি দমননীতি অনুসরণ করে।[১০৯] পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগ সরকারের বহুমাত্রিক অপশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলিম লীগের দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের মধ্য থেকেই স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়।[১১০] স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রয়াস হিসেবে মুসলিম লীগ সমর্থিত বাম ধারার তাজউদ্দিন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫), মোহাম্মদ তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭), অলি আহাদ (১৯২৮-২০১২), কামরুদ্দীন আহমেদ (১৯১২-১৯৮২) মিলে ১৯৪৭ সালের মে মাসে 'পিপলস ফ্রিডম লীগ' নামে একটি ছোট দল গঠন করেন যদিও সরকারি গোয়েন্দাদের কঠোর নজরদারির কারণে এটি বেশি দুর আগাতে পারেনি।[১১১] এই সংগঠনের উদ্যোক্তারাই কামরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে 'গণ আজাদী লীগ' গঠন করেন। লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়নকে সামনে রেখে দলটি গঠিত হলেও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বাম সমর্থন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার নেতৃত্বে থাকা মুসলিম লীগের দাবির কাছে দলটির কর্মকাণ্ড ঢাকা পড়ে যায়।[১১২] এসময় কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত ছাত্র সংগঠন ছিলো ছাত্র ফেডারেশন। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান খান সাহেব আবুল হাসনাতের ঢাকার নূর বকস্ লেন-এর বেচারাম দেউড়ী অবস্থিত বাসায় যুব সম্মেলনে 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১৩] কফিল উদ্দীন চৌধুরী (১৮৯৮-১৯৭২) ও শামসুল হক ছিলেন এর উদ্যোক্তা।[১১৪] 'যুবলীগ' গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, হিন্দু মুসলমান যুবকদের নিয়ে একটি সুখী, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধশালী আদর্শ রাষ্ট্র পাকিস্তান গড়ে তোলাই তাদের লক্ষ্য। তবে সরকারের অত্যাধিক দমন নীতির কারণে কিছু দিনের মধ্যে দলটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।[১১৫] ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র কর্মী সভায় 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ' গঠিত হয়। এতে পূর্ববঙ্গ কমিটির আহবায়ক হন নাইমউদ্দিন আহমদ (১৯২৪-১৯৬৭) এবং ঢাকা শহর কমিটির আহবায়ক মনোনীত হন অলি আহাদ (১৯২৮-২০১২)।[১১৬]

অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান সংগঠক শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এ সময় ভারতে অবস্থান করলেও পুরান ঢাকার ১৫০ মোগলটুলী 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের' কর্মী সংগঠকদের সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। মওলানা ভাসানীও এসময় আসামের ধুবড়ি থেকে ঢাকায় আসেন এবং সরকার বিরোধী মোগলটুলী কর্মীশিবিরের

নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং একটি কর্মী সম্মেলন আহবান করার পরিকল্পনা করেন।[১১৭] এ সময় সংঘটিত দুটি ঘটনা আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল। সেটা ছিল ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে শেখ মুজিবুর রহমানসহ ২৭ জন ছাত্র নেতৃবৃন্দকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং একই মাসে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের প্রার্থীকে পরাজিত করে মোগলটুলী কর্মীশিবিরের প্রগতিশীল কর্মীদের প্রধান সংগঠক শামসুল হকের বিজয়। বিশেষ করে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে শামসুল হকের বিজয়ের পরেই স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্যাপক উৎসাহ বোধ করে।[১১৮] ১৯৪৯ সালের মে মাসের শুরু থেকেই মুসলিম লীগের তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের একটা সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিলো। ঢাকায় ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের শাখা অফিসে সম্মেলন হবে বলা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই শাখা অফিসকে কেন্দ্র করেই বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি সংগঠিত হয়। এই অফিস শুধু এ সম্মেলনের প্রস্তুতি দপ্তরই নয়, এটি ছিল আবুল হাশিমপন্থি তরুণ মুসলিম লীগ কর্মীদের দপ্তর, বিশ্রামাগার এবং প্রশিক্ষণালয়।[১১৯] ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে এখানে মুসলিম লীগ বিরোধী নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে মিলিত হয়ে 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' নামে একটা গ্রুপ গঠন করেন।[১২০] এই গ্রুপের সঙ্গে শীঘ্রই রক্ষণশীল মুসলিম লীগ নেতাদের বিবাদ শুরু হয়। 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' গ্রুপ চেয়েছিল দলের সদস্য সংখ্যা বাড়াতে কিন্তু দলের চাঁদা আদায়ের রসিদ বই ছিল তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ এর নিয়ন্ত্রণে। তিনি 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' গ্রুপকে রসিদ বই না দিলে 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' গ্রুপ কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সভাপতি চৌধুরী খালিকুজ্জামানের নিকট অভিযোগ উপস্থাপন করেন। কিন্তু খালিকুজ্জামান আকরম খাঁর সিদ্ধান্তকেই সমর্থন জানালেন।[১২১] মুসলিম লীগ নেতৃত্বের ধারণা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে নতুন কোন রাজনৈতিক দল গঠিত হবে না। পাকিস্তান মুসলিম লীগ সভাপতি চৌধুরী খালিকুজ্জামান বলেছিলেন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক দল গঠন করা হলে তা জনসমর্থন লাভ করতে পারবে না। নতুন গঠিত দলকে জনগণ গ্রহণ করবে না বরং দলীয় নেতাকর্মীদের ভারতীয় দালাল বলে আখ্যায়িত করে তাদের বর্জন করবে। ভারতীয় দালাল হিসেবে আখ্যায়িত করার পিছনে তারা যুক্তি দেখাতো যে বৃহৎ বাংলা কায়েমের নামে একদল নেতা পাকিস্তান ভাঙ্গার পরিকল্পনা করছে। মূলত কমিউনিস্ট আদর্শের অনুসারী এবং প্রগতিশীল নেতৃত্বকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্যগুলো প্রচার করা হতো। তারপরও চৌধুরী খালিকুজ্জামান পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ১৯৪৯ সালের ১৮-২০ জুন (কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা এবং কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করেন।[১২২] ঐ সম্মেলনে মুসলিম লীগ বিরোধী কর্মী সম্মেলন আহবানের নিন্দা ও মুসলমানদের অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে যোগদান না করার আহবান করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[১২৩] কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামানের প্রকাশ্য অসহযোগিতা উপলব্ধি করে ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের নতুন নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন।[১২৪] তাই ওয়ার্কার্স ক্যাম্প গ্রুপের নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ জুন পূর্ব নির্ধারিত স্বামীবাগে কাজী মোহাম্মদ বশীর হুমায়ুনের রোজ গার্ডেন বাসভবনের হল রুমে বেলা ৩ টায় সম্মেলন শুরু হয়।[১২৫] এ সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব জেলা থেকে প্রতিনিধি উপস্থিত হয়। মওলানা ভাসানীকে সভাপতি এবং ইয়ার মোহাম্মদকে

(১৯২০-১৯৮১) সম্পাদক করে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।[১২৬] সম্মেলনে ২৫০-৩০০ কর্মী উপস্থিত হয় এবং শীর্ষ নেতাদের মধ্যে শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫), আব্দুল জব্বার খদ্দর (১৮৯৭-১৯৮৪), খয়রাত হোসেন (১৯০৯-১৯৭২), আনোয়ারা খাতুন (১৯১৮-১৯৮৮), আলী আহমেদ খান, খোন্দকার মোশতাক আহমদ (১৯১৯-১৯৯৬), শওকত আলী (১৯১৮-১৯৭৫), ফজলুল কাদের চৌধুরী (১৯১৯-১৯৭৩), শামসুদ্দীন আহমেদ (১৮৮৯-১৯৬৯), আতাউর রহমান খান (১৯০৭-১৯৯১), আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৮৬), আলী আমজাদ খান, ইয়ার মোহাম্মদ খান (১৯২০-১৯৮১), কাজী গোলাম মাহবুব (১৯২৭-২০০৬), কফিল উদ্দীন চৌধুরী (১৮৯৮-১৯৭২), আবদুস সালাম খান (১৯০৬-১৯৭২) প্রমুখ যোগ দেন।[১২৭] রোজ গার্ডেনের এই সম্মেলন থেকেই 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে অল্প সময়ের মধ্যে দলটি প্রকৃতই 'আওয়ামী' অর্থাৎ জনগণের দলে পরিণত হয়। মুসলিম লীগের একদল আত্মসচেতন, উদারপন্থি ও অসাম্প্রদায়িক তরুণ রাজনৈতিক কর্মী এ দলটি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর ফলে বাংলাদেশের রাজনীতি উচ্চবিত্ত ও নবাব পরিবার থেকে ক্রমান্বয়ে সর্বসাধারণের কাছে চলে আসে।[১২৮]

আওয়ামী মুসলিম লীগ দলের নামটি প্রায় আগে থেকেই স্থির করা ছিলো। অলি আহাদ তার গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন যে,

> "আমরা কতিপয় ছাত্র ব্যতীত আর সকলেই আওয়ামী লীগ নামকরণের ঘোরপক্ষপাতী, তাহাদের যুক্তি, আমরা সকলেই মুসলিম লীগ কর্মী আকরম খাঁ, নূরুল আমীন, চৌধুরী খালেকুজ্জামান ও লিয়াকত আলী পরিচালিত মুসলিম লীগ হইল সরকারি মুসলিম লীগ এবং আমাদেরটি হবে আওয়ামের অর্থাৎ জনগণের মুসলিম লীগ। ঢাকা হাইকোর্টের জনাব দবিরুল ইসলামের হেবিয়াস কর্পাস মামলা পরিচালনার জন্য জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী যখন ঢাকায় আসিয়া ছিলেন, তখনই তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নেতা মানকী শরীফের পীর সাহেবের অনুকরণে সংগঠনের নাম আওয়ামী মুসলিম লীগ রাখার পরামর্শ দিয়াছিলেন।"[১২৯]

শেষ পর্যন্ত আওয়ামী মুসলিম লীগ নামই চূড়ান্ত হয়। 'মুসলিম' শব্দটি নামের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও চেতনাগতভাবে এটি ছিল অসাম্প্রদায়িক। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় মানুষের মাঝে যেভাবে ধর্মীয় উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল সে পরিস্থিতিতে জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা অকল্পনীয় ছিল এবং বিরোধী দল গঠন সহজসাধ্য ছিলনা। আওয়ামী মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ধর্মীয় অস্ত্র ব্যবহারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে কৌশলগত কারণে দলের নামে 'মুসলিম' শব্দটি যুক্ত করা হয়।[১৩০] সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠ পরিবেশে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি অনুগত ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন মুসলমান এ দলের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হতো।[১৩১] মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি এবং শামসুল হককে সম্পাদক করে ৪০ জন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়।[১৩২]

সারণী-৮

আওয়ামী মুসলিম লীগের কমিটি (১৯৪৯)

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	সভাপতি
আতাউর রহমান খান, অ্যাডভোকেট	সহ সভাপতি
আলী আহমদ খান এম এল এ	সহ সভাপতি
আলী আমজাদ খান, অ্যাডভোকেট	সহ সভাপতি
সাখাওয়াত হোসেন, প্রেসিডেন্ট, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স	সহ সভাপতি
আবদুস সালাম খান, অ্যাডভোকেট	সহ সভাপতি
শামসুল হক	সম্পাদক
শেখ মুজিবুর রহমান	যুগ্ম সম্পাদক
খোন্দকার মোশতাক আহমেদ	সহ সম্পাদক
এ.কে.এম.রফিকুল ইসলাম	সহ সম্পাদক
ইয়ার মুহাম্মদ খান	কোষাধ্যক্ষ

উৎস্য: আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস (১৯৪৯-১৯৭১)*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৫

খসড়া গঠনতন্ত্রে দলীয় কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ১০৪৩ রাখা হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সদস্য নির্বাচিত হতো। এভাবেই মাঠ পর্যায় থেকেই জনগণের প্রতিনিধিত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের যাত্রা শুরু যাকে আমরা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে মূল্যায়ন করতে পারি।[১৩৩] আনুষ্ঠানিক কমিটি গঠিত হওয়ার পর ১৯৪৯ সালের ২৪ জুন অপরাহ্নে মুসলিম লীগের হুমকি ও হামলা উপেক্ষা করে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে মওলানা ভাসানীর (১৮৮০-১৯৭৬) সভাপতিত্বে নবগঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে'র প্রথম প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়।[১৩৪]

প্রতিষ্ঠার সময় আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যেও রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল এই দুই ধারার রাজনীতিবিদ ছিলেন। প্রথম অংশ মুসলিম লীগের ন্যায় গতানুগতিক ধারায় রাজনীতি করার পক্ষপাতি ছিলেন। প্রগতিশীল অংশ সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে দল গঠনের প্রয়াসী ছিলেন। এরা পার্টির নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে পার্টিকে ধর্মনিরপেক্ষ করার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল অংশের মনমানসিকতা থেকে সাম্প্রদায়িক চেতনার অবসান না ঘটায় তারা 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়ার বিরোধী ছিলেন। তাই পার্টির একতা বজায় রাখতে মওলানা ভাসানী 'মুসলিম' শব্দ রেখেই পার্টির নামকরণ করেন। তাছাড়া মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে মুসলিম শব্দযুক্ত বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা তখন ছিল।[১৩৫] পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসনক্ষেত্রে অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা বিশেষ করে ৪৮ এবং ৫২ এর ভাষা আন্দোলনের কারণে দ্রুত গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে স্বল্পসময়ের ব্যবধানে আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িকীকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।[১৩৬] পার্টি গঠনের সময় সোহ্‌রাওয়ার্দী এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এসময় তিনি ভারতে অবস্থান করলেও ঢাকার ১৫০ মোগলটুলীর ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মী সংগঠকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।[১৩৭] তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে বসতি করে আইন ব্যবসা ও 'জিন্নাহ আওয়ামী লীগ' নামে একটি দল সংগঠিত করেছিলেন। পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগকে এর সঙ্গে সংযুক্ত করে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে দলটিকে জাতীয় রূপ দান করেন এবং তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[১৩৮]

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠনের এক বছরের মধ্যেই পার্টি পাকিস্তান গণপরিষদের উত্থাপিত মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরোধিতা করে আন্দোলন গড়ে তোলে।[১৩৯] এই আন্দোলনের ফলে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট গণপরিষদ

থেকে প্রত্যাহৃত হয়। এই ভাবে প্রতিষ্ঠার সূচনাতেই আওয়ামী মুসলিম লীগ একটি আন্দোলনমুখী দলে পরিণত হয়। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারিতে যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের মওলানা ভাসানী। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজয়ের লক্ষ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে আওয়ামী মুসলিম লীগ উদ্যোগী ভূমিকা রাখে। নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করে ক্ষমতা এবং বাংলার রাজনীতি থেকে মুসলিম লীগকে নির্বাসিত করে। ১৯৫৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত পার্টির কাউন্সিল মিটিং-এ পার্টিকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দলে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুসারে ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত পার্টি কাউন্সিলে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয় এবং পার্টির নতুন নাম হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ'।[১৪০] তখন থেকে এই দলটি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের সংগঠনে পরিণত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং হিন্দু তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলি বিকাশ লাভের সুযোগ না পাওয়ায় তারা অনেকে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ফলে এই দল পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে।[১৪১] পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের পতন এবং আইয়ুব খানের আমলে এখানে তার দল 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' শক্তিশালী হতে না পারায় আওয়ামী লীগ একক বৃহত্তম এবং শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[১৪২] অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি তথা ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক রাজনীতির গোড়াপত্তন করে আওয়ামী লীগ। তাছাড়া ধর্মভিত্তিক, উচ্চবিত্ত নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক ধারা থেকে নতুন ধারা হিসেবে বাঙালি জাতীয়তাভিত্তিক তারুণ্যের রাজনীতি শুরু হয় নব্যগঠিত এ দলের মাধ্যমে যাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের একটি স্পষ্ট সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।[১৪৩]

বাঙালিরা জন্মগতভাবে অসাম্প্রদায়িক এবং উদার মতাবলম্বী হওয়ায় এখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বী দলগুলো যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি, তেমনি বামপন্থি দলগুলো বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। ১৯৬০ এর দশকে মওলানা ভাসানী আইয়ুব বিরোধী বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং বামপন্থি রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ায় তিনি 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' সংক্ষেপে ন্যাপকে (১৯৫৭) শক্তিশালী করতে ব্যর্থ হন। উপরন্তু ন্যাপের ভাঙ্গনের (মোজাফফর ন্যাপ অর্থাৎ মস্কোপন্থি এবং ভাসানী ন্যাপ অর্থাৎ চীনপন্থি ন্যাপ) ফলে লাভবান হয় আওয়ামী লীগ। এর প্রমাণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২টি সাধারণ আসনের মধ্যে ১৬০টিতে জয় লাভ করে। তাছাড়া আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ছয়দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণআন্দোলন ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগই নেতৃত্ব দেয়। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই এই দল ১৯৭০ এর নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জন করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিকভাবে এই দলকে অনেক সংকট মোকাবেলা করতে হয়েছে। অনেক প্রবীণ নেতা এই দল ত্যাগ করে নতুন দল গঠন করেছেন। যেমন মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে ন্যাপ গঠন করেছেন। আতাউর রহমান খান গঠন করেছেন ন্যাশনাল লীগ। আওয়ামী লীগ তখন যথেষ্ট শক্ত ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। বহুমুখী আন্দোলনের পথ পাড়ি দিয়ে ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে

একক বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছিল। মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান প্রমুখ প্রবীণ নেতারা দল থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে শেখ মুজিব (১৯২৯-১৯৭৫) তখন নেতৃত্ব দেন; তিনি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনে উপযুক্ত নেতৃত্ব দান এবং সময়োপযোগী দিক নির্দেশনা দেওয়ার কারণে তিনি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। গণভিত্তি এবং তৃণমুল পর্যায় পর্যন্ত জনসমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হওয়ায় আওয়ামী লীগ তার জন্মের চুহাত্তর বৎসর পরেও বর্তমানে (২০২৩ সাল) দেশের সর্ববৃহৎ দল হিসেবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।[১৪৪]

১.৪ পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা (১৯৪৭-১৯৭১) :

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন (১৯৪৭-১৯৭১) চিহ্নিতকরণে তৎকালীন বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শী রাজনৈতিক দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। এসময়ই পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববাংলায় এ পার্টির শাখা হিসেবে ‘পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি’ গঠিত হয় যার সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সদর দপ্তরের সাথে ক্ষীণ যোগাযোগ থাকাই পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি মোটামুটি স্বাধীনভাবেই সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারত। আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটেই পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।[১৪৫] ১৯৪৭ সাল নাগাদ বাংলায় পাঁচ ভাগেরও কম সংখ্যক মুসলিম কমিউনিস্ট পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট আন্দোলন নির্দিষ্ট কিছু কারণে পেটি বুর্জোয়া, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি ও ছাত্রদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল।[১৪৬] এসময় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলন, নানকার, সশস্ত্র টংক, নাচোল ও হাজং আন্দোলন পরিচালিত হয়।[১৪৭] আন্দোলনের তীব্রতা ও বিস্তার দেখে বিদ্যমান সরকার হিংসাত্মক নীতি গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কর্মীদের উপর সরকারি নির্যাতনের মাত্রা বুঝে এ পার্টির প্রকাশ্য কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। কমিউনিস্ট পার্টির এ সংকটকালীন সময়ে বামপন্থিরা মওলানা ভাসানী ও তার প্রতিষ্ঠিত দল আওয়ামী লীগসহ তৎকালীন বিদ্যমান অন্যান্য দলে যোগদান করে তাদের পার্টি আদর্শ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[১৪৮] পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে ৩৭ জনের মধ্যে ৯ জন ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। এভাবেই আওয়ামী মুসলিম লীগে বামপন্থিদের প্রবেশের মাধ্যমে রাজনীতিতে একটা নতুন মেরুকরণ শুরু হয়ে যায় যার সরাসরি প্রভাব পরবর্তীতে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত আওয়ামী মুসলিম লীগে অমুসলমানদের প্রবেশ সম্ভব ছিলনা। এসময় বামপন্থি নেতৃত্বের মধ্যে পৃথক পরিচয় প্রতিষ্ঠার তাগিদ তৈরি হয়।[১৪৯] প্রথম উদ্যোগ হিসেবে ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে ‘যুব লীগ’ গঠিত হয় যার প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি ছিলেন মাহমুদ আলী (১৯১৯-২০০৬) এবং অলি আহাদ (১৯২৮-২০১২)।[১৫০] কমিউনিস্টদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে ছাত্র, তরুণদের সংগঠিত করতে এ দল গঠন করা হয়।[১৫১] এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য তাদের কর্মসূচির (ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, বিশ্বশান্তি, সামান্তবাদ বিরোধিতা, গণতন্ত্র, সকলের জন্য চাকুরির সুযোগ)

প্রতি সাধারণ জনগণের সমর্থন আদায় করা। এক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগোপযোগী কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে তাদের ইতিবাচক অবস্থান তৈরি করা। এ সময় কমিউনিস্টদের উত্থাপিত ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, গণতন্ত্র, বিশ্বশান্তি ইত্যাদি বিষয় তথা নতুন ধারার রাজনীতি ও মতবাদের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পরিচিত হয়। তাছাড়া যুবলীগ কর্মীরা আওয়ামী লীগের মধ্যে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষতা ধারণার প্রসারেও ভূমিকা রাখে। এ দলের কর্মীরা আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট সদস্য এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতো।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে যুবলীগ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এসময় যুবলীগের নেতৃত্বের দ্বারা ভাষা আন্দোলন সরাসরি চালিত হতে থাকে। তাদের এই কর্মকাণ্ডের ফলে মুসলিম লীগ সরকার দমন-নিপীড়ন এবং গ্রেফতার শুরু করে। এরূপ পরিস্থিতিতে যুবলীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব আত্মগোপনে চলে যায় এবং নতুন দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হয়। বামপন্থি মতাদর্শী নেতৃত্ব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এ দল অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মতবাদ প্রচার করে। এ দল তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ধর্মনিরপেক্ষ ছাত্র সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সহজেই এই ছাত্র সংগঠনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। কারণ এ সংগঠনের নীতি, বৈশিষ্ট্য দ্বারা শাসিতগোষ্ঠী তাদের স্বাধীনতা বা মুক্তির পথ খুঁজতে থাকে।[১৫২]

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যদের দ্বারা সরাসরি রাজনৈতিক দল হিসেবে ১৯৫২ সালের ৩১ ডিসেম্বর 'গণতন্ত্রী দল' গঠিত হয়।[১৫৩] প্রাক্তন কৃষাণ সভা নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ (১৯০০-১৯৮৬) সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন মাহমুদ আলী (১৯১৯-২০০৬)।[১৫৪] মূলত আওয়ামী মুসলিম লীগে কাজ করা বা না করার মতদ্বৈততা থেকেই এ দল গঠন করা হয়। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত *কমিনফর্ম* জার্নালে "ফর এ লাস্টিং পিস, ফর এ পিপলস ডেমোক্রেসি" স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ-ঔপনিবেশবাদ বিরোধিতার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগকে প্রশংসা করে এবং এ সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করার ব্যাপারে ইতিবাচক মতামত প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে কমিউনিস্ট পার্টির মুসলিম সদস্যরা আওয়ামী মুসলিম লীগে কাজ করবে এবং অমুসলিমরা কৃষক-শ্রমিক সংগঠনে যোগদান করবে। এভাবে তৎকালীন বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্ট কর্মীরা আস্তে আস্তে আওয়ামী মুসলিম লীগে প্রবেশ করে এবং তাদের দলীয় মতবাদ প্রচার করার কৌশল গ্রহণ করে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে বিস্তার করার পাশাপাশি প্রগতিশীল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি প্রচারের জন্য মূল প্লাটফর্ম হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগকে ব্যবহার করে। এর মাধ্যমেই আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও মতাদর্শে কমিউনিস্ট প্রভাব ঢুকে পড়ে।

গণতন্ত্রী দল গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্ট পার্টির যেসব সদস্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন না এবং যারা অমুসলিম অর্থাৎ যাদের আওয়ামী মুসলিম লীগের সদস্যপদ গ্রহণ করা সম্ভব ছিলনা তাদেরকে এ দলে সম্পৃক্ত করা। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং তার এজেন্ট মুসলিম লীগের উচ্ছেদ, পাকিস্তানের সমস্ত

বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ বাজেয়াপ্ত করা, বিদেশি ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির জাতীয়করণ, ক্ষতিপূরণ ছাড়াই জমিদারি ব্যবস্থার বিলুপ্তি এবং অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কৃষকের মাঝে বণ্টন করা। তৎকালীন প্রথম প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে এসকল কর্মসূচি নিয়ে গণতন্ত্রী দল গঠন করা হয়। উপর্যুক্ত কমিউনিস্ট মতাদর্শী তিন দলের মধ্যে উৎপত্তিগত দিক থেকে মিল রয়েছে। প্রত্যেক দলের প্রধান নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে এসেছে। তাছাড়া মুসলিম লীগ বিরোধী উগ্র রাজনৈতিক গোষ্ঠীই মূলত এ দল গঠনে মূল ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৯ সালে গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে কমিউনিস্টদের প্রভাব ছিল এ কথা বলা যায় না তবে ১৯৪০ এর দশকে যারা মুসলিম লীগের রাজনীতি করত তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল।[১৫৫] ১৯৪২-৪৬ মধ্যবর্তী সময়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মুসলমান সদস্যদের অন্তর্ভূক্তির ফলে মুসলিম লীগের সদস্যপদে প্রগতিশীলদের সংখ্যা বেড়ে যায়। শুরু থেকেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মূলত ছিল মধ্যবিত্ত বিপ্লবীদের পার্টি। পরবর্তীতে এ দলের মুসলমান সদস্যদের মুসলিম লীগে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করা হয় যার ফলে কৃষকদের সাথে কাজে জড়িত বহু বিপ্লবী লীগের স্থানীয় শাখায় যোগদানের মাধ্যমে স্বল্পসময়ে শাখা সেক্রেটারি হয়ে যান। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অত্যন্ত নিচুমানের তাত্ত্বিক জ্ঞানের জন্য বহু মুসলমান সদস্য লীগে স্বস্তিবোধ করেন।[১৫৬] এ কারণেই পরবর্তীতে আওয়ামী লীগে কমিউনিস্টদের অবস্থান সুসংহত হতে দেখা যায়। ১৯৫২ সালে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে আওয়ামী মুসলিম লীগ যখন সামন্তবাদ বিরোধী হয়ে ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ নেয় তখন এর বিরোধিতা করে আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে ডানপন্থি (বুঁর্জোয়া) অনেকেই দল ত্যাগ করে।[১৫৭] ১৯৫২ সালে চীনের পিকিং-এ অনুষ্ঠিত এশিয়ান শান্তি সম্মেলনে শেখ মুজিবসহ দলের অন্যান্য সদস্য যোগদান করেছিলেন।[১৫৮]

আওয়ামী মুসলিম লীগের এ সকল কার্যক্রম থেকে স্পষ্ট হয় যে এ দল বামপন্থিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাছাড়া বর্তমান কমিউনিস্ট নেতারাও স্বীকার করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে তারা মওলানা ভাসানীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে ও তার প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করে তাদের দলীয় আদর্শ ও কার্যক্রম পরিচালনা করে।[১৫৯] ১৯৫৩ সালের মধ্যে ক্ষমতাসীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আওয়ামী মুসলিম লীগ একটি গণবিরোধী দলে পরিণত হয়। ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের প্রভাব নষ্ট হওয়ার পর মুসলিম লীগ বিরোধী ধারায় ইসলাম ভিত্তিক ধারা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দেখা যায় এবং নতুন দুটি দলের জন্ম হয়। ১৯৫৩ সালের ২৩ আগস্ট ঢাকায় এ কে ফজলুল হক তার পুরানো দল 'কৃষক প্রজা পার্টি' নামের স্থলে 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' নামকরণ করে নতুন দল গঠন করেন। মুসলিম লীগের প্রতি অসন্তুষ্ট একটা গ্রুপ এ দলে যোগদান করে। ফজলুল হকের এ দলও এসময় ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল মতবাদ প্রচার করে। 'কৃষক প্রজা পার্টি'র সমসাময়িক ঢাকাতে 'নেজামে ইসলাম পার্টি' গঠিত হয় যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা।[১৬০] এ দলের সভাপতি হন হাফেজ আতহার আলী।[১৬১] এটি মূলত ইসলামের গোড়াপন্থি উলেমা এবং কিছু ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি তরুণ মুসলমানদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এ দলের উদ্দেশ্য ছিল কঠোর ইসলামী

অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। এ দুই দলের প্রধান বৈসাদৃশ্য ছিল এক দল ধর্মনিরপেক্ষ অন্যটি ধর্মভিত্তিক। তবে সাদৃশ্য ছিল যে, দলীয় নেতা কর্মীদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি ছিল অভিন্ন। এ দল দুটির বেশিরভাগ নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানদের মধ্য থেকে এসেছিল যারা বিশাল জমির মালিক, অপেক্ষাকৃত সুপ্রতিষ্ঠিত বুঁর্জোয়া এবং পেশাজীবী শ্রেণি। বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ তথা ইসলাম ভিত্তিক ধারা অনুসরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন করার লক্ষ্যে 'নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ' নেতৃত্ব ইসলামী সমাজতন্ত্র অথবা ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করে যা ধর্মনিরপেক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিরোধী হবে। ইসলামী সমাজতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র থেকে মানুষের মনোযোগ সরিয়ে আনা যার প্রধান কেন্দ্র ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৫০ সালের ২৬ ডিসেম্বর করাচিতে এক প্রেস কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। এসময় পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যমান ছোট বড় প্রায় সকল সংগঠনে বামপন্থি আদর্শ ঢুকে যাওয়ায় সমগ্র রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে যাচ্ছিল।[১৬২] পাকিস্তানের (অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক বিভাগের) মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন (১৮৯৮-১৯৭৭) পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট সমস্যা ব্যাপক আকারে বেড়ে গেছে বলে উল্লেখ করেন।[১৬৩] এসময় বাঙালি মুসলিম লীগ কর্মী পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ করার দাবি করে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে কামিনী কুমার দত্ত (১৮৭৮-১৯৫৯) (পূর্ব পাকিস্তানের নন-কমিউনিস্ট সদস্য) ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সাংবিধানিক পরিষদে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বেশিরভাগ কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং খুবই দারিদ্র্য পরিবেশে বসবাস করে।[১৬৪] এই দারিদ্র্য বাড়তে দেওয়া যাবে না। এটা খুবই আলোচিত সত্য যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা সকল কমিউনিজমের উৎসস্থল। তাই ক্ষুধা বন্ধ হলে কমিউনিজমের বিস্তারও বন্ধ হবে। জনগণের সকল ধরণের চাহিদা যদি সরকার পূরণ করতে পারে এবং জনগণ যদি সরকারের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তাহলে পাকিস্তান থেকে কমিউনিজমের মূলৎপাটন হবে। পূর্ব পাকিস্তান তথা সমগ্র পাকিস্তানে এসময় বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিস্তার চলছিল। এটা রোধ করার জন্যই তৎকালীন তিনজন শীর্ষস্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান এবং খাজা নাজিমুদ্দিন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ছদ্মবেশে তথাকথিত ইসলামিক সমাজতন্ত্র প্রচার করে। মূলত সমাজতন্ত্রের ঢেউ প্রতিহত করার জন্য এসময় পাকিস্তান সরকার ইসলামকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পাকিস্তান সরকারের কোন উদ্দেশ্যই পুরোপুরি সফল হয়নি কারণ পরবর্তীতে বামপন্থি আদর্শ কেন্দ্রিক পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত (২৩ জুলাই ১৯৫৪) হলেও একটা শক্তিশালী গ্রুপ থেকে যায় যারা মুসলিম লীগ বিরোধী এবং বামপন্থি রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।[১৬৫] পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি রাজনৈতিক পর্যায়ে বামপন্থিরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে। ১৯৫৪ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বামপন্থি সদস্যরা যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী মুসলিম লীগ সদস্য হয়ে, হিন্দু সদস্যরা সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্টে, তফসিলি ফেডারেশন এবং গণতন্ত্রী দলীয় সদস্য হিসেবে এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।[১৬৬]

১৯৫৫ সালে ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর ঢাকার সদরঘাটে অবস্থিত "রূপমহল" সিনেমা হল-এ অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়া হয়।[১৬৭] ফলে সকল সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত হয় আওয়ামী লীগ। এসময় হিন্দু ধর্মাবলম্বী কমিউনিস্ট সদস্যরা আওয়ামী লীগে যোগদান করে। তাছাড়া গণতন্ত্রীদল ভেঙ্গে দিয়ে এ দলের সদস্যরাও আওয়ামী লীগে যোগদান করে। তবে কমিউনিস্টদের আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের দলীয় নেতাকর্মীদের আনুষ্ঠানিক সমর্থন ছিলনা। আওয়ামী লীগে কমিউনিস্টদের যোগদানের ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি বা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি। কমিউনিস্টদের একতরফা সিদ্ধান্তে কৌশলে আওয়ামী লীগে যোগদান করে। এসময় তারা অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী মওলানা ভাসানীকে নিয়ে একটা আলাদা গ্রুপ তৈরি করতে থাকে। এ কমিউনিস্ট গ্রুপ বিলুপ্ত গণতন্ত্রী দল এবং গণতান্ত্রিক যুবলীগের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে প্রচার ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। পাকিস্তান মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয়বারের মত কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে এ দলের সদস্যরা আত্মগোপনে চলে যায়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। এসময় মণি সিংহ (১৯০১-১৯৯০) পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।[১৬৮]

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পদত্যাগ করলে ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ ইস্কান্দার মির্জার সঙ্গে এক গোপন সমঝোতার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ 'রিপাবলিকান পার্টি'র সমর্থনে মাত্র ১৩ জন সদস্য নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে।[১৬৯] এ মন্ত্রিসভায় হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী এবং আতাউর রহমান খান পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন।[১৭০] এসময় থেকেই আওয়ামী লীগের দুই নেতা সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে মতদ্বৈততা লক্ষ্য করা যায়।[১৭১] পাকিস্তান বৈদেশিক নীতিতে বরাবরই মার্কিনঘেঁষা ছিল কিন্তু পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান বিচারে এ নীতি অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল। ধর্মীয় বিবেচনা ও দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কিনঘেঁষা বৈদেশিক নীতি খুব অযৌক্তিক ছিল। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষ করে ফিলিস্তিন প্রশ্নে মার্কিনঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি কোনো মুসলমান রাষ্ট্রের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত ছিলো না। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর ভারত ও পাকিস্তান কয়েকটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধের প্রস্তুতিতে দুটি দেশ ভিন্ন ভিন্ন বৈশ্বিক গ্রুপের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যদিও ভারত নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সরঞ্জামের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তি এ বাস্তবতারই ফসল। তাছাড়া পাকিস্তান তার সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে আপস করে তাদের ভূখণ্ডে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে দিয়েছিলো। এভাবে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দেশীয় ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে।[১৭২] বিশেষ করে ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ সালে 'সিয়াটো' (সাউথ-ইস্ট-এশিয়া ট্রিটি অরগানাইজেশন) এবং 'সেন্টো' (সেন্ট্রাল ট্রিটি অরগানাইজেশন) নামক দুটি সামরিক চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ও চীনের চারদিকে মার্কিন পক্ষের শক্তিবলয় সৃষ্টি করা। তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্ট নেতৃত্ব এই দুই চুক্তির ব্যাপক সমালোচনা শুরু করে।

যেহেতু মওলানা ভাসানী মার্কিনবলয় বিরোধী সেহেতু কমিউনিস্টরা তাকে তাদের দলে আনতে সক্ষম হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী সোহ্‌রাওয়ার্দী উপরিউক্ত চুক্তিদ্বয়ের সমর্থক ছিলেন।[১৭৩] প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর সোহ্‌রাওয়ার্দী পশ্চিমা পররাষ্ট্রনীতি চলমান রাখার যৌক্তিকতাসহ ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ৯৮ ভাগ অর্জনের ঘোষণা (১৯৫৭ সালের ১৪ জুন পল্টন ময়দানের জনসভায়) প্রদান করেন।[১৭৪] তাছাড়া তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের পক্ষে জোরালো মত প্রদান করেন। অর্থাৎ মুসলিম লীগ সমর্থিত পররাষ্ট্রনীতিরই সমর্থনের উপর জোর দেন।[১৭৫]

পাকিস্তানের রাজনীতিতে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর যে বিরাট প্রভাব ছিল তা আওয়ামী মুসলিম লীগের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। তার ব্যক্তিগত জীবনের ব্রিটিশ ও মার্কিনঘেঁষা নীতিতে আওয়ামী লীগকেও জড়িয়ে ফেলা হয়। এর পেছনে তৎকালীন পাকিস্তানি রাজনীতিতে সোহ্‌রাওয়ার্দীর ঐতিহাসিক “শূন্যতত্ত্ব” কাজ করত। সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রায়ই সভা-সমাবেশে এই শূন্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন। তিনি বলতেন জোটনিরপেক্ষতার নামে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে মৈত্রী অযৌক্তিক। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা শূন্য। সুতরাং পাকিস্তানের মতো দেশ ‘শূন্য হয়ে আরেকটি শূন্যের’ সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হলে তার ফল শূন্যই হবে (শূন্য+শূন্য=শূন্য) কিন্তু যদি ব্রিটেন অথবা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী হয় তাহলে তাদের শক্তির বহর যদি ৫ হয় তাহলে শূন্যের সঙ্গে যোগ করলে তাও অর্থাৎ পাকিস্তান পাঁচ হবে (০+৫=৫)। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর এই তত্ত্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে দাড়ায়। এ নীতির প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে যায়।[১৭৬] অথচ সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মওলানা ভাসানী তাকে সকল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জোটের বাহিরে এসে আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে প্রাক্তন প্রদেশসমূহ পুনর্গঠন এবং ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দেশরক্ষা, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রাব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য আহবান জানান।[১৭৭] কিন্তু শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মার্কিনঘেঁষা নীতিতে অনড় থাকলে মওলানা ভাসানী ক্ষুব্ধ হন।[১৭৮] এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি এবং আদর্শিক দ্বন্দ্বের কারণে সোহ্‌রাওয়ার্দী ও ভাসানীর মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায় যার প্রভাব আওয়ামী লীগের উপরও পড়ে।[১৭৯] এসময় আওয়ামী লীগের মধ্যে পরিচয় গোপন করে থাকা বামপন্থিরা সক্রিয় হয়ে উঠে এবং মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়।[১৮০] আওয়ামী লীগের এই দুই প্রধান নেতার মধ্যে যখন মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করে তখন মওলানা ভাসানী দলীয় প্রধান হিসেবে ১৯৫৭ সালের ৭-৮ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল জেলার কাগমারী নামক স্থানে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করেন।[১৮১] এই সম্মেলনের আগের দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অলি আহাদ ‘সিয়াটো’ ও ‘বাগদাদ’ চুক্তি থেকে পাকিস্তানের সদস্যপদ প্রত্যাহারের প্রস্তাব উপস্থাপন করলে কমিটির সকল সদস্য তাকে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকেন। উদ্বোধনী ভাষণে (৮ ফেব্রুয়ারি) মওলানা ভাসানী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে বক্তব্য প্রদান করে

পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার হুমকি দেন। এ সম্মেলনে মার্কিনঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি বিরোধী প্রস্তাব পাশ করাতে ব্যর্থ হলে আওয়ামী লীগে প্রকাশ্য ভাঙ্গন শুরু হয়।[১৮২] মওলানা ভাসানী ১৪ জুন ১৯৫৭ নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মীসম্মেলন আয়োজনের ঘোষণা প্রদান করেন।[১৮৩] ১৯৫৭ সালের ২৫-২৬ জুলাই ঢাকার "রূপমহল" সিনেমা হল-এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও মাহমুদুল হক ওসমানীকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করে পাকিস্তান 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (ন্যাপ) গঠিত হয়।[১৮৪] পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি মওলানা ভাসানী এবং সাধারণ সম্পাদক হন মাহমুদ আলী। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের ২৯ জন সদস্য ন্যাপে যোগ দেন এবং প্রাদেশিক সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন।[১৮৫]

আওয়ামী লীগভুক্ত বামপন্থি নেতৃবৃন্দ, বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া গণতন্ত্রীদলের সদস্যরা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য কমিউনিস্ট নেতা ন্যাপে যোগ দেন।[১৮৬] তাছাড়া নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির অধিকাংশ নেতা-কর্মী ন্যাপে যোগদান করায় দলের শক্তি বহুগুনে বেড়ে যায়। ন্যাপের প্রতিষ্ঠা পরবর্তী দশকে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা এ দলের নেতৃত্বপদে চলে আসেন। এসময় ন্যাপ পূর্ব পাকিস্তানে যথেষ্ট জনসমর্থন অর্জন করতে সমর্থ হয়।[১৮৭] দেশভাগের পর ন্যাপই প্রথম রাজনৈতিক দল যা পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচুর জনসমর্থন অর্জন করে।[১৮৮] এভাবেই ন্যাপের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন পটপরিবর্তনের সূচনা হয়। মূলত এ রাজনৈতিক ধারায় বামপন্থি আদর্শ মূল চালিকা হিসেবে কাজ করে। ন্যাপ গঠনের পর এর অঙ্গ-সংগঠন হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি' গঠন করা হয় যার সভাপতি হন আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭)।[১৮৯] ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কমিউনিস্ট ও ন্যাপ নেতৃত্বের উদ্যোগে 'পূর্ব পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন' গঠিত হয়। এ সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন মোহাম্মদ তোয়াহা। এ সমস্ত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১৯০] ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করে সকল প্রকার রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এসময় মওলানা ভাসানীসহ বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ আত্মগোপন করে। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড শুরু হয়।[১৯১]

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কমিউনিস্ট গ্রুপে বিভেদ দেখা দেয় যার প্রভাব পূর্ব পাকিস্তানেও লক্ষ্য করা যায়। এ বিভেদের মূল কারণ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের ২০তম কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্ট গ্রুপে পক্ষ-বিপক্ষ তৈরি হয়।[১৯২] তাছাড়া ১৯৬২ সালে সংঘটিত ভারত-চীন যুদ্ধে পাকিস্তান চীনকে সমর্থন প্রদান করায় কমিউনিস্টরা চীনাপন্থি ও সোভিয়েতপন্থি এ দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এ বিভক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[১৯৩] মওলানা ভাসানী এবং তার দল মিস ফাতেমা জিন্নাহকে (১৮৯৩-১৯৬৭) সমর্থন প্রদান করেনি কারণ আইয়ুব খানের সরকার চীন সরকারের মিত্র ছিল।[১৯৪] যদিও তৎকালীন অন্যান্য বিরোধী দল এ নির্বাচনে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন প্রদান করে। কমিউনিস্ট

পার্টি ও ন্যাপের মধ্যে সৃষ্ট মতাদর্শগত বিরোধ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নকে দ্বিধাবিভক্ত করে।[১৯৫] এসময় ছাত্র ইউনিয়ন নেতা কাজী জাফর আহমদ (১৯৩৯-২০১৫), হায়দার আকবর খান রনো (১৯৪২-) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্ট পার্টির চীনাপন্থি নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেন।[১৯৬] ১৯৬৫ সালের ১-৩ এপ্রিল ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে সোভিয়েতপন্থি গ্রুপ মতিয়া চৌধুরী (১৯৪২-) ও সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক (১৯৩৯-২০০৮) এবং চীনাপন্থি রাশেদ খান মেনন (১৯৪৩-) ও সফিকুর রহমানকে (১৯৫৮-) যথাক্রমে দুই গ্রুপের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।[১৯৭] এই বিভক্তির মাধ্যমে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) এবং ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) নামে বিভক্ত হয়। মতিয়া গ্রুপ সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন প্রদান করলে স্বাভাবিকভাবেই মেনন গ্রুপ চীনের সমর্থকে পরিণত হয়। ছাত্র ইউনিয়নের মত কমিউনিস্ট পার্টিও চীনাপন্থি ও সোভিয়েতপন্থি নামে দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়।[১৯৮] তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭) ও সুখেন্দু দস্তিদারের (১৯১৪-১৯৭৬) নেতৃত্বে চীনাপন্থিরা পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ-লেলিনবাদ) গঠন করে।[১৯৯] দীর্ঘদিন নিষিদ্ধ থাকা স্বত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির শাখা সারাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাস্তবে এই পার্টি মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি নামে পরিচিত হয়।[২০০]

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতপার্থক্যের পরিণতিতে 'ন্যাপ' ১৯৬৭ সালে সোভিয়েতপন্থি ও চীনাপন্থি গ্রুপে বিভক্ত হয়।[২০১] ১৯৬৭ সালের ৩০ নভেম্বর ন্যাপের রংপুর কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে চীনাপন্থি ন্যাপ নেতা-কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন কিন্তু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের (১৮৮৯-১৯৭৩) নেতৃত্বে 'রিকুইজিশনপন্থিরা' এ অধিবেশনে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন।[২০২] ভাসানী বিরোধী গ্রুপ ১৬-১৭ ডিসেম্বর ১৯৬৭ ঢাকাতে পাল্টা কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করেন। এ গ্রুপই সোভিয়েতপন্থি (মস্কোপন্থি) মুজফ্‌ফর ন্যাপ নামে পরিচিত হয়।[২০৩] আদর্শিক এই বিভক্তির ফলে ন্যাপ সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এ বিভক্তির মাধ্যমে কিছু সদস্য কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে যায় এবং কিছু সদস্য আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।

১৯৬৬ সালের পর থেকে কমিউনিস্টদের একটি অংশের মধ্যে অতিবিপ্লবী প্রবণতা প্রবল আকার ধারণ করে। বিপ্লবের রণকৌশল নির্ধারণের প্রশ্নে চীনাপন্থি কমিউনিস্টরা ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দলে, উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[২০৪] শামসুজ্জোহা মানিক, নুরুল হাসান, মাহবুবউল্লাহ, আমজাদ হোসেন (১৯৪২-), আবুল কাশেম ফজলুল হক (১৯৪০-) মিলে ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে গঠন করেন 'পূর্ববাংলার বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন'।[২০৫] দেবেন সিকদার (১৯১৭-১৯৯৪) ও আবুল বাশার (১৯৩৪-২০১০) পার্টির সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে সম্মেলন করায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে তাদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়।[২০৬] ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পাবনার জয়নগরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। তবে অল্প কিছুদিন পরই এ দুই সংগঠন একীভূত হয়ে যায়। মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের কারণে ১৯৬৯ সালে কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো, রাশেদ খান মেনন প্রমুখ ছাত্রনেতা ছাত্রজীবন শেষ করে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নিয়ে 'পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি' নামে পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এদের মধ্যে কাজী জাফর আহমদ শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং টঙ্গী শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক

সংগঠন গড়ে তোলেন।[২০৭] সিরাজ সিকদারের (১৯৪৪-১৯৭৫) নেতৃত্বে বিপ্লবী কমিউনিস্ট ও চীনাপন্থি গ্রুপ আনুষ্ঠানিকভাবে কোন দল প্রতিষ্ঠা না করে ঢাকায় 'মাও গবেষণা কেন্দ্র' নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে চীনপন্থি কমিউনিস্টদের সংঘবদ্ধ করেন কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই এই কেন্দ্র বিলুপ্ত করে ১৯৬৮ সালের ৮ জানুয়ারি 'পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন' নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।[২০৮] পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনই প্রথম সংগঠন হিসেবে পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের একটি পরিপূর্ণ উপনিবেশ হিসেবে চিহ্নিত করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শুরু করার আহবান জানান। পরবর্তীতে এ সংগঠন সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনার ডাক দেয়।[২০৯]

এভাবে ১৯৬০ এর দশকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থি দলগুলো মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন দল, উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। তবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির ধারাবাহিকতায় বামপন্থিদের বহুমূখী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে বামপন্থিদের বহুমাত্রিক অবস্থান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট প্রভাবিত দলের মধ্যে কিছু গ্রুপ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ পর্বে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। যেমন ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের মস্কোপন্থি অংশটি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আন্তরিক ছিল এবং এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সাথে ঐক্য ও সমঝোতার নীতি গ্রহণ করে।[২১০] বাংলাদেশের সামগ্রিক জনগণ সামরিক বাহিনীর আকস্মিক হামলায় দিশেহারা এবং রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা প্রাথমিক প্রতিরোধে পরাজিত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের সংগঠিত করতে ব্যস্ত এসময়ই সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন ভিন্নমূখী রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে যুদ্ধাবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে।[২১১] ১৯৭১ সালের ৩ জুন বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠির পেয়ারা বাগানে অনুষ্ঠিত এক গোপন সম্মেলনে সিরাজ সিকদার পূর্ববাংলায় শ্রমিক আন্দোলন বিলুপ্ত করে গঠন করেন পূর্ববাংলার 'সর্বহারা পার্টি'।[২১২] এ পার্টি পূর্ব পাকিস্তানকে সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদের চারণক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সামন্তবাদী ও জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে উপনিবেশবাদের অবসান করা সম্ভব বলে ঘোষণা করেন।[২১৩]

স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরুতেই সরকার বিরোধী রাজনীতি জোরদার হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে বামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক সচেতনতা এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত জনগণের অবাস্তব চাওয়াকে দায়ী করা হয়। অনেকের মধ্যে বিশ্বাস ছিল স্বাধীনতা অর্জন হলে সকল দুঃখ কষ্টের অবসান হবে।[২১৪] স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যে আওয়ামী লীগের সংস্কারমুখী এক অংশের উদ্যোগে গঠিত হয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)।[২১৫] এ দল খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।[২১৬] তাছাড়া এসময় সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে গঠিত সর্বহারা পার্টিও বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলোড়ন তৈরি করেছিল। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানের পূর্ব অংশ তথা পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট রাজনীতি বিকাশের প্রথম বাঁধা ছিল ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা পর্ব থেকে এ দলের নেতৃত্বে ছিল হিন্দু সম্প্রদায়। পাকিস্তান আমলে এ

অঞ্চলে বাম রাজনীতি নতুন করে শুরু হলেও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং আদর্শগত দ্বন্দ্বের কারণে বামপন্থি দলগুলো বার বার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বামপন্থি দলগুলো প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ আসলে সেটিও সম্ভব হয়নি। কারণ আওয়ামী লীগ সংবিধানে সমাজতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করার কারণে একদল কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ আন্দোলনে উৎসাহ হারায় এবং একটা বড় অংশ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। এসময় শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করায় শ্রমিক আন্দোলন বেগবান হয়নি।[২১৭] তাছাড়া ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারি শেখ মুজিব সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) প্রবর্তন করেন।[২১৮] এ দলে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মত বামপন্থি দল যোগদান করায় বামপন্থি আন্দোলনের গতি অনেকাংশে তিরোহিত হয়।[২১৯] পাকিস্তান আমল তথা ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মোট চব্বিশ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্টদের অবদান মূল্যায়ন করে হায়দার আকবর খান রনো বলেন যে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উদ্ভাবিত 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান আন্দোলনের মতো প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ স্বতোস্ফূর্তভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এ অবস্থান থেকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও বাঙালি জাতীয়তাবোধের ধারায় নিয়ে যেতে কমিউনিস্টদের ব্যাপক ভূমিকা ছিল। কমিউনিস্ট বলতে তিনি কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ছাড়াও ন্যাপ, মওলানা ভাসানী ও তার অনুসারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[২২০]

১.৫ ভাষাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাজনীতি ও ভাষা আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৫২) :

বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি একনিষ্ঠতা ও বাঙালি সত্ত্বার চেতনাবোধ পাকিস্তান সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই ছিল এবং এ চেতনাবোধ সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনকালে পাকিস্তান ও ভারতের রাজনীতি অধিক মাত্রায় ধর্মাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনের মধ্যেও বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক বাঙালি সত্ত্বার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।[২২১] পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত মধ্যবিত্তগোষ্ঠী সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বড় রকমের মানস সংকটের সম্মুখীন হয়। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগের মাধ্যমে শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার গণতান্ত্রিক দাবির প্রতি অবিচার করেনি বরং বিষয়টির সঙ্গে ধর্মের প্রশ্নকে যুক্ত করে ভাষা বিষয়ক সংকটকে আরও জটিলতর করে তোলে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের মতে উর্দু মুসলিম সংস্কৃতির ভাষা এবং মুসলিম জাতির ঐক্যের প্রতীক রাষ্ট্র হল পাকিস্তান। এরূপ পরিস্থিতির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন মহলের মধ্যে একটি বড় প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তারা মুসলমান না কি, পাকিস্তানি না কি, বাঙালি। এসময় এ মহলই অনুধাবন করে যে, তারা তাদের ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা আবশ্যক।[২২২] এভাবে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মাতৃভাষা রক্ষার সংগ্রাম থেকে ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাজনীতির সূচনা হয়। কেননা এই আন্দোলন পাকিস্তান তথা ধর্মভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিপরীত ধারায় প্রতিস্থাপিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে পাকিস্তানি শাসকরা অগ্রসর হয়। বাঙালির প্রাণের ভাষা

ছিল তাদের প্রথম লক্ষ্যবস্তু। তাই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' ভিত্তিক মুসলিম লীগের মুসলিম জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জনগণের ভাষাগত অবস্থান ছিল নিম্নরূপ[২২৩]

সারণি-৯

ভাষা	মোট জনসংখ্যা	শতকরা হার
পশতু	৩৫,৮৯,৬২৬	৭.১
বেলুচি	১০,৭৫,৯৯৯	১.৪
সিন্ধি	৪৩,৫৯,২৮৭	৫.৮
পাঞ্জাবি	২,১৪,৬৬,৮১৫	২৮.৪
ইংরেজি	১৩,৭৭,৫৬৭	১.৮
উর্দু	৫৪,১৯,১৩১	৭.২
বাংলা	৪,১২,৯১,৮৮৯	৫৪.৬

উৎস্যঃ A.K.Choudhury, *The Independence of East Bengal: A Historical Process,* Jatiya Grantha Kendra, Dhaka, 1984, p. 129

এই পরিসংখ্যানে প্রদত্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের ৫৪.৬ শতাংশ মানুষ বাংলা ভাষাভাষী এবং মাত্র ৭.২ শতাংশ মানুষ উর্দুভাষী। পাকিস্তানের সমগ্র অঞ্চলের মোট সাতটি ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা অর্ধেকেরও বেশী মানুষের মাতৃভাষা এবং অন্য ছয়টি ভাষার অর্ধেকেরও কম (শতকরা ৪৫ ভাগ) মানুষ কথা বলে, সাহিত্য রচনা করে। অতএব, যে কোন বিচারে যুক্তির মাপকাঠিতে এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে একমাত্র বাংলা ভাষা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার অধিকার রাখতো। কিন্তু সমাজ ও রাজনীতির বাস্তবতাকে অস্বীকার করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ধর্মের দোহাই দিয়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালির সংস্কৃতির উপর অর্থনৈতিক আক্রমণ শুরু করে।[২২৪]

পাকিস্তান সৃষ্টির অনেক আগেই উর্দু বনাম বাংলা নিয়ে ভাষা বিতর্ক দেখা দেয়। ১৯০৬ সালে যখন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হয় মুসলিম লীগের এই অধিবেশনেও এ প্রশ্ন উঠে। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার তিনদিন আগে একই স্থানে (ঢাকার শাহবাগে) স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) প্রতিষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের বার্ষিক সম্মেলনে বাংলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মাধ্যম কী হবে এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। এসময় উর্দুভাষী প্রতিনিধিবৃন্দ উর্দু বা ফার্সির পক্ষে কথা বললে সিলেটের মৌলবী আবদুল করিম (তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর) তাদের বিরোধিতা করে বাংলা ভাষার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেছিলেন যে, পূর্ববাংলার মুসলমানরা উর্দু ও ফার্সি ছাড়াই মাতৃভাষা বাংলা নিয়েই থাকতে চাই। এটি কোন আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত নয় বরং নিজস্ব সত্তা-স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখার জন্য বাংলা ভাষা অবলম্বন আবশ্যক।[২২৫] ১৯৩৭ সালের অক্টোবরে মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে দলের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রবর্তনের লক্ষ্যে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত দলের বার্ষিক সম্মেলনে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। বাংলা থেকে একশ'জন প্রতিনিধি নিয়ে সম্মেলনে উপস্থিত এ কে ফজলুল হক জিন্নাহর প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করায় প্রস্তাব পাস না করে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।[২২৬] ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের প্রাক্কালে এ বিতর্ক মৃদুভাবে দেখা দেয়। কংগ্রেস নেতারা হিন্দিকে

ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিলে পাল্টা ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ উর্দু ভাষাকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা দাবি করেন।[২২৭]

১৯৪৭ সালের ১৭ মে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান হায়দ্রাবাদে দেওয়া বক্তৃতায় উর্দু পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে বলে উল্লেখ করেন এবং জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দীন আহমেদ (১৮৭৮-১৯৪৭) উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বক্তব্য দেন।[২২৮] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) ছাড়াও বেশ কয়েকজন বাঙালি লেখক ও বুদ্ধিজীবী এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলার পক্ষে বক্তব্য দেন যেমন, প্রাবন্ধিক আব্দুল হক (১৯১৮-১৯৯৭) *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকায় ২২ ও ২৯ জুন ১৯৪৭ সালে 'বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব', *দৈনিক আজাদে* (৩০জুন ১৯৪৭) 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[২২৯] বাংলার ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য ও বাঙালি জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে মতামতসহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ২৯ জুন সংখ্যায় পরিবেশিত হয়। এখানে বলা হয়, "বাঙালির জাতীয়তাবোধ এখনও পরিপূর্ণভাবে স্ফুরিত হয়নি। তার জাতীয় মর্যাদাবোধ এখনও অত্যন্ত কাঁচা। তার পূর্ণ জাতীয় ব্যক্তিত্ববোধ এখনও অপ্রতিষ্ঠিত। *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় উর্দুর সাথে তুলনায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার যোগ্যতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরা হয়। এখানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার প্রস্তাব উপস্থাপনসহ সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবার যোগ্যতা সবচেয়ে বেশি একথাও উল্লেখ করা হয়। তাছাড়া শুধু তত্ত্বগত ও যুক্তির দিক নয়, রাষ্ট্রভাষার অর্থনৈতিক দিকও এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়।[২৩০] ১৯৪৭ সালের ২৭ জুলাই পুনরায় *ইত্তেহাদে* 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে' এবং মিসেস এম.এ হক ছদ্মনামে সাপ্তাহিক *বেগম* পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[২৩১] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) ১৯৪৭ সালের ২৯ জুলাই *আজাদ* পত্রিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন।[২৩২] এছাড়া ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি হিসেবে সাহিত্যিক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার ভাষণে বলেন,

> "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোন আদর্শের কথা নয়। এটা একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা তিলক টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকার জোটি নেই।"[২৩৩]

আবদুল মতিন (১৯২৬-২০১৪) ২১ জুলাই ১৯৪৭ সালে *আজাদ* পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শিরোনামে প্রবন্ধ লেখেন। ২৭ জুলাই ১৯৪৭ সালে এ কে নুরুল হক 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' প্রবন্ধে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার একক যোগ্যতা জোরালোভাবে উপস্থাপন করেন। তাছাড়া ড. মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২), ড. কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) প্রমুখ ভাষাবিদ বাংলা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে যুক্তিগ্রাহ্য জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন।[২৩৪] এভাবে বুদ্ধিজীবী মহল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার যোগ্যতা নিরুপণ ও দাবির যৌক্তিকতা বিচার সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত থাকে।[২৩৫] এ সময় পূর্ববাংলায় সংগঠিত বিভিন্ন সংগঠনও এই বিষয়ে ভূমিকা রাখে। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসেই কামরুদ্দীন আহমেদকে আহবায়ক করে গঠিত হয় 'গণ আজাদী লীগ'

নামে একটি আদর্শ ভিত্তিক সংগঠন। এই সংগঠন স্পষ্টভাবে বাংলাকে পূর্ববাংলার রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করে।[২৩৬] এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেমের (১৯২০-১৯৯১) নেতৃত্বে গঠিত 'তমদ্দুন মজলিস' (১৯৪৭) সভা সমিতি ও লেখনির মাধ্যমে বাংলা ভাষার প্রশ্নে জনমত গড়ে তোলে।[২৩৭] এ সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' যার আহবায়ক মনোনীত হন নুরুল হক ভুঁইয়া (১৯২৩-১৯৯৮)।[২৩৮] এ কমিটিতে ডান-বাম ও মধ্যপন্থি ব্যক্তিদের উপস্থিতি স্বত্তেও তমদ্দুন মজলিশের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি ছিল।[২৩৯] এছাড়া ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী সমাজ, সাংবাদিক সংঘ বিভিন্ন সভা ও স্মারকলিপির মাধ্যমে বাংলাকে পূর্ববাংলার রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।[২৪০] ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ গৃহীত হয়। সরকারি কোন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এই প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। এভাবে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর থেকে বাংলা ভাষা আন্দোলন অনেকটা সুসংগঠিত রূপ লাভ করতে থাকে।[২৪১]

১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালকে বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়। ১৯৪৮ সালে এই আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে।[২৪২] ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১) উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার দাবি করলে মুসলিম লীগের সকল সদস্যদের ভোটে তা অগ্রাহ্য হয়।[২৪৩] মূলত এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলায় ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ছাত্র সমাজ দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় বারের মত 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। এ পরিষদের আহবায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম (১৯২৬-১৯৯৪)।[২৪৪] নবগঠিত পরিষদ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, যুবলীগ, বিভিন্ন হলের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই সংগ্রাম পরিষদ বহুদলীয় চরিত্র অর্জন করে। তারা ১১ মার্চ সারাদেশে প্রতিবাদ দিবস পালন করে। এভাবেই ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের প্রথমার্ধের মধ্যে ভাষা আন্দোলন সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার পটভূমিতে পূর্ববাংলার মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪) রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে আপসের প্রস্তাব করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের মধ্যে আট দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[২৪৫] এ চুক্তি সম্পাদনের মুল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আসন্ন ঢাকা সফর যেনো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। তবে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে ক্রমাগত গণআন্দোলনের প্রভাব বাংলা ভাষা আন্দোলনের ক্রমাগত বিস্তৃতি এবং মুসলিম লীগ রাজনীতির গণবিচ্ছিন্নতা ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে জিন্নাহ ঢাকায় এসেছিলেন। ২১ মার্চ ১৯৪৮ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে এবং উর্দুর স্বপক্ষে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য রাখেন। ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ছাত্রদের সমাবর্তন উৎসবে পুনরায় জিন্নাহ 'একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে' বলে ঘোষণা করার সাথে সাথে উপস্থিত ছাত্রদের মধ্য

থেকে প্রথমেই আবদুল মতিন ও এ. কে. এম আহসান উঠে দাড়িয়ে 'না' 'না' বলে চিৎকার করে উঠেন সাথে সাথে সমস্ত হলে 'নো' 'নো' বলে প্রবল প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়।[২৪৬] ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত পূর্ববাংলার আইন সভায় বাংলা ভাষা বিষয়ক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবশ্য মুসলিম লীগ সরকার এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করেনি।[২৪৭] ৮ এপ্রিল পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভায় ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সম্পর্কিত সংশোধনী প্রস্তাবের জবাবে তৎকালীন পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের মঙ্গল কীসের মধ্যে নিহিত সেটা অন্য যে কোনো ব্যক্তির থেকে কায়েদে আজমই বেশি বোঝেন'।[২৪৮] এভাবেই ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।[২৪৯]

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা সফরের পর ভাষা আন্দোলনের গতি মন্থর হয়ে যায় কারণ তার প্রতি একচেটিয়া গণসমর্থন ছিল। ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জিন্নাহর মৃত্যুর পর ভাষা আন্দোলন কিছুদিনের জন্য স্থিমিত থাকলেও ১৯৪৮ সালের ১৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান (১৮৯৫-১৯৫১) ঢাকা এলে ছাত্র সমাজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, কামরুন্নেসা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন দাবি সম্বলিত আন্দোলনে ঢাকা শহর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানায়। লিয়াকত আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া বক্তৃতায় সুকৌশলে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে ছাত্রদের মধ্য হতে আবারও 'না' 'না' ধ্বনি সম্বলিত প্রতিবাদ ওঠে। এ সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান (১৯০৫-১৯৬৬) বাঙালি হয়েও বাংলা বর্ণমালাকে আরবিকরণের পরিকল্পনা করেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর করাচির শিক্ষক সম্মেলনে আরবি হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। তাছাড়া ১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় তিনি আরবি হরফ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।[২৫০] এই উদ্দেশ্যে ৯ মার্চ ১৯৪৯ মওলানা আকরম খাঁর এর নেতৃত্বে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট 'পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি' গঠিত হয়। এর তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। পূর্ব পাকিস্তান ভাষা কমিটি ৭ ডিসেম্বর (১৯৫০) পেশকৃত রিপোর্টে বাংলা বর্ণমালা আরবিতে লেখার বিরোধিতা করলে সরকারের উক্ত প্রয়াস বাঁধাগ্রস্থ হয়। ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ভাষার প্রশ্নে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়। পাকিস্তান গণপরিষদের সাংবিধানিক মূলনীতি কমিটি ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর একটি অন্তর্বর্তী রিপোর্ট গণপরিষদে পেশ করে। উক্ত রিপোর্টে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের প্রতিবাদে ঢাকায় একটি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় যার মাধ্যমে ব্যাপক প্রতিবাদ কর্মসূচি প্রদর্শিত হয়। অবশেষে পাক প্রধানমন্ত্রী উক্ত রিপোর্ট প্রত্যাহার করে নেয়।[২৫১] তবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যেন একেবারে নিঃশেষ হয়ে না যায় সে উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উৎসাহী ও সংগ্রামী ছাত্র ১৯৫১ সালে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। আবদুল মতিন (১৯২৬-২০১৪) এর আহবায়ক নির্বাচিত হন।[২৫২]

১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে ভাষা আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয় খাজা নাজিমুদ্দিনের এক উক্তিতে। পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকা এসে ২৭ জানুয়ারি পল্টন

ময়দানের এক জনসভায় তিনি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনুরূপ ঘোষণা দেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'।[২৫৩] তিনি আরও বলেন, "প্রাদেশিক ভাষা কী হইবে তাহা প্রদেশবাসীই স্থির করিবে কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে উর্দু। ... একাধিক রাষ্ট্রভাষা থাকিলে কোন রাষ্ট্র শক্তিশালী হইতে পারে না।"[২৫৪] তার এই ঘোষণায় ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী মহলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। খাজা নাজিমুদ্দিনের উক্তির প্রতিবাদে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ৩০ জানুয়ারি সভা ও ছাত্র ধর্মঘট আহবান করে। ভাষা আন্দোলনকে ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে ৩১ জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাজী গোলাম মাহবুব (১৯২৭-২০০৬) এই পরিষদের আহবায়ক মনোনীত হন। সভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ, যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ২৮ মতান্তরে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট্য 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।[২৫৫] উক্ত পরিষদ ৪ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি সমর্থন করে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, বিক্ষোভ, মিছিল ও সভার কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহবান করা হয়েছিল। ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল ঐ অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের তরফ থেকে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচির প্রতি প্রাদেশিক সরকার কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করে।[২৫৬] ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. শামসুল হক কোরেশী ঘোষণা করেন যে, ২০ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে এক মাসের জন্য সমস্ত ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। সরকারি ঘোষণায় বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ছাত্ররা বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে এবং তারা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশ্য এ ব্যাপারে দুই ধরনের মতামত লক্ষ্য করা যায়। আওয়ামী মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস এবং সরকার সমর্থক ছাত্রাবাস ইউনিয়নের (যেমন সলিমুল্লাহ হল) প্রতিনিধিগণ ১৪৪ ধারা অমান্যের জোর বিরোধিতা করে সশস্ত্র প্রশাসনের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি নিতে অস্বীকৃতি জানায়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বিশিষ্ট ব্যক্তি আবুল হাশিম ও কামরুদ্দীন আহমদ প্রমুখও বিরোধিতা করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিষয়ে পক্ষ বিপক্ষের অন্যতম কারণ ছিল এসময় মওলানা ভাসানী ঢাকায় ছিলেন না। সাধারণ ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ১৪৪ ধারা অমান্য করার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল যাদের সাথে ছাত্র নেতৃত্বের বামপন্থি অংশের সমর্থন ছিল। এ পক্ষ ১৪৪ ধারা অমান্য করে একুশের নির্ধারিত কর্মসূচি অর্থাৎ সভা, মিছিল, বিক্ষোভ, ঘেরাও ইত্যাদি কর্মতৎপরতা নিয়ে এগিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলো। সলিমুল্লাহ হল ইউনিয়নের ভি.পি ও জি.এস (মুজিবুল হক এবং হেদায়েত হোসেন চৌধুরী) এগিয়ে না আসা সত্ত্বেও সেখানে এস এ বারি এবং ফকির শাহাবুদ্দিনের উদ্যোগে আলাদাভাবে ১৪৪ ধারা অমান্যের পক্ষে ছাত্রদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[২৫৭] ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা বা না করার ব্যাপারে তর্ক বিতর্কের পর আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার এবং পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচি বাতিলের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন। আবদুল মতিন ও অলি আহাদ প্রবল আপত্তি জানালে সেটা ভোটের মাধ্যমে সমাধান করা হয়।[২৫৮] অবশেষে ১১/৩/(১) ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৫৯] তবে সর্বদলীয় বৈঠকের সিদ্ধান্তে

একুশ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সমবেত ছাত্রসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু এ দুইটি মতামতই উপস্থাপন করা হবে এবং সেখানে ছাত্র সাধারণের মতামত চূড়ান্ত হবে। এসময় সভাপতি আবুল হাশিম বলেন যে, উক্ত ছাত্রসভায় সর্বদলীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য হলে সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ স্বতঃসিদ্ধভাবেই বিলুপ্ত হবে। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের মতামত ও কার্যক্রম আওয়ামী মুসলিম লীগ ও অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। এদের সমর্থনে ছিল মধ্যপন্থি, ডানপন্থি দল এবং সাংবিধানিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ। মূলত রাজনীতি সচেতন ছাত্রসমাজের মতামতেই ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া সাধারণ জনগণ ও সরকারি কর্মচারীদের একটা অংশ ১৪৪ ধারা অমান্য করার পক্ষে সমর্থন প্রদান করেন। তারা সরকারি দমন নীতি উপেক্ষা করে নির্ভয়ে আন্দোলনে গতি সঞ্চার করেছিল। আর সাংগঠনিক ভাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ নয় বরং বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ, যুবলীগ এবং বিভিন্ন ছাত্রাবাসের নেতাকর্মী লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন।[২৬০]

এভাবে ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সভায় পরস্পর বিরোধী দুইটা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। আওয়ামী মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস, সরকার সমর্থক ছাত্রাবাস প্রতিনিধিবর্গ এবং সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিল কিন্তু বাম সমর্থক ছাত্রসমাজ আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের উপযুক্ত সুযোগ মনে করে ১৪৪ ধারা অমান্য করার পক্ষে জোরালো মত প্রদান করে। পূর্ব ঘোষণানুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা জমায়েত হতে থাকে।[২৬১] আবু নছর মোহাম্মদ গাজীউল হকের (১৯২৯-২০০৯) সভাপতিত্বে বেলা প্রায় ১১ টার দিকে আমতলার সভা শুরু হয়। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত মাফিক শামসুল হক তাদের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ১৪৪ ধারা অমান্য না করা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাসহ বক্তব্য প্রদান করেন। এসময় খালেক নেওয়াজ খান (১৯২৬-১৯৭১), কাজী গোলাম মাহাবুব (১৯২৭-২০০৬), হেদায়েত হোসেন চৌধুরী (১৯৩১-২০১৪), এস এম নুরুল আলম প্রমুখ তাকে সমর্থন করেন কিন্তু কিছু ছাত্রের প্রতিবাদের মুখে শামসুল হকের বক্তৃতা ম্লান হয়ে যায়।[২৬২] এরপর বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক আবদুল মতিন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, "আজ ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা না হলে ভাষা আন্দোলন তো বটেই, ভবিষ্যতে কোন আন্দোলনই ১৪৪ ধারার ভয়ে এগিয়ে নেওয়া যাবে না। দীর্ঘ পথ পার হয়ে আন্দোলন বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, এখন পিছিয়ে আসার কোন উপায় নেই।" সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি প্রশ্ন করেন যে, "আমরা কি তাহলে ১৪৪ ধারার ভয়ে পিছিয়ে যাবো ?" উত্তরে সমস্বরে উত্তেজিত কণ্ঠে উচ্চারিত হয় 'না', 'না'। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পন্থা হিসেবে দশজন দশজন করে ছাত্র রাস্তায় মিছিল বের করবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আন্দোলনকারী সবার লক্ষ্য ছিল মিছিল করে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদ ভবনে (অডিটোরিয়াম, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) পৌঁছানো। এসময় সবার মুখে স্লোগান ছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'চলো চলো অ্যাসেম্বলি চলো'।[২৬৩] খণ্ড মিছিলগুলো যখন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে পথে নামছিল তখন রাস্তায় অপেক্ষমান পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। অবশেষে পুলিশ মিছিলকারীদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু করে। পুলিশী হামলার মুখে ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। প্রথম দিকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী কিছু ছাত্র গ্রেপ্তার হয়। ছাত্ররা আত্মরক্ষার্থে

ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশের পাল্টা হামলায় ছাত্রদের একটি বড় অংশ মেডিকেল কলেজের কাছে সমবেত হয়। মেডিকেলে সমবেত ছাত্রদের ওপর পুলিশ আকস্মিকভাবে গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে আবদুস সালাম (১৯২৫-১৯৫২), আবুল বরকত (১৯২৭-১৯৫২), শফিউর (১৯১৮-১৯৫২), রফিক উদ্দীন (১৯২৬-১৯৫২), আব্দুল জব্বার (১৯১৯-১৯৫২), ঘটনাস্থলে নিহত হন। ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা পরিণত হয় মিছিল, বিক্ষোভ আর শোকের সমন্বয়ে এক উত্তাল নগরীতে। ২১ ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনা ঢাকার জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তাছাড়া ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা সারাদেশের বিভিন্ন জেলা, মহকুমা শহর অতিক্রম করে প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে।[২৬৪]

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে সমবেত ছাত্র জনতার ওপর গুলি বর্ষণের ব্যাপারে সরকার পক্ষ থেকে বিচারপতি টমাস হোবার্ট এলিসকে (১৮৯৪-১৯৮১) প্রধান করে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়।[২৬৫] এ কমিশন পরিস্থিতির বিচারে গুলির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। তবে ভাষা আন্দোলনের সাথে প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক বিষয় এক্ষেত্রে বিবেচ্য। অল্পসংখ্যক ছাত্রের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সমাবেশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গুলিবর্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সমালোচনা আছে। এ প্রসঙ্গে গুলি বর্ষণের সব দায়দায়িত্ব অবাঙালি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোরাইশি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাসুদ আহমদ এবং চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদের ওপর ন্যাস্ত করা হয় তবে বাঙালি ডি আই জি ওবায়দুল্লাহর দায়ও কম ছিল না। কারণ এলিস কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ম্যাজিস্ট্রেট, ডি আই জি এবং পুলিশ সুপার একমত হয়েই গুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। তাছাড়া তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন এবং তার মন্ত্রিপরিষদ (যারা বাঙালি ছিলেন) সদস্যরা সমানভাবে দায়ী ছিলেন। রাজনৈতিক তাৎপর্য বিচারে বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে এটা শ্রেণিস্বার্থ সংঘাত ছিল না যে কারণে প্ররোচনাহীন সমাবেশে নূরুল আমীন প্রশাসন গুলি চালানোর নির্দেশ দিতে পেরেছিল। দুপক্ষের দ্বন্দ্বের বিষয় ছিল ভাষা এবং অঞ্চল বিচারে ভাষার বিজয়, ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের সম্ভাবনা নিয়ে বহুদূর পর্যন্ত যেতে পারতো, যেক্ষেত্রে এর পরিণতি রাজনৈতিক দিক থেকে ও শ্রেণি বিচারে তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা নয়। তাই বাঙালি বা অবাঙালি উভয়ে একই রাজনৈতিক স্বার্থের টানে তাদের পদক্ষেপ নির্ধারণ করে এবং ভাষা আন্দোলন সমূলে বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা চালায়। অন্যথায় স্বাভাবিকভাবে বাঙালি নূরুল আমীন মন্ত্রিসভা এতটা তীব্র বাংলা বিরোধী হওয়ার কোন কারণ ছিল না। আবার এমন হয়নি যে, প্রশাসনের কারসাজি বা চতুরতায় গুলি চালানো হয়েছে। এটা যদি হতো তাহলে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদে নূরুল আমীন এতটা কঠিন মনোভাব নিয়ে গুলিবর্ষণ সম্পর্কে কোন প্রকার সহানুভূতি প্রকাশে অস্বীকৃতি জানাতেন না, কিংবা ঘটনাস্থল পরিদর্শনের ব্যাপারে রূঢ়, অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করতেন না। ব্যবস্থাপক পরিষদে তার ভূমিকা দেখে বোঝা যায় যে, গুলিবর্ষণ সম্পর্কে যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা ভেবেচিন্তেই নিয়েছিলেন। ছাত্র সমাজের মিছিল এবং গুলিবর্ষণের ঘটনায় কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ছাত্রের আপসবাদী মনোভাব সত্ত্বেও বেশিরভাগ ছাত্রের সুদৃঢ় লৌহকঠিন জঙ্গী মনোভাব যা নেতৃত্বের দুর্বলতা সত্ত্বেও অন্তর্নিহিত দুর্জয় শক্তির প্রকাশ ঘটেছিল। ছাত্র জনতার মনস্তাত্ত্বিক এ বিষয়টি তৎকালীন প্রশাসন বুঝতে পেরেছিল। আপাতদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খল এবং সেনানায়ক বিহীন এইসব ভাষা সৈনিক ভাষা চেতনায় উদ্দিপ্ত হয়ে অপরাজেয় সাহসে

এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এলিস কমিশনের প্রতিবেদন মতে প্রথম রাউন্ড গুলি বর্ষণের পরও ছাত্ররা পিছু হটেনি। যার কারণে পুলিশ প্রশাসন বিপদের কারণ অনুভব করে এ শক্তিকে চিরদিনের জন্য শেষ করার লক্ষ্যে গুলি বর্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিচক্ষণতার অভাবে তারা তাৎপর্যপূর্ণ এ তারুণ্যের শক্তির সম্ভাবনা অনুধাবন করতে পারেনি। অসংগঠিত এবং রাজনৈতিকভাবে অদূরদর্শী চেতনার ছাত্র-যুবক নেতৃত্ব এ সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারেনি। সঠিক কর্মপন্থা নিয়ে এগিয়ে গেলে ভাষা আন্দোলন বিরোধী শক্তিকে আগেই দমিয়ে দেওয়া যেত। একুশ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী গণজাগরণ আরও তীব্র, ব্যাপক এবং সত্যিকার অর্থে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হত। এ শক্তির স্বরূপ ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করতে পারলে ভবিষ্যতে সংগঠিত করে রাজনৈতিক কর্মসূচি ও নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হত। তাছাড়া এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক বিজয়ের সম্ভাবনা তৈরি এবং ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হতে পারতো। অন্যদিকে বাম রাজনৈতিক সংগঠন ও তাদের কর্মতৎপরতা সংহত করার দূরদর্শী প্রয়াস বা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেনি। নেতৃত্বের দুর্বলতা, সঠিক নীতি গ্রহণে অপারগতা, অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক দক্ষতার অভাবে একুশের সম্ভাবনা রাজনৈতিক লক্ষ্যে ব্যবহারের ব্যাপারে কোন দল বা নেতা দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে পারেনি।[২৬৬]

ভাষা আন্দোলন পরবর্তী দুই বছর ভাষার প্রশ্নে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো ২১ দফাতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার অঙ্গীকার করা হয়। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভের পর তাদের দাবি পূরণের জন্য গণপরিষদে সুপারিশ করে। এই সুপারিশের আলোকে ৯ মে ১৯৫৪ তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে উর্দু ও বাংলা এবং অন্য আর কোন ভাষা যা কোন প্রাদেশিক পরিষদে সুপারিশ করা হবে।[২৬৭] গণপরিষদের এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এভাবেই বাংলাভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৬২ সালে ঘোষিত সংবিধানে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বহাল রাখা হয়। সর্বশেষ ১৯৭২ সালে প্রণীত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা।[২৬৮]

ভাষা আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনসমূহে পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো সবসময় সহযোগিতা করেছে।[২৬৯] এ আন্দোলনের সূচনাপর্ব নবউত্থিত বামপন্থি তরুণদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তৎপরবর্তী ঘটনাবলীতে বামপন্থিদের প্রধান নেতৃত্বের ভূমিকায় দেখা যায়।[২৭০] মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পর ভাষা আন্দোলন একটি পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং বিভিন্ন মতাদর্শী রাজনৈতিক দল ও বর্তমান বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ এ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে মুসলিম লীগের মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও দ্বি-জাতিতত্ত্ব ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাই উনিশশত ষাটের দশকে স্বৈরশাসন বিরোধী ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আন্দোলনে প্রেরণা যোগায়। মূলত ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে। 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠনে অসাম্প্রদায়িক

মনোভাবের প্রকাশ পায়। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ তথা ছাত্র সমাজ প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং বাংলা ভাষার পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নতুন মেরুকরণ ঘটে। ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে, মুসলিম লীগের দল হিসেবে পতনের পথ প্রশস্ত হয়। তাছাড়া হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূচনা হয় যদিও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে প্রথম থেকে পাকিস্তান সরকারের অপতৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু প্রভাবিত উল্লেখ করে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহারের চেষ্টা, উর্দুকে আরবি ভাষা গোত্রের অংশ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে কিন্তু মুসলিম লীগের ধর্মান্ধ রাজনৈতিক আদর্শের পরিবর্তে ভাষা বা জাতিভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং রাজনীতির প্রসার হয়। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির নতুন যাত্রা শুরু এবং এ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন পর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। এ কারণেই ১৯৪৮ সাল থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক সংকট পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে কম তৈরি হয়েছে যা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হিসেবে বিবেচ্য।[২৭১]

১.৬ যুক্ত রাজনৈতিক ধারায় যুক্তফ্রন্ট গঠন (১৯৫৪) :

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও ১৯৪৬ সালের নির্বাচন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক আইন সভার কাজ চলছিল। ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ এ ঘোষিত "Provincial Legislative Assembly Order 1947" অনুসারে ১৯৪৬ এর নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যগণ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যে পরিণত হয়। পাঁচ বছর পর নির্বাচনের রীতি অনুযায়ী ১৯৫২ সালে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু ১৯৪৬ সালের পরিষদ অধিবেশন ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছে, এই যুক্তিতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৬১ (২) নং ধারা সংশোধন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচন ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৫৩ সালের ৯ মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদ আইন বলে পূর্ববাংলার প্রাদেশিক আইন সভার মেয়াদ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ পর্যন্ত বর্ধিত করে। মূলত ২৬ এপ্রিল ১৯৪৯ সালে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে সরকার দলীয় প্রার্থী পরাজিত হওয়ায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার আর কোন নির্বাচন মোকাবেলা করতে ভয় পায়। কারণ টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের শক্তিশালী প্রার্থী খুররম খান পন্নী (১৯২১-১৯৯৭) তার এলাকার ধনী এবং প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। তাছাড়া তাকে বিজয়ী করার জন্য মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন স্বয়ং এবং অন্য পাঁচজন মন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন। তার এই পরাজয়ে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তরুণ নেতা শামসুল হক বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার কারণেই এই নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে পরাজয়ের আশঙ্কা থেকে পূর্ববাংলার ৩৪ টি শূন্য আসনে কোন নির্বাচন দেওয়া হয়নি। তবে ১৯৫৩ সালের শুরুতেই মুসলিম লীগ সরকার বুঝতে পারে যে, নির্বাচন বেশিদিন স্থগিত রাখা যাবে না। তাই সরকার ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের দিন ধার্য্য করে।[২৭২]

নির্বাচনী জোট গঠনের ব্যাপারে তৎকালীন বামপন্থি নেতৃত্ব প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারা ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সময়ে সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে সরকারি নির্যাতনের স্বীকার হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রাজনীতি সম্পর্কে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। পাকিস্তান সরকারের কমিউনিস্ট দমন কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ আওয়ামী মুসলিম লীগে প্রবেশ করে। এরপর থেকে আওয়ামী লীগে অসাম্প্রদায়িক যাত্রা শুরু হলে যুক্তফ্রন্ট গঠনে সহায়ক হয়েছিল।[২৭৩] এক্ষেত্রে কমিউনিস্ট অঙ্গসংগঠন ‘গণতন্ত্রী দল’ ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠার পরই যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।[২৭৪] এ সময় যুবলীগ, গণতন্ত্রী দলসহ অন্যান্য কমিউনিস্ট সংগঠনের ছাত্ররা জোট গঠনে জনসমর্থন সৃষ্টির লক্ষ্যে বিক্ষোভ সভা-সমাবেশ করতে থাকে এবং মওলানা ভাসানী ও ফজলুল হককে জোট গঠনে অনুপ্রাণিত করে।[২৭৫] এ উদ্যোগের পেছনে কারণ ছিল যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) সহ বিভিন্ন হলের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক গঠিত ‘গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট’ ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করলে সকল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে জোটবদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসে। কমিউনিস্টরা সার্বক্ষণিক চেষ্টা করতো মওলানা ভাসানীকে যুক্তফ্রন্টের জোটে নিয়ে আসতে কারণ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। তাছাড়া এ সময় তারা ফজলুল হককে প্রস্তাবিত জোটে আনার জন্য চেষ্টা করতো কারণ তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে জোটের ব্যাপারে রাজি করাতে সমর্থ হবেন। তাছাড়া ফজলুল হকের নিজস্ব কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দল না থাকায় বামপন্থিরা আশা করেছিল তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ পশ্চিমী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সোহ্‌রাওয়ার্দীর উপর আস্থা রাখতে পারছিলেন না।[২৭৬] তাছাড়া সোহ্‌রাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব প্রথমেই নাকচ করে দিয়েছিলেন।[২৭৭] একইভাবে তৎকালীন বামপন্থি দল যুবলীগও যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য জোরালো ভূমিকা রাখে। যুবলীগ নেতা তোয়াহাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যুক্তফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে সক্রিয় তৎপরতা শুরু করে।[২৭৮]

১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলায় সাধারণ নির্বাচনের সরকারি ঘোষণায় চাকুরি ছেড়ে দিয়ে এ কে ফজলুল হক পুনরায় রাজনীতিতে মনোযোগী হয়ে ওঠেন।[২৭৯] ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে ঢাকার বাসায় অনুষ্ঠিত এক সভায় ‘কৃষক-শ্রমিক পার্টি’ নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন।[২৮০] ফজলুল হক অল্প সময়ের ব্যবধানে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং তার দলের কর্মসূচির সঙ্গে আওয়ামী মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম বা খেলাফতে রব্বানী পার্টির দলীয় কর্মসূচির সাথে মিল থাকায় মুসলিম লীগ বিরোধী জোট গঠনে উদ্যোগী হন। তিনি ১৯৫৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বিরোধী দল নিয়ে জোট গঠনের ঘোষণা দেন।[২৮১] ১৯৫৩ সালের ১৬ নভেম্বর তার বাসায় অনুষ্ঠিত এক সভায় যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আবদুল লতিফ বিশ্বাসকে জোট গঠনের ব্যাপারে অন্যান্য দলের সাথে যোগাযোগের কথা বলেন। অবশ্য আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে ফজলুল হক আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন।

১৯৫৩ সালের মে মাস থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ নির্বাচনী জোট গঠনের ব্যাপারে তৎপর হতে থাকেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর এ দল মুসলিম লীগ বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে।[২৮২] যে কারণে জনসমর্থন ও সাংগঠনিক দিক থেকে মুসলিম লীগের পরেই আওয়ামী মুসলিম লীগের অবস্থান থাকলেও ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালে পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নির্বাচনে মুসলিম লীগের কাছে ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়। তাই পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের বিকল্প রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে নির্বাচনের আগ থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গসংগঠন গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনসহ অন্যান্য কমিউনিস্ট সংগঠনের সাথে একযোগে কাজ করার নীতি অব্যাহত রাখে। তাছাড়া আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছিল যে নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এককভাবে জয়লাভ করা যাবে কি না। অন্যদিকে ফজলুল হকের নতুন করে রাজনীতিতে যোগদান এবং দল গঠন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করায় তার সাথে জোট গঠন করা জরুরি হয়ে ওঠে।[২৮৩] এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৫৩ সালের মে মাসে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ময়মনসিংহের এক জনসভায় সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জোট গঠনের ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ অধিবেশনে সোহ্‌রাওয়ার্দী, মিয়া মোহাম্মদ ইফতেখার উদ্দিনসহ (১৯০৭-১৯৬২) শীর্ষস্থানীয় অনেক নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন।[২৮৪] ১৯৫৪ সালের ১৪-১৫ নভেম্বর মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত সভায় যুক্তফ্রন্ট গঠনে একমত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৩ সালের ১৭ নভেম্বর আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠকে যুক্তফ্রন্ট গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[২৮৫] পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এই ফ্রন্ট গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠনের পূর্ব পর্যন্ত দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যকার আলোচনা চলতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী ও ফজলুল হকের মধ্যে অনুষ্ঠিত (আওয়ামী মুসলিম লীগ দলীয় কার্যালয়) এক দীর্ঘ আলোচনার পর নিজ নিজ দলের পক্ষে যুক্তফ্রন্ট গঠন সংশ্লিষ্ট নথিপত্রে স্বাক্ষর করে একটি যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন। তবে এক্ষেত্রে নেজামে ইসলাম পার্টি ও গণতন্ত্রী দলের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।[২৮৬] যদিও আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি প্রধান ভূমিকা পালন করে কিন্তু ছোট ছোট দলগুলোকে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভূক্তিতে শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ পরস্পর বিরোধিতা করে এবং এরই প্রেক্ষিতে যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়।[২৮৭] মূলত বামপন্থি দল ও তার অঙ্গসংগঠন গুলোকে এ জোটে অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারে সমস্যা তৈরি হয়। নেজামে ইসলাম পার্টির আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (১৮৯৩-১৯৭৬) এ ব্যাপারে আপত্তি জানালে ফজলুল হক তাকে সমর্থন করেন।[২৮৮] অন্যদিকে বামপন্থি দল ও সংগঠনের অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারে আওয়ামী মুসলিম লীগের মওলানা ভাসানী, খেলাফতে রব্বানী পার্টির আবুল হাশিম গণতন্ত্রী দলের মাহমুদ আলী বামপন্থিদের নিয়ে জোট গঠনে জোরালো মতামত প্রকাশ করে এবং বলে যে তাদের ছাড়া জোট গঠনের মূল্য নেই।[২৮৯] এই পরস্পর বিরোধী পরিস্থিতির কারণে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ও তার অঙ্গসংগঠন যুবলীগ যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। নির্বাচনে গণতন্ত্রী দলের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণা এবং তাদের আওয়ামী মুসলিম লীগের নামে মনোনয়ন লাভ থেকে বোঝা যায় যে, গণতন্ত্রী দলের সাথে আওয়ামী মুসলিম লীগের গোপন যোগাযোগ

ছিল।[২৯০] যুক্তফ্রন্টে দলীয় অবস্থান বা জোট নিয়ে বিতর্ক থাকলেও যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভীতির কারণ হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ ছিল না। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ যুক্তফ্রন্ট নামক রাজনৈতিক জোটকে পাকিস্তান ধ্বংসকারী আঁতাত বলে প্রচার করতে থাকে এবং সকল পরিস্থিতিতে এ জোটের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে। তবে গণতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী নেতৃবৃন্দ এ জোটকে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে গঠিত ঐক্যবদ্ধ নতুন শক্তির উত্থান বলে অভিহিত করে।[২৯১] পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি ছাড়াও মুসলিম লীগ বিরোধী এ প্রক্রিয়ায় শরিক হয় গণতন্ত্রী দল ও নেজামে ইসলাম পার্টি। যদিও এ নির্বাচনে ১৬টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কিন্তু নির্বাচন মূলত মুসলিম লীগ ও মুসলিম লীগ বিরোধী নির্বাচনে পরিণত হয়।[২৯২] মুসলমান আসনে যে সকল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সেগুলো হলো মুসলিম লীগ (১৯০৬), পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (১৯৪৯), কৃষক-শ্রমিক পার্টি (১৯৫৩), নেজামে ইসলাম (১৯৫৩), যুবলীগ (১৯৫১), গণতন্ত্রী দল (১৯৫২), খেলাফতে রাব্বানী পার্টি (১৯৫২) প্রভৃতি। অমুসলমান আসনে যে দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলো পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, তফশিলি ফেডারেশন, গণসমিতি, অভয় আশ্রম (কুমিল্লা), পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল প্রভৃতি। কমিউনিস্ট পার্টির মুসলমান সদস্যগণ মুসলমান আসনে এবং হিন্দু সদস্যগণ হিন্দু আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।[২৯৩]

মূলত দলত্যাগী ও নতুন প্রজন্মের নেতারা মিলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রতীক হিসেবে বেছে নেয় নৌকা।[২৯৪] ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ফ্রন্টের পক্ষ থেকে পূর্ববাংলার মানুষের সামনে একুশ দফা কর্মসূচি পেশ। ১৯৫৩ সালের ১১ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে এই একুশ দফা কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়। এই একুশ দফা রচনায় মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)। যুক্তফ্রন্ট 'নৌকা' প্রতীক নিয়ে একুশ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে।[২৯৫] ১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে যুক্তফ্রন্টের প্রচার দপ্তর থেকে প্রকাশিত একুশ দফা কর্মসূচি ও নীতি ছিল নিম্নরূপ ঃ

নীতি: কোরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতি বিরুদ্ধ কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হবে।

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও বাতিল করে ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হবে এবং উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হবে এবং সার্টিফিকেটযোগ্য খাজনা আদায়ের প্রথা বাতিল করা হবে।

৩. পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন এনে পাট চাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার সময়কালের পাট কেলেংকারি তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাদের অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৪. কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে।

৫. পূর্ববঙ্গকে লবন শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবন তৈরির কারখানা স্থাপন করা হবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা আমলের লবন কেলেংকারি সম্পর্কে তদন্ত করে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে ও তাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণির মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল হতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করে ও কৃষিকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করে কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান পার্থক্য বাদ দিয়ে একই পর্যায়ভুক্ত করে সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল আইন-কানুন বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প-ব্যয় সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হবে।

১২. শাসন ব্যয় সর্বোচ্চ হারে হ্রাস করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন হ্রাস করে ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়িয়ে তাদের আয়ের একটি সুসংহত সামঞ্জস্য বিধান করা হবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ করবেন না।

১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিসওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারী ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ নেওয়া হবে এবং সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অধ্যাদেশ প্রভৃতি আইনকানুন বাতিল করে, বিনা বিচারে আটক বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হবে এবং সংবাদপত্র প্রকাশ ও সভা-সমিতি করার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করা।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউজের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত বিলাস বহুল বাড়িতে বসবাস করবে এবং বর্ধমান হাউজকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হবে।

১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হয়েছেন, তাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হবে এবং তাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

১৮. ফেব্রুয়ারি ২১ দিনটিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করে সরকারি ছুটির দিন করা হবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌম করা হবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত বাকী বিষয় (অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনা হবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌ-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করে পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের মেয়াদ বাড়াবে না। আইন পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয়মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হবে, তিন মাসের মধ্যে তা পূরণের জন্য উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে এবং পর পর তিনটি উপ-নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন।[২৯৬]

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণায় মুসলিম লীগ শাসনের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ, চক্রান্তমূলক রাজনীতির ধরণ এবং অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়। তাছাড়া এ নির্বাচনে মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ নেতা সারাবাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে একুশ দফার পক্ষে জনগণকে সচেতন করে তোলেন। মুসলিম লীগও নির্বাচনে জয়লাভের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ববঙ্গ আইন সভার মোট আসন ছিল ৩০৯ (স্পিকারসহ ৩১০), পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির আওতায় মুসলিম আসন সংখ্যা ছিল ২৩৭ এবং অমুসলিম আসন সংখ্যা ছিল ৭২। ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের সম্পূর্ণ ফলাফল সরকারিভাবে ঘোষিত হয় ২ এপ্রিল। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং মুসলিম লীগের

ভরাডুবি ঘটে। এ নির্বাচনের ফলাফলকে ব্যালট বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উক্ত নির্বাচনের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ।[২৯৭]

মুসলিম আসন = ২৩৭

দলের নাম	**আসন সংখ্যা**
যুক্তফ্রন্ট	২২২
মুসলিম লীগ	৯
স্বতন্ত্র	৫
খেলাফতে রব্বানী	১
মোট আসন	**২৩৭**

সংখ্যালঘু আসন = ৭২

সংখ্যালঘু দলের নাম	**আসন সংখ্যা**
কংগ্রেস	২৪
সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট	৯
গণতন্ত্রী দল	২
কমিউনিস্ট পার্টি	৫
তফসিলী ফেডারেশন ও স্বতন্ত্র	২৯
বৌদ্ধ	২
খ্রিস্টান	১
মোট	৭২

উৎস্য: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩৮৯

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল ঢাকার বার লাইব্রেরি হল-এ মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভায় এ কে ফজলুল হককে পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচন করা হয়। তার নেতৃত্বেই ৩ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট সরকার শপথ গ্রহণ করে। ফজলুল হকসহ চার সদস্যবিশিষ্ট এই মন্ত্রিসভায় আওয়ামী মুসলিম লীগের কোন সদস্য অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় যুক্তফ্রন্টের দুই প্রধান শরিক দলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। অবশ্য ৯ এপ্রিল আতাউর রহমান খান (সহ সভাপতি, আওয়ামী মুসলিম লীগ) এবং এ কে ফজলুল হক এর (সভাপতি, কৃষক শ্রমিক পার্টি) মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনায় আওয়ামী মুসলিম লীগের কয়েকজনকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এই ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা পূর্ববাংলার সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি উচ্ছেদের কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলার মুসলিম লীগ গোষ্ঠী, পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র কোনক্রমেই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে মেনে নিতে পারেনি। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে যথাক্রমে খুলনা ম্যাচ ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক সংঘর্ষ, আদমজী পাটকলে (১৫ মে ১৯৫৪) এবং কর্ণফুলী পেপার মিলে (১৯৫৪ সালের ২৩ মার্চ) সংঘটিত হয় বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা। মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠী এই সকল ঘটনায় ইন্ধন যোগানোর পাশাপাশি পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি নষ্টের অভিযোগ তুলে ব্যাপক প্রচারণা শুরু করে। এ সময় যুক্তফ্রন্টের ১৬২ জন সদস্য পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তিকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য বিপজ্জনক বলে অভিহিত করে।[২৯৮] ফলে পাকিস্তান সরকার যে কোন অজুহাত দেখিয়ে নির্বাচিত

সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। মূলত যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে এ সরকারকে বরখাস্ত করার নানা উপায় খুঁজতে থাকে।

১৯৫৪ সালের ৩০ এপ্রিল পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক চিকিৎসার জন্য কলকাতা গমন করেন। তৎকালীন পশ্চিম বাংলার মূখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের (১৮৮২-১৯৬২) সাথে তিনি পূর্ববাংলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। তার এই পশ্চিম বাংলা সফর ও বক্তব্যকে পাকিস্তান সরকার দেশদ্রোহী হিসেবে অভিহিত করে। বস্তুত পাকিস্তান সরকার, মুসলিম লীগ গোষ্ঠী ও আমলাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল তার পশ্চিমবঙ্গ সফরকে কেন্দ্র করে মিথ্যা অভিযোগের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্তের ব্যবস্থা করা। এ জন্য দেশের অভ্যন্তরে বাঙালি-অবাঙালি এবং হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সৃষ্টি, অন্যদিকে একটানা ভারতবিরোধী প্রচারণা-এই দুই ধারার চক্রান্ত অব্যাহত থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২(ক) ধারা বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন এবং একইসঙ্গে পূর্ববাংলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়।[২৯৯] চৌধুরী খালিকুজ্জামানের স্থলে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে (১৮৯৯-১৯৬৯) পূর্ববাংলার গভর্নর করা হয়।[৩০০] এসময় আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানসহ শতশত রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও সংগঠকদের গ্রেফতার করা হয়। ফজলুল হককে গৃহে অন্তরীণ করা হয়। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্তের সময় লন্ডনে অবস্থানরত মওলানা ভাসানীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে যুক্তফ্রন্ট সদস্যদের আন্দোলন থেকে বিরত রাখে।[৩০১] তবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বরখাস্তের সিদ্ধান্ত প্রতিবাদ করার মত জোরালো কোন কর্মসূচি এ সময় দেখা যায়নি। যুক্তফ্রন্টের প্রধান তিন নেতার অনুপস্থিতি পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে। (এ কে ফজলুল হক অন্তরীণ অবস্থায় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিবৃতি দেন। মওলানা ভাসানী লন্ডনে ছিলেন এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী সুইজারল্যান্ডে চিকিৎসারত ছিলেন।) তিন নেতা যদি ঢাকায় অবস্থান করে কেন্দ্রীয় সরকারের বরখাস্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতেন তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে পুনর্বহাল করতে বাধ্য হতেন। মূলত নেতৃত্বের দুর্বলতা যুক্তফ্রন্টের অবসানে বড় ভূমিকা পালন করে।[৩০২]

পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনেই সর্বপ্রথম একটি সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী ইশতেহার উপস্থাপন করে রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে নির্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মুসলিম লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষাকে প্রাধান্য দিলেও যুক্তফ্রন্ট পূর্ববাংলার জনগণের কল্যাণ ও স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি-দাওয়া সম্বলিত একুশ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা কর্মসূচিই পরবর্তীকালে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন, আওয়ামী লীগের ছয় দফা, সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ১১ দফা কর্মসূচিসহ ১৯৭০ এর নির্বাচনে নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন ও প্রচারণায় একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করে। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে যুক্তফ্রন্ট গঠন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, কারণ যুক্তফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক

ধারায় যুক্ত রাজনীতির সূচনা হয়। যুক্তফ্রন্টেই প্রথম ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক গোষ্ঠী একত্রিত হয় এবং মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রতিহত করে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববাংলার জনগণ পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রশ্নে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ এবং তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে বদ্ধ পরিকর। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির এই পটপরিবর্তনে এ কে ফজলুল হক, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যুক্তফ্রন্ট গঠন ও পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করে তারা পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সাধারণ জনসাধারণের রাজনৈতিক স্বার্থ সবসময় উপেক্ষিত হয়। যুক্তফ্রন্ট গঠনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালি, খাজা পরিবার, ব্যবসায়ী ও এলিটদের রাজনৈতিক আদর্শে চরম আঘাত পড়ে এবং ভিন্ন ধারার যুক্ত রাজনীতির প্রবর্তন হয়।[৩০৩]

১.৭ পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসন ও গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা (১৯৫৮-১৯৭১) :

১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার যুক্তফ্রন্টের নিকট রীতিমত পর্যুদস্ত হয়। তাই তারা নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকারকে অস্থিতিশীল এবং উৎখাত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্ট ছিল একাধিক রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত একটি রাজনৈতিক জোট। নির্বাচনে জয়লাভের পর মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে ফ্রন্টের ভেতর অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কিন্তু সমঝোতার মাধ্যমে কিছুটা সমাধান হলেও পরবর্তীকালে জোটভুক্ত দলের সদস্যের মধ্যে মতানৈক্যের অভাবে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যায়। এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক চরিত্রই বদলে যায়। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার উদ্ভব হয় যার ফল ছিল অগণতান্ত্রিক শক্তির ক্ষমতা দখল। এসময় পূর্ব পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয় অংশে শক্তিশালী প্রতিবাদী ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়।[৩০৪] ১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির (বিরোধী দল) সদস্যের মধ্যে এক অপ্রীতিকর ঘটনায় ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী মারাত্মকভাবে আহত হয়ে তিন দিন পর মারা যান। মূলত এ ঘটনাই সেনাশাসন জারির প্রত্যক্ষ কারণ। তাছাড়া জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়।[৩০৫]

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাত ১০:৩০ মিনিটে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা (১৮৯৯-১৯৬৯) সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মালিক ফিরোজ খানের (১৮৯৩-১৯৭০) সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন।[৩০৬] তিনি ফরমান জারির মাধ্যমে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আগা মুহাম্মদ আইয়ুব খানকে (১৯০৭-১৯৭৪) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। একই ফরমানে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহকে বরখাস্ত করে ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল ঘোষণা করা হয়। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহ ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং রাজনৈতিক দলসমূহ বিলুপ্ত ঘোষণার সাথে সাথে মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত করা হয়। এরপর মাত্র বিশ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে উৎখাত করে ঐ দিনই মধ্যরাত থেকে নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সশস্ত্র বাহিনীর

সর্বাধিনায়ক বলে ঘোষণা করেন। স্বভাবতই অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণ করায় আইয়ুব খান তার ক্ষমতা গ্রহণের আবশ্যকতা প্রমাণ করার জন্য ঢালাওভাবে রাজনীতিবিদদের চরিত্রে নানা রকম কুৎসা রটনা করেন। তাছাড়া দুর্নীতির হাত থেকে দেশোদ্ধার ও উন্নতির আশ্বাস দিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।[৩০৭] তিনি ক্ষমতা স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে নিবর্তনমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান ৭ আগস্ট ১৯৫৯ এ নির্বাচিত সংস্থাসমূহ (অযোগ্যতা) আদেশ, The Elective Bodies Disqualification Order 1959 (EBDO) এবং Public Officer Disqualification Order (PODO) আদেশ নামে দুটি আদেশ জারি করেন।[৩০৮]

তাছাড়া ক্ষমতা গ্রহণের পর ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আইয়ুব খান সামরিক আইন বলে কৃত্রিমভাবে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক রাখার ব্যবস্থা করেন। চোরাকারবারী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এ কাজে জড়িত ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করার ঘোষণা প্রদান করেন। সামরিক আইন ও সাধারণ আইনের আওতায় বিচার ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সারাদেশ জুড়ে অসংখ্য সামরিক আইন আদালত স্থাপন করা হয়।[৩০৯] ভূমি সংস্কার আইন, মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ, ১৯৬১ ইত্যাদি আইন জারি করে আইয়ুব খান জনগণের প্রশংসাভাজন হন।[৩১০] এছাড়া নিজ অবস্থান দৃঢ় ও পাকাপোক্ত করার জন্য আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর 'মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ' জারি করেন যার অধীনে চার স্তর ভিত্তিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ও পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি সমন্বিত একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধান করা হয়। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বৈধতা লাভের আশায় ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ সালে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের দুই অংশ থেকে মোট ৮০,০০০ ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য (যারা মৌলিক গণতন্ত্রী নামে পরিচিত ছিল) নিয়ে গঠিত নির্বাচক মণ্ডলীর এক আস্থা ভোটের আয়োজন করেন। এতে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৯৫.৬ ভাগ ভোট তিনি লাভ করেন বলে ঘোষণা করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় দেশশাসনে বৈধতার ছাপ লাগিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তার সামরিক বেসামরিক আমলা শাসনকে একটি স্থায়ী সাংবিধানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে উদ্যোগী হন এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ সালে পাকিস্তানে ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে একটি সংবিধান কমিশন গঠন করেন।[৩১১] এই কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে আইয়ুব খান ১ মার্চ ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন সংবিধান জারি করেন। এই নতুন সংবিধানের আলোকে গঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে যথাক্রমে ২৮ এপ্রিল ও ৬ মে ১৯৬২ অনুষ্ঠিত হয়।[৩১২]

জেনারেল আইয়ুব খানের কঠোর সামরিক শাসন চলাকালীন প্রথম চার বছর (১৯৫৮-৬২) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। সামরিক শাসনে বিরোধী যে কোন কর্মকাণ্ড কঠোরভাবে বাঁধা দেওয়া হতো। তবে ছাত্ররাই প্রথম আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। যদিও ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু করার চিন্তা-ভাবনা করছিল কারণ ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপনে কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাদের মধ্যে

আলাপ-আলোচনায় ছাত্র আন্দোলন দিয়ে আইয়ুব শাসনের বিরোধিতা শুরু করার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়।[৩১৩] শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনে অতিষ্ট হয়ে আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীও তার উপর বলবৎকৃত নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে রাজনীতিতে সক্রিয় হবার চেষ্টা করলেন। তার গোপন তৎপরতার অংশ হিসেবে ২৪ জানুয়ারি ১৯৬২ সালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কয়েকজন নেতা আতাউর রহমান খানের (১৯০৭-১৯৯১) বাসভবনে এক গোপন আলোচনায় মিলিত হন। এদের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫), তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (১৯১১-১৯৬৯), আবু হোসেন সরকার (১৮৯৪-১৯৬৯), ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) (১৯০৫-১৯৭১) প্রমুখ।[৩১৪] আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে কীভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা যায় বিশেষ করে আইয়ুব প্রস্তাবিত নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার সাথে সাথে যেনো এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করা যায়, এছিল তাদের ঐ আলোচনার বিষয়বস্তু। সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সরাসরি আঘাত করা হয়। কিন্তু এই শাসনের বিরোধিতা থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।[৩১৫] গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে বিদ্যমান রাজনৈতিক দল ও দলীয় আদর্শ ভিত্তিক নতুন রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয় যা পরবর্তীকালে সকল আন্দোলনে প্রেরণা হিসেবে সক্রিয় ছিল।[৩১৬]

১.৮ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতি (১৯৬৬-১৯৭০) :

১৯৫৮ পরবর্তী সামরিক শাসন বিরোধী স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। সামরিক সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবাদ থেকেই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদ অনুভূত হয়।[৩১৭] সামরিক শাসক আইয়ুব খান রোমান হরফে বাংলা বর্ণমালা প্রবর্তনের চেষ্টা করলে বিভিন্ন মহল থেকে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়। বিশেষ করে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে প্রতিবাদলিপি ছাপা হয়। *দৈনিক ইত্তেফাক* এবং *মাসিক মোহাম্মদী* এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া ১৯৫৯ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির এক অনুষ্ঠানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) ভাষা সংস্কারের প্রতিবাদ করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।[৩১৮] বাংলা ভাষাকে পরিবর্তন করে মুসলমানিত্ব প্রদানের উদ্যোগে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার শব্দ পরিবর্তন করা হয়। তাছাড়া রবীন্দ্র বিদ্বেষী নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এসময় প্রচার করা হয় যে, রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মানুসারী হওয়ায় তার রচিত সাহিত্যকর্ম ও গান মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবে পূর্ব পাকিস্তানে তাৎক্ষণিকভাবে এসকল আদেশ ও কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করা হয়।[৩১৯]

ষাটের দশকের প্রারম্ভে সাংস্কৃতিক কর্মী, ছাত্র ও ছাত্র সংগঠনসমূহের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সামরিক শাসনের বিভিন্ন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।[৩২০] ১৯৬১ সালের শেষের দিকে শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫), তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (১৯১১-১৯৬৯), মণি সিংহ (১৯০১-১৯৯০) ও খোকা রায়ের (১৯০৭-১৯৯২) মধ্যে ঢাকায় এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[৩২১] ঐ বৈঠকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের বিষয়ে ঐক্যমত্য হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, আইয়ুব খান কর্তৃক শাসনতন্ত্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করবে এবং ক্রমেই তা সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। ঐ বৈঠকে আরও

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, 'ছাত্র-লীগ' ও 'ছাত্র-ইউনিয়ন' যৌথভাবে কাজ করবে।[৩২২] ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি বিকালে সোহ্‌রাওয়ার্দীকে কোন প্রকার প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়েই গ্রেফতার করা হলে আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। তার গ্রেফতারের সংবাদ ৩১ জানুয়ারি ঢাকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর দাবানলের মত সমগ্র পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্ররা ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ সালে ছাত্র ধর্মঘট আহবান ও রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ৫ ফেব্রুয়ারি রাতে হঠাৎ নির্দেশ দেওয়া হয় ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। শেখ মুজিবুর রহমান, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া প্রমুখ রাজনীতিবিদ এবং অনেক ছাত্র নেতাকে সরকার গ্রেফতার করে। সোহ্‌রাওয়ার্দীর গ্রেফতারের পরেই সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন পাকিস্তানের প্রশাসনের ভীতকে কাঁপিয়ে দেয়। আর এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬২ সালের জানুয়ারিতে সামরিক শাসন বিরোধী প্রকাশ্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।[৩২৩]

আইয়ুব খান ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থাভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১ মার্চ ১৯৬২ পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান ঘোষণা করা হয় (কার্যকর করা হয় ৮ জুন ১৯৬২ থেকে)। উক্ত সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানিদের দাবি-দাওয়া চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়। এই সংবিধান ঘোষিত হওয়া মাত্র পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-সমাজ বিক্ষোভ, সমাবেশ এবং ক্লাস বর্জন শুরু করে। এসময় অসংখ্য ছাত্র-নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ছাত্রদের ব্যাপক হারে গ্রেফতারের আরেকটি কারণ ছিল, ইতিমধ্যে নতুন সংবিধানের আওতায় সারাদেশে ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদের এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষিত হয়েছিল। ছাত্ররা উক্ত নির্বাচন বয়কটের জন্য রাজনীতিবিদদের প্রতি আহবান জানায়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের নির্বাচন বয়কটের আহবানে সাড়া না দিলেও কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা যেমন হামিদুল হক চৌধুরী (১৯০১-১৯৯২), নূরুল আমীন (১৮৯৩-১৯৭৪), আতাউর রহমান খান (১৯০৭-১৯৯১), সৈয়দ আজিজুল হক (১৯০৬-১৯৬৯), মোহসেন উদ্দীন আহমদ গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি দাবি করেন।[৩২৪] অবশেষে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ৮ জুন ১৯৬২ সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি দেওয়া হয়।[৩২৫]

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে ছাত্ররা আরেকটি আন্দোলন সংগঠিত করেছিল যা ইতিহাসে 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন' নামে অভিহিত করা হয়। শুধুমাত্র শিক্ষা সমস্যাকে কেন্দ্র করে এমন ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে এর আগে কখনই হয়নি। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের ছাত্র-ছাত্রী স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করে। আইয়ুব খান সামরিক আইন জারি করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের নামে যে চমক দেখান, শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা তার একটি। এ আন্দোলনের মূল কারণ ছিল তদানিন্তন শিক্ষা সচিব এম এস শরীফকে সভাপতি করে এগারো সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন। 'শরীফ শিক্ষা কমিশন' নামে খ্যাত এই কমিশন ১৯৫৯ সালের ২৬ আগস্ট সুপারিশ পেশ করে। এই কমিশন যে সকল সুপারিশ পেশ করে তার মধ্যে অন্যতম ছিল-

'তিন বছরের বি.এ পাস কোর্স পদ্ধতি চালু করা (এর আগে দুই বছরের বি.এ পাস কোর্স চালু ছিল)। স্কুল কলেজের সংখ্যা সীমিত রাখা; শিক্ষা ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগ অভিভাবক এবং বাকী ২০ ভাগ সরকার কর্তৃক বহন করা; ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত ইংরেজি বাধ্যতামূলক করা।

এ কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন শুরু করে ঢাকা কলেজ। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু করে।[৩২৬] পরবর্তীতে এ আন্দোলন চলে যায় ছাত্রলীগ (১৯৪৮) ও ছাত্র ইউনিয়নের (১৯৫২) যৌথ নেতৃত্বের হাতে। ছাত্ররা ১৫ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন মিছিল, বিক্ষোভ ও সমাবেশ করে। তাছাড়া ১০ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে অবস্থান ধর্মঘটের ডাক দেয়। কিন্তু সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে প্রেসনোটের মাধ্যমে ছাত্রদের ধর্মঘট থেকে বিরত থাকার আহবান জানায়। এরপরও ছাত্ররা দমে যায়নি। তারা ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালন উপলক্ষে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী হরতাল আহবান করে। ১৭ সেপ্টেম্বর আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে ছাত্ররা রাস্তায় মিছিল বের করে। এই মিছিল যখন হাইকোর্ট পার হয়ে আব্দুল গণি রোডে প্রবেশ করছিল তখন মিছিলের পেছনে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। এতে বেশ কয়েকজন ছাত্র নিহত হয়।[৩২৭] কিন্তু ছাত্ররা এতে আন্দোলন থেকে সরে যায়নি বরং পরবর্তীতে আরও বেগবান আন্দোলনে অংশ নেয়। ২৪ সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে বিদ্যমান সকল সংগঠনের সমন্বয়ে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ছাত্রদের দাবি অবিলম্বে মেনে নেওয়ার জন্য সরকারকে চরমপত্র দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর গোলাম ফারুক খানের (১৮৯৯-১৯৯২) সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত করেন। এ সময় ১৯৬৩ সালের স্নাতক পরীক্ষার জন্য যারা ফর্ম পূরণ করেছিল তাদেরকে বিনা পরীক্ষায় পাশ করিয়ে ডিগ্রি প্রদান করলে আংশিক বিজয়ের মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলন ধীরে ধীরে স্থিমিত হয়। এই আন্দোলনের বড় সাফল্য এই যে, ছাত্ররাই পরবর্তীকালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়।[৩২৮]

ষাটের দশকের প্রায় পুরোটাই ছাত্রদের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ১৯৬৪ সালের ৭ জানুয়ারি সরকারের ইঙ্গিতে অবাঙালি মুসলমানরা প্রথমে ঢাকা শহরে এবং তারপর আশে পাশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে। ১০ জানুয়ারি এই দাঙ্গা ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং তা বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গায় পরিণত হয়। ঢাকার সচেতন সমাজ এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং দাঙ্গায় আহত ও ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পাশাপাশি রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবকে কেন্দ্র করে আরেকটি আন্দোলন শুরু হয়। সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে। রাজনৈতিক দলগুলো ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শী হলেও এ আন্দোলনের মাধ্যমে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়। পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে ছাত্র আন্দোলনের গুরুত্ব হয়ে ওঠে সুদূরপ্রসারী। সামরিক শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তথা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি সৃষ্টি করে এবং এ অঞ্চলের রাজনীতিতে পটপরিবর্তনের নতুন ধারার সূত্রপাত ঘটে ছাত্রদের দ্বারা রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।[৩২৯]

১.৯ স্বায়ত্তশাসনের রাজনীতিতে ছয়দফা ও এগারো দফা (১৯৬৬-১৯৬৯) :

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কাশ্মীর ইস্যুকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। এসময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। এ জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে।[৩৩০] বাঙালিরা নিরাপত্তাহীনতাবোধ থেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যে, ভারত যেকোন মূহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নিতে পারে। এ পর্যায়ে নিজেদেরকে ব্যাপকভাবে অবহেলিত মনে করে এবং আশাহত হয়। অবশ্য ভারত কৌশলগত কারণেই পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে আক্রমণ করেনি কিন্তু বাঙালিরা নিরাপত্তাহীনতার এ ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির জনমানসে জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা প্রবল রূপ নিতে থাকে। বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশের মধ্যে নিজেদের বাঙালি পরিচয়টিকে তুলে ধরার ব্যাপক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো ক্রমশ আওয়ামী লীগের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। অর্থাৎ পাক-ভারত যুদ্ধকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতার সরাসরি প্রতিক্রিয়া হিসেবে ছয়দফা আন্দোলন তথা স্বায়ত্তশাসন ভিত্তিক গণআন্দোলন যার নেতৃত্বে ছিল আওয়ামী লীগ।[৩৩১] ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের বিশেষ অধিবেশনে যুদ্ধ চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক অবস্থার কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।[৩৩২] পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক ব্যবস্থা যে কতটা দুর্বল ছিল তা এই যুদ্ধের সময় স্পষ্ট হয়ে যায়। যুদ্ধের সতেরো দিন প্রশাসনিক দিক দিয়েও এ প্রদেশ কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও অরক্ষিত হয়ে পড়েছিল যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা বলে যে, বন্ধু রাষ্ট্র চীন পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু বাঙালিরা প্রকৃত অবস্থা অবলোকন করে পরবর্তী করণীয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।[৩৩৩] ভারত ইচ্ছা করলেই ঢাকা আক্রমণ করতে পারতো এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে সামান্যতম আত্মরক্ষা করা সম্ভব হত না। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি যা দেশ ভাগের সময় থেকেই উচ্চারিত হচ্ছিল তা পাক-ভারত যুদ্ধের পর আরো জোরদার হয়। এ পরিস্থিতিতে বাঙালিরা স্পষ্ট বুঝতে পারে যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামগ্রিক স্বার্থ সম্পূর্ণ আলাদা। এ উপলব্ধি থেকে স্বায়ত্তশাসনের দাবি কার্যক্রম শুরু করে আওয়ামী লীগ অর্থাৎ আওয়ামী লীগ স্বায়ত্তশাসনের রাজনীতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন রাজনৈতিক ধারার আন্দোলন শুরু করে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পরপরই স্বায়ত্তশাসনের প্রবক্তাদের অন্যতম শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায় অতি আবশ্যক হয়ে পড়েছে। পূর্ব পাকিস্তানকে সর্ব বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। এ সময়ই তাসখন্দ চুক্তি পর্যালোচনা করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে বিরোধী দলের আহবানে ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিবকে যোগদানের আহবান করেন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নসরুল্লাহ খান (১৯১৬-২০০৩)। শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে সম্মেলনে যোগদানে অনীহা প্রকাশ করলে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া তাকে অনুরোধ করলে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নেন। শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন সে বিষয়ে লেখার জন্য বাঙালি সি এস পি কর্মকর্তা এম. রুহুল কুদ্দুসের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি খসড়া তৈরি করেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদের সহযোগিতায় রুহুল কুদ্দুস তৈরিকৃত খসড়া থেকে ছয়দফা রচনা

করা হয়।[৩৩৪] এসময় স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এসময় কপ (কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টি) রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল। নেজামে ইসলাম, ন্যাপ, মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী পার্টি তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা-নেতৃত্বের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। নেজামে ইসলাম পার্টির কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। কাউন্সিল মুসলিম লীগের হয়ে কাজ করছিলেন মিস ফাতেমা জিন্নাহ। নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী, অলি আহাদ প্রমুখ তত্ত্ব ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি অনুসরণ করে চলছিলেন।[৩৩৫] ১৯৬৬ সালের ১৬ জানুয়ারি ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এর দলীয় সভায় নেতা আতাউর রহমান খান বলেন যে, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব নিয়ে খেলা করছে এবং স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের নামে পূর্ব পাকিস্তানকে বিপদজনক পথে ঠেলে দিচ্ছে। নূরুল আমীন আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। একই দিনে অনুষ্ঠিত (ধানমন্ডির ৩২ নাম্বার বাসভবনে) আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব সভা শেষে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আমরা তাসখন্দ ঘোষণা নিয়ে চিন্তিত নই বরং আমরা চাই পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন।[৩৩৬] মওলানা ভাসানী ১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফাকে সি আই এ (সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি-আমেরিকা) রচিত দলিল বলে আখ্যায়িত করেন, যদিও এ কথার সমর্থনে কোন প্রমাণ তিনি দেখাতে পারেননি। ছয়দফা আন্দোলনের সময় অনেক আওয়ামী লীগ নেতা মনে করতেন একটা বড় রকমের ঝামেলা বাঁধলে মার্কিন সাহায্যে তাদের ইচ্ছা পূরণ হবে, সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী (১৯২২-১৯৮০) ছয়দফা আন্দোলন সম্পর্কে এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৩৩৭] এরূপ রাজনৈতিক মতদ্বৈততার মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ছয়দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়।[৩৩৮] লাহোরের এই সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন যে,

> "ভারতের সহিত বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানে বিশ্বাসী এবং বিরোধ মীমাংসার জন্য শক্তির ব্যবহারকে আওয়ামী লীগ নিন্দা করে। শান্তিকে সমুন্নত রাখার সুস্পষ্ট ব্রত লইয়াই আমরা প্রস্তাবিত লাহোর সম্মেলনে যোগদান করিতেছি। তিনি আরও বলেন যে, সাম্প্রতিককালে উপর্যুপরি পটপরিবর্তনে ইহাই প্রতিভাত হইয়াছে যে ব্যক্তির খেয়াল খুশি অনুযায়ী নহে, সমষ্টির বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ীই দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক শর্তানুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও দেশ রক্ষামূলক বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল করার দ্বারাই দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখা সম্ভব।"[৩৩৯]

১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে দলসমূহের নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশন (নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয় যা আইয়ুব খান কর্তৃক তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধিতা করার জন্য আয়োজন করা হয়েছিল।[৩৪০] ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসায় কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালের সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়।[৩৪১] পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর লে. জেনারেল আজম খান (১৯০৮-১৯৯৪) ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (১৯০৫-১৯৮০) সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন।[৩৪২] উক্ত কনভেনশনে

মূলত পাকিস্তানের ডানপন্থি দলসমূহ (নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগ) নিয়ে গঠিত ছিল। কনভেনশনে উপস্থিত ৭৪০ জন প্রতিনিধির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ছিলেন মাত্র ২১ জন। উক্ত ২১ জনের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ও তার দলের ৪ জন নেতা (প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫), কোষাধ্যক্ষ জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরী (১৯২৫-১৯৯৫), জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী (১৯২৩-১৯৯৮) এবং প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাফিজ হাবিবুর রহমান)।[৩৪৩] সাবজেক্ট কমিটির সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করার সময় শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্বলিত ছয়দফা পেশ করেন। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ করে বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপস্থাপন করা ঠিক হবে না। শেখ মুজিব এর জবাবে যুদ্ধকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অসহায়ত্বের বিষয়টি তুলে ধরেন এবং ছয় দফার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত অন্য সবার আপত্তির মুখে শেখ মুজিবের প্রস্তাব সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে রাখা হয়নি।[৩৪৪] শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করলে উপস্থিত ৭৩৫ জন প্রতিনিধি তা তাৎক্ষণিকভাবে নাকচ করে দেন। এর প্রতিবাদে শেখ মুজিব তার ছোট প্রতিনিধি দল নিয়ে সম্মেলন স্থান ত্যাগ করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক সংবাদ সম্মেলনে ছয়দফা ঘোষণা করে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন।[৩৪৫]

৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সংবাদপত্রে ছয়দফা ঘোষণা সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাপা হয়। এসময় আওয়ামী লীগের মধ্যে ছয়দফা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। এই দাবিগুলো সম্পর্কে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা অবগত ছিলেন না। বিষয়টি উপস্থাপনার পূর্বে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদন নেওয়া হয়নি এবং কমিটির সামনে তা পেশ করা হয়নি। ছয়দফা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় অনেকেই আগে থেকে কিছুই জানতেন না। ফলে অনেক নেতা কর্মী ক্ষুব্ধ হন এবং অনেকে বিভ্রান্ত হন। আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা আতাউর রহমান খান শেখ মুজিবের তৎকালীন কর্মকাণ্ড নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। লাহোর সম্মেলনে শেখ মুজিবের ছয়দফা উপস্থাপন সম্পর্কে তার মতামত ছিল না কারণ তিনি বলেন যে, ছয়দফা উত্থাপনের উপযুক্ততা বিশ্লেষণ না করেই এটা করা হয়েছে।[৩৪৬] তবে ছয়দফার প্রতি আওয়ামী লীগের তরুণ-নেতৃবৃন্দের পূর্ণ সমর্থন ছিল। প্রবীণ নেতাদের আপত্তি বা গড়িমসি সত্ত্বেও তরুণ কর্মীরা 'বাঙালির দাবি ছয়দফা', 'বাঁচার দাবি ছয়দফা'র ভিতরেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন নিহিত' ইত্যাদি শ্লোগান সংবলিত পোস্টারে পোস্টারে দেয়াল ছেয়ে ফেলেন।[৩৪৭] কেবল তাই নয় ওয়ার্কিং কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ব্যানার এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি ছয়দফা কর্মসূচি' শীর্ষক এক পুস্তিকা বিলি করা হয়।[৩৪৮] উক্ত পুস্তিকায় ছয়দফার দাবিগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। যদিও শেখ মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর সাধারণ আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে' আগামী ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদনের জন্য ছয়দফা পেশ করা হবে। কিন্তু ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ কার্যালয় ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা প্রচার সম্পাদক আবদুল মমিন কর্তৃক সর্বসাধারণের

মাঝে জোরালোভাবে প্রচার শুরু হয়ে যায়। এসময় আওয়ামী নেতৃবৃন্দের অনেকেই পুস্তিকার প্রচার অবৈধ বলে আখ্যায়িত করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের প্রচার সংক্রান্ত সাবজেক্ট কমিটির সভায় ছয়দফা নিয়ে রাজশাহীর আওয়ামী লীগ নেতা মজিবর রহমানের সাথে সাংগঠনিক সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদের প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক হয়। এভাবেই ছয়দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।[৩৪৯] সংক্ষেপে ছয়দফা দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রথম : ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়তে হবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকবে। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের বা সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইন সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।

দ্বিতীয় : ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবল মাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুটি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট বিষয় প্রদেশের হাতে থাকবে।

তৃতীয় : এই দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়। এর যে কোন একটি গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয়:

ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে।

খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

চতুর্থ : সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে স্বাভাবিকভাবে জমা হয়ে যাবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংক সমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকবে। এভাবেই জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হবে।

পাঁচ : এই দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয়:

ক. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আদায়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখতে হবে।
খ. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।
গ. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রা দুই অঞ্চল হতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হার মতে আদায় হবে।
ঘ. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি রপ্তানি চলবে।
ঙ. ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রপ্তানি করার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করে শাসনতান্ত্রিক বিধান করতে হবে।

ষষ্ঠ : এই দফায় পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করা হয়।[৩৫০]

শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা শুরু হয়। এ কমিটির বর্ধিত বৈঠকে ছয়দফা দাবির প্রতি আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অকুণ্ঠ সমর্থন ও আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দান করা হয়।[৩৫১] তৎকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি একটি সর্বজনীন দাবিতে পরিণত হয়। বিশেষ করে ১৯৬৭ সালের ৬ জুনের পর থেকে ছয়দফাকে কেন্দ্র করে বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়। পূর্ব পাকিস্তানে এমন কোন জায়গা পাওয়া যায়নি যেখানে ছয়দফা আন্দোলনের বার্তা পৌঁছায়নি। এ আন্দোলনের জনপ্রিয়তা দেখে তৎকালীন পাকিস্তান গোয়েন্দা বিভাগ সরকারকে প্রতি মুহূর্তে সাবধান করে দেয়। এই দাবিকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়া ও দাবি বাস্তবায়নের জন্য একটি গণআন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগ।[৩৫২]

শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃত্ব সারাদেশ জুড়ে ছয়দফার প্রচার শুরু করেন। ১৯৬৬ সালের ১১ মার্চ ময়মনসিংহের জনসভায় শেখ মুজিব (সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম) ছয়দফা দাবি উপস্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, "পূর্ব পাকিস্তান তথা পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার মানসেই ছয়দফা দাবি উত্থাপন করা হইয়াছে এবং ছয়দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই শক্তিশালী পাকিস্তান কায়েম করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন যে, শক্তিশালী কেন্দ্র নয়, বরং শক্তিশালী অঞ্চলই জনগণের কাম্য।" এ জনসভায় তিনি এক এক করে ছয়দফার প্রতিটি দফা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, "ছয়দফা বাস্তবায়ন করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।" এভাবে শেখ মুজিব দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছয়দফা দাবির বাস্তবায়নে সাংগঠনিক সভা করেন এবং ছয়দফা দাবি আদায়ের সংগ্রামের জন্য সকলকে প্রস্তুত হওয়ার আহবান জানান।[৩৫৩] ছয়দফা সকলের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করে, ফলে আইয়ুব-মোনায়েম সমর্থকগোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ছয় দফার প্রচারণার এক পর্যায়ে ৮ মে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার হন। তার প্রচারণায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফার পক্ষে যে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি করেন তা সকলের কাছে অকল্পনীয় ছিল। ১০ মে ১৯৬৬ সালের মধ্যে শেখ মুজিবসহ দলের প্রায় ৩৫০০ নেতাকর্মী গ্রেফতার হন।[৩৫৪] পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনাধিকার তথা স্বাধিকার আদায়ে ছয় দফার গুরুত্ব অপরিসীম। ছয়দফা ছিল বাঙালির আশা-আকাঙ্খার প্রতীক এবং এ কারণেই মুক্তিকামী বাঙালি ছয় দফাকে বাঁচার দাবি হিসেবে গ্রহণ করে। আক্ষরিক অর্থে ছয়টি দাবির মধ্যে স্বাধীনতার কথা উল্লেখ না থাকলেও দাবিগুলো বিশ্লেষণ করলে মূল লক্ষ্য হিসেবে স্বাধীনতাকেই পাওয়া যায়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী খুব সহজেই অনুধাবন করেছিল তাই স্বৈরশাসক আইয়ুব খান তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ছয়দফাকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'বিদেশি মদদপুষ্ট', 'ধ্বংসাত্মক' এবং 'বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি' হিসেবে আখ্যায়িত করে। ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন ছিল পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রথম সর্বাত্মক দুর্বার আন্দোলন। তাছাড়া ছয়দফা ছিল একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরশাসনাধীন পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার প্রথম প্রয়াস। কারণ ছয়দফাভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করে এবং পরবর্তীকালে সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে স্বতস্ফূর্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর এ কারণেই

ছয়দফা আন্দোলনকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় পটপরিবর্তনের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৩৫৫]

ইতিমধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ থেকে এপ্রিল ১৯৬৬ পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে জনসভা ও বিবৃতির মাধ্যমে পাকিস্তানের দুই অংশের পাহাড় সমান বৈষম্য তুলে ধরে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্বলিত ঐতিহাসিক ছয়দফাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। ছয় দফা দাবি আইয়ুবের পক্ষে মেনে নেওয়া কখনো সম্ভব ছিল না। তাই আইয়ুব খান শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আখ্যা দিয়ে ছয় দফা দাবি প্রত্যাখ্যান করেন।[৩৫৬] তাছাড়া ছয়দফা দাবি নস্যাৎ করার লক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমানসহ আন্দোলনের পক্ষের বহু নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ঐদিন ছাত্র জনতার মিছিলে গুলি চালিয়ে পুলিশ কয়েকজনকে হত্যা করে। তাছাড়া এ ঘটনায় বহু লোক আহত হয়। এর প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলীয় সদস্যগণ 'ওয়াক আউট' করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিক, সংবাদকর্মী, ছাত্র-জনতা প্রতিবাদ জানায় এবং ধর্মঘট পালন করে। ছয়দফা ভিত্তিক আন্দোলন যখন সর্বস্তরে প্রসার লাভ করেছিল তখনই সরকার রবীন্দ্র সঙ্গীত ও পহেলা বৈশাখ পালন নিষিদ্ধ এবং আরবি হরফে বাংলা চালুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে আন্দোলনে ঘৃর্তাহুতি দেয়।[৩৫৭] এ সকল ঘোষণার কারণ হিসেবে আবদুল মোনেম খান (১৮৯৯-১৯৭১) উল্লেখ করেন যে, ইসলাম রক্ষার্থে হিন্দু সংস্কৃতি থেকে মুসলমানদের দূরে থাকা উচিত।[৩৫৮] আরবি ভাষা ইসলাম ধর্মের ভাষা তাই আরবি হরফে বাংলা চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফা আন্দোলন এক গণআন্দোলনে পরিণত হয়। অবশ্য ছয়দফা ঘোষণার প্রথমদিকে এর পক্ষে-বিপক্ষে দুইটি গ্রুপ তৈরি হয়। ছয়দফা সমর্থনের প্রথমদিকে নানা অভিমত থাকলেও শেষদিকে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ ছয়দফার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়।[৩৫৯]

সরকার ছয়দফা নামক গণআন্দোলনকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে নানামুখী কৌশল গ্রহণ করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পূর্ব পরিকল্পিত এরূপ কৌশলের একটি অংশ। তাছাড়া ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছিল আইয়ুব খানের শাসনামলের সর্বাপেক্ষা সমালোচিত ঘটনা। বর্তমানে আগরতলা মামলা সম্পর্কে অনেক গবেষক বলছেন এ মামলা সত্য ছিল। এ মামলা বিষয়ে বিভিন্নমুখী বিতর্ক চলছে। আগরতলা মামলার আসামী কর্ণেল শওকত আলী (১৯৩৭-২০২০) তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

> "...ঐতিহাসিক আগরতলা মামলাকে এখনও মিথ্যা মামলা বলে যারা উল্লেখ করেন, তারা নিজেদের অজান্তে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য অভিযুক্তকে অসম্মান করেন। ...উল্লেখ্য, মামলাটির রাষ্ট্রীয় নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের প্রচার যন্ত্রে মামলাটির শিরোনাম বিকৃত করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বলে প্রচার করা হয়। ফলে এখনও পত্রপত্রিকায় মামলাটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়ে থাকে। আজও মামলাটির প্রসঙ্গ এলে প্রায় সবাই 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বলে থাকেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আমরা যারা মামলাটিতে

অভিযুক্ত ছিলাম, 'ষড়যন্ত্র' শব্দটি তাদের জন্য খুবই পীড়াদায়ক। কারণ আমরা ষড়যন্ত্রকারী ছিলাম না। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্রপন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে আমরা বঙ্গবন্ধুর সম্মতি নিয়ে একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠন করেছিলাম।"[৩৬০]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল, একটি নির্দিষ্ট রাতে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে তারা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সবকটি ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বন্দী করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। এ কথা ঠিক, তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৌশলগত কারণে বঙ্গবন্ধুসহ আসামীরা সবাই বিশেষ ট্রাইব্যুনালে নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেছিলেন। বাঙালি জাতিও মামলাটিকে মিথ্যা মামলা হিসেবে অভিহিত করে তা প্রত্যাহারের দাবি তুলেছিল। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত 'ছয়দফা' আন্দোলনের ফলে বাঙালিরা পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা দেখে ভীতসন্ত্রস্ত ও ক্ষিপ্ত হয়েছিল। শুধুমাত্র ছয়দফা আন্দোলনের কারণেই ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়নি। ছয়দফার কারণেই যদি এ মামলা দায়ের করা হত তাহলে কর্ণেল শওকত আলীর মতো তৎকালীন সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত সদস্যরা এবং সিএসপি অফিসারদের ঐ মামলায় জড়িত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। উল্লিখিত অফিসাররা ছয়দফার সমর্থক হলেও রাজনৈতিকভাবে ছয়দফা আন্দোলনের সঙ্গে তাদের যুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। মামলার বিবরণ, ধারা ও গোটা কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে এ মামলার নাম 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হওয়া যৌক্তিক ছিল না। সরকারি ভাষ্য মতে ১২-১৫ জুলাই ১৯৬৭ তারিখের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সম্ভাব্য ভারতীয় সাহায্যের বিষয়ে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য পরিকল্পনাকারীরা আগরতলা যান। তবে সরকারি ভাষ্যমতে কোন ভারতীয় সাহায্য পূর্ব পাকিস্তানের কেউ গ্রহণ করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তদুপরি মামলার বিবরণ সংবলিত অভিযোগে বিবৃত সভাগুলি ও কার্যাবলি যা মামলার মূল বিষয় ছিল, ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত মূলত করাচি, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় সংঘটিত হয়। সে কারণে মামলার নামের আগে 'আগরতলা' শব্দটি সংযোজনের যৌক্তিকতা নেই। এ মামলার নামকরণে যদি কোন স্থানের নাম যুক্ত করা আদৌ প্রয়োজন হতো তাহলে তা হওয়া উচিত ছিল করাচি। কারণ সরকার পক্ষের অভিযোগের বিবরণ অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমান করাচিতে ১৯৬৪ সালের ১৫-২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাঁচজনসহ অভিযুক্তের সঙ্গে প্রথম বৈঠক করেন এবং পরিকল্পিত সশস্ত্র বিপ্লব সংক্রান্ত বেশিরভাগ সভা ও কার্য করাচিতেই সংঘটিত হয়। পরবর্তীকালে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য মামলাটি যখন পেশ করা হয় তখন সরকারিভাবে মামলাটির নামকরণ করা হয় 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। কিন্তু সরকারি প্রচারযন্ত্র, সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তি, আইয়ুব খানের সমর্থকরা এবং কতিপয় সংবাদপত্র আগরতলা শব্দটি নিয়ে এতবেশি প্রচারণা চালান যে, তখন থেকেই মামলাটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত এবং এ নামেই পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসের অংশ হয়।[৩৬১]

১৯৬৭ সালে ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি যখন ব্যাপক আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে রূপ লাভ করে তখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আন্দোলনকে স্তিমিত করার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি সরকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করে যে, ২ জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের আগরতলায় ভারতীয় হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি মিস্টার ওঝার সাথে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং ভারতীয়দের সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিছিন্ন করার লক্ষ্যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা করেন। অভ্যুত্থান সফল করার জন্য তারা ভারতীয়দের নিকট থেকে অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করেন বলে অভিযোগ করা হয়। অভিযোগ নামায় অর্থ ও অস্ত্রের একটি তালিকাও তৈরি করা হয়। ৬ জানুয়ারি আসামীদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি 'ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা ও পরিচালনার' অভিযোগ এনে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে পূর্বের ২৮ জনসহ মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আর একটি মামলা দায়ের করা হয়।[৩৬২] 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত এ মামলার সরকারি নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য অভিযুক্ত'।[৩৬৩] যদিও তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুসহ মামলার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার লক্ষ্যে মামলাটিকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বলে প্রচার করেছিল। এর পেছনে আইয়ুব খান তথা পাকিস্তানিদের লক্ষ্য ছিল শেখ মুজিব ও অন্যান্য বাঙালি অভিযুক্তদের গণবিচ্ছিন্ন করে তাদের প্রতি জনগণের বিদ্বেষ ও ক্ষোভ জাগিয়ে তোলা। কিন্তু তাদের এ অসৎ উদ্দেশ্য হিতে বিপরীত হয়ে শেখ মুজিব ও অন্যান্য বাঙালি অভিযুক্তদের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠে। পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, যে সশস্ত্র পরিকল্পনার মাধ্যমে অভিযুক্তগণ বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন ঠিক সেভাবে না হলেও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয়। এ প্রসঙ্গে ফয়েজ আহমদ এর ভাষ্য এরূপ, "এই বিদ্রোহের উদ্যোগটি সত্য। তখন থেকে আমরা কিছু সংখ্যক রিপোর্টার মামলার জেরার অংশ, যাতে মামলাটির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রেখে বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যে পত্রিকার রিপোর্ট উপস্থাপন করতে থাকি। জেনে শুনেও এখানে আমরা সত্যকে মিথ্যা বলেছি।[৩৬৪] আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য সকল মহল থেকে এ মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান হয়। ১৯ জুন ১৯৬৮ কুর্মিটোলা সেনানিবাসে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আগরতলা মামলার বিচার কার্য শুরু হয়। এই মিথ্যা মামলা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়।[৩৬৫] পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অনুধাবন করতে পারে যে, এটি একটি সাজানো মামলা এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ মামলার অবতারণা করা হয়েছে। আগরতলা মামলায় ৩৫ জন অভিযুক্তের প্রত্যেকেই নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন।[৩৬৬] এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে শেখ মুজিবসহ সকল অভিযুক্ত নিজেদের নির্দোষ হিসেবে দাবি করার ফলে সশস্ত্র পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত না থাকার বিষয়টির সত্যতা প্রমাণ হয়ে যায়নি। আর যে কোন সশস্ত্র মামলায় অভিযুক্ত যে কোন ব্যক্তিই নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে থাকে। সেটিই স্বাভাবিক। শেখ মুজিবসহ ৩৪ জন অভিযুক্ত সকলেই তাদের আইনজীবীদের অভিন্ন কৌশল অবলম্বনের কারণে তাদেরকে নির্দোষ এবং ঘটনার বিষয়ে তারা কিছুই জানেনা বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। অভিযুক্তরা অভিযোগ অস্বীকার করলেই তাদের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত না থাকার বিষয়টি

যথেষ্ট প্রমাণ করে না।[৩৬৭] এ সম্পর্কে সাংবাদিক আবদুল মতিন জানান, "শেখ সাহেব বললেন, "তিনি আইউবকে পরোয়া করেন না। জনগণের মনের কথা তিনি জানেন। এরপর কয়েক মুহূর্ত নিরব থেকে তিনি আইয়ুব বিরোধী সংগ্রামে আগরতলাকে ব্যবহার করার কথা উল্লেখ করেন।[৩৬৮] প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীর কতিপয় বাঙালি অফিসার কর্মীসহ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অফিসারদের পূর্ববাংলাকে স্বাধীন করার এই প্রাথমিক সশস্ত্র আয়োজন সত্য ও বাস্তব ছিল।[৩৬৯] আবার রাজসাক্ষীদের অনেকেই গোপন তথ্য ফাঁস করে দেন। এমনকি তাদের জোরপূর্বক সাক্ষ্য দিতে বলা হয়েছে যে তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে। এ কারণে বিচারকরাও বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে থাকেন। ফলে মামলাটির বিচার প্রক্রিয়া শিথিল হয়ে আসে। এমতাবস্থার মধ্য দিয়ে শুনানি ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।[৩৭০]

আগরতলা মামলা চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে পটপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময় রাজনৈতিক নেতৃত্ব শূন্যতা সৃষ্টি হওয়ায় আন্দোলনের ভার নতুন নেতৃত্বের উপর পড়ে। কারণ সে সময় উপরতলার রাজনীতিবিদেরা আইয়ুব খানের প্রতিশ্রুত আসন্ন নির্বাচন নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পাঁচমিশেলী ঐক্যফ্রন্ট গঠনের লক্ষ্যে একটার পর একটা ব্যর্থ উদ্যোগ চলছিল। তাছাড়া শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জেলে থাকায় বড় রকমের নেতৃত্ব শূন্যতা তৈরি হয়। তাই এ নেতৃত্ব শূন্যতার প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-সমাজ সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। সারাদেশের গ্রামে ও শহরে ছাত্ররা বিচ্ছিন্নভাবে ছোট ছোট গোপন দল সংগঠিত করে এবং সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়ে আইয়ুব-মোনেম সরকারের উৎখাতের চেষ্টা চালাতে থাকে। এসময় আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ডাকসুর সমন্বয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এ সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগেই পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের দাবি সম্বলিত ঐতিহাসিক ১১ দফা প্রণীত হয়। প্রকৃত পক্ষে আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে ছিল ছাত্রনেতৃবৃন্দ এবং আন্দোলনের প্রধান এজেন্ডা ছিল ছাত্রদের প্রণীত ১১ দফা কর্মসূচি।[৩৭১] সংক্ষেপে ১১ দফা বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. স্বচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করতে হবে, শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য সর্বত্র বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে স্কুল কলেজ স্থাপন করতে হবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজসমূহকে দ্রুতই অনুমোদন দিতে হবে। ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করতে হবে। হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল ও ক্যান্টিন খরচ শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসেবে প্রদান করতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অফিস আদালতে বাংলাভাষা চালু করতে হবে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে। নারী-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করতে হবে। ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কনসেশনে' টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। চাকুরির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

২. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে।

৩. পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হবে ফেডারেশন পদ্ধতিতে এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম। ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা-এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। অপরাপর সকল বিষয়ে প্রদেশগুলোর ক্ষমতা হবে নিরঙ্কুশ। দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। দুই অঞ্চলের দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করতে হবে। সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহি:বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করবে এবং বহি: বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা প্রদেশগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে সাব ফেডারেশন গঠন করতে হবে।

৫. ব্যাংক বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করতে হবে।

৬. কৃষকের উপর হতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার কমাতে হবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করতে হবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্যমূল্য দিতে হবে।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, বোনাস দিতে হবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী আইনকানুন প্রত্যাহার করতে হবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করতে হবে।

৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. মজুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

১০.সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করে জোট বর্হিভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করতে হবে।

১১.দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।[৩৭২]

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা ভিত্তিক ছাত্র আন্দোলন যখন জোরালো হতে থাকে ঠিক সে মুহূর্তে ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের আটটি রাজনৈতিক দল মিলে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (ডাক) নামক সংগঠনের উদ্যোগে ৮ দফা ভিত্তিক দাবি নিয়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের ডাক দেয়। আট দফার প্রধান দাবি ছিল আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত ও বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য বন্দিদের মুক্তি দান ও মামলা প্রত্যাহার।[৩৭৩] আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হলেও তা ১৯৬৯ এর জানুয়ারিতে ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং মধ্য জানুয়ারিতে গণআন্দোলনে রূপ নেয়।[৩৭৪] ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) নেতা আসাদুজ্জামান (১৯৪২-১৯৬৯) পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।[৩৭৫] ১৪৪ ধারা জারি করে কিংবা সান্ধ্য আইন জারি করে, কিংবা শত শত নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করেও আন্দোলন থামানো সম্ভব হয়নি। আন্দোলন গ্রাম গ্রামান্তর সকল জায়গায় বিস্তৃত হয়েছিল।[৩৭৬] স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে যখন প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করার সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শহীদ মুহম্মদ শামসুজ্জোহা (১৯৩৪-১৯৬৯) পুলিশের বেয়নেট চার্জের ফলে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৭৭] তার মৃত্যু সংবাদে সারাদেশে এমন ব্যাপক গণবিক্ষোভ সৃষ্টি হয় যে, সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উক্ত সভায় ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদের (১৯৪৩-) প্রস্তাবনায় শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৩৭৮]

এ সভায় 'বঙ্গবন্ধু' ছয়দফা ও এগারদফা দাবি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার পর আন্দোলনের ব্যাপকতা আরো বেড়ে যায়।[৩৭৯] এ অবস্থায় ৮ জানুয়ারি ১৯৬৯ রাজনৈতিক দলগুলো জনসাধারণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি অহিংস, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও সংঘবদ্ধ বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প ঘোষণা করে আট দফা দাবি নামার একটি কর্মসূচি ঘোষণা করে।[৩৮০] এ কর্মসূচির সরাসরি ফল হিসেবে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' বা সংক্ষেপে 'ডাক' (Democratic Action Committee) কমিটি গঠিত হয়। 'ডাক'-এ পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতারা স্বাক্ষর করে এবং আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[৩৮১] এ অবস্থায় আপস-মীমাংসার জন্য আইয়ুব খান বিরোধী 'ডাক' নেতৃবৃন্দের এক গোলটেবিল বৈঠক আহবান করেন। শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন এবং আওয়ামী লীগের ছয়দফা দাবি ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবি আলোচনার জন্য বৈঠকে উপস্থাপন করেন। অনেক আলাপ-আলোচনার পর মাত্র দুইটি বিষয়ে (ফেডারেল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠান) সম্মতি প্রকাশের মাধ্যমে ১৩ মার্চ গোলটেবিল বৈঠক সমাপ্ত হয়।[৩৮২]

এরূপ পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান হতাশ হয়ে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখান করেন। শেখ মুজিবুর রহমান 'ডাক' থেকে আওয়ামী লীগকে প্রত্যাহার করে নেন, ফলে ১৪ মার্চ 'ডাক' ভেঙ্গে যায়। এ সময় ঢাকায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে

স্বায়ত্তশাসনের সমর্থকদের এক প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। গোল টেবিলের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে আইয়ুব বিরোধী জোটের মধ্যে দুটি গ্রুপের সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে ২১ মার্চ ১৯৬৯ শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা ও ১১ দফার আলোকে পাকিস্তান সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর খসড়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সমীপে পেশ করেন। সংবিধানে সংশোধনীর এই খসড়া পেয়ে আইয়ুব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন কেবল পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা পশ্চিম পাকিস্তানেও ব্যাপকতা লাভ করে।[৩৮৩] এমতাবস্থায় আইয়ুব খানের পক্ষে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু স্বৈরাচারী আইয়ুব খান তার ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দেওয়ার চেয়ে সেনাবাহিনীর হাতে অর্পণ করাকে শ্রেয় মনে করে ২৪ মার্চ ১৯৬৯ তৎকালীন পাকসেনা প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে (১৯১৭-১৯৮০) ক্ষমতা গ্রহণের আহবান জানান।[৩৮৪] ফলে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ দেশে সামরিক আইন জারি করেন। এভাবে পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মত সামরিক শাসন জারি হয়। ছয়দফা ও এগারদফা আন্দোলন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে একটি মাইল ফলক বলা যায়। এ আন্দোলনের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশব্যাপী এক প্রচণ্ড গণবিপ্লবের সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানে এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতির জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়েছিল এবং স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। ছয়দফা ও এগারদফার রাজনীতির মাধ্যমে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে যে সর্বজনীনতা লাভ করে তা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির (১৯৪৭-৭১) জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পটপরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[৩৮৫]

১.১০ নির্বাচন (১৯৭০) এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পূর্ণতা অর্জন :

২৫ মার্চ ১৯৬৯ আইয়ুব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহিয়া খান (১৯১৭-১৯৮০) সারাদেশে অর্থাৎ পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করে তিনি নিজে সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে যথাশীঘ্র সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি ২৮ নভেম্বর ১৯৬৯ ঘোষণা করেন যে, প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন যাদের কাজ হবে ১২০ দিনের মধ্যে দেশকে একটি কার্যকরি শাসনতন্ত্র প্রদান ও যেসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা পাক-জনসাধারণকে আলোড়িত করছে তার একটি সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে বের করা। ইয়াহিয়া খান ২৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে পরবর্তী নির্বাচন ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ১ জানুয়ারি ১৯৭০ থেকে যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর বিধি নিষেধ তুলে নেওয়া হয়।[৩৮৬] ৩০ মার্চ ১৯৭০ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কতিপয় শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপসহ আইনগত কাঠামো আদেশ, ১৯৭০ (Legal Framework Order, 1970) বা এল.এফ.ও জারি করেন।[৩৮৭]

আইনগত কাঠামো আদেশে সার্বভৌম পার্লামেন্টের বদলে একটি দুর্বল পার্লামেন্টের রূপরেখা দেওয়া হয় এবং প্রেসিডেন্ট সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে থেকে যান। আওয়ামী লীগ, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী

পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) এর সমালোচনা করে। এ দলগুলো আইনগত কাঠামো আদেশের সমালোচনা করে এ আদেশের জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব নষ্টকারি ধারা ও সংসদ সদস্যের ক্ষমতা সংকোচন করে এমন সব ধারার বিরোধিতা করে। শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও একমাত্র ন্যাপ (ভাসানী) ছাড়া সব দলই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।[৩৮৮] নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কি করবে না এই নিয়ে ন্যাপ (ভাসানী) বরাবরই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল। নির্বাচনের তারিখ যতই এগিয়ে আসে ন্যাপের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ততই বাড়তে থাকে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে ন্যাপ হঠাৎ করে 'ভোটের বাক্সে লাথি মারো পূর্ববাংলা স্বাধীন কর' ধ্বনি তুলে নির্বাচন বর্জনের কর্মসূচি ঘোষণা করে।[৩৮৯] ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলে এই দল নির্বাচনের পূর্বেই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং জাতীয় সংসদে কৃষক ও শ্রমিকের জন্য আসন বরাদ্দ প্রভৃতি পূর্বশর্ত আরোপ করে। অবশেষে ১৯৭০ সালে ১২ নভেম্বর দক্ষিণ বাংলায় যে ভয়াবহ সাইক্লোন সংঘটিত হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাপ (ভাসানী) নির্বাচন স্থগিত বা বাতিল রাখার দাবি পেশ করে।[৩৯০] কিন্তু সে সময় শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে যারা বিবেচিত ছিল তার সবগুলোই ছিল মূলত আঞ্চলিক। কোন দলেরই সর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয়তা ছিল না। এরকম জনপ্রিয়তা বা জনসমর্থনের প্রেক্ষাপটেই পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।[৩৯১]

আওয়ামী লীগ ছয়দফাকে নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো হিসেবে ঘোষণা করে। তারা নির্বাচনকে ছয়দফা ও ১১ দফার প্রশ্নে একটি গণভোট বলে অভিহিত করে। এভাবে সব দলই সাংবিধানিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও কূটনৈতিক বিষয়ে তাদের বিস্তৃত ইশতেহার প্রস্তুত করে।[৩৯২] রাজনৈতিক দলগুলো ভিন্ন ভিন্ন মতামত নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক দর্শনে প্রধান দলগুলোর মধ্যে তেমন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। তবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার বা প্রতিশ্রুতি ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়।[৩৯৩] ১৯৬১ সালের আদমশুমারির ওপর ভিত্তি করে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে সাধারণ আসন সংখ্যা ছিল ৩০০টি এবং সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল ১৩টি। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত হয় ১৬২টি সাধারণ এবং ৭টি মহিলা আসন। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্য কোন দলই এ নির্বাচনে সবকয়টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দিতে পারেনি।[৩৯৪] জনসভা, পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন, ইশতেহার ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী প্রচারণা অভিযান পরিচালনা করে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচার কার্যে ছাত্র সমাজ ও যুব সম্প্রদায় অত্যন্ত বলিষ্ঠ অবদান রাখে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সারাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন আবার পূর্ণমাত্রায় উজ্জীবিত হয়। বলা যায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক পূর্ণতা অর্জনের যাত্রা শুরু হয় যা রাজনৈতিক মেরুকরণ প্রবল করে।[৩৯৫]

সকল আয়োজন শেষে পূর্ব পাকিস্তানে ৭ ডিসেম্বর এবং ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ যথাক্রমে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর দক্ষিণ বাংলায় এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে যার কারণে দুর্যোগ কবলিত বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের ৯টি আসনে ১৭ জানুয়ারি ১৯৭১ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আপামর

জনগণের অভূতপূর্ব সাড়া এবং অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সমাপ্ত হয়। এ নির্বাচনে পাকিস্তানের ১১ কোটি ৫০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৬৪ লাখের মত। পূর্ব পাকিস্তানে ৩ কোটি ১২ লক্ষ ভোটার ভোট প্রদান করে। সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীরা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরে নির্বাচিত হন। এ নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার (১৯০৬-১৯৮৫)।[৩৯৬] পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল নিম্নরূপ ছিল।[৩৯৭]

সারণী-১০

দলের নাম	সাাধারণ আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	মোট আসন
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	২	-	২
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	-	-	-
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	-	-	-
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	-	-	-
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	-	-	-
ন্যাপ (ওয়ালী)	১	-	১
জামায়াতে ইসলামী	১	-	১
নেজামে ইসলামী	১	-	১
উলামায়ে ইসলাম (থানভি গ্রুপ)	-	-	-
মার্কাজে আহলে হাদিস	-	-	-
জামায়েত-ই-উলামায়ে ইসলাম (হাজারী)	-	-	-
জামায়েত-ই-উলামায়ে ইসলাম (নূরাণী)	-	-	-
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৭	-	৭
মোট	৩০০	১০	৩১০

সূত্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র*, *প্রথম খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৫৯২

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তান পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে।[৩৯৮] ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানের দুই প্রদেশে দুটি দল প্রাধান্য লাভ করার ফলে পাকিস্তানে নির্বাচনোত্তর অবস্থা জটিলতর হয়ে ওঠে। নির্বাচনী রায় পাকিস্তানের দুই অংশকে পরস্পর বিরোধী মুখোমুখি অবস্থানে এনে দেয়। ফলে দেশের জাতীয় সংহতি ও অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রকৃত অর্থেই ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম এবং শেষ সাধারণ নির্বাচন।[৩৯৯]

১৯৪৭ সালের পর থেকেই বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে স্বতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠার দাবি করে আসছিল। এ নির্বাচনে বাঙালি জাতির সে স্বাতন্ত্রবাদের বিজয় ঘটে। নির্বাচনে জয় লাভের মাধ্যমে যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রতিষ্ঠা পায় তা তাদের রাজনৈতিক পূর্ণতার বড় প্রমাণ।[৪০০] পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের প্রতি এ বিপুল রায় প্রকারান্তরে ছয় দফা কর্মসূচির প্রতি বাঙালির গণরায় যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য বাঙালির ম্যান্ডেট স্বরূপ। এই ঐতিহাসিক রায় দ্বারা এদেশের মানুষ অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মসূচি প্রত্যাখ্যান করে।[৪০১] ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ সর্বাধিক আসন পেয়ে বিজয় অর্জন করে এ অঞ্চলে আওয়ামী লীগ পার্টি হিসেবে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের একজন গ্রহণযোগ্য নেতা হিসেবে গুরুত্ব বৃদ্ধি করে

যা পরবর্তীতে যে কোন জাতীয় প্রশ্নে এ দলের নেতৃত্বের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভিত্তি রচিত হয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ পরবর্তীকাল থেকে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে কোন দলই সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। এ নির্বাচনের পর থেকে অধিকাংশ জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এক কথায় ১৯৭০ পরবর্তী আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে দৃশ্যমান পরিপূর্ণতা দান করে।[৪০২]

১.১১ সর্বজনীন রাজনীতি ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা (১৯৭১) :

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয় অর্জন করে। জোটের মূল্যায়নে দেখা যায় যে, মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে ৭৫.১০% এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৭০.৪৮% ভোট পায়। নির্বাচনে এরূপ ফলাফল পূর্ব পাকিস্তানকে একটি পৃথক অঞ্চল এবং বাঙালি জাতিকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এই অঞ্চলের উপর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর হস্তক্ষেপকে অবৈধ বলে প্রমাণ করে।[৪০৩] নির্বাচনের এই ফলাফলের ভিত্তিতে আইনানুগভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের অধিকার অর্জন করে। আর ন্যয়সঙ্গতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শেখ মুজিবুর রহমানকেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তান সরকারের শোষণ থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নতুন করে ক্ষমতা দখলের ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর নিরঙ্কুশ বিজয় স্বৈরাচারী সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট অনুসারে তারা ভেবেছিল আওয়ামী লীগ ১০২টি আসনের বেশি পাবে না। কিন্তু বাস্তবে তা ভুল প্রমাণিত হয়। মূলত সর্ব সাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতার মাধ্যমেই আওয়ামী লীগের অভাবনীয় বিজয় অর্জিত হয়।[৪০৪]

স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগের বিজয়ে ইয়াহিয়া খানসহ পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারি-বেসরকারি সর্ব মহল অসন্তুষ্ট হয়। মূলত পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের অধিকার হাতছাড়া করতে তারা একেবারেই নারাজ ছিল। সুতরাং আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য শুরু হয় কেন্দ্রের অগণতান্ত্রিক ও নেতিবাচক প্রচেষ্টা।[৪০৫] পশ্চিম পাকিস্তানি কট্টরপন্থি সেনাকর্মকর্তাবৃন্দ যথা মেজর জেনারেল ওমর, হামিদ, গুল হাসান খান (১৯২১-১৯৯৯) ও টিক্কা খানের (১৯১৫-২০০২) সাথে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন পাকিস্তানি পিপলস্ পার্টি (১৯৬৭) প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো (১৯২৮-১৯৭৯)।[৪০৬] পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ জমিদার শ্রেণির প্রতিনিধি ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক দল কেন্দ্রে জাতীয় সরকার গঠন করে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করুক কোন ক্রমেই এটি মেনে নিতে পারেননি। আওয়ামী লীগের ছয়দফা ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টিও তার অপছন্দনীয় ছিল। ফলে ভুট্টো রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সঠিক পন্থা নির্ধারণ করার জন্য সময়ক্ষেপণ করেন। এক্ষেত্রে ভুট্টো ইয়াহিয়াকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। নির্বাচনের ফলাফল যাই

হোক না কেন, যে কোন উপায়েই প্রধানমন্ত্রী হবার ইচ্ছে তার। ভুট্টোর চাপের মুখে জেনারেল ইয়াহিয়া শেষ পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আধাবেলা মূলতবি ঘোষণা করেন।[৪০৭] এদিকে নির্বাচনে জয়লাভের পর বঙ্গবন্ধু সংবিধান প্রণয়ন করার জন্য প্রস্তুত হন। লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের শর্ত অনুযায়ী সংবিধান প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ ১৯৭১ এক ঘোষণা জারির মাধ্যমে ৩ মার্চ ১৯৭১ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করায় পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দরা বিস্মিত ও চরম ক্ষুব্ধ হয়। নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার পাকিস্তানি কৌশলে পূর্ব-পাকিস্তানিরা চরম প্রতিবাদমুখী হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় এবং তার পরদিন সারা প্রদেশে হরতাল ডাকেন। ২ এবং ৩ মার্চ হরতালের ফলে সকল সরকারি কর্মকাণ্ড অচল হয়ে পড়ে। প্রদেশটির যোগাযোগ সারাবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ২ মার্চের হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত এবং কয়েকজন গুরুতর আহত হলে শেখ মুজিব ঐদিন সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিন্দা প্রকাশ করেন এবং ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ২ মার্চ ১৯৭১ ছাত্রলীগ তথা স্বাধীন বাংলা ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনে মানচিত্র সম্বলিত লাল সবুজ পতাকা উত্তোলন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ৩ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করে। এর মধ্য দিয়েই সূচিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। মূলত এভাবেই বাঙালিরা রাজনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করে।[৪০৮]

এ সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করে। জাতীয় পরিষদ স্থগিত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান যেমন দেশব্যাপী ধর্মঘটের আহবান করেন, তেমনি শ্রমিক সংগঠন থেকে শুরু করে ছাত্র জনতার বিভিন্ন সংগঠন ইয়াহিয়া খানের এ অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। এ ব্যাপারে পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে ২ মার্চ ১৯৭১ 'খোলাচিঠি' নামে একটি প্রচারপত্র পেশ করে। খোলা চিঠির মূল বক্তব্য ছিল: পূর্ববাংলার উপর থেকে পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান করে বাঙালির নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে এবং জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগুরু নেতা হিসেবে স্বাধীন গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দানের আহবান। এছাড়া ৩ মার্চ ১৯৭১ স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ অনুরূপ আহবান জানিয়ে পল্টন ময়দানে এক সমাবেশ করে।[৪০৯] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়।[৪১০] সমাবেশে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে এদিন শপথ গ্রহণ করে ঘোষণা করা হয় যে ১৯৪৭ এর পর তেইশ বছরের শোষণ, কুশাসন ও নির্যাতন এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে যে, সাত কোটি বাঙালিকে গোলামে পরিণত করার জন্য বিদেশি পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তা থেকে বাঙালির মুক্তির একমাত্র পথ স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকা। ৫৪ হাজার ৫ শত ৬ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্য আবাসিক ভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ'।

শুধু তাই নয় স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে কতিপয় লক্ষ্য অর্জনের পন্থা, আন্দোলন পরিচালনা কর্মপন্থা ও আন্দোলনের ধারা তথা সার্বিক কর্মসূচিও স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এদিন ঘোষণা করে।[৪১১]

এভাবে অধিকার সচেতন বাঙালি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করায় আক্রোশে ফেটে পড়ে। তারা শহর, বন্দর, গ্রাম-গঞ্জে বিক্ষোভ ও জনসভা করে তাদের পুঞ্জিভূত আক্রোশের প্রচণ্ড বহি:প্রকাশ ঘটায়। রংপুর, খুলনা, যশোরসহ সারাদেশে অফিস, আদালত, স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার সবকিছুই বন্ধ হয়ে যায়। এসময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১৬৫ জনের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়।[৪১২] ইয়াহিয়া খানের এ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ঘোষণায় বাঙালি জাতি এতটাই ক্ষুদ্ধ ও প্রতিবাদী হয়ে উঠে যে, সশস্ত্র সংগ্রাম ও যুদ্ধ করে হলেও স্বাধীনতা লাভের জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে যায়। ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। ৩ মার্চ আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রেসকোর্স ময়দানে শপথ গ্রহণ করে। এসময়ই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত এ অন্দোলন অব্যাহত থাকে। শহর ও গ্রামে, ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন হতে দেখা যায়।[৪১৩] ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে ১০ লক্ষাধিক মানুষের বিশাল জনসভায় স্বাধীনতার জন্য মুক্তি সংগ্রামের ডাক দিয়ে সবাইকে যার যা কিছু সম্বল আছে তা নিয়ে সদা প্রস্তুত থাকার আহবান জানান। বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের প্রদত্ত শ্রেষ্ঠতম বক্তৃতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ বক্তৃতায় তিনি বলেন, "আর দাবায়ে রাখতে পারবা না; .....রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব; এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তিনি বাঙালিকে সাহসের সাথে শত্রুর মোকাবেলা করতে প্রতিটি ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার আহবান জানান এবং প্রদেশব্যাপী সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার নির্দেশ প্রদান করেন। ৭ মার্চের ভাষণ এ দেশের আপামর জনসাধারণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। মূলত তার ভাষণে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে স্বাধীনতার দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া ৭ মার্চের ভাষণ এ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ মিনিটের এক অবিস্মরণীয় বক্তৃতায় বাঙালি জাতির মুক্তি তথা জন্মভূমির স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে বাঙালি জাতি বহুল প্রতিক্ষিত স্বাধীনতা লাভের জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।[৪১৪]

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের প্রতিটি শব্দ অভাবনীয়ভাবে ছড়িয়ে পড়ে বাংলার ঘরে ঘরে। এ ভাষণের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী সর্বস্তরের বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ইতিমধ্যেই রংপুর, সৈয়দপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহীতে বেসামরিক বাঙালিদের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্বিচার গুলিতে বহু হতাহত হয়। এ ঘটনায় সারাদেশের মানুষ অতিশয় ক্ষুদ্ধ হয়। মোহাম্মদপুর, মিরপুরে বিহারি-বাঙালি মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হয়। ২৫ মার্চ দুপুরে আওয়ামী লীগের সভায় এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ২৭ মার্চ সারাদেশে হরতাল পালনের আহবান জানান।[৪১৫] এরূপ পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ ঢাকা এসে ২৩ মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে লোক দেখানো শান্তি আলোচনা চালিয়ে যান ও সময়ক্ষেপণ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইয়াহিয়া মার্চ মাসের পুরো সময় ধরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এনে পূর্ব পাকিস্তানে জমায়েত করেন। তিনি

২৫ মার্চ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করার পূর্বে কাঠোর হস্তে বাঙালিদের দমন করার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু বাঙালিরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখার প্রতিজ্ঞায় অটল থাকে।[৪১৬] বাঙালি তথা সারা বিশ্ববিবেককে বিস্মিত ও হতবিহবল করে পৈশাচিক গণহত্যার মাধ্যমে বাঙালির দাবিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ২৫ মার্চ ১৯৭১ এর কালো রাত্রিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী হাজার হাজার নিরীহ নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত বাঙালিকে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) (বর্তমানে বিজিবি) ব্যারাকে, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পুরান ঢাকাসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু করে ট্যাংক, কামান সাজোয়া যান নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র নৃশংস বর্বরতায় মেতে উঠে তারা শতাব্দীর জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড চালায়। কিন্তু বাঙালি এরূপ ভয়াবহ এবং জঘন্য জিঘাংসার কথা কল্পনাও করতে পারেনি। যদিও বাঙালিরা সকল কর্মকাণ্ডের প্রতিরোধের চেষ্টা করে। কিন্তু পূর্ব প্রস্তুতি না থাকায় আকস্মিক আক্রমনাত্মক, অধিক সৈন্যবল, উৎকৃষ্টতর অস্ত্র-শস্ত্রের কাছে সে প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় এলাকায় শত শত ছাত্র-শিক্ষক, পুরান ঢাকার হাজার হাজার বাসিন্দা, ধানমণ্ডি, মিরপুর, মোহাম্মদপুরের হাজার হাজার হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান তথা দেশপ্রেমিক বাঙালি তাদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। পাকিস্তানি হানাদাররা সারাবিশ্বের কাছে তাদের অপকর্ম গোপন করার জন্য ২৫ মার্চেই বিদেশি সাংবাদিকদের ঢাকা শেরাটন হোটেলে (বর্তমান ইন্টারকন্টিনেন্টাল) নিয়ে কার্যত বন্দি করে ফেলে। তাদের বাংলাদেশ ত্যাগেও বাধ্য করা হয়। কিন্তু সেই প্রতিকূল অবস্থায়ও বিদেশি সাংবাদিকরা পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের তথ্য বিশ্ববাসীকে জানাতে সমর্থ হয়। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন লন্ডনের *‘ডেইলি টেলিগ্রাফ’* পত্রিকার সাংবাদিক সায়মন ড্রিং (১৯৪৫-), আর্নল্ড জেটলিন, মর্ট রোজেন ব্লুম, জন কোগিন (১৯৩৭-১৯৮১), অ্যান্থনি মাসকারেনহাস (১৯২৮-১৯৮৬)।[৪১৭] এ গণহত্যার ব্যাপারে এ্যান্থনি মাসকারেনহাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে চালানো লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অবর্ণনীয় হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা দিয়েছেন।[৪১৮] ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ ৯ মাস ধরে পাকবাহিনী পৈশাচিক গণহত্যা চালায়। বিশ্ব ইতিহাসে একাত্তরের গণহত্যার কোন তুলনা নেই। পাকিস্তানিরা গণহত্যা চালিয়ে ৩০ লক্ষ বাঙালির জীবন কেড়ে নিয়েছে। দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি ঘটিয়েছে। তাদের সহযোগিতা করেছে রাজাকার, আল শামস, আলবদরের সদস্যরা। দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী স্বশস্ত্র সংগ্রামে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির জীবনদান, নিরূপন অসাধ্য অসংখ্য ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।[৪১৯]

প্রান্তটীকা

১. **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি** ১৬০০ সালে রাণী ১ম এলিজাবেথ প্রদত্ত সনদের মাধ্যমে সৃষ্ট একটি কোম্পানি। এর প্রাথমিক নাম ছিল 'The Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies' যা ১৬১২ সালে মোগল প্রশাসনের কাছ থেকে সুরাটে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৩৩ সালে মহানন্দা বদ্বীপের হরিহরপুরে একটি ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে বাংলায় বাণিজ্যের অনুমতি পেলেও বাংলার সুবাদার শাহ সুজার পক্ষ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা তথা বার্ষিক নাম মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। এ সুবিধার মাধ্যমে পরবর্তীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে। কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারি ক্রয় করার মাধ্যমে কোম্পানির প্রভাব বিস্তারের পরবর্তী ধাপের শুরু করে এবং বাংলায় এ কোম্পানির শক্তিশালী ভিত্তি প্রতিষ্ঠা পায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাবের পরাজিত হওয়ার মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরোক্ষ শাসন শুরু হয়। ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা লাভ করে। ১৭৭২ সালে প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে নিযুক্ত করে প্রত্যক্ষভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু হয় যা ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন পাস করে ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ করে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা করে। ১৮৫৮ সালে রাণী এলিজাবেথের ১ম আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিলুপ্ত করেন। সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, চয়নিকা, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৯-১০

২. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৫।

দেওয়ানি লাভ ও দ্বৈতশাসন: ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে ত্রিশক্তির পরাজয়ের পর প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত ব্যাপী ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনের সম্ভাবনা তৈরি হয়। এরূপ অবস্থায় ১৭৬৫ সালের মে মাসে রবার্ট ক্লাইভ দ্বিতীয়বার বাংলায় আগমন করে। ১৭৬৫ সালের ১৬ আগস্ট ক্লাইভ এলাহাবাদের প্রথম চুক্তির মাধ্যমে ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ ছাড়া সমগ্র অযোধ্যা সুজাউদ্দৌলাকে ফিরিয়ে দেন এবং দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে এলাহাবাদের দ্বিতীয় চুক্তির মাধ্যমে দিল্লীর সিংহাসন ফিরিয়ে দেন। এসময় ইংরেজদের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কারা ও এলাহাবাদের বিনিময়ে এবং বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের শর্তে দ্বিতীয় শাহ আলম ইংরেজদের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি তথা রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করে যা ইতিহাসে দেওয়ানি লাভ নামে পরিচিত। লর্ড ক্লাইভ দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভের পর বাংলার নবাব নাজিম-উদ-দৌলার সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এ চুক্তির মাধ্যমে বাংলার নবাব ৫৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে নিজামত বা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভ করে অর্থাৎ নবাব পায় ক্ষমতাহীন দায়িত্ব এবং কোম্পানি পায় দায়িত্বহীন ক্ষমতা। বাংলার ক্ষমতা ভাগাভাগির এই ব্যবস্থাকে দ্বৈত শাসন হিসেবে অভিহিত করা হয়। সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪-৬৭

৩. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

সিপাহী বিদ্রোহ ঃ সিপাহী বিদ্রোহে ভারতীয়দের পরাজয়ের মাধ্যমে উপমহাদেশে সরাসরি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের শাসন শুরু হয়। ইংল্যান্ডের শাসক কর্তৃপক্ষ ভারতের মত বিশাল দেশের শাসনভার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহস পায়নি। ১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত শাসন আইন' পাস করে মহারাণীর শাসন প্রবর্তিত হয়। রাণীর প্রতিনিধি হিসেবে গভর্নর জেনারেল 'ভাইসরয়' (রাজ প্রতিনিধি) উপাধি গ্রহণ করে সরাসরি শাসন পরিচালনা শুরু করে। ভাইসরয়ের অধীনে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিল গঠিত হয়। লর্ড ক্যানিং ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম ভাইসরয় হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। রতন লাল চক্রবর্তী, *সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৩৪-১৪৩

৪. ব্রিটিশ শাসনাধীন অর্থাৎ ১৮৫৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল মধ্যবর্তী সময়কালে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের শাসনের সুবিধার্থে প্রণীত উল্লেখযোগ্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কার নিম্নরূপ:

ভারতীয় কাউন্সিল আইন- ১৮৬১, ১৮৯২

মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন-১৯০৯

ভারতীয় কাউন্সিল আইন- ১৯০৯

ভারত শাসন আইন-১৯১৯

রাওলাট আইন-১৯১৯

ভারত শাসন আইন-১৯৩৫, ১৯৪৭। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২-১৬৯

৫. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০

৬. **১৯৩৫ সালের আইনের ভারত শাসন সম্পর্কিত প্রধান ধারাসমূহ নিম্নরূপ-**

সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র: ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলো নিয়ে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন করা হবে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন: ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশগুলোর স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রদেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পরিচালনার ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত হবে তবে মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ আইন সভার নিকট দায়ী থাকবে।

শাসন সংক্রান্ত বিষয়: কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, যোগাযোগ ও মুদ্রা। প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে কৃষি, ভূমি রাজস্ব, বাণিজ্য, শিল্প-আইন, স্বাস্থ্য, স্থানীয় প্রশাসন এবং ফৌজদারি আইন, বিচারসহ অন্যান্য বিষয় কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয়ের হাতে থাকবে।

দ্বৈত শাসন: প্রদেশসমূহে দ্বৈতশাসনের অবসান করা হয় কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করা হয়।

দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা: এ আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট (উচ্চ কক্ষ-কাউন্সিল অফ স্টেট ও নিম্নকক্ষ-যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ) আইনসভা করার ব্যবস্থা করা হয়।

পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা : ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়।

প্রাদেশিক গভর্নর : এ আইনের মাধ্যমে প্রতিটি প্রদেশের শাসনক্ষমতা একজন গভর্নরের ওপর অর্পণ করা হয়। উপরিউক্ত বিষয় ছাড়াও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত, উপদেষ্টা বোর্ড গঠন, নতুন প্রদেশ (উড়িষ্যা ও সিন্ধু) সৃষ্টি, সংবিধান সংশোধন ব্যবস্থা সহজীকরণ, ভারত সচিবের ক্ষমতা হ্রাস, শাসন বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন, রাজপ্রতিনিধির পদসৃষ্টিসহ শাসন সংক্রান্ত বহুমুখী বিষয় এ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭-১৬৯

৭. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯

৮. **মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮)** পাকিস্তানের করাচিতে জন্মগ্রহণ করেন। দাদাভাই নওরোজ (১৮২৫-১৯১৭) এবং গোপাল কৃষ্ণ গোখলের (১৮৬৬-১৯১৫) অনুপ্রেরণায় ১৯০৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় কাউন্সিল আইন পাস হলে রাজনীতিতে জিন্নাহর প্রকৃত উত্থান শুরু হয়। ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করলেও ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। একই সঙ্গে দুই দলের সদস্য থেকে জিন্নাহ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে কাজ করেন এবং ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরে অবদান রাখেন। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের নাগপুর সম্মেলনের পর থেকে কংগ্রেসের প্রতি আস্থা হারান এবং সম্পর্ক ছেদ করেন। এসময় মুসলিম লীগের সাথেও জিন্নাহর দূরত্ব তৈরি হয় কারণ মুসলিম লীগ নেতৃত্বের অভিজাত অংশ ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাদের চিরাচরিত আনুগত্য থেকে সরে আসতে সম্মত ছিল না। গোলটেবিল আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৩১ সালে জিন্নাহ সিদ্ধান্ত নেন যে, রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন এবং স্থায়ীভাবে লন্ডনে বসবাস করবেন। কিন্তু তৎকালীন মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচার করে ১৯৩৪ সালে ভারতে ফিরে আসেন এবং মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ সালে জিন্নাহ হিন্দু সম্প্রদায়ের মুসলিম বিরোধী প্রচারণার মোকাবেলা করার জন্য দিল্লীতে *'ডন'* নামে ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৪০ সাল থেকে 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' তথা পাকিস্তান আন্দোলন শুরু করেন এবং একই বছর ২৩ মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হলে জিন্নাহ ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি করাচিতে মৃত্যুবরণ করেন। এনামুল হক, *বাংলাপিডিয়া* (সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩)

৯. A. B. Rajput, *Muslim League Yesterday and Today*, Lahore, Pakistan, 1948, p. 56-57

১০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ২-৩

১১. **খান বাহাদুর ক্যাপ্টেন স্যার সিকান্দার হায়াত খান (১৮৯২-১৯৪২)** পাঞ্জাবের মুলতানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাবের 'ইউনিয়নবাদী' নামক রাজনৈতিক দলের প্রধান নেতা ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত লাহোর প্রস্তাবের সংগঠক এবং সমর্থক। তিনি ভারত বিভাগের বিরোধী ছিলেন। সিকান্দার হায়াত খান পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪২ সালের ২৫ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। https://en.wikipedia.org/wiki/Sikandar_Hayat_Khan

এ কে ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) পৈত্রিক নিবাস বরিশালের চাখারে। স্যার খাজা সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর সাথে সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে তার রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়। ১৯১৩ সালে তিনি বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯১৬ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কংগ্রেসের রাজনীতির সাথেও যুক্ত ছিলেন। ১৯১৮ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত এ সংগঠনের সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৯ সালে ফজলুল হক অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২৪ সালে ছয় মাসের জন্য শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কৃষকদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়ন করার জন্য ১৯৩৫ সালে 'কৃষক প্রজা পার্টি' গঠন করেন। ১৯৩৭ সালে ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী হয়ে হক-লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৩৯ সালের মধ্যে বাংলার গ্রাম ও শহরে তার অবস্থান তৈরি হয়ে যায়। তিনি ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাবের উপস্থাপক ছিলেন। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ফজলুল হক ভাইসরয়ের প্রতিরক্ষা পরিষদে যোগদান করলে জিন্নাহ তাকে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করেন। ১৯৪২ সাল থেকে ফজলুল হক জোরালোভাবে দ্বি-জাতি তত্ত্ব বিরোধী হয়ে মুসলিম লীগের প্রভাব হ্রাস করার জন্য তার সম্পূর্ণ

শক্তি নিয়োগ করে। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কলকাতায় অবস্থান করে এ দাঙ্গা প্রতিরোধে কাজ করেন। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে পুনরায় মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তানের অ্যাডভোকেট জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন। ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের পক্ষে ছিলেন। ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই ফজলুল হক 'কৃষক-শ্রমিক পার্টি' গঠন করেন। যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে তার মূখ্য ভূমিকা ছিল। এ নির্বাচনে ফজলুল হকের দল সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও তিনি মূখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হন এবং ১৯৫৮ সালে এ পদ থেকে অপসারিত হয়। এরপর ফজলুল হক বাংলার রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *বাংলাদেশ গড়লেন যারা*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৯-৫২। ASM Abdur Rab, *AK Fazlul Huq (Life Achievement)*, Barisal, 1966

চৌধুরী খালিকুজ্জামান (১৮৮৯-১৯৭৩) ভারতের লক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে যুক্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত একই পদে ছিলেন। খালিকুজ্জামান সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৪২ সালের ক্রিপস মিশন এবং সিমলা ডেপুটেশনে মুসলিম লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর তিনি পাকিস্তানে চলে আসেন এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগের আহবায়ক মনোনীত হন। পরবর্তীতে মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৫০ সালের জুন মাসে দল থেকে পদত্যাগ করেন। চৌধুরী খালিকুজ্জামান ১৯৫৩ সালের ৪ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে পর্যন্ত স্ব-পদে কর্মরত ছিলেন। আবু জাফর, *বাংলাপিডিয়া*

১২. কামরুদ্দীন আহমেদ, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৪৬-৪৮

১৩. Harun-or-Rashid, "*The 1940 Lahore Resolution : Bengal Ideas of Statehood,*" *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities) Vol. 39, No. 1*, June 1994, p. 64-65. হারুন-অর-রশিদ, *৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ১৯

১৪. **আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪)** ভারতের বর্ধমানে (বর্তমান নাম কাসেম নগর) জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমানে আইন ব্যবসা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৩৬ সালে আইন ব্যবসা থেকে অবসর নিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালে বর্ধমান জেলা মুসলিম লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন। আবুল হাশিম ভিন্ন উপলব্ধি থেকে মুসলিম লীগ রাজনীতি গ্রহণ করলেও তাকে ঢাকার নবাব বাড়ি নিয়ন্ত্রিত লীগ রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সম্পর্কে তিনি তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন, "১৯৪৩ সালে অক্টোবর মাসে মৌলানা আজাদ সোবহানী বর্ধমানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আমার আতিথ্য গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, "আপনাকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হতে হবে এবং বাংলায় মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকে ইসলামের প্রায়োগিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হবে।"

সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের পর মুসলিম লীগকে একটি আধুনিক, গণতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাচেতনালব্ধ রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে নতুন কর্মসূচি ও কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগের বিভিন্ন নীতি পরিকল্পনা সম্পর্কে নতুনভাবে পরিকল্পনা করেন। আবুল হাশিমের কর্মজীবনের সবচেয়ে সাফল্যমণ্ডিত ও ঐতিহাসিক পর্ব হচ্ছে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৪৭ সালে সোহ্‌রাওয়ার্দী-শরৎবসুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে কাজ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণ তথা মুসলিম লীগকে নতুন সমীকরণে বসাতে আবুল হাশিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫০ সালে তিনি পাকিস্তানে আগমন করেন কিন্তু ১৯৪৯ সালে গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া ম্যানিফেস্টোতে আবুল হাশিমের পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। ১৯৪৯ সালের মোগলটুলী কর্মী সম্মেলনের আগেই শামসুল হক বর্ধমানে আবুল হাশিমের সাথে দেখা করে এবং আলোচনার মাধ্যমে খসড়া ম্যানিফেস্টো তৈরি করেছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিসে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির যে গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে আবুল হাশিম সভাপতিত্ব করেন। ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা পালন করায় তাকে ১৯৫২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার করা হলে ১৬ মাস কারা ভোগ করেন। ১৯৫৩ সালে খেলাফতে রব্বানী পার্টি গঠন করে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি পুনঃরায় মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তিনি এসময় রাজনীতিতে প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। ১৯৬২ সালে সামরিক একনায়ক আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব উত্থাপিত ছয়দফা আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয় সমর্থন দান করেন এবং পাকিস্তান সরকারের রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার বন্ধ সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেন। পরবর্তীতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে ১৯৬৫ এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খানকে সমর্থন দান করেন। তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় জীবনের শেষ দিকে তিনি ইসলামী চিন্তা জগতে প্রবেশ করেন কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ভিন্ন ধারার প্রচলন আবুল হাশিমই প্রথম করেছিলেন। এই প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ ১৯৭৪ সালের ৫ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। মফিদুল হক, *আবুল হাশিম*, জীবনী গ্রন্থমালা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১০-২৪, ৩৪-৩৫। Abul Hashim, "*Contribution of Muslim Bengal To Freedom Struggle,*" Fazlul Haque memorial lecture series organized by the Pakistan Council first lecture delivered by Mr. Abul Hashim on 18th July, 1970 at Dacca Centre. আবুল হাশিম,

(অনুবাদ শাহাবুদ্দীন মহম্মদ আলী) *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, চট্টগ্রাম-ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৪৭-৫৭, ১৩৭-১৫৩। সৈয়দ আবুল মনসুর আহমদ (সম্পা.), *আবুল হাশিম তার জীবন ও সময়*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩১৫-১৬।

১৫. আবুল হাশিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪-১১৫।
১৯৪৭ সালের ৭-৯ এপ্রিল দিল্লী মহানগরীর এ্যাংলো এরাবিক কলেজে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ লেজিসলেটরস কনভেনশনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবক্রমে লাহোর প্রস্তাবের একাধিক রাষ্ট্র গঠনের পরিবর্তে একটি মাত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সম্পর্কে আবুল হাশিম তার ভূমিকা সম্পর্কে বলেন ...পূর্বাহ্নে সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে জিন্নাহ এক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি পেশ করেন। আমি পয়েন্ট অব অর্ডারের কথা বললে জিন্নাহ বললেন, "মৌলানা সাহেব আপনার কী পয়েন্ট অব অর্ডার" আমি বললাম, "আপনার প্রস্তাবটি গ্রাহ্যতাহীন এবং কর্তৃত্ব বহির্ভুত (Void and Ultra vires)।" জিন্নাহ বললেন, "কেন কেন" এসময় আবুল হাশিম বলেন, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ১৯৪১ সালের মাদ্রাজ অধিবেশনে দলীয় মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব একটি পাকিস্তান নয় বরং ভারতীয় মুসলমানদের জন্য দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অঙ্গীকার। এটা আইনসভার সদস্যবৃন্দ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের বিষয় পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকার রাখে না। তাছাড়া লাহোর প্রস্তাবের বিষয়বস্তু মুসলিম লীগের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ঐ সময় জিন্নাহ বললেন, "ভালো, মৌলানা সাহেব, বহুবচন 'এস'-এর ওপর চাপ দিচ্ছেন সেটি স্পষ্টত ছাপার ভুল।" আমি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানকে সভার কার্যবিবরণী পেশ করার জন্য অনুরোধ করায় তিনি সেটি পেশ করলেন এবং সেখানে জিন্নাহ তার স্বাক্ষরিত বহুবচন 'এস' দেখতে পেলেন। নওয়াবজাদা বললেন, "কায়েদে আজম, আমাদের পরাজয় হয়েছে।" আমাকে উদ্দেশ্য করে জিন্নাহ বললেন, "মৌলানা সাহেব, আমি এক পাকিস্তান রাষ্ট্র চাই না, আমি চাই ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি বিধানসভা। আপনি আমার প্রস্তাবটিকে এমনভাবে সংশোধন করতে পারেন কী যাতে লাহোর প্রস্তাবের অবমাননা না করে আমার উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।" আবুল হাশিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪

১৬. A. B. Rajput, *The Cabinet Mission, 1946,* Lion Press, Lahore, 1946, p. 19-25. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৯

১৭. **ক্রিপস মিশন (১৯৪২)** ঃ ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ ক্যাবিনেট মন্ত্রী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে একটি মিশন প্রেরণ করেন। ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব ছিল যে, ভারতে একটি 'ফেডারেল ইউনিয়ন' গঠন করা হবে কিন্তু কোন প্রদেশ বা অঞ্চল যদি প্রস্তাবিত ইউনিয়নে যোগ না দিয়ে বাইরে থাকতে চায় তবে সেসব প্রদেশকে সে অধিকার দেওয়া হবে এবং যুদ্ধ চলাকালীন সকল দলের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। কংগ্রেসের নিকট ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়নি কারণ পরোক্ষভাবে এ প্রস্তাবে পাকিস্তানের বীজ নিহীত ছিল কারণ সম্ভাবনা ছিল যে, মুসলমান সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহ হয়ত ফেডারেল ইউনিয়নের বাইরে থাকবে। অন্যদিকে মুসলিম লীগের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি কারণ যে সকল প্রদেশ ইউনিয়নের বাইরে থাকবে তারা কোন ইউনিয়ন গঠন করে প্রস্তাবিত ফেডারেল ইউনিয়নের মর্যাদা লাভ করার স্বীকৃতি প্রস্তাবে ছিলনা। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থ বিবেচনা করে ক্রিপস মিশন বা পরিকল্পনা বর্জন করে। কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, দ্বিতীয় খণ্ড*, ইনসাইড লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ১৪-১৬

১৮. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯
ভারতের শাসনতান্ত্রিক জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ১৬ মে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা নির্মোক্ত বিষয়সমূহ সুপারিশ করেঃ ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ নিয়ে ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হওয়া উচিত, যার নিয়ন্ত্রণে থাকবে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও যোগাযোগ। এ সমস্ত বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের জন্য আবশ্যকীয় ক্ষমতা থাকবে।
কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো ব্যতীত অবশিষ্ট বিষয়গুলোর ব্যাপারে সর্বময় ক্ষমতা প্রদেশগুলোর উপর অর্পণ করা।
কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো ব্যতীত বাদবাকী বিষয় ও ক্ষমতা দেশীয় রাজ্যগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকবে।
প্রশাসন ও আইন পরিষদসহ প্রয়োজনীয় বিভাগ গঠন প্রদেশগুলোর ক্ষমতাভুক্ত থাকবে। কোন কোন প্রাদেশিক বিষয় সাধারণভাবে গ্রহণ করা হবে তা প্রত্যেক বিভাগই সিদ্ধান্ত নিবে।
কেন্দ্রীয় ও বিভাগগুলোর সংবিধানে বিধান থাকা উচিত যে, প্রথম দশ বছর এবং তৎপরবর্তী প্রত্যেক দশ বছর অন্তর যে কোনো প্রদেশ নিজস্ব আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংবিধানের ধারাসমূহ পুন:বিবেচনা দাবি করতে পারবে।
মন্ত্রিপরিষদ পরিকল্পনা নির্মোক্তভাবে ভারতবর্ষকে তিনভাগে বিভক্ত করার সুপারিশ করে।
সেকশন-এঃ মাদ্রাজ, বোম্বে, সংযুক্ত প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ নিয়ে গঠিত হবে ১৬৭ টি সাধারণ আসন ও ২০ টি মুসলিম আসন।
সেকশন-বিঃ পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশ সমন্বয়ে ৯ টি সাধারণ আসন, ২২ টি মুসলিম আসন ও ৪ টি শিখ আসন থাকবে।
সেকশন-সিঃ ৩৪ টি সাধারণ আসন ও ৩৬ টি মুসলিম আসন নিয়ে বাংলা প্রদেশ ও আসাম গঠিত হবে। অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

১৯. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮-১৯।

২০. **জওহর লাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪)** ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান নেতা এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৭-১৯৬৪)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি আইনজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভারতীয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯৩৬ সালে নেহেরু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৪২ সালের ৭ আগস্ট তিনি মুম্বাইয়ের কংগ্রেস অধিবেশনে ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রস্তাবক ছিলেন। এরপর ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতার পক্ষে নেহেরু সরাসরি মতামত প্রদান করেন। ১৯৬৪ সালের ২৭ মে নেহেরু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। Judith M. Brown, *Nehru : A Political Life,* Yale University Press, 2003. শেখ মুজিবুর রহমান, *আমার দেখা নয়াচীন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ১৮৭

২১. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮-১৯।

২২. **খাজা নাজিমুদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪)** ঢাকার নবাব পরিবারের সন্তান। ১৯২২ সালে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯২২-২৯ সাল পর্যন্ত সময়ে তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় খাজা নাজিমুদ্দিন স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে (১৯৩৭-১৯৪১) দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পান এবং পাকিস্তানের গভর্নর (১৯৪৮-৫১) নির্বাচিত হন। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৩ সালে তাকে পদচ্যুত করলে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন। ১৯৬২ সালে নবগঠিত কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি এবং আমৃত্যু একই পদে বহাল ছিলেন। সিমিন হোসেন রিমি, *তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী ১৯৪৭-১৯৪৮*, প্রতিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২১৬

নওয়াব মোহাম্মদ ইসমাইল খান (১৮৮৪-১৯৫৮) খুব অল্প বয়সেই রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হন। ১৯১০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ এর দশকে উত্তর প্রদেশে তিনিই মুসলিম লীগের নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলের মুসলিম লীগ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে যৌথ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে ভারতের আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। https://bn.m.wikipedia.org.wiki/ নবাব মোহাম্মদ ইসমাইল খান

২৩. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮-১৯।

২৪. **হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯৩-১৯৬৩)** পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা, অক্সফোর্ড এবং লন্ডনে পড়াশোনা শেষ করে কলকাতায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯২০ সালে ইংল্যান্ড থেকে ফিরেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী রাজনীতিতে যোগদানের পর থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা এবং পাকিস্তান গণপরিষদের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি' এবং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পূর্বে কলকাতায় 'ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি' নামে নতুন দল গঠন করেন। এ নির্বাচনের সময় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আহবানে নবগঠিত দল নিয়ে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। প্রকৃতপক্ষে সোহ্‌রাওয়ার্দীই ছিলেন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তার নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম লীগ অভূতপূর্বভাবে জয়লাভ করে। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের সময় কলকাতায় অবস্থান করেও ওয়ার্কার্স কর্মীদের সাহস ও পরামর্শ প্রদান করেন। যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে জয়লাভের ক্ষেত্রে সোহ্‌রাওয়ার্দীর দিকনির্দেশকের ভূমিকা ছিল। তিনি ১৯৬২-৬৩ সালের আইয়ুব বিরোধী সম্মিলিত জোটের আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সমতার নীতি প্রতিষ্ঠায় সবসময় কাজ করেছেন। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে 'গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আনু মাহ্‌মুদ, *গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী*, আকাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮

২৫. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮-১৯

২৬. A. B Rajput, *The Cabinet Mission,* 1946, *ibid,* p. 49-60

২৭. Dominique Lapierre & Larry Collins, *Freedom at Midnight,* William Collins (UK), 1975, Vikash Publishing House Pvt. Ltd. Kolkata, 1976, অনুবাদ রবিশেখর সেনগুপ্ত, দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ৯৬-১০৯। বিমলানন্দ শাসমল, *ভারত কী করে ভাগ হলো*, ইউনিভার্সাল বুক সাপ্লাই, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৫৬-১৫৭

২৮. **মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বা মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)** ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সফল নেতৃত্ব। তাছাড়া তিনি প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক নেতা। লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে ব্রিটিশ আইনজীবী হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিপীড়িত ভারতীয় সম্প্রদায়ের নাগরিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তার অহিংস নীতির প্রয়োগ করে। ১৯১৫ সালের ৯ জানুয়ারি গান্ধী ভারতে আসেন এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২০ সালে সমগ্র ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন কিন্তু চৌরিচেরায় তীব্র সংঘর্ষের পর এ আন্দোলন থেকে সরে আসেন। ১৯২১ সালে গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাহী সদস্য হন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসার পর গান্ধী সমগ্র ভারতের জনমানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজ করতে শুরু করেন। ১৯৩০ সালে গান্ধী ভারতীয়দের লবন করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন করেন। মহাত্মা গান্ধী সকল পরিস্থিতিতে অহিংস মতবাদ এবং সত্যের ব্যাপারে দৃঢ় ছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে গান্ধী সবচেয়ে বেশি পরিচিত ভারত-ছাড় আন্দোলনের জন্য। ১৯৪২ সালে তিনি ইংরেজ শাসকদের প্রতি সরাসরি ভারত ছাড়ার আন্দোলন বা ভারতছাড় আন্দোলনের সূত্রপাত

করেন। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি গান্ধীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। Louis Fischer, *Gandhi: His Life and Message for the World*, HarperCollins, 1983. Judith M. Brown, *Gandhi: Prisoner of Hope*, Oxford University Press, 1990.
https://bn.m.wikipedia.org.wiki/

২৯. Dominique Lapierre & Larry Collins, *ibid*, পৃ. ৯৬-১০৯। বিমলানন্দ শাসমল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬-১৫৭
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগের একক ইচ্ছায় ভারত বিভাগ হয়নি। ১৯৪৭ সালের শুরু থেকেই শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভারত বিভাগের ব্যাপারে সম্মতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস নেতা বল্লভ ভাই প্যাটেল লর্ড ওয়াভেলের ভারত ত্যাগের আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, পূর্ববাংলা, পশ্চিমপাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান গঠন করে জিন্নাহকে আলাদা করে দিতে। তাই ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ শুধুমাত্র মুসলিম লীগের একক দাবি বলা যায় না বরং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের যৌথ প্রয়াসে নিজেদের স্ব স্ব দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টার ফলাফলে ভারত বিভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিমলানন্দ শাসমল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮-১৬০

৩০. বিমলানন্দ শাসমল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬-১৫৭

৩১. Dominique Lapierre & Larry Collins, *ibid*, পৃ. ৯৬-১০৯। বিমলানন্দ শাসমল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮।
১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দলের বিজয়ে ক্লেমেন্ট এটলি সরকার গঠন করে। এ বিজয় মুসলিম লীগের জন্য আশঙ্কার বিষয় হয়ে দাড়ায় কারণ ব্রিটিশ শ্রমিক দলের অনেক সদস্য দীর্ঘদিন ভারতে অবস্থান করায় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি হয়। বিশেষ করে জওহরলাল নেহেরু, কৃষ্ণমেনন, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ রাজনীতিবিদের সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার সর্বপল্লী, স্যার জগদীশচন্দ্র বসুসহ ভারতের অন্যান্য মনীষীদের প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের শ্রদ্ধা ছিল। এই সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বাড়তি সুবিধা আদায় করে নেয়। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের থেকে কোন সহযোগিতা বা অনুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হয়নি। কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

৩২. G.W. Choudhury, *Constitutional Development in Pakistan*, Longman Group Ltd. London, 1969, p. 14-20

৩৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ২২-২৪

৩৪. Sarat Chandra Bose, *I Warned my Countrymen*, Calcutta, Netaji Research Bureau, 1968, P. 183 উদ্বৃত, মো: মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৫-১৬

৩৫. **শরৎচন্দ্র বসু (১৮৮৯-১৯৫০)** কংগ্রেসের ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্যতম একজন নেতা। চিত্তরঞ্জন দাসের অনুপ্রেরণায় তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের প্রশ্নে তিনি বাংলা বিভাগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বাংলার মূখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠায় জোরালো ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি শরৎচন্দ্র বসু কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। চিত্তরঞ্জন মিশ্র, *বাংলাপিডিয়া*
কিরণ শংকর রায় (১৮৯১-১৯৪৯) মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় থানার তেওতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাক স্বাধীনতাকালে বঙ্গীয় কংগ্রেসের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। ১৯২১ সালে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহেরুর প্রচেষ্টায় 'স্বরাজ পার্টি' গঠন করলে তিনি এ পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯২৩ সালে কিরণ শংকর রায় 'স্বরাজ পার্টি'র সম্পাদক হন এবং পরপর দুইবার বেঙ্গল কাউন্সিলে নির্বাচিত হন। ১৯২৭ সালে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হন এবং দক্ষতার সাথে কাজ চালিয়ে যান। ১৯৪৭ সালে কিরণ শংকর রায় অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরৎ বসুর সঙ্গে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেন। অবিভক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ব্যর্থ হলে পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান নির্বাহী পরিষদের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে তিনি ভারতে গিয়ে পশ্চিম বাংলায় ডা. বিধান রায়ের মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। তপন কুমার দে, *বৃটিশ বিরোধীদের জীবন কথা*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৪৮-৪৯
সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ (১৮৯৩-১৯৭৬) ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত 'যুগান্তর' দলের সদস্য ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাসের 'স্বরাজ্য দলে' তার বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯২০ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু এ দলের রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির অ্যাডহক সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত আইন পরিষদে কংগ্রেস পার্টির ডেপুটি নেতা ছিলেন। সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু (সম্পা.), *সংসদ বাঙালি চরিতাবিধান*, *প্রথম খণ্ড*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৮১৫-৮১৬

৩৬. Sharat Chandra Bose, *I Warned my Countrymen*, Calcutta, Netaji Research Bureau, 1968, p. 183 উদ্বৃত, মো: মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১৬।
মোহাম্মদ আলী (১৯০৯-১৯৬৩) বগুড়ার জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি বগুড়া জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর অবিভক্ত বাংলা মন্ত্রিসভায় তিনি অর্থ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী (১৯৪৬-৪৭) ছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বার্মায় (১৯৪৮), কানাডায় (১৯৪৮-৫২) এবং যুক্তরাষ্ট্রে (১৯৫২-৫৩) রাষ্ট্রদূতের

দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হিসেবে ইতিহাসে অধিক পরিচিত। M.A.Hannan, *Mohammad Ali (Bogra): A Biographical Sketch,* M.S Huq Publishers, Dhaka, 1967.

ফজলুর রহমান (১৯০৫-১৯৬৬) তৎকালীন ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। অবিভক্ত ভারতে ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য মনোনীত হন। ফজলুর রহমান ১৯৩৯ সালে গঠিত বঙ্গীয় মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের (১৯৪৩-১৯৪৫) চিফ হুইপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভায় (১৯৪৬-১৯৪৭) অর্থমন্ত্রী ছিলেন। রাজনৈতিকভাবে ফজলুর রহমান খাজা নাজিমুদ্দিন গ্রুপ সমর্থিত রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ১৯৬৬ সালে ইন্তেকাল করেন। হারুন-অর-রশীদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৮১। সিমিন হোসেন রিমি, *তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরি ১৯৪৮-১৯৪৯*, প্রতিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২২০

৩৭. Joya Chatterji, *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1932–1947*, Cambridge University Press, India, 2002. জয়া চ্যাটার্জী, *"বাঙলা ভাগ হল, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭"* (অনুবাদ আবু জাফর) দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২৯৬-২৯৭

৩৮. Sharat Chandra Bose, *ibid*, p. 183 উদ্বৃত, মোঃ মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১৬।

৩৯. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh, Bengal Muslim League and Muslim Politics 1906-1947,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987, P. 273-340

৪০. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৪২১-৪২২। Harun-or-Rashid, *ibid*, P. 6

৪১. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি, সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০)*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৩৩

৪২. **মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)** পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার হাকিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৮ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে *মোহাম্মদী* ও *আল-এসলাম* পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩৬ সালের অক্টোবরে তৎকালীন সময়ের একমাত্র বাংলা পত্রিকা *দৈনিক আজাদ* প্রকাশ করেন। আকরম খাঁ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক হয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থে তিনি ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে বিশ্বাসী আকরম খাঁ ১৯২২ সালে চিত্তরঞ্জন দাসের 'স্বরাজ পার্টি' এবং ১৯২৩ সালে 'বেঙ্গল প্যাক্টে'র প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। পরবর্তীতে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ দল ত্যাগ করে প্রজা বা কৃষক রাজনীতির সাথে (১৯২৩-১৯৩৫) যুক্ত হন। ১৯৩৬ সালে কৃষক রাজনীতি পরিহার করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন এবং ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এ টি এম আতিকুর রহমান, *বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৯০৫-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫।

নূরুল আমীন (১৮৯৩-১৯৭৪) মুসলিম লীগের ময়মনসিংহ জেলা শাখার সভাপতি হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। পাকিস্তান আন্দোলনে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯৪৮ সালে তিনি পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন এবং তৎপরবর্তী পাঁচ বছর একই পদে নিয়োজিত ছিলেন। নূরুল আমীন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন। মুয়াযযম হুসায়ন খান, *বাংলাপিডিয়া*

হামিদুল হক চৌধুরী (১৯০১-১৯৯২) নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পক্ষে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। তাছাড়া হামিদুল হক 'খাজা নাজিমুদ্দিন গ্রুপে'র সমর্থক ছিলেন। ১৯৯২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ*, *পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১

৪৩. **সরদার বল্লব ভাই প্যাটেল (১৮৭৫-১৯৫০)** স্বাধীন ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী। ১৯১৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গুজরাট শাখার সেক্রেটারি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন ও ভারত ছাড় আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। দ্বি-জাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী প্যাটেল ভারত বিভাগের অন্যতম সমর্থক হলেও ১৯৪৭ সালের অখণ্ড বাংলা গঠনে প্রবল বিরোধিতা করেন। সিমিন হোসেন রিমি, *তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরি ১৯৪৭-১৯৪৮*, প্রতিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২২৬

৪৪. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি, সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩

৪৫. *Patel's Correspondence 1945-1950, Vol-IV,* Ahmedabad 1972 উদ্ধৃত সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২২

৪৬. *The Transfer of Power, X,* P. 1039-1041 উদ্ধৃত তাহমিনা খান, *পাকিস্তানের প্রথম দশকে পূর্ববাংলার রাজনীতি*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৫৪

৪৭. *Viceroy's Personal Report No.7 File L/P & J/10/79*, P. 222-226, উদ্ধৃত সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৩
৪৮. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১-৪৬
৪৯. বদরুদ্দীন উমর, *বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৭৬
৫০. **হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী (১৯০৬-১৯৬৬)** ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে ফেনীর পরশুরাম নির্বাচনী অঞ্চল থেকে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আন্দোলনে হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও ১৯৪৭ সালে অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে অসহযোগিতা করেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ গঠিত প্রথম মন্ত্রিসভায় তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৩ সালে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। রফিকুল আকবর, *বাংলাপিডিয়া*
৫১. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬
৫২. সিরাজুদ্দিন হোসেন, *ইতিহাস কথা কও*, দীপায়ন, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৬৮
৫৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১-৪৬
৫৪. আহসানুল্লাহ, *অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন*, লায়ন্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৬৫-৮৬
৫৫. কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ববাংলার সামাজিক ইতিহাস*, পাইওনিয়ার প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ৯২-৯৩

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ এর প্রধান প্রধান ধারাসমূহ :

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত নামক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হবে। দেশীয় রাজ্যগুলোর উপর ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের অবসান হবে। এ রাজ্যগুলো স্বাধীন থাকবে নাকি ভারত বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে তা রাজ্যসমূহ সিদ্ধান্ত নিবে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে সৃষ্ট দু'টি রাষ্ট্র বা এর কোনো অংশের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

নতুন সৃষ্ট দু'টি রাষ্ট্রের জন্য একজন গভর্নর জেনারেল থাকবেন। ব্রিটিশ রাজা গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করবেন।

১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে দু'টি রাষ্ট্র (ভারত ও পাকিস্তান) তাদের নিজেদের আইনসভা গঠন করে স্ব স্ব রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করার অধিকার ভোগ করবে।

ভারত ও পাকিস্তানে নতুন সংবিধান প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রের গণপরিষদ উক্ত রাষ্ট্রের আইনসভারূপে কাজ করবে।

দু'টি রাষ্ট্রের নতুন সংবিধান প্রণীত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রের সরকার এবং রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ সমূহের সরকার অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী কাজ পরিচালনা করবে। ১৯৪৮ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত এ ক্ষমতা ভোগ করবেন। উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে এ ক্ষমতা গণপরিষদের হাতে থাকবে।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুসারে ভারত সচিবের পদ বিলুপ্ত করা হবে এবং ভারত সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করবে কমনওয়েলথ সেক্রেটারি।

এ আইন প্রণয়নের সময় বিদ্যমান সকল সরকারি কর্মচারী এবং স্বশস্ত্র বাহিনী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৯

৫৬. খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৬৭
৫৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৩
৫৮. হারুন-অর-রশিদ, *৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
৫৯. মওদুদ আহমদ, (অনুবাদ: জগলুল আলম) *বাংলাদেশ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১০
৬০. হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ*, *পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮-৩৯
৬১. কর্ণেল শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬৪
৬২. হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ*, *পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮-৩৯
৬৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫-৫৬
৬৪. মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪-৫
৬৫. হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ*, *পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫-৫৬
৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-২০
৬৭. তারিক আলী, *পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ জান্তা না জনতা* (অনুবাদ মাহফুজ উল্লাহ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৫-২৬
৬৮. হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ*, *পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-২০
৬৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-২০
৭০. অমলেন্দু দে, *বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ২৩৩
৭১. হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ*, *পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২২
৭২. অমলেন্দু দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জন্মের সময় মোট জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষ যাদের মধ্যে ২,৯৪,৮৪,০০৯ জন মুসলমান, ১,১৭,৩৬,০২৯ জন হিন্দু, ৫৬,৮৮২ জন খ্রিস্টান এবং ১,১৭৯ জন শিখ।

এসময় মাইল প্রতি জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৭৭৫ জন যা ছিল বিশ্বে সর্বোচ্চ ঘনবসতি। (*East Pakistan Forges Ahead, Homes Political Bundle*, উদ্ধৃত সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭)

৭৩. সালাহউদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশ: জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা গণতন্ত্র*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৩

৭৪. হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ, পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

৭৫. সালাহউদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

৭৬. সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২০-২২

৭৭. মফিদুল হক, আবুল হাশিম, *জীবনী গ্রন্থমালা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১০-২৪

৭৮. আরিফা সুলতানা, *"আবুল হাশিম ঃ কর্ম ও রাজনৈতিক জীবন"*, এম.ফিল থিসিস (অপ্রকাশিত), ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৪৩

৭৯. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

৮০. হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ, পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০-৩৩। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের শীর্ষ নেতা সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম সমর্থক প্রগতিশীল অংশের নেতা-নেতৃত্বে মধ্যে পাকিস্তান আন্দোলন ছিল বাংলা ও ভারতের পিছিয়ে পড়া বহুমূখী অধিকার বঞ্চিত ও শোষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি বা আন্দোলন। এ ধারণা থেকে অনেক বামপন্থি নেতা পাকিস্তান আন্দোলনে সমর্থন ও অংশগ্রহণ করেন। হারুন-অর-রশিদ, *৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪১

৮১. সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২২

৮২. হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ২। মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

৮৩. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh, Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987, P. 332

৮৪. হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১-২

৮৫. হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ, পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫-৫৬। শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫-১২১। Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh*, Dhaka University Press Limited, Dhaka, 1986, p. 77-78. হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১-২

৮৬. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩-৬৪

৮৭. এ কে এম শাহনাওয়াজ (সম্পা.), *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদ্বয়ের ইতিহাস*, সি বি ও পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১২৩

৮৮. হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১-৪

৮৯. হারুন-অর-রশিদ, *৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১। A.F. Salahuddin Ahmed, *Bangladesh Tradition and Transformation,* Dhaka University Press Ltd. Dhaka, 1987, p. 79.

৯০. সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-২৩

৯১. নেহাল করিম, *জাতীয়তাবাদ উন্মেষ ও বিকাশ*, কৃষ্ণচুড়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৭৩

৯২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯

৯৩. *পাকিস্তান অবজারভার*, ঢাকা, ২১ ডিসেম্বর ১৯৬২

৯৪. নেহাল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

৯৫. A. M. A Muhit, *Bangladesh Emergence of a Nation,* Bangladesh Books International Ltd. Dhaka, 1978, p. 106-107

৯৬. *Ibid,* p. 108-109

৯৭. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ: রাজনীতি, সরকার ও শাসন তান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯

৯৮. *পাকিস্তান অবজারভার*, ১৯ জুন, ঢাকা, ১৯৬৮

৯৯. *Verinder Grover (ed.), Encyclopaedia of SAARC Nation Bangladesh,* Deep and Deep Publication, New Delhi, 1997, p. 19

১০০.*Bangladesh Documents, Vol.1,* Delhi Ministry of External Affairs, Government of India, 1971, p.19, উদ্ধৃত, সৈয়দা শায়েলা তায়েফ, *নির্বাচন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচন*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৩৫-৩৬

১০১.সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫-২৬

১০২.মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ উত্থান পর্ব (১৯৪৮-১৯৭০)*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৪৫

১০৩.ফকরুল আলম (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা (২০২০-২০২২)*, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২২, পৃ. ১৫৭

১০৪.Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh, Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947, ibid*, p. 159-165.

১০৫.মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান তালুকদার (সম্পা.), *হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতিকথা*, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৫৩

১০৬.আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস (১৯৪৯-১৯৭১)*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১০-১৩। হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২-৩

১০৭.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১২

১০৮.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০-১৩। হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২-৩।

১০৯.আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১*, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২১৯।

১১০.অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-২৯। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠনে ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের তরুণ নেতৃবৃন্দের মূখ্য ভূমিকা ছিল। তবে চল্লিশের দশকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অভ্যন্তরীণভাবে দ্বি-ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে (সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপ বনাম খাজা গ্রুপ)। এই বিভক্তি ছিল একদিকে মধ্যবিত্ত, অন্যদিকে অভিজাত জমিদারি স্বার্থের দ্বন্দ্ব। তৎকালীন সময়ে অধিকাংশ মানুষ এ বিভক্তিকে জনগণ বনাম প্রাসাদ দ্বন্দ্ব হিসেবে আখ্যায়িত করে। এই উদারপন্থি তরুণ কর্মীদের বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আগত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং তাদের ধ্যান-ধারণা ছিল সংস্কারপন্থি। তাছাড়া এ গ্রুপই বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল। তারা পূর্ববাংলার জন্য অধিক স্বায়ত্তশাসন লাভ ও পাকিস্তানকে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলো। তাছাড়া তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারে বিশ্বাসী ছিল এবং সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদবিরোধী মনোভাব পোষণ করতো। ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হওয়ার পরই উদারপন্থি এই গোষ্ঠী সংগঠিত হতে থাকে। আবুল হাশিম এবং শামসুল হকের কর্মতৎপরতায় ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে ১৯৪৪ সালের ৯ এপ্রিল পুরান ঢাকার ১৫০ মোগলটুলীতে প্রতিষ্ঠিত 'মোগলটুলী পার্টি হাউজ'-কে কেন্দ্র করে শতশত ছাত্র যুবক সংগঠিত হয় এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, কামরুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দিন আহমদ, আনোয়ারা খাতুন, ফজলুল কাদের চৌধুরী প্রমুখ এই উদারপন্থি গ্রুপের সদস্য ছিলেন। হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১। Rangalal Sen, *ibid*, p. 86-88

পাঞ্জাবি নেতৃবৃন্দের স্বপ্নের পাকিস্তান ছিল তাদের বর্ণবাদী মনোভাব বা জাত্যাভিমান প্রসূত নিয়ন্ত্রণ অর্জনের নিরাপদ ক্ষেত্রস্বরূপ। কারণ পাঞ্জাবি পাকিস্তানিরা নিজেদের সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতো এ যুক্তিতে যে, তাদের পূর্ব পুরুষেরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আগত বিজয়ী মুসলমান তাই তাদের ধমনীতে জন্মসূত্রে অভিজাত নীল রক্ত প্রবাহমান। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা হিন্দু নিম্নশ্রেণি থেকে ধর্মান্তরিত এবং আচার আচরণ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাসে হিন্দুদের প্রায় কাছাকাছি যে কারণে তাদের স্থান শাসিতের স্তরে। তাছাড়া হাজার মাইলের দুরত্বে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ পাকিস্তান রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত ছিল অতিরিক্ত প্রাপ্তি। আইয়ুব খান, *ফ্রেন্ডস নট মাস্টারস: এ পলিটিক্যাল অটোবায়োগ্রাফি*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৮৭

১১১.**তাজউদ্দিন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫)** গাজীপুর জেলার কাপাসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে বামপন্থি রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগের সাথে যুক্ত হন এবং ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি মুসলিম লীগের গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতির অন্যতম একজন বিরোধী ছিলেন। ১৯৪৯ সালে গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তাও তিনি। তাজউদ্দিন আহমদ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের (৪ জানুয়ারি ১৯৪৮) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গঠিত 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে'র গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করেন এবং কারা নির্যাতনের স্বীকার হন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক (১৯৫৩-১৯৫৭) ছিলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে কাপাসিয়া থেকে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সময় তিনি সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ছয়দফা আন্দোলনে তার ভূমিকা পালনের জন্য তাকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় দলের পক্ষে এ আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে তাজউদ্দিন আহমদ এম এল এ নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরু হলে তিনি তার সহকর্মীবৃন্দসহ ভারতে গমন করেন। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ প্রবাসী সরকার গঠিত হলে তাকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এসময় তিনি মুক্তি বাহিনীর জন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হলে প্রথমে

অর্থ এবং পরে অর্থ ও পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োজিত হন। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নেও তার অসামান্য অবদান ছিল। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর কারাগারে বন্দী থাকাবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়। মুনতাসীর মামুন, *তাজউদ্দীন আহমদ এক তারুণ্যের রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯

মোহাম্মদ তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭) ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে'র সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হলে এ পার্টির সাথে যুক্ত হন এবং পরবর্তীতে তিনি ন্যাপ-এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। গণঅভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসহ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের নিয়ে নিজ অঞ্চল নোয়াখালী সদর পশ্চিমে মুক্তাঞ্চল গঠন করেন। আবু মো: দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাপিডিয়া*

অলি আহাদ (১৯২৮-২০১২) ছাত্রাবস্থায়ই পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের মে মাসে গঠিত 'পিপলস ফ্রিডম লীগ' প্রতিষ্ঠায় সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠন করা হলে ঢাকা জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের আহবায়ক নির্বাচিত হন। ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে চূড়ান্ত পর্ব পর্যন্ত তিনি দিক নির্দেশকের ভূমিকায় ছিলেন। ১৯৫১ সালের ২৭-২৮ মার্চ অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনে 'পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ' গঠিত হলে এ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অলি আহাদ। তিনি ১৯৫৩ সালের অক্টোবরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৭

কামরুদ্দীন আহমদ (১৯১২-১৯৮২) রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই মুসলিম লীগ সমর্থক ছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল দলীয় চরিত্রের প্রেক্ষাপটে এ দল ত্যাগ করেন। ১৯৪৭ সালে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে'র সদস্য হিসেবে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কামরুদ্দীন আহমদ ১৯৫৪ সালে সরাসরি আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং ১৯৫৫ সালে এ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে রাজনীতি ছেড়ে কূটনীতিকের (কলকাতা, বার্মা, পাকিস্তান) পেশা গ্রহণ করেন। তাছাড়া তিনি লেখক হিসেবেও সমধিক পরিচিত। মো. সেলিম, *বাংলাপিডিয়া*

১১২. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-২৯

১১৩. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।

খান সাহেব আবুল হাসনাত ঢাকার বেচারাম দেউড়ির ঐতিহ্যবাহী জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মৌলভী আবুল খায়রাত হোসেন মোহাম্মদ আঠারো শতকের ঢাকা ও সোনারগাঁও এর জমিদার ছিলেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মূল প্রবেশদ্বার পিছনে ফেলে সামনের রাস্তা তার নামে নামকরণ করা হয়েছে। ঢাকার নূর বকস্ লেন এর বেচারাম দেউড়িতে অবস্থিত প্রায় ২০০ বছরের পুরানো আবুল হাসনাতের এই বাড়িটিতে ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য আবুল হাসনাতের এই বাড়িতেই প্রথমে তৎকালীন যুবকর্মীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যুবলীগ গঠিত হয়। এসময় তিনি ঢাকা পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে তার বাড়িটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সিমিন হোসেন রিমি, *তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরি ১৯৪৭-১৯৪৮*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭

১১৪. **কফিল উদ্দিন চৌধুরী (১৮৯৮-১৯৭২)** মুন্সিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত 'কৃষক প্রজা পার্টি'তে যোগদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে একই দলের হয়ে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হয়ে শ্রীনগর-সিরাজদিখান অঞ্চল থেকে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে নির্বাচিত হয়ে যোগাযোগ, আইন ও বন মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে শ্রীনগর, সিরাজদিখান ও লোহজং নির্বাচনী এলাকা থেকে এম এল এ নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতায় ভারতে গমন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন। সিমিন হোসেন রিমি, *তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরি ১৯৪৭-১৯৪৮*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪

১১৫. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

১১৬. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৫

নাইমউদ্দিন আহমদ (১৯২৪-১৯৬৭) ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি এবং বিভিন্নমূখী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি সভা-সমাবেশে যোগদান বা সাংগঠনিক কাজই করেননি 'পাকিস্তান বনাম অখণ্ড হিন্দুস্তান' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৪৯ সালে আরবি হরফ চালুর সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে ছাত্রসমাজ ও সাধারণ জনগণকে সরকারি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে হুশিয়ার করে দেন। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ভাষা সম্পর্কিত জিন্নাহর ঘোষণায় তার নেতৃত্বে 'নো' 'নো' ধ্বনি উচ্চারণ করে সম্মুখে প্রতিবাদ জানানো হয়। এ জন্য তাকে কার্জন হলের গেটেই গ্রেফতার করা হয়। এভাবে ভাষা আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে তিনি সরাসরি ভূমিকা রেখেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করে সোহ্‌রাওয়ার্দীর জুনিয়র হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায় যুক্ত হন। নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের যে সকল নেতা পূর্ববাংলা বিশেষ করে রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতো তারা ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠন করেন। নবগঠিত এ দলে নাইমউদ্দিন আহমদ পূর্ববাংলা কমিটির আহবায়ক মনোনীত হন। মোরশেদ শফিউল হাসান, *ভাষা সংগ্রামী নাইমউদ্দীন আহমদ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭

১১৭.মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১। হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন রোজ গার্ডেন এর হল কামরায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্কার্স কর্মী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী উপস্থিত ছিলেন। তাকে সভাপতি করে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করা হয়। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব যখন বাংলা ও আসাম প্রদেশ মুসলিম লীগের শাখা একত্রিত করে 'পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি' গঠন করেন তখন আসাম মুসলিম লীগ প্রাদেশিক শাখার সভাপতি মওলানা ভাসানী পূর্ববাংলা মুসলিম লীগ প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই মওলানা আকরম খাঁর ইচ্ছায় কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সন্দেহ করা হয় যে, মওলানা ভাসানীসহ আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ হাশিম-সোহরাওয়ার্দী সমর্থক। এ কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে আকরম খাঁ নিজে চেয়ারম্যান হয়ে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন। এসময় থেকেই মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ সংগঠনে যুক্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া মওলানা ভাসানী ১৫০ মোগলটুলী মুসলিম লীগ ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের নেতা ও সংগঠকদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন (১৯৪৯, ১৮-২০ জুন) চলাকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া ঘোষণাপত্র তৈরি করেছিলেন শামসুল হক। এসময় মওলানা ভাসানী তাকে সার্বক্ষণিক তদারকি করেছিলেন। মওলানা ভাসানী আসামের ধুবড়ি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ঢাকায় আসেন এবং আলী আমজাদ খানের বাসায় ওঠেন। এসময় তিনি মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী কার্যক্রমের প্রতিবাদ করেন। ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের তরুণ প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ যেহেতু মুসলিম লীগ বিরোধী প্লাটফর্মে কাজ করছিল এজন্য মওলানা ভাসানী সরকার বিরোধী ভূমিকা সক্রিয় করার লক্ষ্যে মোগলটুলী কর্মী শিবিরের সাথে কাজ করেন। তৎকালীন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এ কর্মী শিবিরের সাথে আলাপ আলোচনা করে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং একটি কর্মী সম্মেলন আহবান করেন। ঢাকার মোগলটুলীতে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনেই 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করা হয়। মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১। হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩। আবু আল সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৪

১১৮.হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২-৩। ফকরুল আলম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারী ধর্মঘটে যোগদানের অপরাধে শেখ মুজিবুর রহমানসহ ২৭ জন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করা হয়। আবদুল মতিন, অলি আহাদ, দবিরুল ইলাম, দেওয়ান মেহবুব আলী, লুলু বিলকিস বানু প্রমুখ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ফকরুল আলম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬-১৮৭

১১৯.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

১২০.ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা থেকে এসে তরুণ ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এসকল ছাত্র নেতৃবৃন্দ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের সমর্থক ছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। তাই তারা পুনরায় মুসলিম লীগে নিজেদের অবস্থান পুন:প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' প্রতিষ্ঠা করেন। কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

১২১.মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪১

১২২.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

১২৩.হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬, পৃ. ৩

১২৪.মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪১।

১২৫.ঢাকা পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান **কাজী মোহাম্মদ বশীর (হুমায়ুন সাহেব)** ১৯১৯ সালে ঢাকায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পাকিস্তানি আমলের প্রথম দিকে ঢাকায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কাজী মোহাম্মদ বশীর নিজের জীবন বিপন্ন করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু লোকের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করেন। তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান (১৯৫১-১৯৫৪) পদে অধিষ্ঠিত থেকে বিভাগোত্তর জনবহুল একটি প্রদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকা নগরীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও নগরবাসীদের জীবনের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। জনসেবার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে দেশের সমকালীন রাজনীতিতে কাজী মোহাম্মদ বশীর সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ব্রিটিশ আমলে ঢাকা নগর মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত ছিলেন। ঢাকা শহরে কে. এম. দাস লেনস্থ তার বাসভবন 'রোজ গার্ডেন' তদানীন্তন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মিলন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। শুধু তাই নয়, আজকাল যেমন নাগরিক সম্বর্ধনাসমূহ বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হয়, সেকালে এসব নাগরিক সম্বর্ধনা এই রোজ গার্ডেনেই অনুষ্ঠিত হত। এই রোজ গার্ডেনেই ১৯৪৭ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে বর্তমান আওয়ামী লীগের জন্ম। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হওয়া পর্যন্ত তিনি সোনারগাঁ-এর অন্তর্গত মরজাল জমিদারির সর্বশেষ জমিদার ছিলেন। ব্রিটিশ আমলেই তার নামে ঢাকা নগরীর একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছিল।

https://www.facebook.com/dhakakendra97/posts/1759934317404698/

১২৬.মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪১

১২৭.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮-৪১।

আবদুল জব্বার খদ্দর ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকালে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসেবে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেন। সমবায়, ব্যাংক ও ইন্সুরেন্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠায় একজন বিশিষ্ট সংগঠক ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০, ২৫৩, ৩০৬

খয়রাত হোসেন (১৯১১-১৯৭২) ১৯৩৮-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একশত বারো জন কাউন্সিল সদস্যের দস্তখতে একটা রিক্যুইজিশন সভা আহবানের দাবি করা হলে তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন অনুষ্ঠিত ১৫০ নম্বর মোগলটুলীর কর্মী সম্মেলনে খয়রাত হোসেন উপস্থিত ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের সময় মুসলিম লীগ সরকার আন্দোলনকারীদের গণগ্রেফতার ও নানাভাবে অত্যাচার শুরু করলে অন্যান্য নেতৃত্বের সাথে তিনি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন। ১৯৫২ সালে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং এসময় তিনি অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে গ্রেফতার হন। আজীবন তিনি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭, ৯১, ৯৩, ১২০, ১৬৬, ২৩৮, ৩০৯।

আলী আহমদ খান ১৯৪৬ সালে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগ বিরোধী একটা গ্রুপ যখন ঢাকার ১৫০ মোগলটুলী অফিসকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হচ্ছিল এবং সম্মেলনের প্রস্তুতি নেয় তখন আলী আহমদ খান সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রতিষ্ঠার পর আওয়ামী লীগ থেকে যখন শীর্ষস্থানীয় নেতারা বিবৃতি দিয়ে পদত্যাগ করছিলেন তখন আলী আহমদ খান দলের হয়ে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০-১২১, ১৬৬

খোন্দকার মোশতাক আহমদ (১৯১৯-১৯৯৬) ছিলেন আওয়ামী লীগের (১৯৪৯ সালে) প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হয়ে কুমিল্লার নির্বাচনী অঞ্চল (দাউদকান্দি-হোমনা) থেকে এম এল এ নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদীয় মন্ত্রী ছিলেন। স্বাধীনতার পর গঠিত শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভায় বিদ্যুৎ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পরবর্তীতে বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১০

শওকত আলী (১৯১৮-১৯৭৫) ঢাকা জেলার গেণ্ডারিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শওকত আলী ১৯৪৭ সালে অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিশে'র রাষ্ট্রভাষা উপকমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনের প্রস্তুতিসহ সম্মেলনের দিন তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৫০ মোগলটুলীর মূল তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কর্মীদের থাকা-খাওয়াসহ যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতেন তিনি। শেখ মুজিবুরের বন্ধু হওয়ায় শওকত আলীর বাসায় সানন্দে তাকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। পুরানো মুসলিম লীগ কর্মী হিসেবে নতুন দল আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে শওকত আলীর অবদান সর্বজনগ্রাহ্য। ১৯৫০ সালে তিনি ঢাকা নগর আওয়ামী মুসলিম লীগের মূখ্য সংগঠক ছিলেন। বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গঠিত প্রতিটি ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, গোপন আলোচনা তার বাসায় অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ২০১১ সালে তাকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। এম আর মাহবুব, *যারা অমর ভাষা সংগ্রামী*, অনিন্দ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩৫২-৩৫৪

ফজলুল কাদের চৌধুরী (১৯১৯-১৯৭৩) ১৯৪২ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কাজ করেন। তিনি শেখ মুজিব উত্থাপিত ছয় দফার বিরোধী কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনীর পক্ষে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। মুয়ায্যম হুসায়ন খান, *বাংলাপিডিয়া*

আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৮৬) ১৯৩৬ সালে মুসলীম লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে সিরাজগঞ্জ আসন থেকে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় মুসলিম লীগ ত্যাগ করে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়েই আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে নিজেকে যুক্ত করেন। তিনি ১৯৫৭-১৯৬৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কিছুকাল আওয়ামী লীগের বাহিরে দলীয় অবস্থান নিলেও ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় পুন:রায় আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত হন। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা (১৯০৫-১৯৪৭)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৫৭-২৬৬

আতাউর রহমান খান (১৯০৭-১৯৯১) ১৯৪৪ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং মানিকগঞ্জ মহকুমা লীগের সহ সভাপতি নিযুক্ত হন। আতাউর রহমান আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আতাউর রহমান খান ১৯৪৯-৫৮ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহ সভাপতি ছিলেন। ১৯৫০ সালে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদান করেন। ১৯৫২ সালে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক ছিলেন আতাউর রহমান খান। ১৯৫৩-৫৫ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্টের যুগ্ম-আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদ এবং ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী (১৫.০৫.১৯৫৪-২৯.০৫.১৯৫৪),

মূখ্যমন্ত্রী (৬.৯.১৯৫৬-৩১.৩.১৯৫৮; ১.৪.১৯৫৮-১৮.৬.১৯৫৮; ২৫.৮.১৯৫৮-৭.১০.১৯৫৮) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি NDF (National Democratic Front) এবং PDM (Pakistan Democratic Movement) এর শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। আতাউর রহমান খান ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই জাতীয় লীগ গঠন করেন এবং এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল গঠন করলে তিনি বাকশালে যোগদান করেন। আতাউর রহমান খান ১৯৭৬ সালে জাতীয় লীগ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। আতাউর রহমান খান এরশাদের মন্ত্রিসভায় (৩০.৩.১৯৮৪-১.১.১৯৮৫) প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। আতাউর রহমান খান, *স্বৈরাচারের দশ বছর: আইয়ুবি শাসনের চালচিত্র ১৯৫৮-১৯৬৯*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০২০, পৃ. লেখক পরিচিতি অংশ

আবদুস সালাম খান (১৯০৬-১৯৭২) গোপালগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে মুসলিম লীগের রাজনীতি পছন্দ করতেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনের উদ্যমী কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি গোপালগঞ্জ জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক ছিলেন। গোপালগঞ্জ জেলায় আবদুস সালাম খান খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তার সম্পর্কে *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* বর্ণনা আছে, "...শতকরা আশি ভাগ লোকই তাঁকে চায়। সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। আমার আব্বাকে শহীদ সাহেব জিজ্ঞাসা করলে আব্বা বলেছিলেন, সালাম সাহেবকে লোকে চায়। তবে সালাম সাহেব ও খন্দকার শামসুদ্দীন সাহেব উভয়ই উপযুক্ত প্রার্থী। ...শেষ পর্যন্ত আমিও হাশিম সাহেবকে বলেছিলাম, সালাম সাহেবকে নমিনেশন দিতে। শহীদ সাহেব রিপোর্ট দিলেন, সালাম সাহেবই সকলের চেয়ে জনপ্রিয়।"

দেশ ভাগের পর মুসলিম লীগের বিভিন্ন নীতি পরিকল্পনার প্রতিবাদ করেন। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ভেঙ্গে দিলে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতা মিলে একশত বারোজন কাউন্সিল সদস্যের দস্তখত নিয়ে একটা রিক্যুইজিশন সভা আহবান করার দাবি করেন। আবদুস সালাম খান এতে দস্তখত করেন। পাকিস্তান সরকারের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী নীতির প্রতিবাদে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে ১৯৪৯ সালে গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের সহ সভাপতি হিসেবে আবদুস সালাম খান সারাদেশে নব্যগঠিত দলের জেলা ও মহকুমা শাখা গঠন করেন। ফরিদপুরে আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হয়েছিল। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ সরকার গণগ্রেফতার শুরু করলে অনেক পুরানো নেতা পদত্যাগ করেছিলেন। এরূপ সংকটকালীন সময়েও তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে ছিলেন। তাছাড়া আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর সাংগঠনিক সফরে শেখ মুজিবের সাথে বিভিন্ন অঞ্চলে সাংগঠনিক সফরে যেতেন। ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে আবদুস সালাম খান উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের একজন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৫৭ সালে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। পরে আবার তিনি আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে করা পাকিস্তান সরকারের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিবের প্রধান কৌঁসুলি হিসেবে ১৯৬৯ সালে আবদুস সালাম খান দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭, ৯১, ১২১, ১৩০, ১৬৬, ২১৯, ২৪৪, ২৬০, ৩০৬

শামসুদ্দীন আহমেদ (১৮৮৯-১৯৬৯) কুষ্টিয়া (পূর্বে নদীয়া) জেলার সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৯ সালে খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে তার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা করেন। পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনেও যোগদান করেন। শামসুদ্দীন আহমেদ কংগ্রেস আদর্শের অনুসারী ছিলেন। বিশেষ করে চিত্তরঞ্জন দাসের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন তিনি এর সেক্রেটারি ছিলেন। শামসুদ্দীন আহমেদ প্রথমে কৃষক প্রজা সমিতির যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হলেও ১৯৩৪ সালেই আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংগঠনে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টির পক্ষ থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। তিনি ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারি ছিলেন। ১৯৪৫ সালে শামসুদ্দীন আহমেদ 'কৃষক প্রজা পার্টি' থেকে পদত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। মুসলিম লীগে যোগদানের পর ১৯৪৬ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল থেকে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভায় শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পর্যন্ত একই পদে বহাল ছিলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি 'পাকিস্তান সোস্যালিস্ট পার্টি' নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে শামসুদ্দীন আহমেদ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ততোটা সক্রিয় ছিলেন না। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা (১৯০৫-১৯৪৭)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২১১। Humaira Momen, *A Study of Krishak Praja Party and the Election of 1937,* Dacca, 1972, p. 66-89

১২৮.আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯

১২৯.অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

১৩০.হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬।

ঢাকা পৌঁছানোর পর শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (২০ অক্টোবর ১৯৫৫) সাংবাদিকদের নিকট দেওয়া সাক্ষাৎকারে আওয়ামী মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ব্যাপারে বলেন যে, অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দলীয় নীতিরও পরিবর্তন হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্ত কোন ব্যক্তি বা প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান নিতে পারে না, প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা এ ধরণের কোন প্রস্তাব গৃহীত হলেও তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হতে পারে না। ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর কাউন্সিল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী দীর্ঘ ৫০ মিনিট বক্তৃতা প্রদান করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়ার যৌক্তিকতা উল্লেখ করে বক্তৃতা করেন। রাষ্ট্রকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলার জন্য হিন্দু-মুসলিম পরস্পর ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সবাই পাকিস্তানি অর্থাৎ সবাই মিলেই রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করতে হবে। *দৈনিক আজাদ*, ২১ অক্টোবর, ১৯৫৫, পৃ. ১ উদ্ধৃত হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

১৩১. হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

১৩২. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

১৩৩. হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬-৭

১৩৪. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩-৭৪

১৩৫. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৮-৬৯

১৩৬. হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৭

১৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২-৩

১৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১২

১৩৯. **মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট:** ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধানের মূলনীতির রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে ২৪ সদস্যের মূলনীতি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ১৯৫০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর একটি অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্ট একটি ইউনিট পরিষদ ও গণপরিষদসহ দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা নিয়ে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করে। ইউনিট পরিষদে পাকিস্তানের সকল ইউনিট বা প্রদেশের প্রতিনিধি থাকবে এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। তবে এ কমিটি গণপরিষদের নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা উল্লেখ করেনি। একটি শক্তিশালী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উপর জোর প্রদান করা হয়। প্রেসিডেন্টকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং সংবিধান স্থগিত করার ক্ষমতা প্রদান করে। তাছাড়া উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের সুপারিশ করে। পূর্ববাংলার জনগণ মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। মো. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাপিডিয়া*

১৪০. হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮-৩৮।
মওলানা ভাসানী ১৯৫৫ সালের ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন দলের নামের সঙ্গে 'মুসলিম' শব্দ যুক্ত করার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, পাকিস্তান হওয়ার পর যারা সরকারের বিরোধিতা করেছিলেন এবং সরকারি নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষ ভালো করে জানে। এ সম্পর্কে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, "প্রতি কথায় কথায় সরকার তাহাদিগকে "রাষ্ট্রদ্রোহী" "ভারতের দালাল" ও "পঞ্চম বাহিনী" আখ্যা দেয়। ... ঢাকায় ছাত্র সমাজ ও জনসাধারণ বাংলা ভাষার আন্দোলন আরম্ভ করে। সরকার তখন এই আন্দোলন পায়জামা পরিহিত হিন্দুদের সৃষ্ট বলিয়া অপপ্রচার চালাইতে শুরু করে। ... এই অবস্থায় সেই সময় যদি আমরা অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতাম, তাহা হইলে সূচনায়ই তাহার মৃত্যু হইতো।" এসময় তিনি প্রস্তাবটি দলীয় কাউন্সিলের ভোটে দেওয়ার পূর্বে বলেন যে, তিনি সমগ্র প্রদেশ দলীয় সফর করে আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক করার দাবি উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হওয়ায় উপস্থিত সকলের মতামত বিচার করে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেন। উল্লেখ্য এই অধিবেশনে উপস্থিত প্রায় ৭০০ কাউন্সিলরের মধ্যে মাত্র পাঁচজন মওলানা ভাসানী উত্থাপিত প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ৬ জুন ১৯৫৭। হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮-৩৯

১৪১. হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯-১২

১৪২. পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন পোক্ত এবং তার সমর্থন বৃদ্ধি করার জন্য ১৯৬২ সালে কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠন করেন। মূলত তিনি পাকিস্তান মুসলিম লীগ থেকে বের হয়ে এ দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইয়ুব খান এ দলের পক্ষে প্রার্থীতা করেন। কনভেনশন মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রতীক ছিল গোলাপ ফুল। https://bn.m.wikipedia.org>wiki

১৪৩. হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯-১২

১৪৪. মো: মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৮-৬৯

১৪৫. Rangalal Sen, *ibid*, p. 77-78

১৪৬. Marcus F.Franda, *"Communism and Regional Politics in East Pakistan", Asian Survey, Vol X, No. 7*, University of California Press, 1970, p. 588-606

১৪৭.**তেভাগা আন্দোলন** ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে শুরু হয়ে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চলে। বর্গা বা ভাগ চাষীরা এতে অংশ নেয়। মোট উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে চাষী, একভাগ জমির মালিক এই দাবি থেকেই তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত। তৎকালীন পূর্ববাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়। তবে দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এই আন্দোলনের প্রধান নেত্রী ছিলেন ইলা মিত্র। ধনঞ্জয় রায় (সম্পা.), *তেভাগা আন্দোলন*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০০।

নাচোল বিদ্রোহ : তেভাগা আন্দোলন বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে যুগান্তকারী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ১৯৪৭ সালে এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেলেও এর প্রভাব বাংলাদেশের রাজশাহীর নাচোল অঞ্চলে রয়ে যায়। এরই সরাসরি প্রভাবে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সাল মধ্যবর্তী সময়ে এ এলাকায় নতুন করে বিস্তৃত কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকারী কৃষকবৃন্দ সকলেই প্রায় সাওতাল জাতিভূক্ত ছিলেন এবং তাদের প্রধান নেতা ছিলেন মাতলা সর্দার। এসময় আন্দোলন চলমান অঞ্চলে ক্ষমতাসীন সরকারি প্রভাব প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে সাঁওতাল কৃষক ও পুলিশের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় যাতে উভয় পক্ষ থেকে অসংখ্য মানুষ হতাহত হতে দেখা যায়। এ সংঘর্ষের পর সরকারি নির্যাতন বহুগুণে বেড়ে যায় এবং অবশেষে পুলিশের অমানসিক নির্যাতনে আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১

হাজং বিদ্রোহ : ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদার বিরোধী আঞ্চলিক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তেমনিভাবে সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হাজং আন্দোলন দেশভাগের আগেই শুরু হয় এবং দেশভাগের পর এ আন্দোলন সংগঠিতভাবে নতুন করে দানা বেঁধে ওঠে। এসময় ধানের ওপর লেভী ও টঙ্ক (ধানের মাধ্যমে খাজনা) প্রথার বিরোধিতার মাধ্যমে হাজং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী এ আন্দোলন সংঘটিত করে। এ আন্দোলন শেষ দিকে স্বশস্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে যার ফলে হাজংদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত নির্যাতন ও অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে হাজং সম্প্রদায়ের এ আন্দোলন বিলুপ্ত হয়। হাজং আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত কৃষক সমিতি। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪

নানকার বিদ্রোহঃ নানকার বিদ্রোহ বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের একটি কৃষক আন্দোলন যা ১৮ আগস্ট ১৯৪৯ সালে সংঘটিত হয়। নানকার ফার্সি শব্দ যার অর্থ হল খাবারের বিনিময়ে কায়িক শ্রমদান। শুধু খাবারের বিনিময়ে যে জমির ভোগসত্ত্ব প্রজাদেরকে দেওয়া হত সে জমি নানকার জমি হিসেবে চিহ্নিত করা হত। এই নানকার প্রজারা ভূমি মালিকের হুকুমের দাস ছিল। সাধারণত নিম্নবর্গের হিন্দুরাই (কিরাণ, নমশুদ্র, মালি, ঢুলি, নাপিত, পাটনি) নানকার শ্রেণির প্রজা ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে শুরু হওয়া আন্দোলন ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির পর সমাপ্ত হয়। অজয় ভট্টাচার্য, *নানকার বিদ্রোহ, প্রথম খণ্ড*, মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১৭-১৮

টঙ্ক আন্দোলনঃ টঙ্ক আন্দোলন বাংলার কৃষকদের অধিকার আদায়ের একটি অন্যতম আন্দোলন। ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা ও শেরপুর জেলায় টঙ্ক প্রথা প্রচলিত ছিল। টঙ্ক বলতে কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের উপর আরোপিত খাজনা বোঝায়। এ খাজনার পরিমাণ ছিল প্রচলিত খাজনার থেকে কয়েকগুণ বেশি যা দরিদ্র কৃষকের পক্ষে পরিশোধ অসম্ভব ছিল। ১৯৪৬ সালে টঙ্ক প্রথা বিলোপ আন্দোলনের সাথে সাথে জমিদারি প্রথা বিলোপের আন্দোলনও শুরু হয়। ১৯৪৯ সালে কুমুদিনী হাজং, রশিমনি হাজং, যাদুমণি হাজংসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় এ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বাতিলের পর টঙ্ক আন্দোলন সমাপ্ত হয়। মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৪৮-৭৫

১৪৮.হায়দার আকবর খান রনো (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীরা*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩২

১৪৯.Rangalal Sen, *ibid*, p. 86-88

১৫০.**মাহমুদ আলী (১৯১৯-২০০৬)** ১৯৪৬ সালে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে বামপন্থি মতাদর্শী নেতৃবৃন্দ তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুবলীগ গঠন করেন যার সভাপতি ছিলেন মাহমুদ আলী। তাছাড়া ১৯৫২ সালের ৩১ ডিসেম্বর গণতন্ত্রী দল প্রতিষ্ঠা হলে তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে গণতন্ত্রী দলের প্রার্থী হয়ে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হলে তিনি পূর্ব পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে মাহমুদ আলী জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট দলের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। Ayesha Jalal, *The State of Martial Rule: The Origin of Pakistan's Political Economy of Defence Vanguard Books, 1991*, India, p. 190. Nair Bhaskaran, *Politics in Bangladesh: A Study of Awami League 1949-58*, Northern Book Centre, India, 1990, p. 154

১৫১.হায়দার আকবর খান রনো (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

১৫২.Rangalal Sen, *ibid*, p. 86-88

১৫৩.*Ibid*, p. 86-91

১৫৪.**হাজী মোহাম্মদ দানেশ (১৯০০-১৯৮৬)** ১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন কিন্তু তেভাগা আন্দোলনে সংশ্লিষ্টতার কারণে তাকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়। হাজী দানেশ ১৯৫২ সালে গণতন্ত্রী দল নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৫৭ সালে তার দল বিলুপ্ত করে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'তে (ন্যাপ) যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে ন্যাপের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৬৫ সালে এ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি

নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে ন্যাপ থেকে পদত্যাগ করেন এবং মুজিবনগরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতে শুরু করেন। মাহফুজুর রহমান সরকার, *বাংলাপিডিয়া*

১৫৫.Rangalal Sen, *ibid*, p. 86-88

১৫৬.তারিক আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-৩৮

১৫৭.Rangalal Sen, *ibid*, p. 86-88

১৫৮.এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলন ১৯৫২ সালের ২-১২ অক্টোবর চীনের তৎকালীন রাজধানী পিকিং-এ অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের ৩৭টি দেশের ৩৭৮ জন প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালের কোরীয় যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক মতাদর্শী দেশের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিনিধির কথা ছিল 'শান্তি চাই, যুদ্ধ চাই না'। পিকিং-এ অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে শান্তি পরিষদের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে শেখ মুজিবসহ দলের অন্যান্য সদস্য যোগদান করেছিলেন। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান চীনের সমাজতান্ত্রিক নেতা মাও সে তুং এর সাথে বাংলা ভাষার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং সম্মেলনে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। শেখ মুজিবুর রহমান, *আমার দেখা নয়াচীন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২০। শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০-২৩৫

১৫৯.হায়দার আকবর খান রনো (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

১৬০.Rangalal Sen, *ibid*, p. 86-88

১৬১.**হাফেজ আতহার আলী (১৮৯১-১৯৭৬)** ১৯৫২ সালে 'নেজামে ইসলাম পার্টি'র সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে তার নেতৃত্বে এ পার্টি প্রাদেশিক পরিষদে চারটি ও জাতীয় পরিষদে ৩৬ টি আসন লাভ করে। https://bn.wikipedia.org/wiki/আতহার আলী

১৬২.Rangalal Sen, *ibid*, p. 86-88

১৬৩.**খাজা শাহাবুদ্দীন (১৮৯৮-১৯৭৭)** ঢাকার নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা জেলা বোর্ডের সদস্য হন। তিনি ১৯২৮ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। খাজা শাহাবুদ্দীন ১৯৩৭ সালে নারায়ণগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। তিনি খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভায় বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী (১৯৪৩-১৯৪৫) ছিলেন এবং ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন। আইয়ুব খান সরকারের অধীনে তথ্য ও বেতার মন্ত্রী (১৯৬৫-১৯৬৯) থাকাবস্থায় বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা প্রদান করায় বাঙালিদের কাছে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হন। মোহাম্মদ আলমগীর, *বাংলাপিডিয়া*

১৬৪.**কামিনী কুমার দত্ত (১৮৭৮-১৯৫৯)** কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। দেশ বিভাগপূর্বকালে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। পাকিস্তানের সংবিধান রচনা কমিটিতে কাজ করেন। তাছাড়া দেশ ভাগের পর প্রথমে তিনি পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী ও পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। *Dhaka Tribune*, Dhaka, 31 July 2013.

১৬৫.Rangalal Sen, *ibid*, p. 86-91

১৬৬.জগলুল আলম, *বাংলাদেশের বামপন্থি রাজনীতির গতিধারা, (১৯৪৮-১৯৮৯)*, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২৪

১৬৭.মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯-৮০

১৬৮.জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।
পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন মনি সিংহ, খোকা বাবু, নেপাল নাগ, বারীণ দত্ত ও অনীল মুখার্জী। সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন শহীদুল্লাহ কায়সার, সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, আমজাদ হোসেন ও কুমার মৈত্র।

১৬৯.**রিপাবলিকান পার্টি** : পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা জাতীয় সংসদে পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ সৃষ্টির পক্ষে সমর্থকগোষ্ঠী তৈরির উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধবাদী কিছু সদস্যের সমন্বয়ে ১৯৫৬ সালের ২৮ মে 'রিপাবলিকান পার্টি' নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এ দল গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর ক্ষমতা খর্ব করা। এ লক্ষ্যে সীমান্ত প্রদেশ কংগ্রেস নেতা ডা. খান সাহেবকে দিয়ে এ দল গঠন করানো হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন পশ্চিম পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী ডা. খান সাহেব এবং ইস্কান্দার মির্জা সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রিপাবলিকান পার্টি গঠনের এক সপ্তাহ পর এর সদস্য সংখ্যা হয় ১৩ জন যারা প্রত্যেকে মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে এসে এ দলে যোগদান করেন। এ দল গঠনের পর থেকেই জাতীয় সংসদের অভ্যন্তরে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভাঙ্গা-গড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী রিপাবলিকান পার্টির সমর্থনে ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন যেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। S.A Akanda, "Was Parliamentary System of Government a Failure in Pakistan? A case study of a Constitutional Debate in Pakistan during Martial Law, 1958-62" *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol-vi* (1982-83), Rajshahi, p. 158.

১৭০.Rangalal Sen, *ibid*, p. 151

১৭১.জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯
১৭২.কর্ণেল শওকত আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
১৭৩.জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯
১৭৪.Rangalal Sen, *ibid*, p. 151. মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১। হায়দার আকবর খান রনো (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২
১৭৫.সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮। হায়দার আকবর খান রনো (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২-৩৩
১৭৬.সাক্ষাৎকার, সিরাজুল আলম খান, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ১৯৬৩-১৯৬৫) ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী (সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ১৯৬৭-১৯৬৮) উদ্ধৃত মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২০৭
১৭৭.জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯
১৭৮.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১২
১৭৯.Rangalal Sen, *ibid*, p. 151.
১৮০.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১২
১৮১.সৈয়দ আবুল মকসুদ, পৃ. ১৩৮
১৮২.মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭-৮৮
১৮৩.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১
১৮৪.**মাহমুদুল হক ওসমানী** পশ্চিম পাকিস্তানের বামধারার একজন নেতৃত্ব। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে বিরোধ প্রকাশ্য রূপ লাভ করলে আওয়ামী লীগের বামপন্থি অংশের উদ্যোগে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হল-এ ১৯৫৭ সালের ২৪-২৫ জুলাই কর্মী সম্মেলনে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' গঠিত হয়। এ সময় মাহমুদুল হক ওসমানী নতুন এ পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন। রণজিৎ কুমার দাস, *বাংলাপিডিয়া*
১৮৫.মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১
১৮৬.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১২
১৮৭.জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২
১৮৮.তারিক আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭
১৮৯.জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

আবদুল হক (১৯২০-১৯৯৫) বর্তমান বাংলাদেশের বামপন্থি রাজনীতিবিদ। ১৯৪১ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কস-লেলিনবাদী) প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭২ সালে এ দল দুই অংশে বিভক্ত হয়। একটি অংশের নেতৃত্বে আবদুল হক সক্রিয় ছিলেন এবং তার নেতৃত্বে এ অংশের নাম 'বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি' রাখা হয়। https://bn.wikipedia.org/wiki/আবদুল হক

১৯০.জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২। মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০-১৪১
১৯১.জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২
১৯২.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫। ১৯৬৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে গৃহীত নির্মোক্ত প্রস্তাবসমূহ নিয়ে কমিউনিস্টদের রণকৌশল নির্ধারণে বিতর্ক তৈরি হয়। প্রস্তাবগুলো ছিল- ১. সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শিবিরের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ২. উভয়পক্ষ কর্তৃক যুদ্ধবিরোধী নীতি অবলম্বন। ৩. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সে দেশের স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করা এবং যেখানে যেমন প্রয়োজন তথা বিপ্লবের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ পন্থায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ অবলম্বন করা এবং ৪. স্ট্যালিনের সুদীর্ঘ শাসনকালীন সময়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে সে সময়ে অনুসৃত নীতিমালার মূল্যায়ন করা। জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯
১৯৩.মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩
১৯৪.**ফাতেমা জিন্নাহ (১৮৯৩-১৯৬৭)** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দন্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে পড়াশুনা শেষ করে বড় ভাই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সহকর্মী ও উপদেষ্টা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র পক্ষে ছিলেন এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সদস্য হিসেবে কাজ করেন। ফাতেমা জিন্নাহ ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর 'পাকিস্তান উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেছিলেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর তিনি তার কাজ চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সালে আইয়ুব খানের বিরোধী পক্ষের তথা সম্মিলিত বিরোধী দলের (কপ) প্রার্থী হয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং রাজনীতিতে সক্রিয় হন। https://bn.m.wkipedia.org>wiki/ফাতেমা জিন্নাহ
১৯৫.মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩
১৯৬.**কাজী জাফর আহমদ (১৯৩৯-২০১৫)** বাংলাদেশের একজন অন্যতম বামপন্থি নেতা। তিনি ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট রাজনীতির মতাদর্শগত বিভক্তির প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন দুইভাগে বিভক্ত হয়। এসময় কাজী জাফর আহমদ চীনপন্থি নীতি অনুসরণ

করেন। তিনি বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি (১৯৬৭-১৯৮৫) ছিলেন এবং শ্রমিক শ্রেণির উন্নয়নে আমৃত্যু কাজ করেছেন। হায়দার আকবর খান রনো (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৬-৪৭৭

হায়দার আকবর খান রনো বাংলাদেশের বিশিষ্ট বামপন্থি নেতা। তিনি ভারতের কলকাতায় জন্মগ্রহণ (১৯৪২) করেন। কিন্তু পৈত্রিক নিবাস বাংলাদেশের নড়াইল জেলায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাবস্থায়ই কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হন। তিনি পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬২ সালে এ দল বিভক্ত হলে তিনি চীনপন্থি ধারা অবলম্বন করেন। ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেলিনবাদী) প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৯ সালে এ দলের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি নামকরণ করা হয়। ১৯৭৯-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ সালে হায়দার আকবর খান রনো বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য মনোনীত হন। *দৈনিক মানবজমিন*, ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি, ২০২২। হায়দার আকবর খান রনো (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৭

১৯৭.**মতিয়া চৌধুরী** ১৯৪২ সালের ৩০ জুন পিরোজপুর জেলার নাজিরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল ও কলেজ জীবন থেকেই তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকাবস্থায় তিনি বাম রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫২ সালে চূড়ান্ত পর্যায়ের ভাষা আন্দোলনে মতিয়া চৌধুরী প্রকাশ্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক বাম রাজনীতির বিভক্তির প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি গ্রুপ পিকিংপন্থি অর্থাৎ মেনন গ্রুপ হিসেবে এবং অন্য গ্রুপ মস্কোপন্থি অর্থাৎ মতিয়া গ্রুপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৬২ সালে ছাত্র ইউনিয়নের হয়ে ডাকসুর জিএস হিসেবে সামরিক সরকার তাকে গ্রেফতার করে। ১৯৬৩ সালে স্বৈরাচার বিরোধী এবং শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলনে জোরালো ভূমিকা পালন করেন। মতিয়া চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভানেত্রী (১৯৬৪-১৯৬৫) নির্বাচিত হন। স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করায় বহুবার কারাবরণ করেন এবং ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত একাধারে দুই বছর কারাবরণ করলে ছাত্রী নেত্রী ও মহিলা নেত্রীদের সমন্বয়ে তথা সার্বিক আন্দোলনের পর তাকে গণঅভ্যুত্থানের সময় মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় পালন করেছেন সংগঠক হিসেবে বহুমাত্রিক ভূমিকা। ১৯৭১ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। মতিয়া চৌধুরী ১৯৯৬ এবং ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। সুপা সাদিয়া, *৭১' এর একাত্তর নারী*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৬৮-১৭০

সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক (১৯৩৯-২০০৮) পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুব শাসন বিরোধী আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত হন। ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৬৬ সালে সোভিয়েতপন্থি গ্রুপের সভাপতি মনোনীত হন। ১৯৬৯ সালের ১১ দফাভিত্তিক গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের প্রথম সারির নেতা। মুক্তিযুদ্ধে তিনি ন্যাপ এবং সিপিবি (কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ), ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের নিয়ে গঠিত যৌথ গেরিলা বাহিনীর সংগঠক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৮৭ সালে সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তীতে সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯৪ সালে 'গণ ফোরাম' গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং আমৃত্যু এ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। চপল বাশার, *বাংলাপিডিয়া*

রাশেদ খান মেনন (১৯৪৩-) বাংলাদেশের বামপন্থি ধারার একজন উল্লেখযোগ্য নেতা। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্র ইউনিয়নের চীনপন্থি ধারার সমর্থক হয়ে ষাটের দশকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা পালন করেন। রাশেদ খান মেনন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির নির্বাচিত সভাপতি। হায়দার আকবর খান রনো (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৪

সফিকুর রহমান বাংলাদেশের বামপন্থিধারার একজন নেতা। তিনি ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের মধ্যকার মতাদর্শগত বিরোধ ছাত্র ইউনিয়নেও দেখা যায়। ১৯৬৫ সালের ১-৩ এপ্রিল ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ছাত্র ইউনিয়ন সোভিয়েতপন্থি ও চীনাপন্থি এ দুই ধারায় বিভক্ত হলে সফিকুর রহমান চীনাপন্থি গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫-৪০

১৯৮.জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫-৪০

১৯৯.মার্কসবাদ হচ্ছে একটি রাজনৈতিক মতবাদ। মার্কসবাদ সামাজিক পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও শ্রেণি সম্পর্ককে কেন্দ্রীভূত করে সমাজ বিশ্লেষণে ব্যবহারের প্রক্রিয়া ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি। মার্কসবাদী প্রক্রিয়াকে পদ্ধতিগত অর্থনৈতিক পরিবর্তনে শ্রেণি সংগ্রামের ভূমিকা এবং পুঁজিবাদ বিকাশের সমালোচনা ও বিশ্লেষণে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা ও প্রয়োগে ব্যবহার করা হয়। লেলিনবাদ হচ্ছে সাধারণভাবে শ্রমিক বিপ্লবের মতবাদ ও রণকৌশল এবং বিশেষভাবে এটি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্বের মতবাদ ও রণকৌশল।
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin

সুখেন্দু দস্তিদার (১৯১৪-১৯৭৬) চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই বিপ্লবী রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তাই তিনি 'অনুশীলন সমিতি'র সাথে কাজ করেছেন। সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে তিনি সর্বকণিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। সুখেন্দু দস্তিদার মার্কসবাদ, লেলিনবাদ, মাও সেতুং এর রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শিক মতদ্বৈততায় তিনি চীনপন্থা অবলম্বন করেন। এ সময় মোহাম্মদ তোয়াহা ও সুখেন্দু দস্তিদারের নেতৃত্বে চীনাপন্থিরা পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ-লেলিনবাদ) প্রতিষ্ঠা করেন। এ পার্টির প্রথম কংগ্রেসে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে দলের নাম 'বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল'

(মার্কসবাদ-লেলিনবাদ) করা হয়। অঞ্জলি বসু ও সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পা.), *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৭৭৮-৭৮০। জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫-৪০

২০০.জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫-৪০। মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

২০১.সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৬-৩০৭

২০২.**মুজফ্ফর আহ্‌মদ (১৮৮৯-১৯৭৩)** ১৯২০ সালে খেলাফত কমিটিতে যোগদানের মাধ্যমে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। তার ষাট বছরের রাজনৈতিক জীবনে বায়ান্ন বছরই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। মুজফ্ফর আহ্‌মদ, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি* ১৯২০-১৯২৯, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৯৭৭

২০৩. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৬-৩০৭

২০৪.সিরাজ সিকদারের 'রচনা সংকলন', প্রথম খণ্ড, চলন্তিকা বইঘর, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৩-১৪

২০৫.**শামসুজ্জোহা মানিক** ষাটের দশকের অন্যতম ছাত্র নেতা। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অন্যতম সংগঠক। ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে চীনপন্থি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ 'পূর্ববাংলার বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন' নামে সংগঠন গড়ে তোলেন। এ দল গঠনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আদর্শগত মতপার্থক্যের কারণে শামসুজ্জোহা মানিক ১৯৭২ সালে কমিউনিস্ট রাজনীতি পরিত্যাগ করেন।

আমজাদ হোসেন (১৯৪২-) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয়কর্মী হিসেবে ষাটের দশকের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। তিনি পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেলিনবাদী) এর সম্পাদক ছিলেন। আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৯৬, লেখক পরিচিতি অংশ

২০৬.**দেবেন সিকদার (১৯১৭-১৯৯৪)** ১৯৩৭ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চট্টগ্রাম জেলা শাখায় যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালে কমিউনিস্ট দল বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এ বিভক্তির সূত্র ধরেই ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে কমরেড দেবেন সিকদারের নেতৃত্বে 'পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হয়। তাছাড়া তার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ মজদুর পার্টি' গঠিত হয়। পরবর্তীতে বিপ্লবী ঐক্যের স্বার্থে তার এ দল এবং 'বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল' একীভূত হয়ে নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল'। হায়দার আকবর খান রনো (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০-১৯১

২০৭.সিরাজ সিকদারের *'রচনা সংকলন'*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩-১৪

২০৮.**সিরাজ সিকদার (১৯৪৪-১৯৭৫)** বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬৭ সালে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৮ সালে তিনি ঢাকায় মাও সেতুং গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ১৯৬৮ সালের ৮ জানুয়ারি 'পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার পর ৩০ এপ্রিল পূর্ববাংলা সশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী গড়ে তোলেন। এটি পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ৩ জুন তার নেতৃত্বে সর্বহারা পার্টি নামকরণ করা হয়। অনেকের মতে ১৯৭৫ সালের ১ জানুয়ারি তিনি গ্রেফতার হন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তার মৃত্যু হয়। https://bn.wikipedia.org/wiki/সিরাজ_সিকদার। রবীন আহসান, *সিরাজ সিকদার রচনা সংগ্রহ*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২২-২৪। হায়দার আকবর খান রনো (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮

২০৯.সিরাজ সিকদারের *'রচনা সংকলন'*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩-১৪

২১০.মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

২১১.হায়দার আকবর খান রনো (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭-১৯০

২১২.**সর্বহারা পার্টি** সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। মাও সেতুং এর আদর্শে উজ্জীবিত ও গোপন সশস্ত্র আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী এ দল আত্মগোপন অবস্থায় ক্যাডার ভিত্তিক রাজনীতি পরিচালনা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে থেকেই একদিকে বিক্ষুব্ধ যুবকদের আস্থা অর্জন করে অন্যদিকে গ্রামভিত্তিক শোষক ভূমি মালিকদের ত্রাস হিসেবে সারাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করে। মূলত স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে 'পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন' নামের সংগঠনকে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক দলের অবকাঠামো দিয়ে সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ৩ জুন সর্বহারা পার্টি গঠিত হয়। জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮। হায়দার আকবর খান রনো (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭-১৯২

২১৩.হায়দার আকবর খান রনো (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭-১৯৭

২১৪.এনায়েতুল্লাহ খান, *শেখ মুজিবের উত্থান-পতন*, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা, আগস্ট, ১৯৭৫। শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে নিহত হওয়ার পর এ নিবন্ধ ছাপা হয়।

২১৫.**জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ):** বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর মধ্যবিত্ত পেটি বুঁর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে দলীয় ক্ষমতার ব্যবহার করলে আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একটি অংশ আওয়ামী দলীয় রাজনীতির প্রতি হতাশাগ্রস্থ হয়ে বিকল্পপন্থা অনুসন্ধান শুরু করে। সিরাজুল আলম খান এবং আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের বামপন্থি অংশ ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠার পর অল্পদিনের মধ্যেই বাংলাদেশের গোটা রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। তাদের ধারণা ছিল বুঁর্জোয়া রাজনীতি এবং বুঁর্জোয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশে যথার্থ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সে অনুযায়ী শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব নয়। জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১। এস আমিনুল ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*

২১৬.এনায়েতুল্লাহ খান, *প্রাগুক্ত*

২১৭.জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮

২১৮.**বাকশাল :** বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) ছিল মূলত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং জাতীয় লীগ নিয়ে গঠিত একটি রাজনৈতিক জোট। ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এর প্রধান লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। হারুন-অর-রশিদ, *৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০-৬৫

২১৯.জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯-১১

২২০.হায়দার আকবর খান রনো (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীরা*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৮২*

২২১.হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ*, *পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

২২২.মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা ১৯৪৭-১৯৭০ দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৬

২২৩.সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫-৩৬ A. K. Choudhury, *The Independence of East Bengal: A Historical Process,* Jatiya Grantha Kendra, Dhaka. p. 3. ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ৭-৯ এপ্রিল ১৯৪৬-এ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'দিল্লি মুসলিম লেজিসলেটরস কনভেনশন' আহবান করেন। পূর্ববাংলা থেকে পর্যবেক্ষক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান এ কনভেনশনে যোগদান করেছিলেন। শেখ মুজিব তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন, "তার কাছেই আমাদের স্থান। যখন উর্দু স্লোগান উঠত, আমরাও তখন বাংলা স্লোগান শুরু করতাম।" শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

২২৪.আতিউর রহমান ও লেলিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন: পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, ঢাকা, পৃ. ৩৪

২২৫.Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh, Bengal Muslim League and Muslim Politics 1906-1947, ibid,* P. 7

২২৬.*ibid,* P. 118.

২২৭.আতিউর রহমান ও লেলিন আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

২২৮.*দৈনিক আজাদ*, ১৯ মে ১৯৪৭। হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি*, *সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২-১৬৩

জিয়াউদ্দীন আহমেদ (১৮৭৮-১৯৪৭) ভাষা বিষয়ক বক্তব্যে বলেন যে, পাকিস্তানের প্রদেশ সমূহের বিদ্যালয়ে প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহার না করে একমাত্র উর্দুকে শিক্ষার বাহন হিসেবে চালু করার দাবি করেন। এ দাবির তীব্র প্রতিবাদ করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তার মতে এটা কেবল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতি বিরুদ্ধই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারও বিরোধী। বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, *প্রথম খণ্ড*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪, (প্রথম সংস্করণ ১৯৭০), পৃ. ১৯-২০

২২৯.*দৈনিক আজাদ*, কলকাতা, ৩০ জুন ১৯৪৭

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যশোর জেলা স্কুলের শিক্ষক (১৯০৮-১৯০৯) হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে তিনি অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন। তিনিই প্রথম উর্দুর পরিবর্তে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিক দাবি উপস্থাপন করেন। মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা ১৯৪৭-১৯৭০ দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১-১৫৮

আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭) রাজশাহী জেলার চাপাইনবাবগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যুক্তিবাদী ও মননশীল লেখক হিসেবে সমধিক পরিচিত। সমকালীন রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর যুক্তিনিষ্ঠ প্রখর দৃষ্টি রেখে সৃজনশীল প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ভাষাবিতর্কের একেবারে গোড়ার দিকে *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকায় (২২ ও ২৯ জুন ১৯৪৭) এবং *দৈনিক আজাদ* (৩০ জুন ১৯৪৭) পত্রিকায় 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ওয়াকিল আহমদ, *বাংলাপিডিয়া*। *দৈনিক আজাদ*, কলকাতা, ৩০ জুন ১৯৪৭

২৩০.আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২৯

২৩১.আবদুল হক, "ভাষা আন্দোলনের পটভূমি", *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, সপ্তদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র; ১৩৭৯। বেগম সুফিয়া কামাল (সম্পা.) *সাপ্তাহিক বেগম* পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শিরোনামে মিসেস এম. এ. হক (কমরেড আবদুল হকের ছদ্মনাম) তার নিবন্ধে লিখেন, "সমগ্র পাকিস্তানের তিনভাগের প্রায় দু-ভাগ অধিবাসী পূর্ব পাকিস্তানে বাস করে এবং এদের সকলেরই মাতৃভাষা বাংলা ... সেহেতু রাষ্ট্রভাষা হবার দাবি সর্বাপেক্ষা প্রবল বাংলা ভাষার। ... যাতে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হয়, সেজন্য আমাদের নারী সমাজ সর্বত্র আন্দোলন করবেন আশা করি। এ বিষয়ে পাকিস্তানের গণপরিষদস্থ পূর্ব পাকিস্তানের গণপ্রতিনিধিগণের বিশেষত মহিলা প্রতিনিধির গুরুতর কর্তব্য রয়েছে।" *সাপ্তাহিক বেগম*, কলকাতা, ২৭ জুলাই ১৯৪৭।

২৩২.আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৪

২৩৩.*দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ১ জানুয়ারি ১৯৪৯ উদ্ধৃত সুলতানা নিগার চৌধুরী, *বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী চিন্তা (১৯৪৭-১৯৭১)*, প্রকাশিত পি এইচ.ডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ. ১২৪

২৩৪.আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১। নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত মাসিকপত্র '*কৃষ্টি*'র কার্তিক সংখ্যায় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত মোহাম্মদ এনামুল হক প্রবন্ধটিতে বাংলা রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেন। প্রবন্ধে বলা হয় "উর্দু বাহিয়া আসিবে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মরণ- রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু। এই রাষ্ট্রীয় ভাষার সূত্র ধরিয়া শাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান হইবে উত্তর ভারতীয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানি উর্দু ওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র; যেমন ভারত ছিল ইংরেজি রাষ্ট্রভাষার সূত্রে ইংরেজদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র।" *সওগাত* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে ড. কাজী মোতাহার হোসেন বলেন, "যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের ওপর রাষ্ট্রভাষারূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশিদিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব-পশ্চিম সম্বন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা আছে।" আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১।

ড. এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২) ছিলেন বাঙালি শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, ও সাহিত্যিক। তিনি সবসময় সত্যানুসন্ধান ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ভাষা বিতর্কের সময় তিনি বাংলা রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১।

ড. কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে প্রদর্শক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯২৩ সালে একই বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান। তার শক্তিশালী যৌক্তিক লেখনীর মাধ্যমে ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা যুগিয়েছেন। ভাষা বিতর্কের সূচনাতেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবিতে জোরালো সমর্থন প্রদান করে বক্তব্য ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা ১৯৪৭-১৯৭০ দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩-২৬৮

২৩৫.আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪

২৩৬.বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫-১৬৬

২৩৭.১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলা রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি শিক্ষিত শ্রেণির সামনে তুলে ধরার প্রত্যয়ে 'তমদ্দুন মজলিস' গঠিত হয়। তবে তমদ্দুন মজলিসের একমাত্র অবদানে ভাষা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে এ কথা বলা যায় না কারণ এই সংগঠনের প্রকাশিত পুস্তকাদি এবং প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবুল কাশেম ও তার সহযোগীদের বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত বক্তব্যে বোঝা যায় যে, তাদের লক্ষ্য ছিল দেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করা। তাদের রাজনৈতিক চিন্তায় প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থার ঘোর বিরোধিতা ছিল। মতাদর্শগত বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা ভাষা আন্দোলনকে একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন এবং এ কারণে তারা আন্দোলনে আপসপন্থা গ্রহণে অমত করেনি। অন্যদিকে বাম বিরোধী ভূমিকা পালন করায় আন্দোলনের সংহতি নষ্ট হয়। যার ফলাফলে আটচল্লিশের আন্দোলন লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল এবং একই সঙ্গে সচেতন ছাত্র যুবসমাজের কাছে তমদ্দুন মজলিশের জনপ্রিয়তা ও তার দলগত শক্তি ক্রমশ হ্রাস পায়। এভাবেই ভাষা আন্দোলনের ধারা এবং গতি ভিন্নরূপে পরিচালিত হতে থাকে। আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯-৬০

২৩৮.**নুরুল হক ভূঁইয়া (১৯২৩-১৯৯৮)** নারায়ণগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে নিয়মিত শিক্ষক হিসেবে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের (বর্তমান ঢাকা কলেজ) ছাত্রাবাস নুপুর ভিলায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে এক ঘরোয়া সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় যেখানে তিনি উপস্থিত থেকে মতামত প্রদান করেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের নিকট প্রেরিত স্মারক লিপিতে অন্যতম স্বাক্ষরকারী এবং প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এ সময় তিনি ভাষা সংক্রান্ত মিছিল-মিটিং, সভা-সমাবেশ, ধর্মঘটসহ সকল কর্মসূচিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রথম আহবায়ক ছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন তথা চূড়ান্ত পর্বে নুরুল হক ভূঁইয়া তমদ্দুন মজলিসের সদস্য হয়ে *সৈনিক পত্রিকা* প্রচার ও প্রসারে এবং তমদ্দুন মজলিসের বহুমুখী বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। ভাষা আন্দোলনকর্মী ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের বাইরে তিনি একজন স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ছিলেন। এম আর মাহবুব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩-২০৫

২৩৯.আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

২৪০.বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫, ঢাকা, পৃ. ১৭৯-১৮৬

২৪১.বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, *প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০-৩১

২৪২.*দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

২৪৩.**ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১)** ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দলের প্রার্থী হয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালের ২৫ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের সকল কার্যক্রমে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষা অন্তর্ভূক্ত করার দাবি উপস্থাপন করেন। মিনার মনসুর, *ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত জীবনী গ্রন্থমালা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৬-৩৫।

২৪৪.**শামসুল আলম (১৯২৬-১৯৯৪)** টাঙ্গাইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাবস্থায়ই রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক মনোনীত হন। তিনি তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হলে শামসুল আলম আহবায়ক মনোনীত হন। এই পরিষদের নেতৃত্বেই ১১ মার্চের ভাষা দিবস পালনের লক্ষ্যে হরতাল ও ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং এ পরিষদের নেতৃত্বে ১৫ মার্চ প্রাদেশিক মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তি হয়। শামসুল আলম পরিষদের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারী ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে জোরালো মতামত প্রদান করেন এবং মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ তার নেতৃত্বে ২১ সদস্য রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন। খান মাহাবুব, *টাঙ্গাইল জেলা পরিচিতি*, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৫২-৫৩

২৪৫.১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ খাজা নাজিমুদ্দিন ও রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সদস্যদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির শর্তগুলি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ হতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হবে।

২. পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী উজীরে আলা স্বয়ং তদন্ত করে এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে বিবৃতি দেবেন।

৩. ১৯৪৮ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে বেসরকারি আলোচনার জন্য নির্ধারিত তারিখে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার এবং এটাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় চাকুরি পরীক্ষা দিতে Central Services Examination উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।

৪. পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে এপ্রিল মাসে একটি প্রস্তাব তোলা হবে যে, প্রদেশের অফিস আদালতের ভাষা ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা হবে।

৫. আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।

৬. সংবাদপত্রের উপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে।

৭. ২৯ ফেব্রুয়ারি হতে পূর্ববঙ্গের যে সকল অংশে ভাষা আন্দোলনের কারণে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে, তা প্রত্যাহার করা হবে।

৮. সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর তিনি (খাজা নাজিমুদ্দিন) এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছে যে, এ আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়।

২৪৬.বাংলা একাডেমি (সম্পা.), *একুশের সংকলন ৮০*, স্মৃতিচারণ বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ১১৩

২৪৭.আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

২৪ মার্চ ১৯৪৮ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে ভাষা সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক আবুল কাশেম, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শামসুল আলম (সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সমাজসেবা সম্পাদক), অলি আহাদ, মোঃ তোয়াহা, নাইমউদ্দিন আহমদ, নুরুল হক ভুঁইয়া, কামরুদ্দীন আহমদ, আজিজ আহমদ, তাজউদ্দিন আহমদ, নূরুল হুদা, লিলি খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। জিন্নাহর একগুয়ে মনোভাবের কারণে আলোচনায় ঐকমত্য হয়নি। প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, *প্রবন্ধ মঞ্জুষা*, স্ববিকাশ পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৯৭

২৪৮.মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

২৪৯.আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

২৫০.অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

২৫১.বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭-৩১০

২৫২.আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০। অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

আবদুল মতিন (১৯২৬-২০১৪) ১৯৫০ সালে গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক মনোনীত হয়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন। ভাষা আন্দোলনে অসামান্য অবদানের জন্য 'ভাষা মতিন' হিসেবে সর্বজন পরিচিত ছিলেন। আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

২৫৩.*Pakistan Observer,* Dhaka, 28 January 1952

২৫৪.আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০

২৫৫.সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯-৪৫

কলকাতা মুসলিম লীগের সোহ্‌রাওয়ার্দী-আবুল হাশিম গ্রুপের সমর্থক তরুণ ছাত্ররা নতুন সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়াসে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের মিলনায়তনে একটি কর্মীসভা আহবান করেন। উপস্থিত সকলের ঐক্যমতে এদিন 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠন করা হয়। রাজশাহীর নাইমউদ্দিন আহমদকে আহবায়ক করে ১৪ সদস্যের একটি অস্থায়ী সাংগঠনিক কমিটি তৈরি হয়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে 'মুসলিম' শব্দ থাকায় হিন্দু সদস্যরা এ দলে যোগদান করতে পারতো না। তাই ১৯৫৩ সালে ছাত্রলীগকে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়া হয়। আস্তে আস্তে এ সংগঠন পূর্ব পাকিস্তানে একক বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। পাকিস্তান শাসনামলে সংঘটিত সকল আন্দোলন তথা ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ নির্বাচন, আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ১৯৬৬ এর ছয়দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ এর গণআন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৫। মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-২৮

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ-যুবক রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ তাদের বিভাগোত্তর রাজনীতিতে ভূমিকা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ৬-৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান খান সাহেব আবুল হাসনাতের বেচারাম

দেউড়ি ঢাকার বাস ভবনের হল কামরায় একটি যুব কর্মী সম্মেলন আহবান করেন। এ সম্মেলনেই 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ' গঠন করা হয়। তসাদ্দুক আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রাক্তন মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সেক্রেটারি অলি আহাদ, আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারি শামসুল হক, তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আব্দুল গফুর, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের সম্পাদক সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ পূর্ব পাক মোহাজের অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আবুল ফজল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহবায়ক আবদুল মতিন, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সৈফুদ্দিন প্রমুখ বক্তৃতা প্রদান করেন। সাপ্তাহিক নওবেলাল, ঢাকা, ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩। অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-২৮

অলি আহাদের বর্ণনা মতে, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২৮ জন নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে গঠিত হয়। সদস্যবৃন্দ নিম্নরূপ,

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী	: সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ
জনাব আবুল হাশিম	: খেলাফতে রব্বানী পার্টি
জনাব শামসুল হক	: সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ
জনাব আবদুল গফুর	: সম্পাদক, *সাপ্তাহিক সৈনিক*
অধ্যাপক আবুল কাসেম	: তমদ্দুন মজলিশ
জনাব আতাউর রহমান খান	: আওয়ামী মুসলিম লীগ
জনাব কামরুদ্দীন আহমদ	: সভাপতি, লেবার ফেডারেশন
জনাব খয়রাত হোসেন	: সদস্য, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ
আনোয়ারা খাতুন	: সদস্য, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ
জনাব আলমাস আলী	: নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী মুসলিম লীগ
জনাব আবদুল আওয়াল	: নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী মুসলিম লীগ
সৈয়দ আবদুর রহিম	: সভাপতি, রিকশা ইউনিয়ন
জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা	: সহ সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ
জনাব অলি আহাদ	: সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ
জনাব শামসুল হক চৌধুরী	: ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
জনাব খালেক নওয়াজ খান	: সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
জনাব কাজী গোলাম মাহবুব	: আহবায়ক, সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ
জনাব মীর্জা গোলাম হাফিজ	: সিভিল লিবার্টি কমিটি
জনাব মজিবুল হক	: সহ সভাপতি, সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ
জনাব হেদায়েত হোসেন চৌধুরী	: সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ
জনাব শামসুল আলম	: সহ সভাপতি, ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ
জনাব আনোয়ারুল হক খান	: সাধারণ সম্পাদক,ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ
জনাব গোলাম মওলা	: সহ সভাপতি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ
সৈয়দ নূরুল আলম	: পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
জনাব মোহাম্মদ নূরুল হুদা	: ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
জনাব শওকত আলী	: পূর্ববঙ্গ কর্মীশিবির, ১৫০ মোগলটুলী, ঢাকা
জনাব আবদুল মতিন	: আহবায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
জনাব আখতার উদ্দিন আহমদ	: নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ

২৫৬.বশির আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭-৩১৩। আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭-৩১৩

২৫৭.আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮-৮৯

২৫৮.বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ৩য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, (প্রথম সংস্করণ ১৯৭৫, চট্টগ্রাম), পৃ. ১৭৫-৭৬

২৫৯.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩-২৩৪। ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য ভোটাভুটিতে (১১/৩/১) উত্থাপিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অলি আহাদ, আবদুল মতিন, গোলাম মওলা, শামসুল হক, শামসুদ্দীন আহমদ, কাজী গোলাম মাহবুব, আনোয়ারা খাতুন, খয়রাত হোসেন, আবুল হাশিম প্রমুখ এগারো জন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। তবে মোহাম্মদ তোয়াহা ভোটদানে বিরত থাকেন। আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

২৬০.আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯৩

২৬১.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮-৯৩

২৬২.**আবু নছর মোহাম্মদ গাজিউল হক** (১৯২৯-২০০৯) ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে প্রতিবাদ মিছিলে তিনি নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাছাড়া ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং এ সভা থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নাসিম আনোয়ার ও সুজাতা হক (সম্পা.), *আমাদের গাজীউল হক*, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৪১-২৪৭

খালেক নওয়াজ খান (১৯২৬-১৯৭১) ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ছাত্র থাকাবস্থায় বেকার হোস্টেলে ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ছাত্রলীগের সভাপতি মনোনীত হন। ভাষা আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে এবং ১৯৫২ সালে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিরোধী ছিল। ১৯৫২ সালে তাকে ভাষা আন্দোলনে যোগদানের কারণে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ময়মনসিংহের নান্দাইল অঞ্চল থেকে মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনকে পরাজিত করে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালে ভাষা আন্দোলনে তার অনন্য অবদানের জন্য মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। *দি পাকিস্তান অবজারভার*, ঢাকা, ৮ মার্চ ১৯৫১। এম আর মাহবুব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯-১৫১

২৬৩.সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পা.), *আবুল হাশিম তার জীবন ও সময়*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৭৬-১৭৭। আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫-৯৭

২৬৪.বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৩-৪৩৭, আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-৩১

২৬৫.**বিচারপতি স্যার টমাস হোবার্ট এলিস** (১৮৯৪-১৯৮১) ১৯১৯ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি (১৯৫৩-১৯৫৪) ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার উপর পুলিশের গুলি বর্ষণের ঘটনা তদন্ত করার লক্ষ্যে গঠিত তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের ভারপ্রাপ্ত গভর্নর মনোনীত হন। আবু জাফর, *বাংলাপিডিয়া*

২৬৬.আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১-১১২

২৬৭.গণপরিষদ বিতর্ক ৯ মে ১৯৫৪, *CAP Debates Vol-XVI*, p.72, উদ্ধৃত, মো. মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০

২৬৮.মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০২

২৬৯.আবুল কাশেম ফজলুল হক, *মুক্তিসংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৯

২৭০.হায়দার আকবর খান রনো (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

২৭১.ফকরুল আলম, *বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা (২০২০-২০২২)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮-১৬২।

ভাষা আন্দোলনে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা সম্পর্কে ভিন্ন মতামত লক্ষ করা যায়। ১৯৫০ সালের মূলনীতি রিপোর্টে দেখা যায় প্রস্তাবিত সংবিধানের বিধি অনুযায়ী পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পূর্ব পাকিস্তান একটি সংখ্যালঘু এলাকার চেয়েও নিকৃষ্ট উপনিবেশে পরিণত হবে এবং চাকরি ও ব্যবসা বাণিজ্যে অবাঙালিদের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হবে। তাছাড়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও 'ইসলামিকরণের' নামে বাঙালি মুসলমানের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বাতিলের সুপারিশ করা হয়। মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলনের আগ পর্যন্ত বাংলা ভাষা আন্দোলন ছিল মূলত ছাত্র সমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহলের প্রগতিশীল অংশের আন্দোলন। এ পর্যায়ের আন্দোলন ঢিলেঢালাভাবে চলছিল এবং এ সময়কার দাবি ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষারূপে বাংলার স্বীকৃতি আদায় করা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও প্রথম দিকে সরাসরি বাংলার দাবি না করে বলেছিলেন যে, ইসলামী ভাষা এই দাবিতে যদি উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হয় তাহলে আরবিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হোক।

মূলনীতি রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতা থেকে ভাষা আন্দোলনও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের প্রতি ব্যাপক সমর্থন তৈরি হয়। মূলত ভাষাপ্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবোধ থেকে নয়, নিজেদের অধিকার ও অস্তিত্ব রক্ষা সম্পর্কে ভীতি থেকে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান তথা উদীয়মান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই সময় বাধ্য হয়ে ভাষাকে তাদের আত্মরক্ষার মাধ্যম ও অস্তিত্ব রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ধারণ করতে বাধ্য হন। পাকিস্তানি অবাঙালি শাসকদের একের পর এক পদক্ষেপে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এই আতঙ্ক হয় যে, তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে বাধ্য করা হবে এবং চাকরী ও ব্যবসা বাণিজ্যের সর্বক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে যেমনটি হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনামলে এমনটি ধরে নেয় এই বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ। এরূপ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি দৈনিক পত্রিকা *দি ডন*-এ প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় যে, কেন্দ্রের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ বাড়াতে এবং সহজে বিনিময়ের সুযোগের জন্য সরকারি উচ্চ পদগুলোতে উর্দু জানা ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে উপযুক্ত সংখ্যক জনবল পাওয়া না গেলে পাঞ্জাবি ও সিন্ধি কর্মকর্তাদের পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হবে। পূর্ব পাকিস্তানের ডাক, তার ও রেলওয়ে প্রশাসন পুনর্গঠনে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উত্তর প্রদেশ ও বিহারের লোকদের নিয়োগ করার পরিকল্পনার কথাও বলা হয়। তাছাড়া বলা হয় যে, সামরিক-বেসামরিক ও বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর নিয়োগে বাঙালিদের থেকে নিয়োগ দেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে। এই সার্কুলারটি পাকিস্তানের তৎকালীন রাজধানী করাচি থেকে পাঠানো হয়েছিল প্রাদেশিক চিফ সেক্রেটারি (পাঞ্জাবি) আজিজ আহমদের কাছে। *ডন* পত্রিকায় এ সার্কুলারটি ভুলে প্রকাশ করে ফেলায় পূর্ব পাকিস্তানে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অবশ্য *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় এ সম্পর্কে 'অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরুতেই বাঙালিরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই উপলব্ধি করতে পারে যে, কেবলমাত্র মুসলমান হওয়ার জন্য তারা

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমজাতিত্ব ও সমঅধিকারের অংশীদারী হবে না। এই উপলব্ধি থেকেই বাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তানি পরিচয় থেকে বাঙালি পরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রতি অধিক মনোযোগী হয়ে ওঠে এবং অস্তিত্ব রক্ষার প্রথম মাধ্যম হিসেবেই বাংলা ভাষার প্রতি আশ্রয় নেয়। ভাষাপ্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবোধ থেকে নয় বরং আত্মরক্ষা ও হুমকির সম্মুখীন অস্তিত্ব রক্ষার বাস্তব প্রয়োজনই ভাষা আন্দোলনে প্রবল হয়ে ওঠে।

এ সময় বাঙালি মুসলমানদের মনমানসিকতায় দ্রুত দিক পরিবর্তন হতে থাকে। অবিভক্ত বাংলায় যতদিন উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালিদের প্রতিযোগী ছিল ততদিন সঙ্গত অসঙ্গত উভয় কারণেই নিম্ন মধ্যবিত্ত অথবা উঠতি মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মনে হিন্দু বিদ্বেষ ছিল এবং শিক্ষিত অংশের মধ্যেও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও দেশী ভাষা কৃষ্টিকে হিন্দু ভাষা কৃষ্টি বলে অবজ্ঞা প্রদর্শনের একটা প্রবণতা ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর হিন্দু প্রভাবমুক্ত পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসেবে দেখা দেয় বহিরাগত ভিন্ন ভাষাভাষী সম্প্রদায়। বাঙালি মুসলমানের মধ্যে পাঞ্জাবিদের প্রভুত্ব, উর্দুভাষার দাসত্ব এবং উর্দুভাষী মহাজেরদের আধিপত্য সম্পর্কে আতঙ্ক দেখা দেয়। মুসলমানদের মধ্যে বিরাজিত এই বিদ্বেষ, বিরোধিতা ও অসন্তোষ যত বৃদ্ধি পায় ততই তারা অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াসে বাংলা ভাষাভিত্তিক আন্দোলনের দিকে মনোনিবেশ করে। এ সময় বাঙালি মুসলমানরা দেশী ও লোকায়ত উৎসব দিবসকে উৎসাহের সাথে পালন করতে শুরু করে। যদিও পূর্বে হিন্দু সংস্কৃতি বলে বিবেচনা করতো। এভাবে বাঙালি শিক্ষিত মুসলমান তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, শুধু মুসলমান পরিচয়ের মাধ্যমে তারা পশ্চিম পাকিস্তানি অবাঙালি মুসলমানদের সাথে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবেনা। তাই তারা বাঙালি পরিচয় দ্বারা আত্মরক্ষার এবং পাকিস্তানিদের ভাষা সংস্কৃতির চেয়ে উন্নত বাংলা ভাষা, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি এবং বাঙালিদের সংস্কৃতির অন্যান্য উপকরণের দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া বাঙালি মুসলমানদের আর কোন উপায় ছিল না। তারা অবাঙালি শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক আঘাত ও হামলার মুখে স্বদেশ ও স্বভাষার মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষার আশ্রয় খুঁজেছেন। এই যুক্তির বড় প্রমাণ ছিল স্বাধীনতার পর বাঙালি মুসলমানদের স্বদেশ ও স্বকৃষ্টির আনুগত্যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটে। সৈয়দ আমীরুল ইসলাম ও কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি: ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কট*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১২৪-১৩৫

আওয়ামী লীগের রাজনীতি গবেষক শ্যামলী ঘোষ মনে করেন ভাষা আন্দোলন ছিল মুসলিম লীগ বিরোধী একটি প্লাটফর্ম যার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ বিরুদ্ধবাদী, ডানপন্থি, বামপন্থি, কেন্দ্রবাদী, জাতীয়তাবাদী, আঞ্চলিকবাদী, মিশ্র মতাদর্শী ইত্যাদি পক্ষের সমাবেশে রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি হয়। শ্যামলী ঘোষ, *আওয়ামী লীগ, ১৯৪৯-১৯৭১*, (অনুবাদঃ হাবীব উল আলম) ইউপিএল, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৯-১০

২৭২.Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature, 1947-58*, University of Dhaka, 1980, p. 164-166

২৭৩.Talukder Maniruzzaman, *The Politics of Development The Case of Pakistan (1947-1958)*, Green Book House Ltd. Dhaka, 1971, p. 38. Talukder Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*, Bangladesh Books International Ltd., Dhaka, 1975, p. 4

২৭৪.অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১-১৩৩

২৭৫.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১

২৭৬.Kamruddin Ahmed, *A Socio Political History of Bengal and The Birth of Bangladesh*, Inside Library, Dhaka, 1975, p. 112-15

২৭৭.Shyamali Ghosh, *The Awami League 1949-1971*, Academic Publishers, Dhaka, 1990, p.3-4

২৭৮.মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৪

২৭৯.Kamruddin Ahmed, *ibid*, p. 112-116

২৮০.Mushtaq Ahmad, *Government and Politics in Pakistan*, Pakistan Publishing House, Karachi, 1963, p. 163

২৮১.*দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩

২৮২.Shyamali Ghosh, *ibid*, p. 3-4

২৮৩.আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬২-২৬৪

২৮৪.Rangalal Sen, *ibid*, p. 118

মিয়া মোহাম্মদ ইফতেখার উদ্দিন (১৯০৭-১৯৬২) ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪৭-১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি আজাদ পাকিস্তান পার্টির (১৯৫০-১৯৫৬) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯৫৭ সালে (রূপমহল সিনেমা হল-এ) অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ গঠনের সময় পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার 'খোদাই খেদমতগার পার্টি' বিলুপ্ত করে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'র সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তিনি প্রগ্রেসিভ পেপার লিমিটেড কোম্পানির পরিচালনায় ছিলেন যেখান থেকে *পাকিস্তান টাইমস*, *ইমরোজ* এবং *লাইলুন নাহার*সহ কয়েকটি প্রগতিশীল সংবাদপত্র প্রকাশ হত। শেখ মুজিবুর রহমান, *আমার দেখা নয়াচীন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ১৯১। তারিক আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

২৮৫.*দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ১৮-১৯ নভেম্বর ১৯৫৩

২৮৬.সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, *প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৮-৩৭১

২৮৭.আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৪-২৬৫

২৮৮.**আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী (১৮৯৩-১৯৭৬)** কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। তিনি কুমিল্লা জেলা খেলাফত কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে আইন অমান্য করার দায়ে দুই সপ্তাহের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পরবর্তীতে আরও কয়েকবার কারাবরণ করেন। ১৯৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে কংগ্রেসের আহ্বানে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ ও ত্রিপুরা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর ১৯৩৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ সালে সুভাষ চন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান ও এর সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে শিক্ষামন্ত্রী মনোনীত হন। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪-১০৬

২৮৯.Rangalal Sen, *ibid*, p. 120.

২৯০.Najma Chowdhury, *ibid*, p. 160

২৯১.Muhammad Ghulam Kabir, *Minority Politics in Bangladesh,* Vikash Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1980, p. 43

২৯২.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, *প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫-১৩৬

২৯৩.Najma Chowdhury, *ibid*, p. 85-88

২৯৪.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫-৩৬

২৯৫.আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১০, পৃ. ২৫২-৫৩

২৯৬.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭২-৭৩

২৯৭.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৯

২৯৮.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪-৬৫। যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিজয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে সরকার পতনে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে। বগুড়ার মোহাম্মদ আলী যুক্তফ্রন্ট সরকারকে 'ভারতের অর্থপুষ্ট' এবং নয়াদিল্লি, মস্কো ও পিকিং-এর দলিল বলে অভিহিত করেন। তাছাড়া তিনি ১৫ জুন বেতার ভাষণে ফজলুল হকের কলকাতায় প্রদত্ত বক্তৃতাকে 'দেশদ্রোহিতা' হিসেবে অভিহিত করেন। পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট সরকার নিয়ে মার্কিন কূটনীতিক, সাংবাদিক ও গুপ্তচরদের ব্যাপক উৎসাহ ছিল। মূলত তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করার পরই পাকিস্তান 'সিয়াটো' এবং 'বাগদাদ চুক্তি' সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করে। এ দুই চুক্তির একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ সমগ্র এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোতে কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা প্রতিহত করা। পাকিস্তানি সরকার তাদের কমিউনিজম বিস্তারের কৌশল হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন কল-কারখানায় বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গায় ইন্ধন দিয়েছিল। যে কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্তের সময় বলা হয়েছিল কমিউনিস্ট বিশৃঙ্খলা দমনে হক মন্ত্রিসভা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০৬

২৯৯.Rangalal Sen, *ibid*, p. 128-138

৩০০.**ইস্কান্দার মির্জা (১৮৯৯-১৯৬৯)** মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের সন্তান। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলার গভর্নর এবং ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানের গভর্নর (১৯৫৫-১৯৫৬) থাকার পর পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত হন। তিনিই প্রথম (১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর) পাকিস্তানে সামরিক শাসন আইন জারি করেন। পরবর্তীতে ২৭ অক্টোবর ১৯৫৮ আইয়ুব খান তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে বিদেশে নির্বাসন দেন এবং নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। https://bn.wikipedia.org/wiki/ইস্কান্দার_মির্জা

৩০১.Rangalal Sen, *ibid*, p. 128-138

যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং দ্রুত ভাঙ্গনে তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সরাসরি ক্রিয়াশীল ছিল। ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ঢাকার মুকুল সিনেমা হল-এ অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের শুরুতেই যুক্তফ্রন্ট গঠন নিয়ে কাউন্সিলরদের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্ক হয়। যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে রাজনৈতিক জোট হলেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে স্থায়ী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। যুক্তফ্রন্ট গঠন প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। এসময় তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে চাকরি করতেন। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে এ পদ ছেড়ে দিয়ে ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করেন। অবশ্য শেখ মুজিব এসময় তাকে আওয়ামী লীগে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। চাঁদপুরের এক জনসভায় ফজলুল হক আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদানও করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে আসন্ন নির্বাচনের কথা বিবেচনা করে তিনি ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই কৃষক-শ্রমিক পার্টি (কেএসপি) গঠন করেন। এসময় অনেকের ধারণা ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টি মিলে বিরোধী জোট করবে। তবে ফজলুল হককে বোঝানো হল যে, তিনি আওয়ামী লীগে গেলে তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে না। প্রথম দিকে মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিব যুক্তফ্রন্ট করার পক্ষে ছিলেন না। পরবর্তীতে আওয়ামী মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিব একমত

হয়েছিলেন যে, ফজলুল হক যদি তাদের দলে আসে তাহলে তাকে উপযুক্ত স্থান দেওয়া হবে। ১৯৫৩ সালের ১৪-১৫ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবের প্রস্তাব ছিল ইলেকশন এলায়েন্স করার কিন্তু শেখ মুজিবকে না জানিয়ে ফজলুল হক ও মওলানা ভাসানী ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর দস্তখত করে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রথম থেকেই এ জোটের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য তৈরি হয়নি। মতাদর্শগত বিরোধ ছাড়াও এসময় তিন দলের প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্টের সভাপতি সোহ্রাওয়ার্দীকে ফজলুল হক খুবই অপছন্দ করতেন। শেখ মুজিব সোহ্রাওয়ার্দীর খুব অনুগত ছিলেন এবং ফজলুল হকের প্রতি সমীহ কম থাকায় ফজলুল হকও তেমনিভাবেই শেখ মুজিবকে মনে করতেন। এরূপ সম্পর্কের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট অনেকটা জোড়াতালি দিয়েই করা হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন ছিল একচেটিয়াভাবে কিন্তু আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির মধ্যে বৈরি সম্পর্ক থাকায় যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গতে সহজ হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের প্রধান নেতা সোহ্রাওয়ার্দীর একনায়কসুলভ আচরণ দলীয় ঐক্য রক্ষা করতে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছিল। যুক্তফ্রন্টের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের অনৈক্যের কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করার সময় মন্ত্রিসভা গঠন ও মন্ত্রিত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্টের মধ্যকার এই অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করে পাকিস্তান সরকার। এসময় বিভিন্ন স্থানের (২৩ মার্চ ১৯৫৪ চন্দ্রঘোনা কর্ণফুলী পেপার মিল, ১৫ মে ১৯৫৪ আদমজি পাটকল) কারখানায় বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা শুরু হয় এবং এর প্রেক্ষিতে বলা হয় পূর্ববাংলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ফজলুল হক চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কলকাতায় যান। ১৯৫৪ সালের ৪ মে কলকাতার এক সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতাদানকালে বলেন যে, রাজনৈতিক কারণে বাংলা ভাগ হয়েছে কিন্তু বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি আর বাঙালিত্বকে কোন শক্তিই কোনদিন ভাগ করতে পারবে না; দুই বাংলার বাঙালি চিরকাল বাঙালিই থাকবে।

এ সময় *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর সাংবাদিক কালাহান ফজলুল হকের একটা সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে দেখানো হয় ফজলুল হক 'বিচ্ছিন্নতাবাদে'র পক্ষে কথা বলেছেন। এ ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশের সাথে সাথে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক হৈ চৈ পড়ে যায়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ফজলুল হক ও তার মন্ত্রিসভার শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান, আজিজুল হক, নান্না মিয়া, মোহন মিয়া ও আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য মে মাসে পাকিস্তানের করাচি যান এবং ২৯ মে ঢাকায় ফিরে আসেন। ৩০ মে ১৯৫৪ কেন্দ্রীয় সরকার গণপরিষদে গৃহীত অস্থায়ী সংবিধানের ৯২ (ক) ধারা প্রয়োগ করে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারি করে। ফজলুল হককে পাকিস্তান রাষ্ট্রে 'আত্মস্বীকৃত বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে আখ্যায়িত করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা এবং 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা' রক্ষায় এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়। হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯-৩০। মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪-৬৯। সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১। আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩-৩৪

৩০২.অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭

৩০৩.সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১-৬২

৩০৪.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩-৩৫। মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪-৬৯

৩০৫.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১-২

৩০৬.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৩-২৬

মালিক ফিরোজ খান (১৮৯৩-১৯৭০) পাকিস্তানের পাঞ্জাবে জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালের ৫ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ১৯৫৭ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালের ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় সামরিক শাসন জারি করে তাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত করেন। আবু জাফর, *বাংলাপিডিয়া*।

৩০৭.*পাকিস্তান অবজারভার*, ঢাকা, ১১ আগস্ট ১৯৫৯।

৩০৮.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬।

আইয়ুব খান নিজের ক্ষমতাকে পোক্ত করার জন্য নিপীড়নমূলক আইন প্রণয়ন করেন। ১৯৫৯ সালের ৭ আগস্ট নির্বাচিত সংস্থাসমূহ (অযোগ্যতা) আদেশ EBDO (Election Bodies Disqualification Order, 1959) এবং PODO (Public Officer Disqualification Order জারি করেন। এ আদেশ বলে আইয়ুব খানের সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন নির্বাচিত সংস্থার সদস্য ছিলেন এমন ব্যক্তিদেরকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে 'অসদাচরণের' দায়ে অভিযুক্ত করা হত। উপরিউল্লিখিত আদেশের বলে 'অসদাচরণ' বলতে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কার্যকলাপ, ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য অসৎ উপায়, অবলম্বন ও দুর্নীতি করাকে বোঝাত। নির্বাচিত সংস্থার সদস্যের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উপস্থাপন করা হলে অনুসন্ধান ও শুনানি গ্রহণের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুটি এবং কেন্দ্রে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ট্রাইব্যুনালে কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হলে তিনি ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে নিজ দেশের যে কোন নির্বাচিত সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য অযোগ্য প্রমাণিত হতেন। তাছাড়া অভিযুক্তদের বিভিন্ন অংকের অর্থদণ্ডও প্রদান করা হত। এভাবে আইয়ুব খান ৮৭ জন বিশিষ্ট্য রাজনৈতিক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১২

৩০৯.Khalid Bin Sayeed, *The Political System of Pakistan*, Oxford University, Dhaka Press, 1967, P. 93-100

৩১০.সামরিক শাসক আইয়ুব খানের উল্লেখযোগ্য সংস্কার হল ভূমি সংস্কার। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর সাত সদস্যবিশিষ্ট ভূমি সংস্কার কমিশন গঠন করেন যার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আখতার হোসেন। এই কমিশনের সকল সদস্য সিভিল সার্ভিসের সদস্য ছিলেন। এসময় দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় কোন রাজনীতিবিদ কমিশনের কাজে বাঁধা দিতে পারেনি। অবশ্য কিছু বেসামরিক কর্মকর্তা ভূমি কমিশনের কাছে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকসহ বেশিরভাগ মানুষ ভূমি সংস্কারের পক্ষে মতামত প্রদান করেন। ভূমি সংস্কার কমিশন প্রথমে যে সুপারিশ (সর্বোচ্চ ভূমি সিলিং সেচকৃত জমির জন্য সর্বোচ্চ ৫০০ একর এবং অসেচকৃত জমির জন্য সর্বোচ্চ ১০০০ একর ধার্য করা হয়) পেশ করে তা পরবর্তীতে সংশোধন করা হয়। কমিশনের অধিকাংশ সদস্যই যুক্তি দেন যে, জমির সিলিং কম করা হলে ভূস্বামীরা কৃষি উৎপাদনে নিরুৎসাহিত হবে। সর্বশেষ সামরিক সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী জমির সর্বোচ্চ সিলিং সেচকৃত জমির জন্য ৫০০ একর এবং অসেচকৃত জমির জন্য ১০০০ একর ধার্য করেন। যে সকল জমি জায়গিরদারীতে ছিল সে সকল জমি কোন রকম ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বাজেয়াপ্ত করা হয়। আইয়ুব খান তার ভূমি সংস্কারমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে বাইশ লক্ষ একর দখল করে দেড় লক্ষ পরিবারের মধ্যে বণ্টন করেন। ভূমি সংস্কার কমিশনের কাজ সম্পাদনের পরও ছয় হাজার ভূস্বামী পরিবারের নিয়ন্ত্রণে চৌষট্টি লক্ষ একর জমি থেকে যায়। Khalid Bin Sayeed, *ibid*, P. 94-102.

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে অধ্যাদেশ আকারে জারি করা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আইন হল ১৯৬১ সালের 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ'। বর্তমান বাংলাদেশে এ আইনের অধিকাংশ ধারা কার্যকর। এ আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ নিম্নরূপ:

কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা হবে তার মৃত্যুর পূর্বে তার কোন ছেলে বা মেয়ে মারা গেলে এবং উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির ভাগের সময় তার উক্ত ছেলে বা মেয়ে সন্তানাদি জীবিত থাকলে তারা প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সম্পত্তির ঐরূপ ভাগ পাবে, যা তাদের পিতা বা মাতা জীবিত থাকলে যেরূপ পেত।

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী যেকোনো প্রকার বিবাহ সম্পন্ন হলে তার প্রত্যেকটি এ অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করতে হবে।

সালিশ পরিষদের অগ্রিম অনুমতি গ্রহণ ছাড়া কোন ব্যক্তি একটি বিয়ে বলবৎ থাকাবস্থায় আর কোন বিবাহ করতে পারবে না। কোন ব্যক্তি সালিশ পরিষদের অনুমতি ব্যাতীত আরেকটি বিয়ে করলে তাকে অবিলম্বে বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণের দেনমোহরের যাবতীয় অর্থ পরিশোধ করতে হবে। যদি তিনি এ অর্থ পরিশোধ না করেন তাহলে বকেয়া রাজস্বের ন্যায় অর্থ আদায়যোগ্য হবে।

উপরিউক্ত বিধান ছাড়াও ১৯৬১ সালের 'মুসলিম পারিবারিক আইনে' তালাক, তালাক ছাড়া অন্যভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ, স্ত্রীর ভরণপোষণ, দেনমোহর ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ডি.এফ. মুল্লা, *মুসলিম আইনের মূলনীতি* (শেখ মতলুব আহমদ অনুদিত) আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৪৯৫-৫০২

৩১১.হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি, সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০)*, নিউএজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২২৫

৩১২.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-২৫

৩১৩.মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২১

৩১৪.সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭

আবু হোসেন সরকার (১৮৯৪-১৯৬৯) ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনোনীত হন। এরপর তিনি পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। অঞ্জলি বসু (সম্পা.), *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ৪৩-৪৪

ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) (১৯০৫-১৯৭১) পাকিস্তান আন্দোলন এবং মুসলিম লীগের রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক (১৯৪৭-১৯৫২) ছিলেন। এরপর তিনি যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে 'কৃষক শ্রমিক পার্টি'র প্রার্থী হিসেবে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় কৃষি, বন ও পাটমন্ত্রী মনোনীত হন। পরবর্তীতে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টিতে যোগদান করেন। ইউসুফ আলী চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৬ নভেম্বর, ২০১৭

৩১৫.*পাকিস্তান অবজারভার*, ঢাকা, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২

৩১৬.সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১-৯৭

৩১৭.সৈয়দা শায়লা তায়েফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮-৫৯

৩১৮.*দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯

৩১৯.মুনতাসির মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

৩২০.সাঈদুর রহমান, *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৫০

৩২১.**মণি সিংহ (১৯০১-১৯৯০)** ময়মনসিংহের জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে মার্কসবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। ১৯২৫ সালে ভারতের কমিউনিস্ট দলে যোগদান করেন। কলকাতা থেকে ফিরে তিনি তার অঞ্চলের কৃষকদের

সংগঠিত করে টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৫১ সালে তিনি পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক মনোনীত হন। পাকিস্তান সরকার কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ করলে ১৯৬৭ সালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট রাজনীতির দ্বিধাবিভক্তিতে মণি সিংহ সোভিয়েতপন্থি নীতি গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল রাজশাহী কারাগার থেকে সাধারণ কয়েদিদের সহায়তায় মুক্তি লাভ করে দেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু একই পদে দায়িত্বরত ছিলেন। সালেহ আতহার খান, *বাংলাপিডিয়া*। তপন কুমার দে, *বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের জীবনকথা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০৮

খোকা রায় (১৯০৭-১৯৯২) স্কুলজীবন থেকেই বিপ্লবী রাজনীতিতে যুক্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন সময়ে বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করায় জগন্নাথ হল থেকে বহিষ্কার হন। এরপর তিনি তার অঞ্চল ময়মনসিংহ এসে কার্যক্রম শুরু করলে গ্রেফতার হন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৩৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং একই বছর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ময়মনসিংহ জেলা শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ হওয়ায় তিনি ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সদস্য ও পরবর্তীতে সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। দেশভাগের পর আত্মগোপনে থেকে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে ভারতে গমন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে সংগঠক হিসেবে কাজ করেন। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধে তিনি আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক*, বর্তমান সময়, ঢাকা, ২০১০

৩২২.মুনতাসির মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

৩২৩.মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত* পৃ. ২৩৫-২৪১

৩২৪.**সৈয়দ আজিজুল হক** (১৯০৬-১৯৬৯) বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন পেয়ে বাখেরগঞ্জ সদর পশ্চিম আসন থেকে নির্বাচিত হন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন দপ্তরের মন্ত্রিত্ব লাভ করেছিলেন। *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ৪ এপ্রিল ১৯৫৪। Rangalal Sen, *ibid*, p. 129

৩২৫.কাজী জাফর আহমেদ, "*বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন*," *বিচিত্রা ঈদসংখ্যা*, ষষ্ঠবর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, ঢাকা, পৃ. ৪১-৫১, আবুল কাশেম, "*বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন*," *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৩-২৪, ১৪০২-০৪, পৃ. ২৬-৩২

৩২৬.*দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬২। মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০

৩২৭.মুনতাসির মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

৩২৮.মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৪-২৫৬

১৯৬০ এর দশকে পৃথিবীর অনেক দেশে ছাত্র আন্দোলন দেখা যায়। বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিবাদে বিভিন্ন দেশের তরুণ সমাজ প্রতিবাদ প্রবণ হয়ে ওঠে। ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে তরুণ সমাজ আন্দোলনমুখী হয়। ফ্রান্সে সামরিক শাসক দ্য গলের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তা পর্যায়ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। ষাটের দশকে পৃথিবী ব্যাপী অসংখ্য সাড়া জাগানো রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে। ভিয়েতনামে মার্কিনী আগ্রাসন এবং এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছাত্রদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় ছাত্র ও যুবকদের সমন্বয়ে গঠিত রেড গার্ডদের সংশোধনবাদ বিরোধী অভিযান, কিউবার বিরুদ্ধে সামরিক অবরোধ, চীন-রাশিয়া মতাদর্শগত লড়াই, আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম প্রভৃতি ঘটনা পৃথিবী ব্যাপী এক নতুন ধারার সূচনা করে। এভাবেই ১৯৬০ এর দশকে ছাত্র আন্দোলনের একটা বৈশ্বিক চরিত্র লক্ষ করা যায়। এ দশকে তরুণদের বিদ্রোহ পৃথিবী ব্যাপী যে পরিবর্তনের সূচনা করে পাকিস্তানের ছাত্র জনতা তার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলনা। পাকিস্তানের উভয় অংশে এর সরাসরি প্রভাব পড়ে এবং উভয় অংশের ছাত্র জনতার প্রায় অভিন্ন আন্দোলনের ফলে লৌহ মানব আইয়ুব খানের পতন ঘটে। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৩০ এর দশকে অধিকার প্রশ্নে ছাত্রদের অন্তর্ভুক্তিতা দেখা যায় এবং ছাত্ররাই প্রথম পাকিস্তান দাবি করে। চৌধুরী রহমত আলীসহ অন্যান্য ছাত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রদান করেন। তারিক আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১-৩

৩২৯.আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৩-৩১৬। মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭২-২৭৯

৩৩০.অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮

৩৩১.মোরশেদ শফিউল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪৫

৩৩২.অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮

৩৩৩.কামাল হোসেন, *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা* ১৯৬৬-১৯৭১, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৯

৩৩৪.লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের জাতীয় সম্মেলনে যোগদানের ব্যাপারে *দৈনিক ইত্তেফাক* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া শেখ মুজিবকে বলেন, 'মুজিবর মিয়া যদি যেতেই হয়, আপনিই যান। আর আপনার মনে এতকাল যে কথাগুলো আছে সেগুলো লিখে নিয়ে যান। ওরা শুনুক না শুনুক, এতে কাজ হবে।' মহিউদ্দি আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২-১৩৩

৩৩৫.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

৩৩৬.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭-১৩৯

৩৩৭.**জহুর হোসেন চৌধুরী (১৯২২-১৯৮০)** ১৯৪৫ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দ্য স্টেটম্যান*, *কমরেড ও স্টার অব ইন্ডিয়ায়* সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে এসে '*উপাত্ত*' ও '*পাকিস্তান অবজারভার*' পত্রিকায় কিছুদিন কাজ করার পর ১৯৫১ সালে *দৈনিক সংবাদে* সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন।

১৯৫৪ সালে এ পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার পর থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া পঞ্চাশের দশকে জহুর আহমদ 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'র প্রাদেশিক কমিটির সদস্য হিসেবে ন্যাপের রাজনীতি প্রসারে কাজ করেন। সিমিন হোসেন রিমি, *তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরি ১৯৪৯-১৯৫০*, প্রতিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৬৬

৩৩৮.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০-১৫১, Shyamoli Ghosh, *ibid*, p. 105-146

৩৩৯.*দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

৩৪০.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০-১৫১, Shyamoli Ghosh, *ibid*, p. 105-146. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৫-৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

৩৪১.Kamal Hossain, *Bangladesh: Quest for Freedom and Justice*, UPL, Dhaka, 2013, p. 19
পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক শাসন জারি করা হলে মুসলিম লীগের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' গঠন করলে মুসলিম লীগের আইয়ুব বিরোধী গ্রুপ 'কাউন্সিল মুসলিম লীগ' গঠন করেন। ১৯৬৬ সালে সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি হন এবং তার সভাপতিত্বে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে শেখ মুজিব ছয়দফা ঘোষণা করেন। Kamal Hossain, *ibid*, p. 18-20

৩৪২.*দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

৩৪৩.Rangalal Sen, *ibid*, p. 209-10. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ছয়দফা ঘোষণার দিন শেখ মুজিব ও তার দলের চারজন নেতা উপস্থিত ছিলেন। তাজউদ্দিন আহমদ ঐ সময় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আওয়ামী লীগের তৎকালীন কোষাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। তিনি ১৯৫১ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করেছিলেন। নুরুল ইসলাম চৌধুরী ছয়দফা আন্দোলনেও সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী দলীয় সদস্য অধ্যাপক ইউসুফ আলী (১৯২৩-১৯৯৮) ১৯৬০ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ছয়দফা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাফিজ হাবিবুর রহমান লাহোর সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

৩৪৪.Kamal Hossain, *ibid*, p.19. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

৩৪৫.*দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৪-৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

৩৪৬.আতাউর রহমান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০
ছয়দফা উপস্থাপন সম্পর্কে আতাউর রহমান খান বলেন, "অধিবেশন চলাকালে শেখ মুজিব হঠাৎ বোমা নিক্ষেপ করলেন–ছয়দফা। প্রস্তাব বা দাবির আকারে একটা রচনা নকল করে সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হল। কোন বক্তৃতা বা প্রস্তাব নেই, কোন উপলক্ষ নেই, শুধু কাগজ বিতরণ। পরে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। জাতীয় কনফারেন্সে এই দাবি নিক্ষেপ করার কী অর্থ হতে পারে? কনফারেন্স ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে সম্মিলিত হয়েছে। এই দাবি যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, এই সম্মেলন ও এই সময় তার উপযোগী নয়–সম্পূর্ণ অবান্তর।" ছয়দফার জন্ম সম্পর্কে তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক চিন্তাশীল লোক দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দূরবস্থার কথা আলাপ আলোচনা করেন। তাদের ঈঙ্গিত ও উৎসাহ পেয়ে একটা খসড়া দাবি প্রস্তুত করেছিলেন। প্রস্তুতকৃত দল কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না বা কোন রাজনৈতিকও নন। তারা সাতদফার একটা খসড়া আতাউর রহমান খানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে দিয়েছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল স্মারকলিপি হিসেবে আইয়ুব খানের হাতে দেওয়া অথবা জাতীয় পরিষদে প্রস্তাব আকারে পেশ করার ব্যবস্থা করা। এই খসড়ার কপি বিরোধী দলীয় প্রত্যেক নেতাকেই দেওয়া হয়েছিল, শেখ মুজিবকেও দেওয়া হয়। খসড়ার সাত নম্বর দফা আতাউর রহমান খানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সমর্থন করেনি। এসময় শেখ মুজিব সাত নম্বর দফা কেটে দিয়ে ছয় দফা তারই প্রণীত বলে প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা ছয় দফার দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য লিখে প্রচার করা হয়। দেশব্যাপী ইংরেজি ও বাংলায় মুদ্রিত করে পুস্তক আকারে প্রচার করা হয়। এভাবেই লাহোর সম্মেলন ব্যর্থ হয়ে যায়। তৎকালীন প্রবীণ নেতারা শেখ মুজিবকে এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী করে। এসকল নেতা অভিযোগ করেন যে, শেখ মুজিব সরকার পক্ষ থেকে প্ররোচিত হয়ে এই কাজ করেছেন। এ সম্পর্কে আতাউর রহমান খান আরও বলেন যে, "লাহোরে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আইয়ুব খার একান্ত বশংবদ এক কর্মচারী শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কী মন্ত্র তার কানে ঢেলে দেয়, যার ফলেই শেখ মুজিব সব ওলট-পালট করে দেয়।" আতাউর রহমান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০-২৬১

৩৪৭.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩

৩৪৮.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯-২৬৯

৩৪৯.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২

৩৫০.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০-৬৯

৩৫১.*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা নির্ধারিত ছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের সন্দেহ ছিল যে, এ সভাতে কার্যকর কমিটি তাকে ছয়দফার প্রশ্নে সমর্থন দেবে না, তবে আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের আঞ্চলিক কর্মী এবং সর্বসাধারণের সমর্থনের ব্যাপারে তার আস্থা ছিল। তৎকালীন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে শেখ মুজিব

কার্যকর কমিটিতে ছয়দফা উপস্থাপনের ঝুঁকি গ্রহণ করেননি। তাই লাহোরে যাত্রা শুরু করার আগেই কার্যকর কমিটির সভাটি স্থগিত করা হয়েছিল। তাছাড়া ছাত্রলীগের তরুণ নেতৃবৃন্দ লাহোরে ছয়দফা উপস্থাপনের আগেই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির এক বর্ধিত সভায় ছয়দফার সদৃশ দাবি সম্বলিত প্রস্তাব পাস করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা প্রশ্নে ওয়ার্কিং কমিটির মতামত গ্রহণ না করার পিছনে আরেকটি কারণ হল ছাত্র নেতৃত্বের মাধ্যমেই আওয়ামী লীগের কার্যকর কমিটির বাইরে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক অবস্থান তৈরি ছিল। তাই কার্যকর কমিটির অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনা না করেই লাহোরে যাওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন যদিও এ ব্যাপারে সাধারণ জনগণের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। মহিউদ্দিন আহমদ, *জাসদের উত্থান-পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৬। Rehman Sobhan, *Untranquil Recollection:The Years of Fulfilment*, Sage Publication, New Delhi, 2016, p. 131

৩৫২.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯-৬১ ও ১৮৭-৮৮

৩৫৩.*দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, মার্চ ২-২০ ১৯৬৬

৩৫৪.মোহাম্মদ সেলিম, *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় আন্দোলন, সশস্ত্র সংগ্রাম ও স্বাধীনতা*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ১৬২। আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯-৪৬

৩৫৫.হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গীয় মুসলিম লীগ, পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৮। আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩০-৩৩

৩৫৬.*দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ১ জানুয়ারি ১৯৬৮

৩৫৭.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০-৭১

৩৫৮.কর্নেল শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭৮

আবদুল মোনেম খান (১৮৯৯-১৯৭১) কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৫ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য মনোনীত হন এবং আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন। এ সময় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির উন্নয়ন হলেও বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশ বিরোধী পদক্ষেপের কারণে ব্যাপক সমালোচিত হন। মুহাম্মদ অবদুস সালাম, *বাংলাপিডিয়া*

৩৫৯.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯-১৫০

৩৬০.কর্নেল শওকত আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭-৮

শওকত আলী (১৯৩৭-২০২০) পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ১৯৫৯ সালে কমিশন প্রাপ্ত হন। তাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ২৬ নম্বর আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধে মাদরীপুর এলাকার কমান্ডার ও পরবর্তীতে ২ নং সেক্টরের অধীনে সাব-সেক্টরে কমান্ডার ও প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৭৭ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৭৯ সালে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে বিভিন্ন মেয়াদে আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কর্নেল শওকত আলী, *প্রাগুক্ত*, লেখক পরিচিতি অংশ

৩৬১.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭-১৬

৩৬২.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২-১৬৪

৩৬৩.সৈয়দা শায়লা তায়েফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪-০৫

৩৬৪.ফয়েজ আহমদ, *আগরতলা মামলা, শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৬

৩৬৫.সৈয়দা শায়লা তায়েফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪-০৫

৩৬৬.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৮-১০

৩৬৭.আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, *বাংলাদেশ সিভিল ও আর্মি ব্যুরোক্রেসির লড়াই*, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৫০

৩৬৮.মোস্তারী আহমেদ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" এর ভূমিকা*, প্রকাশিত এমফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬, পৃ. ৫৯

৩৬৯.ফয়েজ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

৩৭০.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৮-৪১০

৩৭১.আবুল কাশেম ফজলুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২-৭৩। *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৬৮

৩৭২.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৫-০৮

৩৭৩.*দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ৯ জানুয়ারি ১৯৬৯

৩৭৪.Rangalal Sen, *ibid*, p. 238

৩৭৫.**আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (১৯৪২-১৯৬৯)** ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের সমর্থক ছিলেন। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি হলে সকল রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন তুলে নেওয়া হলে পূর্ব পাকিস্তানে পুনরায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট শিবিরে বিভেদ দেখা দেয় যার প্রভাব এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতেও পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ২০তম কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলী, ১৯৬২

সালের ভারত-চীন যুদ্ধে পাকিস্তানের চীনকে সমর্থন দেওয়ার নীতি কমিউনিস্টদেরকে চীনাপন্থি ও সোভিয়েতপন্থি দুই ধারায় বিভক্ত করে। কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের মধ্যে সৃষ্ট মতাদর্শ বিরোধ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নকে প্রভাবিত করে। ১৯৬৫ সালের ১ থেকে ৩ এপ্রিল ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনে ছাত্র ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত হয়। সম্মেলন শেষে সোভিয়েতপন্থিদের গ্রুপ মতিয়া চৌধুরী ও সাইফুদ্দিন মানিক এবং চীনাপন্থিরা রাশেদ খান মেনন ও সফিকুর রহমানকে যথাক্রমে দুই গ্রুপের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেন। এইভাবে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) এবং ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) নামে অভিহিত হয়। জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২-৩৬

৩৭৬.Rangalal Sen, *ibid*, p. 238

৩৭৭.**শহীদ মুহম্মদ শামসুজ্জোহা (১৯৩৪-১৯৬৯)** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রভাষক পদে ১৯৬১ সালে যোগদান করেন। ১৯৬৮ সাল থেকে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি প্রক্টরের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি আসাদ শহীদ হওয়ার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি পুলিশের হামলায় অসংখ্য ছাত্র হতাহত হয়। ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একত্রিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। স্থানীয় প্রশাসন এ দিন বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন নাটোর-রাজশাহী মহাসড়কে ১৪৪ ধারা জারি করে কিন্তু বিক্ষোভরত ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নিলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সংবাদ শুনে শামসুজ্জোহা ঘটনাস্থলে গিয়ে ছাত্রদের ডরমিটোরিতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন এবং সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেন যাতে ছাত্রদের ওপর গুলি না করা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ অনুরোধ অগ্রাহ্য করে গুলি চালালে শামসুজ্জোহা গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর তার মৃত্যু হয়। মোঃ মাহবুব মোর্শেদ, *বাংলাপিডিয়া*

৩৭৮.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৫-৩৮।

তোফায়েল আহমদ ১৯৪৩ সালে ভোলার কোড়ালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাবস্থায় ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) সংসদের ক্রিড়া সম্পাদক হিসেবে এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ইকবাল হল সংসদের সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি ডাকসুর ভিপি ছিলেন। এসময় তিনি ১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন। ১৯৭০ সালের জুন মাসে বঙ্গবন্ধুর আহবানে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ভোলার দৌলতখাঁ-তমুদ্দিন-মনপুরা আসন থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তোফায়েল আহমদ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং মুজিব বাহিনীর অঞ্চলভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত চার প্রধানের একজন। ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় তোফায়েল আহমেদকে রাজনৈতিক সচিব নিয়োগ করেন। তাছাড়া স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে তিনি রাজনীতিতে ৫০ বছর পূর্ণ করেন। *দৈনিক যুগান্তর*, ঢাকা, ২২ অক্টোবর ২০১৯

৩৭৯.Rangalal Sen, *ibid*, p. 244

৩৮০.*দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ৯ জানুয়ারি ১৯৬৯

৩৮১.*দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৯ জানুয়ারি ১৯৬৯

৩৮২.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৩-৮৭

৩৮৩.হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০-১২৩

১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানে সংগ্রামী ছাত্র সমাজের আহবানে এগারো দফা ভিত্তিক দুর্বার আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। এ সময় আইয়ুব খান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সরকার বিরোধী আন্দোলন দমন করার জন্য গণগ্রেফতার শুরু করে। আইয়ুব খানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) প্রধান নেতা ওয়ালি খানকে গ্রেফতার করা হলে পূর্ব পাকিস্তানের মত পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাস থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ পরিস্থিতিতে আইয়ুব খান অনেকটা বিচলিত হয়ে পড়েন। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের ছয়দফা ও এগারো দফা আন্দোলনের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানি ছাত্রদের একযোগে সংঘটিত ছাত্র আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন তথা ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন। *The Times*, London, 9 April 1969 উদ্ধৃত Rangalal Sen, *ibid*, p. 244. হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১

৩৮৪.**আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান (১৯১৭-১৯৮০)** দেরাদুনে ভারতীয় মিলিটারি একাডেমি থেকে ১৯৩৯ সালে কমিশন লাভ করেন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান মোকাবেলায় আইয়ুব খান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হলে ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর প্রধান ইয়াহিয়ার নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। মুয়ায্‌যম হুসায়ন খান, *বাংলাপিডিয়া*

৩৮৫.*দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ২৯ নভেম্বর ১৯৬৯

৩৮৬.*দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ২৯-৩০ নভেম্বর ১৯৬৯

৩৮৭.*The Morning News*, Dhaka, 3 March 1970.

১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কতিপয় শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপসহ ‘আইনগত কাঠামো আদেশ’ বা এল এফ ও (Legal Framework Order) জারি করেন। এই আদেশের মূল বিধানসমূহ ছিল, সর্বজনীন ভোটাধিকারসহ এক ব্যক্তির এক ভোট নীতি, জনসংখ্যার অনুপাতে আসন বন্টন তথা জাতীয় পরিষদে ৩১৩ (পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১৬২+৭ টি সংরক্ষিত মহিলা আসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের চার প্রদেশে মোট ১৩৮+৬

টি সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্ধারণ করা হয়। আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার বিধান এবং কেন্দ্রের হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা রেখে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের বিধান করা হয়। তাছাড়া প্রেসিডেন্টের রক্ষাকবচ হিসেবে দুটি চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখা হয়। প্রথমত, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয় ১২০ দিন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন আয়োজন করতে পারবে। দ্বিতীয়ত, জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক প্রণয়নকৃত সংবিধানের চূড়ান্তকরণে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন আবশ্যক করা হয়। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০২-৫১০

৩৮৮.*দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৫-৭ এপ্রিল ১৯৭০, পৃ. ০৮

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি হলে সকল রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন তুলে নেওয়া হলে পূর্ব পাকিস্তানে পুনরায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট শিবিরে বিভেদ দেখা দেয় যার প্রভাব এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতেও পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ২০তম কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলী, ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধে পাকিস্তানের চীনকে সমর্থন দেওয়ার নীতি কমিউনিস্টদেরকে চীনাপন্থি ও সোভিয়েতপন্থি দুই ধারায় বিভক্ত করে। কমিউনিস্ট পার্টির মতো ন্যাপেও ভাঙনের ধারা লাগে। ন্যাপ নেতৃবর্গ সোভিয়েতপন্থি ও চীনাপন্থিতে বিভক্ত হয়। ১৯৬৭ সালে ন্যাপের রংপুর কাউন্সিল অধিবেশনে ভাসানীর নেতৃত্বে চীনাপন্থি ন্যাপ নেতা-কর্মীবৃন্দ উপস্থিত থাকলে মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বে সোভিয়েতপন্থিরা অনুপস্থিত থাকে এবং তারা ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় পৃথক অধিবেশন আয়োজন করে। এইভাবে দুই পৃথক সম্মেলনে ন্যাপ দ্বিধাবিভক্ত হয়। এরপর থেকে চীনাপন্থি ন্যাপ পরিচিতি লাভ করে ভাসানী ন্যাপ নামে এবং সোভিয়েতপন্থিরা মোজাফফর ন্যাপ নামে। জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

৩৮৯.জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

৩৯০.সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৩৪০-৩৪১। জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬-৮৯।

মওলানা ভাসানী হঠাৎ করে কেন ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন সে ব্যাপারে সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে প্রবীণ বামপন্থি নেতাদের মতামত বিশ্লেষণ করে কিছু কারণ চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, তৎকালীন রাজনীতির মূল অনুসঙ্গ ছয়দফা, এগারো দফা, আগরতলা মামলা, উনসত্তর ও সত্তরের গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন জনমত এককভাবে আওয়ামী লীগের পক্ষে ছিল। তাছাড়া ব্যাপক গণজোয়ারের মাঝে আওয়ামী লীগের সঙ্গে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেয়ে পরবর্তীকালে ন্যাপের গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার একটা আশঙ্কা ছিল। দ্বিতীয়ত, ন্যাপের অভ্যন্তরে নির্বাচন বিরোধী গ্রুপ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাই দলের অভ্যন্তরীণ ঐক্য রক্ষা করার প্রয়াসে ন্যাপ নির্বাচন বর্জন করে। ধীরে ধীরে ন্যাপে চীনপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি ও নকশালপন্থিদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাসানী ন্যাপের সম্পৃক্ততা কমে যায়। তাছাড়া চীনপন্থিরা স্বাধীন পূর্ববাংলা গঠনের পক্ষে ছিল। তাই তাদের দৃষ্টিতে এ নির্বাচন ছিল বুঁর্জোয়াবাদ প্রতিষ্ঠার একটা পথ মাত্র। ন্যাপের বেশিরভাগ নেতাকর্মীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্বাচনে যোগদান ভাসানীর জন্য ঝুকিপূর্ণ ছিল। তৃতীয়ত, কেউ কেউ মনে করেন ন্যাপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং নির্বাচনী ইস্তেহার মওলানা ভাসানীর একক সিদ্ধান্তে করার কারণে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনুমোদন সমস্যা দেখা দেয়। ন্যাপ নেতা মশিউর রহমানসহ অন্যান্য নেতা মওলানা ভাসসানীর একক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা না করলেও সিদ্ধান্ত ঘোষণার বিরোধিতা করে। তাছাড়া এটাকে তারা দলীয় গণতন্ত্রবিরোধী বলে দাবি করে। এই অবস্থায় ন্যাপের সাংগঠনিক ও গঠনতান্ত্রিক নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মওলানা ভাসানী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। চতুর্থত, ন্যাপের মস্কোপন্থি গ্রুপের ধারণা ছিল প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করার জন্য ভাসানী কিংবা অন্য শীর্ষনেতৃত্ব ক্ষমতাসীন পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতায় এসেছিলেন। কারণ ন্যাপের নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তে জনগণের একটা বড় অংশ নির্বাচন থেকে দূরে থাকবে। এক্ষেত্রে ২৮ নভেম্বর ১৯৭০ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি মীমাংসার ইঙ্গিত দেওয়ায় ভাসানী তাকে অভিনন্দন জানান। মূলত এই অভিনন্দন প্রেরণকে তাদের মতের পক্ষে যৌক্তিকতা হিসেবে প্রচার করে। মওলানা ভাসানী একজন ত্যাগী এবং জনপ্রিয় নেতা হওয়া স্বত্তেও রাজনৈতিকভাবে তার গন্তব্যস্থান সুনির্দিষ্ট ছিলনা। ক্ষমতা গ্রহণে তার অনীহার কারণ সম্পর্কে নেতাকর্মী ও জনগণের মধ্যে সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিলনা। তাছাড়া মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক বক্তব্যের নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকায় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকালে দলীয় নেতা কর্মীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়তেন। তেমনি একটা বিষয় ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ন্যাপের অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা। এ নির্বাচনে ন্যাপ ভাসানী অংশগ্রহণ না করার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত এ দলের রাজনৈতিক মৃত্যুর সূচনা করে। শেখ রাজ্জাক আলী (সাবেক স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ১৯৯১-১৯৯৭), আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ *ডায়েরীর পাতা থেকে*, খুলনা, ২০১৭, পৃ. ১৩০। জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫-৮৭

৩৯১.*দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ১৯ জুলাই ১৯৬৯।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানের চব্বিশটি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানে যে দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সেগুলো হচ্ছে : আওয়ামী লীগ (১৯৪৯), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী-১৯৬৭), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম-১৯৭০), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন-১৯৬২), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল-১৯৬২), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, মাজরেকি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, জামায়াতে উলামায়ে ইসলাম, শর্ষিনার পীরের ইসলামিক গণতন্ত্রী দল, পাকিস্তান দরদী সংঘ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, বেলুচিস্তান যুক্তফ্রন্ট, পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ, জাতীয় গণমুক্তি দল (সংখ্যালঘু), জাতীয় কংগ্রেস (সংখ্যালঘু), স্বতন্ত্র পার্টি। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭০

৩৯২.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮১-৮৩
৩৯৩.*দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ১৯ জুলাই ১৯৬৯
৩৯৪.*দি ডন*, করাচি, ২০ নভেম্বর ১৯৭০। জগলুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪
৩৯৫.*দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৬ নভেম্বর ১৯৭০
৩৯৬.*দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ১৯৭০।

আবদুস সাত্তার (১৯০৬-১৯৮৫) পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে ঢাকায় আসেন এবং ওকালতি শুরু করেন। তিনি ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ঢাকায় হাইকোর্টের বিচারপতি এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি (১৯৬৮-১৯৬৯) ছিলেন। তাছাড়া আবদুস সাত্তার পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (১৯৬৯-১৯৭২) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মোফাখ্খর হোসাইন খান, *বাংলাপিডিয়া*

৩৯৭.হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯২-৯৩
৩৯৮.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯২
৩৯৯.Golam Morshed, "Pakistan 1970 Elections and the Liberation of Bangladesh: A Political Analysis." *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol XI*, Rajshahi, 1988, p. 119-12.
৪০০.হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৪
৪০১.Golam Morshed, *ibid*, p. 120.
৪০২.হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১-১৩৫
৪০৩.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২-১৮৩
৪০৪.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৬
৪০৫.আব্দুল ওয়াহেদ তরফদার, *৭০ থেকে ৯০: বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট*, পাণ্ডুলিপি, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৩
৪০৬.**জুলফিকার আলী ভুট্টো (১৯২৮-১৯৭৯)** পাকিস্তানের লারকানায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন এবং ১৯৬৩ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনোনীত হন। ১৯৬৭ সালে তিনি এ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি' নামে দল গঠন করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানে তার দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সার্বিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও বিজয়ী প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে তিনি জোর আপত্তি জানান। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ের পর ইয়াহিয়া খানের স্থলে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। https://bn.wikipedia.org/wiki/জুলফিকার_আলী_ভুট্টো

টিক্কা খান (১৯১৫-২০০২) পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে ১৯৩৯ সালে কমিশন লাভ করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো তাকে জেনারেল পদে পদায়ন করেন এবং ১৯৭২ সালে তাকে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। টিক্কা খান ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সামরিক শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বাঙালিদের উপর সেনাবাহিনী দ্বারা নিষ্ঠুর সামরিক হামলা পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে তাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা গোলাম ওমর, হামিদ, গুল হাসান খান সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে। হেলাল উদ্দিন আহমেদ, *বাংলাপিডিয়া*

গুল হাসান খান (১৯২১-১৯৯৯) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় শীর্ষস্থানীয় সেনা কর্মকর্তা হিসেবে সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোর অধীনে সেনা কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

৪০৭.আব্দুল ওয়াহেদ তরফদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
৪০৮.*মর্নিং নিউজ*, ঢাকা, ২ মার্চ ১৯৭১
৪০৯.*দৈনিক পূর্বদেশ*, ঢাকা, ৩ মার্চ ১৯৭১
৪১০.**স্বাধীনতার ইস্তেহার ঃ** ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন। 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা ও কর্মসূচি' শীর্ষক ইশতেহারে তিনটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করা হবে বলা হয়। তিনটি লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ:

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতির সৃষ্টি ও বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিদ্যমান বৈষম্যের অবসানকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক ও শ্রমিক রাজ্য কায়েম করতে হবে।

স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬৮-৬৬৯

৪১১.*দৈনিক পূর্বদেশ*, ঢাকা, ৩ মার্চ ১৯৭১
৪১২.হাসান হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬৬-৭০
৪১৩.*সাপ্তাহিক স্বরাজ*, ঢাকা, ৬ মার্চ ১৯৭১

৪১৪.*দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ৬ মার্চ ১৯৭১
৪১৫.*দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ৮ মার্চ ১৯৭১
৪১৬.*বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ঢাকা, ২৫ মার্চ ২০১৩, পৃ. ০৪
৪১৭.*দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৫ মার্চ ১৯৭১
৪১৮.এ্যান্থনী মাসকারেনহাস, *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ* (অনু: রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী), পপুলার পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১২৪
৪১৯.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬।

শান্তি কমিটি ঃ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর কয়েকটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল পশ্চিম পাকিস্তানিদের সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসে। ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল নূরুল আমীনের নেতৃত্বে অধ্যাপক গোলাম আযম ও খাজা খয়ের উদ্দীন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর টিক্কাখানের সাথে সাক্ষাৎ করে রাজনৈতিক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন এবং নাগরিক কমিটি গঠন করার কথা বলেন। এ প্রস্তাবনা অনুযায়ী ৯ এপ্রিল ১৯৭১ সালে ১৪০ জন সদস্যের সমন্বয়ে ঢাকায় নাগরিক শান্তি কমিটি গঠিত হয়। ১৪ এপ্রিল ১৯৭১ এ কমিটির নাম পরিবর্তন করে 'শান্তি কমিটি' নামকরণ করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এর শাখা খোলা হয়। রাজাকার নির্বাচন, নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা ছিল শান্তি কমিটির অন্যতম কাজ। এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৪০৯।

রাজাকার বাহিনী ঃ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর জামায়াতে ইসলামীর নেতা গোলাম আযম ৪ এপ্রিল ১৯৭১ গভর্নর টিক্কা খানের সাথে দেখা করে বিদ্যমান রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং ৯ এপ্রিল পুনরায় টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করে ছাত্র-যুবক সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে একটি সহযোগী বাহিনী গঠনের পরামর্শ প্রদান করেন। গোলাম আযমের পরামর্শ অনুযায়ী পাকিস্তান সরকার রাজাকার বাহিনী গঠন অধ্যাদেশ জারি করেন। ১৯৭১ সালের মে মাসে মওলানা এ কে এম ইউসুফের নেতৃত্বে ৯৬ জন জামায়াত কর্মী নিয়ে খুলনায় আনসার ক্যাম্পে রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়। মওলানা ইউসুফ এ বাহিনীর নামকরণ করেন এবং জুন মাসে সরকারি অধ্যাদেশে রাজাকার নাম রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ১০টি জেলায় ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতারা রাজাকার বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৬

আল বদর, আল শামস ঃ ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শেষে আল বদর বাহিনী গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘই আল বদর বাহিনীতে পরিণত হয়। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সদস্য মেজর রিয়াদ হুসাইন এ বাহিনী গঠন প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। গবেষক রেজা নসরের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাহায্যে জমিয়ত-ই-তুলাবা (পাকিস্তান ছাত্রসংঘ) থেকে আল বদর ও আল শামস নামে দুটি আধা সামরিক ইউনিট গঠন করা হয়। আল বদর ও আল শামস বাহিনীর কমান্ডাররা ইসলামী ছাত্রসংঘের শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তান ছাত্রসংঘের নেতা মতিউর রহমান নিজামী আল বদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতা হিসেবে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ পূর্ব পাকিস্তান আল বদর বাহিনীর প্রধান মনোনীত হন। এ দুটি বাহিনীর প্রধান কাজ ছিল মানুষ খুন করা কিন্তু কাগজে কলমে আদর্শিক কর্মসূচি পালনও তাদের কার্যভুক্ত ছিল। মুনতাসীর মামুন, *আলবদর ১৯৭১*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৮-২৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চল

২.১ শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

২.২ আনোয়ারা খাতুন (১৯১৯-১৯৮৮)

২.৩ বদরুন্নেসা আহমদ (১৯২৪-১৯৭৪)

২.৪ নূরজাহান মুরশিদ (১৯২৪-২০০৩)

২.১ শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় নাম শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ ফরিদপুর জেলার (বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলা) গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতা সায়েরা খাতুন। তিনি স্থানীয় এম ই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করার পর গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৩৬ সালে বাবার বদলি জনিত কারণে মাদারীপুর হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯৩৬ সালে চোখে গ্লুকোমা রোগ হওয়ায় একবছর পড়ালেখা করতে পারেননি। কলকাতা থেকে চোখের চিকিৎসা শেষে মাদারীপুর ফিরে আসেন। এ সময় মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জের প্রতিটি ঘরে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব ছিল। আন্দোলনকারীরা পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করাতো। শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিদিন স্বদেশী সভায় যোগ দিতেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি এ সময় সুভাষ চন্দ্র বসুর ভক্ত হয়ে ওঠেন। এভাবেই শেখ মুজিবুর রহমানের শিশুমনে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব পড়ে এবং তিনি ইংরেজ বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। ১৯৩৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৩৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) এবং শ্রমমন্ত্রী সভা করার জন্য গোপালগঞ্জ আসেন। শেখ মুজিবুর রহমান এ সভার স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন। সভায় পরিচয় হওয়ার মাধ্যমে ১৯৩৯ সালে শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতায় গিয়ে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে দেখা করেন।[১]

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের প্রকৃত উত্থান শুরু হয়। তিনি সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গুরু হিসেবে মানতেন। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীও তাকে পছন্দ করতেন এবং স্নেহ করতেন। শেখ মুজিবুর রহমান সোহ্‌রাওয়ার্দীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শগত দিক থেকে সোহ্‌রাওয়ার্দী তাকে সবসময় মধ্যপন্থা অবলম্বনের পরামর্শ প্রদান করতেন। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মতাদর্শে রাজনৈতিক উত্থান এবং বিকাশ হয় শেখ মুজিবের। আবার সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর তিনি আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্বে এসে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করেন এবং নিজেকে জাতির জনক রূপে প্রতিষ্ঠা করেন।[২] তৎকালীন আঞ্চলিক রাজনীতির একজন ধারক হিসেবে সোহ্‌রাওয়ার্দীর পরামর্শ নিয়ে গোপালগঞ্জ মুসলিম লীগ গঠন করে এ সংগঠনের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গোপালগঞ্জ মুসলিম লীগ গঠনের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয়।[৩] শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪১ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর রাজনীতিতে জোরালোভাবে মনোযোগ দেন। মুসলমানদের কল্যাণে পাকিস্তান আনতেই হবে এ বিশ্বাসে সভা-সমাবেশ, বক্তৃতা করেন এবং এ উদ্দেশ্যে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং বেকার হোস্টেলে আবাসিক ছাত্র হিসেবে ছিলেন। কলকাতায় অবস্থান করেও ছাত্রলীগের প্রয়োজনে মাঝে মাঝেই

গোপালগঞ্জ, ফরিদপুরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্রলীগের কনফারেন্সে যোগদান করতেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকলকে শরিক হওয়ার আহ্বান করতেন।

সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ১৯৪২ সালে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর থেকে ছাত্রলীগ কর্মীদের নিয়ে সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। ১৯৪৩ সালে তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য হন। ছাত্রলীগ গঠন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের এ পর্যায়ে তাকে একজন আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ সময় থেকে মুসলিম লীগের মধ্যে দুই দল তৈরি হয়। একটি প্রগতিশীল, অন্যটি প্রতিক্রিয়াশীল। শেখ মুজিব সবসময় শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃবৃন্দরা মুসলিম লীগকে জনগণের লীগে পরিণত করে জন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চাচ্ছিলেন। মুসলিম লীগ তখন পর্যন্ত জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়নি; জমিদার, জোতদার ও খান বাহাদুর নবাবের প্রতিষ্ঠান ছিল তাই জেলায় জেলায় খান বাহাদুরের দলেরাই লীগকে নিজেদের করায়ত্বে রেখেছিল।"[৪]

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে দেখা করেন এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর নির্দেশে বিভিন্ন জায়গায় লঙ্গরখানা খুলে দিন-রাত পরিশ্রম করেন। গোপালগঞ্জ, যশোর, খুলনা, বরিশাল অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের সাহায্য এবং মুসলিম লীগের প্রসারের মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে একটা সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অনেকে নির্ধারিত এ সম্মেলন বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে যোগাযোগ করে শেষ পর্যন্ত সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন করেন।[৫] গোপালগঞ্জের এই সম্মেলনে খাজা শাহাবুদ্দীন (১৮৯৮-১৯৭৭), তমিজউদ্দিন খান (১৮৮৯-১৯৬৩), আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৮৬), মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লাল মিয়া) (১৯৩২-১৯৭১) প্রমুখ নেতা উপস্থিত ছিলেন।[৬] সম্মেলনে পাকিস্তান-জিন্দাবাদ ধ্বনিতে গোপালগঞ্জ শহর মুখরিত হয়ে উঠে। পাকিস্তান আন্দোলনে বিশ্বাসী হলেও শেখ মুজিবুর রহমান হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে কাজ করেছেন।[৭] ১৯৪৬ সালের কলকাতা ও বিহারে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের দাঙ্গাপীড়িতদের রক্ষা, খাদ্য ও পুনর্বাসনে ভূমিকা পালন করেন।[৮] পাকিস্তান আন্দোলনের এ পর্বে আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) মুসলিম লীগ কর্মীদের মধ্যে নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করেন এবং নতুনভাবে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, পাকিস্তান দাবি হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয় বরং হিন্দু-মুসলিমদের শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের বন্দোবস্ত। এ সময় আবুল হাশিম শেখ মুজিবকে পাকিস্তান আন্দোলনে একজন কর্মী হিসেবে নির্বাচিত করেন।[৯] মূলত শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষা পেয়েছিলেন তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা এবং বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমের কাছ থেকে। একদিকে আবুল

হাশিমের গণমুখী প্রগতিবাদী রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে অন্যদিকে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর উদার গণতান্ত্রিক ভাবধারার সংমিশ্রণে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক চরিত্র গঠিত হয়।[১০] পরবর্তীতে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে আসেন সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে শেখ মুজিব অতি প্রয়োজনীয়, নির্ভরযোগ্য, সংগ্রামী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন।[১১] আবুল হাশিমও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর ভক্ত ছিলেন। তাই শেখ মুজিব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর অনুগামী হিসেবে আবুল হাশিমের সাথে একযোগে কাজ করার ব্যাপারে মনস্থির করেন।

১৯৪৭ সাল থেকে মুসলিম ছাত্রলীগ দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। একদল পরিচিত হয় সোহ্‌রাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপ হিসেবে, আরেক দল পরিচিত হয় খাজা নাজিমুদ্দিন-মওলানা আকরম খাঁ গ্রুপ হিসেবে। এ সময় আবুল হাশিম সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে পরামর্শ করে মুসলিম লীগের একটা ড্রাফট ম্যানিফেস্টো বের করেন। শেখ মুজিবুর রহমানসহ প্রগতিবাদী ছাত্ররা মিলে পাকিস্তান আদায়ের পন্থা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কি হবে এ বিষয় নিয়ে আবুল হাশিমের সাথে আলোচনা করতেন। এ সময়কার রাজনীতির মূল দাবি ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম লীগকে কোনভাবেই 'কোটারি' সংগঠনে প্রতিষ্ঠা করতে না দেওয়া।[১২] কারণ পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের হাতে। তাদের কাউন্সিলের মোট ৪৬৫ জন সদস্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত করা হয় মাত্র ১৮০ জন। উপরন্তু জিন্নাহর সময় মুসলিম লীগে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা স্থগিত রাখা হয়। মুসলিম লীগ দলীয় নেতৃবৃন্দ স্বেচ্ছাচারিতা দেখাতে থাকলে দলের প্রগতিশীল নেতা-কর্মীদের মধ্যে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়।[১৩] তাই মুসলিম লীগকে গণমুখী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আবুল হাশিম ১৯৪৭ সালে ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে (ঢাকায়) প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একটা আঞ্চলিক শাখা অফিস খোলেন। শেখ মুজিবুর রহমান এ অফিসের একজন দায়িত্বশীল কর্মী হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হন।[১৪]

শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক প্রয়োজন তথা পাকিস্তান আন্দোলনসহ তাদের নিজেদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রচারের লক্ষ্যে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তৎকালীন বাংলায় প্রকাশিত একমাত্র পত্রিকা *দৈনিক আজাদ* (১৯৩৬) শুধুমাত্র মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করত। এ পত্রিকার মালিক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি ছিলেন। মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) আবুল হাশিমকে পছন্দ করতেন না। এ কারণে শেখ মুজিবুর রহমান নিজ উদ্যোগে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে আলোচনা করে একটি পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর আর্থিক সহযোগিতায় আবুল হাশিমের সম্পাদনায় *'মিল্লাত'* (১৯৪৪) প্রকাশিত হয়। এ সময় রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান নিজে হকারী করে পত্রিকাও বিক্রি করতেন।[১৫] ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তরুণ ছাত্রনেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। যে কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর মাত্র চার মাস পরে মুসলিম লীগ বা পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা তার জন্য বেশখানি ঝুকিপূর্ণ ছিল।[১৬] নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর

মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করার জন্য কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটে কাউন্সিল সভা ডাকা হয়। মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের নয় সদস্য নির্বাচনে দলীয় কোন্দল শুরু হয়। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে এম এল এ হিসেবে পার্লামেন্টারি বোর্ডে নির্বাচিত না করায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা প্রতিবাদ শুরু করে। এ সময় পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠনে সিদ্ধান্তের জন্য কলকাতা অ্যাসেম্বলি পার্টি রুমে সমঝোতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেকার হোস্টেলসহ অন্যান্য হোস্টেল থেকে প্রায় তিনশত ছাত্র নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সভায় উপস্থিত হন। তার ভাষায়,

> "দরজা বন্ধ করে সভা হচ্ছিল। আমি দরজায় যেয়ে বললাম, "আমাদের কথা আছে, শুনতে হবে।" ... আমিই প্রথম বক্তা প্রায় আধ ঘন্টা বক্তৃতা করলাম এবং শহীদ সাহেবকে বললাম আপোস করার কোনো অধিকার আপনার নাই। আমরা খাজাদের সাথে আপোস করব না। মুসলিম লীগে কোটারি করতে আমরা দিব না। আমরাই হক সাহেবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি, দরকার হয় আপনাদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করব। শহীদ সাহেবকে বাধ্য করে সভা থেকে উঠিয়ে নিয়ে চলে এসেছিলাম।"[১৭]

মুসলিম পার্লামেন্টারি বোর্ড নির্বাচনে কাউন্সিলর হিসেবে পাঁচ জনকে নির্বাচন করে সোহ্‌রাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপ।[১৮] ১৯৪৬ সালের আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষ্যে জেলায় জেলায় নির্বাচন অফিস খুলে স্বনামধন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দের উপর প্রচারণার দায়িত্ব অর্পন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। সমগ্র বাংলা অঞ্চল থেকে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী জয় লাভ করেন। শুধুমাত্র বাংলাদেশে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করে। নির্বাচনের পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৬ সালের ৭, ৮ ও ৯ এপ্রিল দিল্লিতে সমস্ত ভারতবর্ষের মুসলিম লীগ পন্থি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের কনভেনশন আহ্বান করেন। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সমর্থনে শেখ মুজিবুর রহমান দশ-পনের জন ছাত্রকর্মীসহ কনভেনশনে যোগদান করেন।[১৯]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) পর ব্রিটেনের নির্বাচনে লেবার পার্টির প্রতিনিধি ক্লেমেন্ট এটলি নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হয়েই তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালের ২৩ মার্চ তিন সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিমিশন প্রেরণ করেন। এ মিশনের বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিচলিত হয়ে পড়েন। মন্ত্রিমিশনের রিপোর্ট কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে ১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বোম্বে শহরে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিল সভা আহ্বান করেন। এ সভা থেকে জিন্নাহ শান্তিপূর্ণভাবে ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের ঘোষণা দেন। এ সময় আবুল হাশিম ও সোহ্‌রাওয়ার্দীর নির্দেশে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান দাবির যৌক্তিকতা প্রচার শুরু করেন। তারা মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে বলেন যে, পাকিস্তান দাবি হিন্দুর বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। কিন্তু এ সময় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্মুখীন হয়। দাঙ্গাকালীন সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান হোস্টেলে খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করেন এবং সম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় সেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করেন। দেড় মাস ধরে দাঙ্গা কবলিত

বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করার পর কলকাতায় ফিরে আসেন। এ সময় তিনি বি.এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পাস করেন।[২০]

১৯৪৬ সালের শেষ দিকে ভারতের রাজনীতিতে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে ঘোষণা করা হয় ভারত ভাগ হবে। এ সময় বাংলা প্রদেশ যাতে ভাগ না হয় এজন্যে সমর্থক নেতৃবৃন্দ আলোচনা সভা করতে শুরু করেন। অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ সময় হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে শরৎ বসু (১৮৮৯-১৯৫০) ও কিরণ শংকর রায় (১৮৯১-১৯৪৯) কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা শুরু করেন। এ সময় বাংলাদেশের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারা একটা ফর্মুলা ঠিক করেন। বেঙ্গল মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এ ফর্মুলা (স্বাধীন অখণ্ড বাংলা গঠন) সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে।[২১] পারিপার্শ্বিক ও সময়ের প্রয়োজনে পাকিস্তান আন্দোলনে সমর্থন করলেও শেখ মুজিব যুক্ত বাংলা আন্দোলনে তার দুই রাজনৈতিক গুরুর (হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম) পক্ষে কাজ করেন এবং কলকাতায় একাধিক সভা-সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করেন।[২২] হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও শরৎ বসুর চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের অসহযোগিতা, সময়ের স্বল্পতাসহ তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব ব্যর্থ হয়।[২৩] এ সময় ভারত পাকিস্তান সীমানা নির্ধারণে র‍্যাডক্লিফ কমিশন (১৯৪৭) গঠন করা হয়। পূর্ববাংলার সীমান্ত নির্ধারণের পর ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইনের শর্ত মোতাবেক সিলেট জেলায় গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। মূলত সিলেট জেলা কি আসামে বা বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হবে এ প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সোহ্‌রাওয়ার্দীর নির্দেশে সিলেটের গণভোটে শেখ মুজিবসহ হাজার হাজার নেতাকর্মী সিলেট গমন করেন। সিলেটের করিমগঞ্জে এক বিশাল জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। এ সময় হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। এ জনসভার সকল খরচ সোহ্‌রাওয়ার্দী বহন করেছিলেন। সিলেটের গণভোটে জয়লাভের পর শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্যরা কলকাতায় ফিরে আসেন।[২৪]

পাকিস্তান আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান একজন আঞ্চলিক ছাত্রনেতা হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ভারত বিভাগের পর থেকে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সংশ্লিষ্টতার বিচারে জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভিষেক হিসেবে ধরা হয়। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন। তার আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থে লিখেছেন,

> "শহীদ সাহেবের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তাকে রেখে চলে আসতে আমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছিল। শহীদ সাহেব বললেন, তোমরা একটা কাজ কর দেশে গিয়ে, সাম্প্রাদায়িক গোলমাল যাতে না হয়, তার চেষ্টা কর। পূর্ববাংলায় গোলমাল হলে আর উপায় থাকবে না। ...পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্যই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে দিও না। ...আমি ভাবতাম পাকিস্তান কায়েম হয়েছে, আর চিন্তা কি? এখন ঢাকায় যেয়ে 'ল'

ক্লাসে ভর্তি হয়ে কিছুদিন মন দিয়ে লেখাপড়া করা যাবে। চেষ্টা করব, সমস্ত লীগ কর্মীদের নিয়ে যাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা না হয়।"[২৫]

ভারত বিভাগের পর শেখ মুজিব আশা করেছিলেন সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সর্বজনীন পাকিস্তান যাত্রা শুরু করবে। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট রাষ্ট্র দুটি জন্মলগ্ন থেকে পুরানো ধারায় পরিচালিত হতে থাকে। পাকিস্তানের নাগরিকরা পূর্বের মতই উত্তরাধিকার সূত্রে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধ লাভ করে। তবে পূর্ব পাকিস্তানে এরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন ভিন্নধর্মী চিন্তা-চেতনার ধারক। এ সময় শেখ মুজিবসহ কিছু তরুণ অসাম্প্রদায়িক ধারার রাজনীতি প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[২৬] ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫) রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের কর্মীদের একটি সভার আয়োজন করেন। শামসুল হকের আহ্বানে শেখ মুজিবুর রহমান সভায় যোগদানের জন্য ১৫০ মোগলটুলী অফিসে আসলে শামসুল হক ও শওকত আলী (১৯১৮-১৯৭৫) খুব খুশি হন কারণ দলীয় কর্মকাণ্ডে তিনি সবসময়ই সক্রিয় থাকতেন। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান সভা অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচনে মোগলটুলী অফিসের কর্মীদের সাথে বৈঠক করেন। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় তরুণ কর্মীরা যাতে ছত্রভঙ্গ না হয়ে যায় এ জন্য একটা যুব প্রতিষ্ঠান গঠন প্রয়োজন। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান খান সাহেব আবুল হাসনাত সাহেবের বাড়িতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশন শেষে গঠিত সাবজেক্ট কমিটির সদস্য করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। সভায় প্রথমে ঠিক করা হয় যে, একটা যুব প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে যাতে যে কোনো দলের লোক যোগদান করতে পারে। তবে সক্রিয় রাজনীতি থেকে প্রতিষ্ঠানকে দুরে রাখার চেষ্টা করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ'। এ প্রতিষ্ঠান গঠনের সময় শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠানকে অসাম্প্রদায়িকীকরণের প্রস্তাব করেছিলেন। তার ভাষায়,

"আমি বললাম, এর একমাত্র কর্মসূচি হবে সাম্প্রদায়িক মিলনের চেষ্টা, যাতে কোনো দাঙ্গা হাঙ্গামা না হয়, হিন্দুরা দেশ ত্যাগ না করে - যাকে ইংরেজিতে বলে, 'কমিউনাল হারমনি' তার জন্য চেষ্টা করা।"[২৭]

গণতান্ত্রিক যুবলীগের কর্মসূচি নিয়ে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন নেতৃত্বের সাথে অন্যান্য কর্মীদের মতদ্বৈততার সৃষ্টি হয়। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের ম্যানিফেস্টো নিয়ে জোর আপত্তি জানান। তবে শামসুল হক দুই পক্ষের মধ্যস্থতা করায় সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। শেখ মুজিবুর রহমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষপাতি ছিলেন। এজন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে থেকে বিভিন্ন দাঙ্গা কবলিত স্থানে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালের নভেম্বরে আইন পড়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এ সময় গণতান্ত্রিক যুবলীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচন, ম্যানিফেস্টো রচনা এবং ময়মনসিংহে সভা অনুষ্ঠান নিয়ে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিবুর রহমান গণতান্ত্রিক যুবলীগের রাজনৈতিক বৈশিষ্টের কারণেই এ প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে আসেন। অন্যদিকে, নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের নাম বদলিয়ে

'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' করা হয়। তাছাড়া ১৯৪৪ সালের পর এ সংগঠনের কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক নতুন কর্মী ভর্তি হয়। ফলে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ফজলুল হক হলে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠন করেন। এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণনা-

> "আমি ছাত্রলীগ কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করলাম। আজিজ আহমেদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আব্দুল হামিদ চৌধুরী, দবিরুল ইসলাম, নইমউদ্দিন মোল্লা, জালালউদ্দিন, আব্দুর চৌধুরী, আব্দুল মতিন খান চৌধুরী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং অনেক ছাত্রনেতা একমত হলেন, আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান করা দরকার। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ফজলুল হক মুসলিম হলের অ্যাসেম্বলি হলে এক সভা ডাকা হল, সেখানে স্থির হলো একটা ছাত্র প্রতিষ্ঠান করা হবে। যার নাম হবে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'। নাইমউদ্দিনকে কনভেনর করা হলো।"[২৮]

শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ১৫০ মোগলটুলীতে নব্যপ্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অফিস প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও এটি মুসলিম লীগ ওয়ার্কার্স ক্যাম্প এর অফিস হিসেবে আগেই পরিচিতি লাভ করে। ছাত্রলীগ গঠন করার পর ব্যাপক সাড়া পড়ে যাওয়ায় শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় সকল জেলায় কমিটি গঠন করেন। যদিও নাইমউদ্দিন আহ্বায়ক ছিলেন কিন্তু তিনি একাই প্রায় সবকিছু দেখাশোনা করতেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ছাত্রলীগ সরকারি গোয়েন্দাগিরির সম্মুখীন হয়।[২৯]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর খুব দ্রুত রাজনৈতিক চিত্র পাল্টে যেতে থাকে। পাকিস্তান আন্দোলনের নিঃস্বার্থ কর্মীরা অবহেলিত হতে থাকে এবং স্বার্থবাদী কর্মীরা তাদের স্বার্থ আদায়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের গভর্নর হওয়ায় চৌধুরী খালিকুজ্জামান (১৮৯৪-১৯৬৪) পাকিস্তান মুসলিম লীগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পাকিস্তান মুসলিম লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দিয়ে একটা 'এডহক' কমিটি গঠন করেন। সোহ্রাওয়ার্দীর জনপ্রিয়তার কারণে একমাত্র বাংলাদেশে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মূলত নাজিমুদ্দিনের সমর্থকদের নিয়ে নতুন করে মুসলিম লীগ গঠন করার জন্য এ পরিকল্পিত কৌশল গ্রহণ করেন।[৩০] এ কৌশলের অংশ হিসেবে মওলানা আকরম খাঁকে চিফ অর্গানাইজার করা হয়। এ সময় শেখ মুজিব একশত বারোজন কাউন্সিল সদস্যের দস্তখত নিয়ে রিক্যুইজিশন সভা আহ্বান করার দাবি করেন। শেখ মুজিবুর রহমান রিক্যুইজিশন সভার দস্তখত নিয়ে নোটিশ তৈরি করার পর মওলানা আকরম খাঁর সাথে দেখা করেন। পরের দিন আকরম খাঁ *আজাদ* পত্রিকায় নোটিশটা এবং যারা দস্তখত করেছে তাদের নাম ছেপে দেন এবং বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়ে দেন রিক্যুইজিশন সভা আহ্বান করার ক্ষমতা কারও নাই। কারণ পুরানো প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে এবং মওলানা আকরম খাঁকে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের 'এডহক' কমিটির সভাপতি করা হয়েছে।[৩১] আকরম খাঁ কেন্দ্রের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া নাজিমুদ্দিনের সমর্থন থাকায় তাকে এ পদে আসিন করা হয়। পূর্ব

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হয় খাজা নাজিমুদ্দিনকে আর দলের সভাপতি হন আকরম খাঁ। পাকিস্তান আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে দুজনেরই তেমন অবদান ছিল না। মূলত জিন্নাহ ও লিয়াকত আলীর সহায়তায় তারা দুজন পূর্ব পাকিস্তানের নীতি নির্ধারকে পরিণত হন। বাস্তবে পরিস্থিতি এমন হয় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ত্যাগী ও প্রগতিশীল সকল পর্যায়ের আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগ দল ও সরকারের রোষাণলে পড়েন।[৩২] মুসলিম লীগের সদস্যপদ থেকে বাদ পড়ার ঘটনা বর্ণনায় শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন,

> "আমরা কেউই আর মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সভ্য নই। এভাবে মুসলিম লীগ থেকেও আমরা বিতাড়িত হলাম। অনেকেই চুপ হয়ে গেল, আমরা রাজি হলাম না। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখব।"[৩৩]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের দলীয় সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতি নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেন।[৩৪] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই জমিদারি প্রথা বাতিলের দাবি গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। এটি পূর্ববাংলার অধিকাংশ কৃষিজীবী মানুষের কাঙ্ক্ষিত দাবি ছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে অঙ্গীকার থাকলেও পাকিস্তান অর্জনের পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ বিষয়ে শ্রেণিস্বার্থে পদক্ষেপ নিতে আগ্রহ দেখায়নি। যে কারণে শেখ মুজিব জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলেন।[৩৫] মূলত এখান থেকেই তার রাজনৈতিক উত্থান শুরু হয়। এ সময় বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা মুসলিম লীগ সরকারের কূটকৌশলপূর্ণ দলীয় সিদ্ধান্ত অনেকাংশে দায়ী ছিল।[৩৬] এ সময় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শীর্ষ ভূমিকা পালনকারী নেতৃবৃন্দকে নানা কৌশলে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক, আবুল হাশিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে কোনঠাসা করে রাখা হয়। দুই বাংলায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৮ সালে লিয়াকত আলীর ইচ্ছায় তার গণপরিষদের সদস্যপদ বাতিল করা হয়। এর আগে সরকার তার ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্ট ও মটরগাড়ি বাজেয়াপ্ত করে। এভাবেই সোহ্‌রাওয়ার্দীকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানি প্রগতিশীল নেতৃত্বকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখার জন্য নানা কৌশল গ্রহণ করে।[৩৭] দেশ ভাগের পর থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সংবিধান সভার বৈঠকে কুমিল্লার কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১) পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুর ভাষা বাংলা এ কারণে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি করলে সঙ্গে সঙ্গে তা নাকচ হয়ে যায়।[৩৮] পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস এর প্রতিবাদ করে। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য ছাত্ররা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ সভা করেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস যুক্তভাবে সর্বদলীয় সভা আহ্বান করে একটা 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। সভায় ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলা ভাষা দাবি দিবস ঘোষণা করা হয়।[৩৯] বাংলা ভাষা দাবি দিবস পালনের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর, যশোর, দৌলতপুর, খুলনা ও বরিশালে

ছাত্রসভা করে প্রচারপত্র, লিফলেট বিতরণের ব্যবস্থা করেন। প্রচারিত লিফলেট, পুস্তিকায় তার নাম মুদ্রিত ছিল। এক্ষেত্রে তাকে একজন আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ১১ মার্চ ভোরবেলা শত শত ছাত্রকর্মী ইডেন বিল্ডিং, জেনারেল পোস্ট অফিস ও অন্যান্য জায়গায় পিকেটিং শুরু করে। সচিবালয় এবং জিপিও এর সামনে ধর্মঘটে শেখ মুজিবুর রহমান নিজে অংশগ্রহণ করেন এবং ছাত্র জনতাকে সংগঠিত করেন। এদিন সন্ধ্যায় প্রায় সত্তর পঁচাত্তরজনকে বেঁধে নিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সচিবালয়ের সামনের রাস্তা থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।[৪০] ফলে অন্যান্য ছাত্র নেতা ছাড়াও ছাত্রীরা মুসলিম লীগ পার্টির বিরুদ্ধে ভীষণভাবে প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদের মুখে খাজা নাজিমুদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনা করতে রাজি হন। আলোচনা শেষে সংগ্রাম পরিষদের সাথে নাজিমুদ্দিন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৫ মার্চ ১৯৪৮ সন্ধ্যায় শেখ মুজিবসহ অন্যান্যদের মুক্তি দেওয়া হয়। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রসভার আয়োজন করা হয়। আমতলায় অনুষ্ঠিত এ সভায় সকলের সম্মতিতে শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতিত্ব করেন।[৪১] বাংলা ভাষার দাবিতে সংগঠিত সকল আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান যুক্ত ছিলেন। ঢাকা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব জেলা যেমন ফরিদপুর, যশোর, রাজশাহী, খুলনা, দিনাজপুরে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় তিনি বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত সভা সমাবেশে যোগদান করেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন,

> "বাংলা পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ লোকের মাতৃভাষা। তাই বাংলাই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। তবুও আমরা বাংলা ও উর্দু দুইটা রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেছিলাম। পাঞ্জাবের লোকেরা পাঞ্জাবি ভাষা বলে, সিন্ধুর লোকেরা সিন্ধি ভাষায় কথা বলে, সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা পশতু ভাষায় কথা বলে, বেলুচরা বেলুচি ভাষায় কথা বলে। উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের ভাষা নয়, তবুও যদি পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইয়েরা উর্দু ভাষার জন্য দাবি করে, আমরা আপত্তি করবো কেন? যারা উর্দু ভাষা সমর্থন করে তাদের একমাত্র যুক্তি হল উর্দু ইসলামিক ভাষা। উর্দু কি করে ইসলামিক ভাষা হলো আমরা বুঝতে পারলাম না।"[৪২]

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে দল, মত নির্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধা করতেন। তাই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাকে দিয়েই এই অযৌক্তিক দাবির বাস্তবায়ন আশা করেছিল। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ জিন্নাহ ঢাকায় আসলে শেখ মুজিবুর রহমান তেজগাঁও বিমানবন্দরে তাকে অভিনন্দন দেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হবে' ঘোষণা করলে শেখ মুজিবসহ উপস্থিত ছাত্রনেতৃবৃন্দ হাত তুলে দাঁড়িয়ে 'মানিনা' বলে প্রতিবাদ করে। এরপর ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বক্তৃতা দান কালে জিন্নাহ যখন আবার বললেন, 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে', তখন ছাত্ররা তার সামনেই বসে চিৎকার করে "না, না, না" ধ্বনি উচ্চারণ করে তার বক্তব্যের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করেন। জিন্নাহ ঢাকা থেকে চলে যাওয়ার পর ফজলুল হক হলের সামনে এক ছাত্র সভা হয়। এই সভায় এক ছাত্র জিন্নাহর কথা মত উর্দুকে রাষ্ট্র

ভাষা করার পক্ষে বক্তব্য প্রদান করলে শেখ মুজিবুর রহমান তার প্রতিবাদ করে বক্তব্য প্রদান করে। তার বক্তৃতায় বলেন,

> "বাংলা ভাষা শতকরা ছাপ্পান্ন জন লোকের মাতৃভাষা, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সংখ্যাগুরুদের দাবি মানতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তাতে যাই হোক না কেন, আমরা প্রস্তুত আছি।"[৪৩]

রাষ্ট্রভাষা প্রশ্ন নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ যখন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরম খাঁর অসহযোগিতা মূলক কর্মকাণ্ড তথা মুসলিম লীগ সদস্য হওয়ার রশিদ বই চেয়ে না পাওয়ার প্রেক্ষিতে পরবর্তী নির্ধারণের জন্য মওলানা ভাসানীর সভপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আতাউর রহমান (১৯০৭-১৯৯১) এবং বেগম আনোয়ারা খাতুন (১৯১৯-১৯৮৮) কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামানের (১৮৯৪-১৯৬৪) সাথে দেখা করেন। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি কারণ চৌধুরী খলিকুজ্জামান রসিদ বইয়ের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "কাগজ পাওয়া যায় না, তাই রসিদ বই পাওয়া কষ্টকর।"[৪৪] এভাবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক লীগ নেতাদের অসহযোগিতায় শেখ মুজিবসহ অন্যান্য ছাত্র নেতা মুসলিম লীগ থেকে বাদ পড়েন।

১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করার পর খাজা নাজিমুদ্দিন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং নূরুল আমীন (১৮৯৩-১৯৭৪) কে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হয়।[৪৫] এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান খুব অল্পসময়ের ব্যবধানে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে স্কুল, কলেজসহ বিভিন্ন জেলায় সংগঠনের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫০ মোগলটুলীতে ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের প্রগতিশীল যুবক, তরুণ ছাত্রদের সংগঠিত করে স্থবির ছাত্র রাজনীতিকে চাঙ্গা করে তোলেন।[৪৬] সরকার ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার শুরু করলে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। এটিই ছিল প্রথম পাকিস্তানের রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির আন্দোলন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের দাবি দওয়ার প্রতি সমর্থন প্রদান করেন এবং তাদের আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[৪৭]

মুসলিম লীগের রাজনীতির বিকল্প হিসেবে এ সময় পুরানো লীগ কর্মী ও নেতারা নতুন দল গঠনের জন্য আলাপ আলোচনা শুরু করে। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর রাজনীতি পরিত্যাগের কথা সকল নেতৃবৃন্দকে বোঝাতে থাকেন। মওলানা ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) তখন সদ্য আসাম থেকে দেশে চলে এসেছেন। শামসুল হক তার সাথে দেখা করেন এবং নতুন একটি সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে আলোচনা করেন। এরই মধ্যে তৎকালীন সরকার টাঙ্গাইলে উপনির্বাচনের ঘোষণা প্রদান করেন। এ নির্বাচনে তিনি শামসুল হককে প্রার্থীতার জন্য অনুরোধ করেন। ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯ এপ্রিল নির্বাচনী প্রচারণায় যোগ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার আগেই তিনি গ্রেফতার হন। এ নির্বাচনে শামসুল হকের বিজয়ে তিনি

জেলে বসে বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করেন। ১৯৪৯ সালের টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে নির্বাচনী মামলা দায়ের করায় শামসুল হক ব্যবস্থাপক সভায় তার আসন গ্রহণ করতে পারেননি। তাই তিনি ঢাকায় ফিরে এসে পুরানো মুসলিম লীগ কর্মীদের নিয়ে কর্মী সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলন সফল করার জন্য কর্মীরা দিন রাত পরিশ্রম করতে থাকে। কর্মী সম্মেলন এবং কর্মীদের কার্যক্রম সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান জেলে থেকেই অবগত হয়েছিলেন। তিনি এ সম্মেলনের বর্ণনা দিয়েছেন তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে যেখানে তার বক্তব্য ছিল যে, শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতৃত্ব সম্মেলনের ফলাফল সম্বন্ধে খুবই চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলেন। তার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল, তার মত নেওয়ার জন্য। তিনি খবর দিয়েছিলেন যে, মুসলিম লীগের পিছনে ঘুরে লাভ নাই কারণ এ দল একটি গণবিচ্ছিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তাই মুসলিম লীগে নিতে চাইলেও সেখানে যাওয়া উচিত হবে না। কারণ তারা মুসলিম লীগকে করায়ত্ব করে ফেলেছে। একে আর জনগণের প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। তাদের কোন কর্মপন্থাও নাই। শেখ মুজিবকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তিনি ছাত্র প্রতিষ্ঠান নাকি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন হলে তাতে যোগদান করবেন। শেখ মুজিব উত্তর পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি ছাত্র রাজনীতি করবেন না, তিনি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই গড়ে তুলবেন। কারণ বিরোধী দল সৃষ্টি করতে না পারলে দেশে এক নায়কত্ব চলবে।[৪৮]

নির্ধারিত সভা স্থানের জায়গা নির্বাচনের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত কে এম লেনস্থ, ঢাকা বশীর হুমায়ুনের (১৯১৯-১৯৮০) 'রোজ গার্ডেন' নামক বাড়িতে এ সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, মওলানা রাগীব আহসান (১৯০৫-১৯৭৫), খয়রাত হোসেন (১৯০৯-১৯৭২), বেগম আনোয়ারা খাতুন (১৯১৯-১৯৮৮), ইয়ার মোহাম্মদ খান (১৯২০-১৯৮১) এবং বিভিন্ন জেলার অনেক প্রবীণ নেতাও যোগদান করেছিলেন। এ সভায় সকলের সম্মতিতে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান এ সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন হওয়ার কয়েকদিন পরই শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পান। জেল থেকে যেদিন ছাড়া পান সেদিনই প্রথম নতুন সংগঠনের পক্ষে জিন্দাবাদ ধ্বনি শুনতে পান। এ সম্পর্কে তিনি তার *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* উল্লেখ করেছেন,

> "...আব্বাকে সালাম করে ভাসানী সাহেবের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকেও সালাম করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ, ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ ধ্বনি উঠল। জেলগেটে এই প্রথম আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ হলো। শামসুল হক সাহেবকে কাছে পেয়ে তাকে অভিনন্দন জানালাম এবং বললাম "হক সাহেব, আপনার জয়, আজ জনগণের জয়।" হক সাহেব আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, "চল, এবার শুরু করা যাক।"[৪৯]

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এদেশের বিদ্রোহী, সংগ্রামী তরুণ নেতৃত্বের বিকাশের কাজটি প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। আওয়ামী মুসলিম লীগের 'যুগ্ম সম্পাদক' হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়েই শেখ

মুজিবের ছাত্র-রাজনীতি থেকে বৃহত্তর রাজনীতিতে উত্তরণ ঘটে। জাতির অবিসংবাদিত নেতৃত্বের শিখরে আহরণে এই-ই ছিল প্রথম ধাপ। তৎকালে মুসলিম লীগের রক্ষণশীল সাম্প্রদায়িক এবং পশ্চিমা নেতৃত্বের আনুগত্যের রাজনীতির বিরোধী ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল থেকেই উঠে আসেন শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতীয়তাবাদের এবং বাঙালি রাষ্ট্র গঠনের সংগঠক হিসেবে, তার সাহসী সংগ্রামী চেতনা, প্রবল সাংগঠনিক কর্মদক্ষতা নিয়ে।[৫০] আওয়ামী লীগের প্রথম ওয়ার্কিং কমিটির সভা ১৯৪৯ সালের জুন মাসে পুরান ঢাকার ১৫০ মোগলটুলীতে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে গঠনতন্ত্র সাব-কমিটি ও একটা কর্মপন্থা সাব-কমিটি করা হয়। জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর থেকে এ সংগঠনের কর্মপন্থানুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমান সংগঠনে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে শুরু করেন। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শামসুল হক ওয়ার্কিং কমিটির সভায় পার্টির ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করার সময় শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন এবং মতামত প্রদান করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পর ১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জে প্রথম মফস্বল সভা আয়োজন করেন। অবশ্য এ সভা বন্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। এ সময় তিনি তার বাবার ইচ্ছানুযায়ী আইন বিষয়ে পড়াশোনা না করে আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনীতিতে আরও সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করার লক্ষ্যে কাজ করা শুরু করেন। যেহেতু শেখ মুজিব আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন সেহেতু ১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসে ঢাকায় ছাত্রলীগের কাউন্সিল সভার আয়োজন করে এ সংগঠন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় গ্রহণ করেন। ছাত্রলীগ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সভা সমাবেশ করতে থাকেন। বিভিন্ন অঞ্চলে সমাবেশ শেষে ঢাকায় ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মিলে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে জনসভা আহ্বান করেন। সভার সভাপতিত্ব করেন মওলানা ভাসানী। এ সভায় শেখ মুজিব বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের ঢাকা সফরকে কেন্দ্র করে ১৯৪৯ সালের ১১ অক্টোবর আরমানিটোলায় সভা আহ্বান করা হয়। এ সভাকে বানচাল করার জন্য উগ্র মুসলিম লীগ কর্মীরা সার্বক্ষণিক লেগে ছিল। ইয়ার মোহাম্মদ খানের সহযোগিতায় মুসলিম লীগ শত চেষ্টা করেও সভায় কোন গোলমাল এবং সভা বন্ধ করতে পারল না। ১১ অক্টোবর সভায় শামসুল হকের বক্তৃতা করার পর শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শেষে তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন যে, যদি কোন লোককে কেউ হত্যা করে, তার বিচার কি হবে? জনগণ উত্তর দিল, 'ফাঁসি হবে'। তিনি আবার প্রশ্ন করেন যে, যারা হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর কারণ, তাদের কি হবে? জনগণ উত্তর দিল যে, তাদেরও ফাঁসি হওয়া উচিত। শেখ মুজিব বললেন যে, তাদের গুলি করে হত্যা করা উচিত। তারপর বক্তৃতা শেষ করে শেখ মুজিব বললেন যে, আমরা মিছিল করি এবং লিয়াকত আলী খান দেখুক পূর্ববাংলার লোক কি চায়।[৫১]

শেখ মুজিবুর রহমান মওলানা ভাসানী ও শামসুল হকের সাথে শোভাযাত্রার সামনের সারিতে ছিলেন। শোভাযাত্রা নাজিরা বাজারে আসলে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছাড়ে পাশাপাশি লাঠিচার্জ করতে শুরু করে। অনেক নেতা কর্মী গ্রেফতার হন আবার অনেকে গুরুতর আহত হন। শেখ মুজিবুর রহমান পায়ে আঘাত পেলে তাকে মোগলটুলী

অফিসে নিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এ সময় মওলানা ভাসানী তাকে গ্রেফতার না হওয়ার জন্য খবর পাঠান। সে কারণে শেখ মুজিবুর রহমান অনেক কৌশল করে পুলিশের নজর এড়াতে সক্ষম হন। তিনি পালানো রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন না। তাই মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করে গ্রেফতার না হওয়ার কারণ জানতে চান। এ সময় মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে লাহোরে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে দেখা করে বাংলার অবস্থা জানানোর কথা বলেন।[৫২] তাছাড়া নিখিল পাকিস্তান পার্টি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পীর মানকী শরীফের (১৯২৩-১৯৬০) সাথে আলোচনা করে সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগকে সারা পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রস্তাব দেওয়ার কথা বলেন।[৫৩] গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও মওলানা ভাসানীর নির্দেশে অনেক কষ্ট সহ্য করে পুলিশের নজরদারি ফাঁকি দিয়ে লাহোরে গমন করেন। লাহোরে সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে দেখা করে শেখ মুজিব পূর্ববাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, কর্মকাণ্ড ও নেতাকর্মীদের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন।[৫৪]

লাহোর থাকাবস্থায় তিনি সোহ্‌রাওয়ার্দীর অনুমতি নিয়ে গোলাম মোহাম্মদ লুন্দখোরের (১৯০৮-১৯৭৪) সাথে পাঞ্জাবের ক্যাম্বেলপুর সীমান্ত আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভায় যোগদান করেন।[৫৫] কারণ শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে দুই প্রদেশের আওয়ামী লীগ নিয়ে একটা 'নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' গঠন করার ব্যাপারে আলোচনা করবেন। এ সভায় শেখ মুজিব ইংরেজিতে বক্তৃতা করেন। নিখিল পাকিস্তান গড়ার ব্যাপারে প্রস্তাব করার পর সকলেই রাজি হন। প্রায় দেড় মাস লাহোরে থাকার পর দেশে ফিরে আসেন। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হন। জেলখানায় তিনি মওলানা ভাসানী ও শামসুল হকের সাথে দেখা করেন এবং লাহোরে যে উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ সময় নূরুল আমীন সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগের কর্মীদের গ্রেফতার করে জেলে অমানবিক নির্যাতন করতে থাকে। বিশেষ করে সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলার জেল তখন রাজনৈতিক বন্দিতে প্রায় ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে শেখ মুজিবকে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। তাছাড়া নিরাপত্তা বন্দি হওয়ার কারণে কারাদণ্ড শেষেও তাকে জেলেই থাকতে হয়। এ সময় তাকে গোপালগঞ্জের জেলে প্রেরণ করা হয়। এরপর তাকে ফরিদপুর জেলে নিয়ে আসা হয়। এভাবে শেখ মুজিব বিচারের প্রয়োজনে বিভিন্ন জেলে অবস্থান করেন এবং বন্দিদের কাছ থেকে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হন। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে লিয়াকত আলী খানকে (১৮৯৫-১৯৫১) রাওয়ালপিণ্ডিতে এক জনসভায় গুলি করে হত্যা করা হয়। এ সময় খাজা নাজিমুদ্দিন গভর্নর জেনারেলের পদ থেকে প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণ করেন। অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদকে (১৮৯৫-১৯৫৬) গভর্নর করা হয়। তাছাড়া খাজা নাজিমুদ্দিন তার মন্ত্রীত্বে পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ আলী কে অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। গভর্নর জেনারেল এবং অর্থমন্ত্রীকে নিয়োগ দানের মাধ্যমে খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমলাতান্ত্রিকতার সূচনা করেন। খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে পল্টন ময়দানের জনসভায়, "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে" ঘোষণা প্রদান করেন। তার এ ঘোষণার প্রতিবাদে রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী

লীগ, ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছাত্রলীগ এবং যুবকদের প্রতিষ্ঠান যুবলীগ সকলেই এর তীব্র প্রতিবাদ করে। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান আসামী হিসেবে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় মোহাম্মদ তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭), অলি আহাদ (১৯২৮-২০১২), খালেক নেওয়াজ (১৯২৬-১৯৭১), কাজী গোলাম মাহাবুবসহ (১৯২৭-২০০৬) আরও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেন এবং ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলে থাকাকালীন সময়ে ২১ ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক ঘটনা জানতে পারেন এবং ভাষা আন্দোলন নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। শেখ মুজিবুর রহমান জেলে থাকাবস্থায় বুঝতে পারলেন যে, তাকে বিনা বিচারে এভাবেই অনির্দিষ্টকালের জন্য জেলে থাকতে হবে।[৫৬] এ কথা অনুধাবন করে ১৯৫২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ ফরিদপুর কারাগারে অনশন শুরু করেন।[৫৭] সারাদেশে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তির দাবি, বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দানের আন্দোলন এবং অনশনে শেখ মুজিবের শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটায় অবশেষে মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সকাল বেলা শেখ মুজিবকে ফরিদপুর জেল থেকে মুক্তি দেয়।[৫৮]

জেলখানায় অনশন করায় শেখ মুজিবুর রহমানের শরীর খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। প্রায় দুই মাস বাড়িতে থেকে একটু সুস্থ হয়েই তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার (১৯১১-১৯৬৯) চিঠি পেয়ে ২২ এপ্রিল ১৯৫২ ঢাকায় আসেন।[৫৯] ঢাকা এসে তিনি (১৯৫২ সালের ২৩ এপ্রিল) মানিক মিয়া, আতাউর রহমানসহ (১৯০৭-১৯৭১) অন্যান্য নেতাদের সাথে দেখা করেন। নবাবপুরে স্থানান্তরিত আওয়ামী লীগ অফিসে যেয়ে সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে ১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল ৯৪ নম্বর নওয়াবপুর রোডে ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দের সম্মতিতে তাকে জেনারেল সেক্রেটারি করে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' সংগঠনের ভার অর্পন করা হয়। আতাউর রহমান এ সভায় সভাপতিত্ব করেন।[৬০] এসময় ভাষা আন্দোলনে শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর বিবৃতি মুসলিম লীগের পত্রিকায় বিকৃত করে ছাপাতে থাকে। বিবৃতিতে বলা হয় শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীও উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চান। শেখ মুজিবুর রহমান প্রকাশিত এ সংবাদের প্রতিবাদে প্রেস কনফারেন্স করেন। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে তিনি এ ঘটনা বর্ণনায় লিখেছেন যে, তিনি সাধারণ সম্পাদক হয়েই একটা প্রেস কনফারেন্স করেন। তাতে বাংলা রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে হবে এবং যারা ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ হয়েছেন তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দান এবং যারা অন্যায়ভাবে জুলুম করেছে তাদের শাস্তির দাবি করেন। বিদেশি কোন রাষ্ট্রের উসকানিতে এই আন্দোলন হয়েছে। সরকার প্রদত্ত এ বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ চান। হিন্দু ছাত্ররা, কলকাতা থেকে এসে পায়জামা পরে আন্দোলন করেছে। মুসলিম লীগ নেতাদের কাছে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ছাত্রসহ পাঁচ-ছয় জন লোক মারা গেল গুলি খেয়ে, তারা সকলেই মুসলমান কি না? যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন মুসলমান কি না? তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে সরাসরি বলেন যে, এত ছাত্র কলকাতা থেকে এল একজনকেও ধরতে পারল না যে সরকার, সে সরকারের গদিতে থাকার অধিকার নাই।[৬১]

শেখ মুজিবুর রহমান বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ইয়ার মোহাম্মদ খান (১৯২০-১৯৮১) ও আতাউর রহমান খানের সাথে আলোচনা করেন। আলোচনার সিদ্ধান্ত মোতাবেক শেখ মুজিবুর রহমান রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে দেখা করা এবং শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে আওয়ামী মুসলিম লীগের নামকরণ বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ১৯৫২ সালের মে মাসে করাচি পৌঁছান এবং প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের অফিসে দেখা করেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্যমূলক আলোচনা শেষে শেখ মুজিবুর রহমান তার সাক্ষাৎকারের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রায় এক ঘন্টাব্যাপি আলোচনা করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন যে, মওলানা ভাসানী, শামসুল হক, আবুল হাশিম, আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, খান সাহেব ওসমান আলীসহ সমস্ত কর্মীকে মুক্তি দিতে। জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি বসাতে বলেন কেন গুলি করে ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছিল? খাজা নাজিমুদ্দিন বললেন এটা প্রাদেশিক সরকারের হাতে, তার কোন ভূমিকা নেই। শেখ মুজিব বলেন, "আপনি মুসলিম লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, আর পূর্ববাংলায়ও মুসলিম লীগ সরকার, আপনি তাদের নিশ্চয়ই বলতে পারেন, আপনি তো চান না যে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হোক, আর আমরাও তা চাই না এজন্য করাচি পর্যন্ত এসেছি আপনার সাথে দেখা করতে, কারণ প্রাদেশিক সরকারের কাছে দাবি করে কিছুই হবে না, তারা যে অন্যায় করেছে সে অন্যায়কে ঢাকবার জন্য আরও অন্যায় করে চলেছে।" এ সাক্ষাতে শেখ মুজিব আরও বলেন যে, আওয়ামী লীগ বিরোধী পার্টি হিসেবে কাজ করছে, আর এ বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র চলতে পারে না। খাজা নাজিমুদ্দিন স্বীকার করেন যে,আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং শেখ মুজিবের উত্থাপিত দাবির ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না।[৬২]

খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে সাক্ষাতের পর শেখ মুজিবুর রহমান সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে দেখা করেন। এ সময় তিনি সোহ্‌রাওয়ার্দীর উপর আনিত অভিযোগ অর্থ্যাৎ বিভিন্ন পত্রিকার রির্পোটে প্রকাশিত তার বক্তৃতা উর্দুই রাষ্ট্র ভাষা হওয়া উচিত এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। অবশ্য শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সাথে সাথে এর প্রতিবাদ করে বলেন যে, তিনি উর্দু ও বাংলা দুইটা ভাষার কথাই বলেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, ভাষা সম্পর্কিত তার মতামত না পেয়ে পূর্ববাংলার জনসাধারণ দুঃখ পেয়েছে। ভাষা সংশ্লিষ্ট আলোচনা ছাড়াও সাংগঠনিক আলোচনা হয়। দলীয় এফিলিয়েশন এবং সংগঠনের নাম নির্ধারণ করার ব্যাপারেও আলোচনা হয়। অনেক আলোচনার পর সোহ্‌রাওয়ার্দী রাজি হন এবং নিজ হাতে তার সম্মতির কথা লেখেন। তাছাড়া উর্দু ও বাংলা দুইটাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সমর্থনের কথাও লিখিয়ে নেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর হাতের মামলা শেষ হলে পূর্ব পাকিস্তানে আসবেন এবং প্রত্যেক জেলায় সভা করবেন এ কথাও জানিয়ে দেন। এ সময় খাজা নাজিমুদ্দিন ও লাহোরে সোহ্‌রাওয়ার্দীর সমর্থকরা প্রেস কনফারেন্স করেন। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষা ও আওয়ামী মুসলিম লীগ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। লাহোরের আওয়ামী লীগ নেতারা তাকে অনেক ধন্যবাদ দেয়।[৬৩]

শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস কনফারেন্সের বক্তৃতা *পাকিস্তান টাইমস*, *ইমরোজ* ও অন্যান্য সংবাদপত্রে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে।[৬৪] তবে সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলি তার বক্তব্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছিল। মূলত

শেখ মুজিবের এই সফরে তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলা, রাজবন্দিদের মুক্তি, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি গুলি করে হত্যার প্রতিবাদ, স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক সমস্যার উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন।[৬৫] লাহোর থেকে ঢাকা ফিরেই শেখ মুজিবুর রহমান ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর মতামতের কথা মওলানা ভাসানীসহ অন্যান্য নেতাদের অবগত করেন। সর্বসম্মতিক্রমে দলীয় এফিলিয়েশন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সময় মওলানা ভাসানী অসুস্থ থাকায় তিনি তার চিকিৎসা খরচ বহন করার ব্যবস্থা করেন।[৬৬] যেহেতু মওলানা ভাসানী হাসাপাতালে সেহেতু শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান ও আবদুস সালাম খানের (১৯০৬-১৯৭২) সাথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। আতাউর রহমান খানের সাথে পাবনা, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরে সভা করেন এবং কমিটি গঠন করেন।[৬৭] আবদুস সালাম খানের সাথে ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনায় সভা (৯-১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫২) করেন।[৬৮] কুষ্টিয়া ও যশোরে সংগঠিত কমিটি গঠন করতে সক্ষম হন। তাছাড়া অনেক জেলায় তিনি নিজে একাই সভা করতেন এবং কমিটি গঠন করতেন। এভাবে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রচার ও প্রসারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৯৫২ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বিশ্রামহীন পরিশ্রম করে দেশের প্রায় সমস্ত জেলা ও মহকুমায় সফর করে আওয়ামী মুসলিম লীগের শাখা গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৬৯]

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সকল স্তরে মুসলিম লীগ ভিন্ন রাজনৈতিক দল ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় শেখ মুজিবুরের ভূমিকা অতুলনীয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনীতিকে গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার সাথে স্থানীয় কমিটি গঠন করে দলীয় সাংগঠনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব সবার উপরে শেখ মুজিবুর রহমানের। গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় শিরোনামে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে একজন আঞ্চলিক নেতৃত্ব হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা মূল্যায়ন অপরিহার্য। কারণ একজন আঞ্চলিক রাজনীতির মহান ধারক হিসেবে আজীবন সর্বসাধারণের মাঝে নিজের অবস্থান তৈরি করতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ঠতা এবং পরবর্তীতে দলের শীর্ষস্থানীয় অবস্থান তাকে সফল হতে মূল ভূমিকা পালন করেছিল। শেখ মুজিবুর রহমান সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার ফাঁকে সময় পেলে তার নিজ বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় যেতেন। তবে পরিবারের সাথে কখনও দীর্ঘ সময় কাটাতে পারতেন না। বিশেষ করে টাকার প্রয়োজন এবং পরিবারের খোঁজ নিতে সময় পেলে বাড়ি যেতেন।[৭০] ১৯৫২ সালের ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর প্রতিনিধিরা শান্তি সম্মেলন আহবান করে।[৭১] চীনের পিকিং এ অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে যাওয়ার জন্য পূর্ববাংলা থেকে পাঁচ জনকে (আতাউর রহমান খান, *ইত্তেফাক* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (১৯২৩-১৯৯৫), সৈয়দ ইউসুফ হাসান) নির্বাচিত করা হয় তার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান একজন ছিলেন।[৭২] পূর্ববাংলা সরকার শান্তি সম্মেলনকে কমিউনিস্ট সম্মেলন বলে আখ্যা দিয়ে পাসপোর্ট নিয়ে সমস্যা শুরু করে। শেখ মুজিবুর ও অন্যান্য নেতার অনেক চেষ্টার পর পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে চীনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।[৭৩] ১৯৫২ সালের ২ অক্টোবর চীনের পিকিং শহরে শান্তি সম্মেলন শুরু হয়। ৩৭ দেশের ৩৭৮ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পান। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে আতাউর রহমান খান ও

শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় বক্তৃতা প্রদান করেন। "শান্তি চাই, যুদ্ধ চাই না"- এ ছিল বক্তৃতার মূল বিষয়।[৭৪]

শেখ মুজিবুর রহমান নতুন প্রেরণা ও উৎসাহ নিয়ে ১৯৫২ সালের ২১ অক্টোবর ঢাকায় ফিরে এসে দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দেশে ফিরে দেখেন মওলানা ভাসানীসহ অন্যান্য নেতাকর্মী কেউই জেল থেকে ছাড়া পাননি। তাই বন্দিমুক্তি আন্দোলন জোরদার করার জন্য আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে পল্টন ময়দানে সভা আহবান করেন। এ সভায় সরকারের জুলুমের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ জানানো হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সকল কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান দলীয় কর্মসূচি নির্ধারণ করে সোহ্‌রাওয়ার্দীকে পূর্ববাংলায় আসার অনুরোধ করেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ঢাকায় আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এটিই ছিল বিরোধী দলের সবচেয়ে বৃহৎ সভা। এ জনসভায়ই সোহ্‌রাওয়ার্দী রাষ্ট্রভাষা বাংলা, বন্দিমুক্তি, স্বায়ত্তশাসনের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন অঞ্চলে সোহ্‌রাওয়ার্দীর জনসভার পর সারাদেশে গণজাগরণ তৈরি হয় এবং জনসাধারণ মুসলিম লীগ ছেড়ে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রতিটি জনসভা শেষে শেখ মুজিবুর রহমান জেলা ও মহকুমার নেতা-কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভা করে সংগঠনকে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা করে যান। আবার সোহ্‌রাওয়ার্দী যে সকল মহকুমায় যেতে পারেননি, সে সকল মহকুমায় শেখ মুজিব সভা আহবান করে দলের শাখা গঠন করেন।[৭৫]

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন হলেও প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় নেতাকর্মী জেলে থাকায় কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই শেখ মুজিবুর রহমান দিনরাত পরিশ্রম করে দলীয় কাউন্সিল সভার আয়োজন করেন। এক্ষেত্রে তিনি মওলানা ভাসানী ও আতাউর রহমান খানের সাথে পরামর্শ করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম কাউন্সিল সভা ঢাকার জনসন রোডে মুকুল (বর্তমান আজাদ প্রেক্ষাগৃহ) সিনেমা হল-এ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দলীয় পদ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের সৃষ্টি হলেও সর্বসম্মতিক্রমে কাউন্সিল সভায় নির্বাচনের মাধ্যমে মওলানা ভাসানী সভাপতি, আতাউর রহমান সহ সভাপতি ও শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তছাড়া এ কাউন্সিল সভায় দলের ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র সর্বসম্মতিক্রমে গঠন করা হয়। ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রকৃত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের মধ্যে পরিচিতি পেল। আওয়ামী মুসলিম লীগ সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য ও পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের শোষণের প্রকৃত চিত্র জনগণের মাঝে প্রকাশ করতে থাকে। মূলত এ কারণেই মুসলিম লীগ সরকার আওয়ামী মুসলিম লীগ ও এ দলের নেতা কর্মীদের উপর চরম অত্যাচার শুরু করে। কিন্তু সাধারণ জনগণ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান ও সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ প্রদর্শন করে।[৭৬] এ সময় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির লক্ষ্যে বন্দিমুক্তি আন্দোলন শুরু হয়, ফলে ক্ষমতাসীন সরকার দলীয় নেতাকর্মীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।[৭৭]

১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ (১৮৯৫-১৯৫৬) ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের সভাপতি, গণপরিষদ ও পার্লামেন্টের সংখ্যাগুরু দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করে আমেরিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) (১৯০৯-১৯৬৩) কে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এমন অগণতান্ত্রিকভাবে খাজা নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদ করেছিলেন। পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন (১৮৯৩-১৯৭৪) খাজা নাজিমুদ্দিনের বিশ্বস্ত ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) এর প্রতি আনুগত্য জানান। মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) এর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি গোলাম মোহাম্মদের (১৮৯৫-১৯৫৬) উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এমনি পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শোষণের ধারা অব্যাহত রাখে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এ সকল নেতৃবৃন্দ জেলা, মহকুমা, থানায় ও গ্রামে গ্রামে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে নিঃস্বার্থ কর্মীবাহিনী সৃষ্টি করেন। পূর্ব পাকিস্তানে এ সময় স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, প্রশাসনিক ধীরগতি, খাদ্য সংকট, বেকারত্ব ইত্যাদি সমস্যা চরম আকার ধারণ করে। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতারা মিলে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে জনমত সৃষ্টিতে কাজ শুরু করেন। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ছাড়া অন্যান্য দাবি সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন যে, শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতৃত্ব তাড়াতাড়ি শাসনতন্ত্র তৈরি করতে জনমত সৃষ্টি করতে লাগলেন। পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা না মেনে নিলে তারা কোনো শাসনতন্ত্র মানবে না। এ সময় ফজলুর রহমান আরবি হরফে বাংলা লেখা পদ্ধতি চালু করতে চেষ্টা করছিলেন। শেখ মুজিবসহ অন্যান্যরা এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। এসময় কোন কোন মুসলিম লীগ নেতা এককেন্দ্রিক সরকার গঠনের জন্য গোপনে প্রপাগান্ডা করছিলেন কিন্তু আওয়ামী লীগ ফেডারেল শাসনতন্ত্র ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির ভিত্তিতে প্রচার শুরু করে জনগণকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল।[৭৮]

পাকিস্তান সরকার ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি পূর্ববাংলায় সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা প্রদান করে। এ সময় আওয়ামী লীগের প্রবীণ গ্রুপ যুক্তফ্রন্ট গঠন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আবদুস সালাম খান, ময়মনসিংহের হাশিম উদ্দিন ও আরও কয়েক জন নেতা প্রচার শুরু করেন। যুক্তফ্রন্ট গঠন তৎপরতা সম্পর্কে তিনি তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, তিনি ফজলুল হকের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে আওয়ামী লীগে যোগদান করতে অনুরোধ করেন। চাঁদপুর আওয়ামী লীগের এক জনসভায় ফজলুল হক যোগদানও করছিলেন। সেখানে ফজলুল হক ঘোষণা করেন যে, যারা চুরি করবেন তারা মুসলিম লীগে থাকুন, আর যারা ভাল কাজ করতে চান তারা আওয়ামী লীগে যোগদান করুন।' এসময় তিনি শেখ মুজিবকে ধরে জনসভায় বলেছিলেন, "মুজিব যা বলে তা আপনারা শুনুন। আমি বেশি বক্তৃতা করতে পারব না, বুড়া মানুষ।" কোন বিরোধী রাজনৈতিক দল তখন ছিল না-একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া যার নাম জনসাধারণ জানে। এ বিষয় নিয়ে মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিব পরামর্শ করলেন। এসময় মওলানা ভাসানী পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন যে, 'যদি হক সাহেব আওয়ামী লীগে আসেন তবে তাকে গ্রহণ করা হবে এবং উপযুক্ত

স্থান দেওয়া যেতে পারে। আর যদি অন্য দল করেন তবে কিছুতেই তার সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করা চলবে না। যে লোকগুলি মুসলিম লীগ থেকে বিতাড়িত হয়েছে তারা এখন ফজলুল হক এর কাঁধে ভর করতে চেষ্টা করছে তাদের সাথে কিছুতেই একত্রে আন্দোলন করা সম্ভব নয়। মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে বললেন এ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ সদস্যদের মধ্যে যেন যুক্তফ্রন্ট সমর্থকরা মাথা তুলতে না পারে।'[৭৯]

যুক্তফ্রন্ট গঠন সম্পর্কে আওয়ামী মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায়ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আওয়ামী লীগের বেশির ভাগ সদস্যই যুক্তফ্রন্টের বিরোধী ছিলেন। কারণ যাদের সাথে নীতি থাকে না তাদের সাথে সাময়িকভাবে ঐক্য গঠিত হলেও ভবিষ্যতে সে ঐক্য থাকে না। তাছাড়া এই ঐক্যে দেশের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। তবে আওয়ামী লীগের এক অংশ মুসলিম লীগকে পরাজিত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষপাতি ছিল। এমনি অবস্থায় মওলানা ভাসানীর নির্দেশে ১৯৫৩ সালের ১৪ ও ১৫ নভেম্বর ময়মনসিংহে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভা আহ্বান করা হয়।[৮০] শেখ মুজিব সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি রাজি হন এবং সভায় যোগদান করেন। তাছাড়া সমস্ত জেলার কাউন্সিলরদের চিঠি দিয়ে সভায় যোগদানের আহ্বান করেন।[৮১] যুক্তফ্রন্ট গঠনে প্রথম দিকে মওলানা ভাসানীর আপত্তি ছিল যে নীতি ছাড়া নেতাদের সাথে জোট করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যার কারণে এ কাউন্সিল সভায় তিনি যোগদান করবেন না বলে জানিয়ে দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করেন এবং ভাল মন্দ আলোচনার পর মওলানা ভসানীকে রাজি করান। ময়মনসিংহের 'অলকা' সিনেমা হল-এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা প্রদান করেন। সম্মেলনে বৈদেশিক নীতি ও যুক্তফ্রন্ট নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। শেখ মুজিব তার বক্তব্যে আওয়ামী লীগের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে প্রস্তাব করেন। পরবর্তীতে ঐক্যফ্রন্ট সমর্থকরা প্রস্তাব আনলে তিনি ঐক্যফ্রন্ট গঠনের বিরোধিতা করেন। এক্ষেত্রে শেখ মুজিব বলেন, যাদের নীতি ও আদর্শ নাই তাদের সাথে ঐক্যফ্রন্ট করার অর্থ হল কতগুলি মরা লোককে বাঁচিয়ে তোলা। মওলানা ভাসানীও ঐক্যফ্রন্টের বিরোধী ছিলেন এবং শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীও কোন আগ্রহ দেখাননি। শেষ পর্যন্ত মওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর উপর অর্পন করা হয় যুক্তফ্রন্টের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে। তবে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান যুক্তফ্রন্ট করার বিরোধিতা করেন এবং মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগকে এককভাবে বিজয়ী করার ঘোষণা দেন। এ লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান জেলায় জেলায় সম্মেলন শুরু করেন।[৮২] কোথায় কাকে নমিনেশন দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করবেন মওলানা ভাসানী ও সোহ্‌রাওয়ার্দী। এভাবেই প্রথম দিকে সিদ্ধান্ত করা হয়। কুষ্টিয়া জেলায় সম্মেলনে যোগদান করার জন্য মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান কুষ্টিয়ায় যান। কুষ্টিয়ায় থাকাকালীন ঢাকা থেকে মানিক মিয়া (১৯১১-১৯৬৯) ও আতাউর রহমান (১৯০৭-১৯৯১) টেলিগ্রাম করেন ঢাকায় ফিরে আসার জন্য। শেখ মুজিবুর রহমান এ সময় মওলানা ভাসানীকে ঢাকায় রওয়ানা হতে বলেন এবং নিজে সম্মেলন শেষ করে ঢাকায় যাবেন সিদ্ধান্ত নেন। কুষ্টিয়ার মিটিং শেষে যখন ঢাকায় রওয়ানা হচ্ছিলেন তখন তিনি খবর পান এ কে ফজলুল হক

ও মওলানা ভাসানী দস্তখত করে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে ফেলেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এসে মওলানা ভাসানীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান ও মানিক মিয়ার কথা বললেন যে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজি করাবে বলে কথা দিয়েছেন। মাওলানা ভাসানী আরও বললেন যে, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী নির্বাচনের নমিনেশন বা নিয়ম কানুন দেখবেন। শেখ মুজিবুর রহমান তার মতের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন হলেও শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্টের পক্ষে কাজ শুরু করেন। যুক্তফ্রন্ট যাতে সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে চলে তার জন্য সর্বাত্নক চেষ্টা করতে লাগলেন। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে চেয়ারম্যান, আওয়ামী লীগ থেকে আতাউর রহমান খান ও কৃষক শ্রমিক পার্টি হতে কফিলুদ্দিন চৌধুরীকে (১৮৯৯-১৯৭২) জয়েন্ট সেক্রেটারি করা হয়। নেজামে ইসলাম পার্টি, গণতান্ত্রিক দল ও আওয়ামী লীগ থেকে সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে নমিনেশন বোর্ড গঠন করা হয়। তবু নমিনেশন নিয়ে জোটভুক্ত দলের মধ্যে ব্যাপক টানাপোড়েন দেখা দেয় এবং শেষের দিকে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার অবস্থায় চলে যায়। তবে সোহ্‌রাওয়ার্দী তার রাজনীতির অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দিয়ে যুক্তফ্রন্টকে রক্ষা করেছিলেন।[৮৩]

শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ ও কোটালী পাড়া এই দুই থানা নিয়ে গঠিত নির্বাচনী এলাকায় যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীতা করেন। তার প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থী ছিলেন মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী ওয়াহিদুজ্জামান (১৯১২-১৯৭৬)।[৮৪] তিনি ধনী ও প্রভাবশালী হওয়ায় ব্যাপকভাবে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের সে তুলনায় অর্থ ছিল না কিন্তু তার সমর্থক ছাত্র ও যুবক কর্মীরা নিজেদের টাকা খরচ করে তার জন্য নির্বাচনী প্রচারণা চালান। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ নির্বাচন ব্যায়ের জন্য টাকা দেয় এবং জনমত সৃষ্টিতে কাজ করে। এমনকি দরিদ্র মহিলা-পুরুষ তার সমর্থনে টাকা দিয়ে কাজ করে। শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে যে পরিমাণ গণজোয়ার তৈরি হয় তা তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগে উপলব্ধি করতে পারেননি। অবশ্য কিছু পীর, মওলানা, মৌলভী ও তাদের সমর্থকরা শেখ মুজিবের বিরোধিতা করে। তারা প্রচার করে মুজিবকে ভোট দিলে ইসলাম থাকবেনা, ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। এসব খবর শুনে নির্বাচনের চারদিন পূর্বে সোহ্‌রাওয়ার্দী গোপালগঞ্জে দুইটি সভা করেন এবং নির্বাচনের একদিন পূর্বে মওলানা ভাসানী একটা সভা করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতার উপস্থিতি এবং ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণের প্রচেষ্টায় প্রায় দশ হাজার ভোটে মুসলিম লীগ প্রার্থী ওয়াহিদুজ্জামান পরাজিত হন। তাছাড়া যুক্তফ্রন্টের এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতারাও পরাজিত হন এবং অনেকের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়।[৮৫] এমনকি পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনও পরাজিত হন। যুক্তফ্রন্টের এই নির্বাচনে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে মানুষকে আহ্বান করেছিলেন। আর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হওয়ার কারণে তাদের আহ্বানে সাড়া প্রদান করেন। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের চরম প্ররোচনায়ও তারা পথভ্রষ্ট হয়নি। তাছাড়া ময়মনসিংহ আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) সম্পাদিত একুশ দফা দাবি মানুষের মধ্যে গণজোয়ার সৃষ্টি করেছিল। আবার ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই একুশ দফার অনেকগুলো দাবি এ দলের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছিল যে কারণে জনগণ তা সহজেই গ্রহণ করেছিল। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের

ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা আসলে তাকে রেল স্টেশনে বিরাট অভ্যর্থনা দেওয়া হয় এবং শোভাযাত্রা করে আওয়ামী লীগ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়।[৮৬] শেখ মুজিব ঢাকায় আসার পর ঢাকা বার লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ সদস্যদের সভা এবং সমস্ত দল মিলে যুক্তফ্রন্ট এম এল এ দের সভায় যোগদান করেন। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার বার লাইব্রেরির এই সভায় এ কে ফজলুল হক সর্ব সম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচিত হন।[৮৭] তিনি নেতা নির্বাচিত হওয়ার কিছু সময় পরেই পূর্ববাংলার গভর্নর তাকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান করেন। ফজলুল হক এ আহ্বানে রাজি হয়ে শীঘ্রই মন্ত্রিসভার নাম পেশ করবেন বলে বাড়িতে ফিরে গেলেন। সেদিনই সন্ধ্যার পর সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী তার সাথে আলোচনা করতে যান। শেখ মুজিবুর রহমানও তাদের সাথে ছিলেন তবে তিনি নেতা আলাদা ঘরে আলোচনায় বসেন। কিছু সময় আলোচনার পর শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী বের হয়ে আসেন। ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়িতে এসে জানান ফজলুল হক এখন মাত্র চার-পাঁচজন মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করবেন এবং কিছুদিন পরে আরও কিছু মন্ত্রী নিবেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতারা তাকে অনুরোধ করলেন যুক্তফ্রন্টের পুরো দলকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতারা ফজলুল হককে বলেছিলেন এভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করলে আওয়ামী লীগের কেউ যোগদান করবে না বরং যখন পুরো টিম নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে তখন সবাই যোগদান করবে। শেখ মুজিবুর রহমানকে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তির জবাবে নেতাদের মধ্যে যে কথপোকথন হয় তার বর্ণনা তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন,

> হক সাহেব শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবকে বলেছেন, "আমি শেখ মুজিবকে আমার মন্ত্রিত্বে নিব না।" তার উত্তরে শহীদ সাহেব বলেছিলেন, "আওয়ামী লীগের কাকে নেওয়া হবে না হবে সেটা তো আমি ও ভাসানী সাহেব ঠিক করব; আপনি যখন বলছেন নান্না মিয়াকে ছাড়া আপনার চলে না, তখন আমরাও তো বলতে পারি শেখ মুজিবকে ছাড়া আমাদের চলে না। সে আমাদের দলের সেক্রেটারি। মুজিব তো মন্ত্রিত্বের প্রার্থী না। এ সকল কথা বললে পার্টি থেকে বলতে পারে।" আমি শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবকে বললাম, "আমাকে নিয়ে গোলমাল করার প্রয়োজন নাই। আমি মন্ত্রী হতে চাই না। আমাকে বাদ দিলে যদি পুরা মন্ত্রিত্ব গঠন করতে রাজি হয়, আপনারা তাই করেন।" আমরা বসে আলাপ করছি, প্রায় এক ঘণ্টা পরে হক সাহেব খবর পাঠিয়েছেন, তিনি ছয়জনকে নিয়ে মন্ত্রিত্ব গঠন করতে চান এবং মুজিবকেও নিতে রাজি আছেন। ভাসানী সাহেব বলে দিলেন, "আওয়ামী লীগ যখন যোগদান করবে, আওয়ামী লীগের সব কয়জনই একসাথে যোগদান করবেন। এভাবে ভাঙা ভাঙা ভাবে যোগদান করবে না।"[৮৮]

মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে সমঝোতা না করেই ফজলুল হক তার পছন্দের লোকদের নিয়ে ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করে। কিন্তু প্রতিবাদে লাট ভবনের সামনে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। ফজলুল হকের সমর্থকরা শেখ মুজিবকে এ সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী করে, যদিও তিনি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কিছুই জানতেন না। পূর্ব পাকিস্তান তথা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি বড় পটপরিবর্তন সম্ভব হত যদি এ সময় যুক্তফ্রন্টের সকল সদস্যের আনুপাতিক হারে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করা যেত। তাছাড়া দেশের সকল জনগণ অভিনন্দন জানাত এবং দেশ নতুন ধারায় পরিচালিত হতে পারত। এরূপ পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রিসভায় যোগদান না করে দলের সাংগঠনিক কাজে মনোযোগ দেন। আওয়ামী লীগকে দূরে রাখার জন্যই ফজলুল হকের সমর্থকগোষ্ঠী তাকে নানাভাবে প্ররোচিত করে। নতুন চক্রান্তের অংশ হিসেবে ফজলুল হকের কলকাতায় প্রদত্ত বক্তব্য নিয়ে নতুন রাজনীতি শুরু করে। মূলত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় আওয়ামী মুসলিম লীগের কেউ যাতে না থাকতে পারে এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য যুক্তফ্রন্ট বিরোধী গ্রুপ গোপনে কাজ করতে থাকে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ফজলুল হকের কলকাতায় প্রদত্ত বক্তব্য দেশদ্রোহিতার সামিল বলে অভিযোগ করতে থাকে। মোহাম্মদ আলী বগুড়া ও তার সমর্থকরা ফজলুল হকের বিরুদ্ধে এসব কার্যক্রম চালাতে থাকে। ফলে ফজলুল হক বিপদের মুহূর্তে আওয়ামী লীগ সদস্যদের সাথে আলোচনা করে পুরো মন্ত্রিসভা গঠন করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৯৫৪ সালের এপ্রিলের শেষার্ধে শেখ মুজিবুর রহমান মওলানা ভাসানীর সাথে মফস্বলে সাংগঠনিক কাজের অংশ হিসেবে টাঙ্গাইলে ছিলেন। টাঙ্গাইলের সম্মেলনে থাকাবস্থায় রেডিওগ্রামের মাধ্যমে জানতে পারেন যে তাকে প্রধানমন্ত্রী ঢাকা যেতে অনুরোধ করেছেন মন্ত্রিসভায় যোগদান করার জন্য। শেখ মুজিব, মওলানা ভাসানী, মানিক মিয়া, আতাউর রহমান খান, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে ফোনে আলাপ করে সর্বসম্মতিক্রমে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালের ১৫ মে ঢাকার লাট ভবনে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের দিনই আদমজী জুটমিলে বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। এ সময় ফজলুল হক শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে নিয়ে আদমজী জুট মিলে রওয়ানা হন। শেখ মুজিবুর রহমান যখন পৌঁছান তখনও দাঙ্গা চলছিল। তিনি সকাল এগারটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান করে আহতদের চিকিৎসা এবং নতুন করে যাতে আর কোন সংঘর্ষ না হয় তার জন্য বক্তৃতা প্রদান করেন। শেখ মুজিবুর রহমান দাঙ্গা থেকে ফিরে ঢাকায় এসে দাঙ্গা সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনায় মন্ত্রিসভার মিটিং এ যোগদান করেন। এ সময় তিনি প্রকৃত দোষীদের কঠোর শাস্তির কথা বলেন। শেখ মুজিবুর রহমান মিটিং শেষ করে রাত একটার সময় ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বক্তৃতা প্রদান করেন যাতে বাঙালি অবাঙালি দাঙ্গা না বাঁধতে পারে। অবাঙালিরা বাঙালিদের হত্যা করেছে এ কথা ঢাকার সকল অঞ্চলে পৌঁছে যায়। তিনি সারা জীবন অসাম্প্রদায়িক ছিলেন তাই এ সময় অবাঙালিদের উপর যাতে কোন আক্রমণ না হয় এজন্য বক্তৃতা প্রদান করে উত্তেজিত জনগনকে শান্ত করেছিলেন। শপথ নেওয়ার পরের দিন শেখ মুজিবকে সমবায় ও কৃষি উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী করা হয়। মন্ত্রিত্ব পাওয়ার পর ফজলুল হকের সাথে শেখ মুজিবের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। ফজলুল হক তাকে যা করতে বলতেন তিনি তাই করতেন। ফলে শেখ মুজিব ফজলুল হকের ভক্ত হয়ে যান। ফজলুল হকও তাকে পছন্দ করতেন।[৮৯]

শেখ মুজিবুর রহমান দায়িত্ব পাওয়ার পর তার দপ্তরে গিয়ে সকল কাজ বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেন। দায়িত্ব নেওয়ার দুই দিন পরেই শেখ মুজিবুর রহমান ফজলুল হকের সাথে করাচি যান। সেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সাথে পূর্ববাংলার

বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এ মন্ত্রিসভার সাথে আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর শেখ মুজিব অসুস্থ শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে দেখতে যান। সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে দেখা করার পর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের সাথে দেখা করেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভাঙ্গার পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে তিনি সকলকে বুঝিয়ে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঢাকায় এসে পৌঁছালে বিরাট জনতা তাদের অভ্যর্থনা জানান। ১৯৫৪ সালের ৩০ মে বেলা তিনটায় কেন্দ্রীয় সরকার ৯২ (ক) ধারা জারি করে মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করেন। এ সংবাদ শোনার পর শেখ মুজিব আতাউর রহমান খানকে সাথে নিয়ে ফজলুল হকের সাথে দেখা করেন এবং মন্ত্রিসভার মিটিং ডাকার অনুরোধ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শেখ মুজিব বিভিন্ন নেতার সাথে দেখা করেন। তিনি মন্ত্রিসভা বরখাস্তের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য দেশের জনগনকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভাঙ্গার সিদ্ধান্তের পরেই শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। দশ পনেরো দিনের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রায় তিন হাজার কর্মী ও সমর্থকদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় ফজলুল হককে তার বাড়িতে অন্তরীণ করা হয়। পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করার দিন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী রেডিও বক্তৃতায় ফজলুল হককে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' এবং শেখ মুজিবকে 'দাঙ্গাকারী' বলে সম্বোধন করেন।[৯০]

কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আতাউর রহমান খান একটি বিবৃতি প্রদান করেন। ৯২ (ক) ধারা জারির পূর্বে মওলানা ভাসানী বিলেতে গিয়েছিলেন। তাছাড়া শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী জুরিখে হাসপাতালে থাকায় এ অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন জোরালো আন্দোলন করা হয়নি। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি গোষ্ঠী যুক্তফ্রন্টের অনৈক্যের কথা বুঝতে পেরে নানা কৌশল গ্রহণ করতে থাকে।[৯১] এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান জেলে থাকাবস্থায়ই তিনদিন পর নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন। মূলত অনির্দিষ্টকালের জন্য গ্রেফতার করে রাখার জন্য মন্ত্রী হওয়ার আগে জেল গেটের গোলমালের ঘটনায় তাকে দায়ী করা হয়।[৯২] গৃহবন্দী হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ফজলুল হককে তার সমর্থকরা দাঙ্গার জন্য তাকে দিয়ে অন্যায় স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করান। এ খবর শোনার পর শেখ মুজিব খুবই মর্মাহত হন। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের অনৈক্যের কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পরিকল্পিত কৌশল সফল করতে পেরেছিলেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের উপর থেকে আস্থা হারান। এ অবস্থায় নেতাহীন ও নীতিহীন মুসলিম লীগ ক্ষমতায় থাকার জন্য সুযোগ করে নেওয়ার চেষ্টা করে। যখন গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয় তখন তথাকথিত মুসলিম লীগ নেতারা অনেকেই মন্ত্রী হয়ে যায়। মোহাম্মাদ আলী (বগুড়া) প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানকে একটা রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিত্তিক ব্লকের দিকে নিয়ে যান। তৎকালিন সময়ে সমস্ত পৃথিবী রাশিয়ান ব্লক বা সমাজতান্ত্রিক ব্লক এবং আমেরিকান ব্লক বা গণতান্ত্রিক ব্লক বা ধনতন্ত্রবাদী ব্লক নামে দুটি ব্লকে বিভক্ত হয়ে যায়। লিয়াকত আলীর সময় থেকেই পাকিস্তান আমেরিকান ব্লকের দিকে যেতে থাকে। ১৯৫৪ সালের মে মাসে পাকিস্তান-আমেরিকা মিলিটারি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং পরে পাকিস্তান 'সিয়াটো' (সাউথ-ইস্ট-এশিয়া ট্রিটি অর্গানাইজেশন, ১৯৫৪) ও 'সেন্টো' (সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন-১৯৫৫) বা 'বাগদাদ চুক্তি'তে স্বাক্ষর করে সম্পূর্ণভাবে আমেরিকার তত্ত্বাবধানে চলে

যায়। শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতারের পূর্বেই পাক-আমেরিকান মিলিটারি চুক্তির বিরুদ্ধে এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ঢাকায় এসে ফজলুল হকের দলের সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে সরকার গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা জানতেন ফজলুল হকের দল কৃষক প্রজা পার্টির সাথে আপস করলে স্বায়ত্তশাসন ছাড়াই সরকার গঠন করা যাবে। কারণ আওয়ামী লীগ স্বায়ত্তশাসন ছাড়া কোন আপস করবে না। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী রোগমুক্তির পর করাচি আসেন। এ সময় গোলাম মোহাম্মদ তাকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, এ মন্ত্রিসভায় কেউ প্রধানমন্ত্রী নন, এটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার, আরও বলা হয় শীঘ্রই শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। তবে এখন আইনমন্ত্রী হয়ে তাকে একটা শাসনতন্ত্র দিতে হবে। সোহ্‌রাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও নেতৃত্বের সাথে কোন আলোচনা ছাড়াই আইনমন্ত্রী হিসেবে নব্যগঠিত মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর আইনমন্ত্রী হওয়ার সংবাদে শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতারা খুবই কষ্ট পান এবং তারা হতাশ হয়ে পড়েন।[৯৩]

শেখ মুজিবুর রহমানের বাবার অসুস্থতার টেলিগ্রাম পেয়ে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি তার বাড়িতে যান। গোপালগঞ্জ যাওয়ার পরের দিন সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আতাউর রহমান করাচি যাওয়ার জন্য টেলিগ্রাম করেন। শেখ মুজিব টেলিগ্রাম পাওয়ার পরের দিনই ঢাকা হয়ে করাচি রওয়ানা দেন। করাচি যেয়ে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে দেখা করেন এবং দীর্ঘ আলোচনা করেন। আইনমন্ত্রী হওয়ায় শেখ মুজিব তার উপর অনেক রাগ করেছেন বুঝতে পেরে সোহ্‌রাওয়ার্দী বললেন যে গোলাম মোহাম্মদ জানিয়ে দিয়েছেন যে, মন্ত্রিসভায় যোগদান না করলে তিনি মিলিটারিকে শাসনভার দিয়ে দেবেন। এ সময় শেখ মুজিব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য নেতাদের চক্রান্তের কথাও বলেছিলেন। কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রথমে না বুঝতে পারলেও পরবর্তীতে তার কথার মর্ম বুঝতে পেরেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান করাচি থেকে ঢাকা ফিরে আতাউর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ ও মানিক মিয়ার সাথে বৈঠক করেন এবং করাচির বিভিন্ন ঘটনা অবগত করেন। ফজলুল হকের দলের সমর্থকগোষ্ঠীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এবং তারা যে সোহ্‌রাওয়ার্দীকে যুক্তফ্রন্টের কেউ মনে করেন না এটা নিয়েও আলোচনা করেন। এ সময় যুক্তফ্রন্টের সভায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন সম্পর্কে আলোচনায় শেখ মুজিব ছাড়া বাকী তিনজন প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তারা অনাস্থা সম্পর্কে আপত্তি করেনি বরং অনাস্থা প্রস্তাবের ভোটাভুটিতে জেতা যাবে কি না সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। সকল আলোচনা শেষে শেখ মুজিবুর রহমান ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করেন। ফজলুল হকের নেতৃত্বে অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি তার আত্মজীবনীতে বলেছেন,

> "আমি ও আতাউর রহমান সাহেব বের হয়ে পড়লাম এম এল এ দের দস্তখত নিতে। সতেরো দফা চার্জ গঠন করলাম। হক সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে কে অনাস্থা প্রস্তাব প্রথমে পেশ করবে, সে প্রশ্ন হল। অনেকেই আপত্তি করতে লাগলেন, আমার নিজেরও লজ্জা করতে লাগল। তাকে তো আমিও সম্মান ও ভক্তি করি। কিন্তু এখন কয়েকজন তথাকথিত নেতা তাকে ঘিরে রেখেছে। তাকে তাদের কাছ থেকে শত চেষ্টা করেও বের করতে পারলাম না। এদের অনেকেই নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস পূর্বে মুসলিম লীগ

ত্যাগ করে এসেই ক্ষমতার লড়াইয়ে পরাজিত হয়। ঠিক হল, আমিই প্রস্তাব আনব আর জনাব আবদুল গণি বার এট ল সমর্থন করবেন।"[৯৪]

শেখ মুজিবুর রহমান ফজলুল হক কে শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু তার দলের সদস্যদের কারণেই মূলত এই অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এজন্য তিনি আওয়ামী লীগের একশত তেরোজন সদস্যের দস্তখত সংগ্রহ করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের পঁয়ত্রিশ জন সদস্য সালাম খানের নেতৃত্বে অনাস্থা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন, অপর দিকে অনেকটাই অপ্রত্যাশিতভাবে কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলামী দলের সদস্যরা জোটবদ্ধভাবে ফজলুল হককে সমর্থন করেন। ফলে শেখ মুজিব যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা বাতিল হয়। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় অনাস্থা প্রস্তাবে পরাজিত হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নতুনভাবে কর্মকৌশল নির্ধারণ করেন।[৯৫]

১৯৫৫ সালের ৫ জুন শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২৫ আগস্ট তিনি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ববাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান না করার পক্ষে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন।[৯৬] ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর ঢাকার সদরঘাটে 'রূপমহল' সিনেমা হল-এ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' রাখা হয়। 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়ার ব্যাপারে সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রবল আপত্তি ছিল। কিন্তু মওলানা ভাসানী দলকে অসাম্প্রদায়িক করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। অনেক আলাপ-আলোচনার পর সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ২২ অক্টোবর সোহ্‌রাওয়ার্দী তার আপত্তি তুলে নেন। শেখ মুজিব এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে অলি আহাদ লিখেছেন,

> "কোন রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে ভাসানী-সোহ্‌রাওয়ার্দী মতান্তর ও মনান্তর নিরসনে শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন একমাত্র সেতুবন্ধ।"[৯৭]

দলের বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করার সময় এ প্রসঙ্গে দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন,

> "এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিরাজমান পরিস্থিতির প্রয়োজনে যখন আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়, তখন আমাদের সংগঠনটিকে একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনের রূপ দিতে হয়েছিল। পাকিস্তানি জনগণের ধর্ম বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে মুসলিম লীগ ইসলামকে তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে স্বীয় ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখে। এছাড়া মুসলিম লীগ যে বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে, তা থেকে জনগণ তখনো সম্পূর্ণরূপে নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে যদিও আমাদের সংগঠনটিকে ধর্ম-নিরপেক্ষতার রূপ দেওয়া সম্ভব ছিল, তথাপি তা মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবকে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হতো।"[৯৮]

শেখ মুজিব আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর ১৯৫৩ সাল থেকে দেশের সকল জেলা, থানা, মহল্লায় দলীয় কমিটি গঠন করেন যার কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ধর্মকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেও নির্বাচনে ভরাডুবী হয় কিন্তু আওয়ামী লীগের অবস্থান পূর্বের তুলনায় সুদৃঢ় হয়।[৯৯] এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি সাধারণ সম্পাদকের বক্তৃতা প্রদানের সময় আওয়ামী লীগকে গণমুখী ও প্রগতিশীল অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। যে কারণে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ এ দলে যোগদান করে এবং এরপর থেকে আওয়ামী লীগের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা শুরু হয়।[১০০] পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির এই পটপরিবর্তনের ধারায় তিনি পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি আজীবন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দসহ মূখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে খসড়া শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান। তিনি সবসময় দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলার চেষ্টা করতেন। ১৯৫৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বানিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তর এর মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন কিন্তু সংগঠনকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ৩১ মে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পররাষ্ট্রনীতিকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে মতভেদ চরম আকার ধারণ করে।[১০১] মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে শেখ মুজিব ১৯৫৭ সালের ১৩-১৪ জুন আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা আহবান করেন। প্রথমে ঢাকার পিকচার প্যালেসে (পরবর্তী নাম শাবিস্তান) এবং পরে 'গুলিস্তান' সিনেমা হল-এ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সোহ্‌রাওয়ার্দী সরকারের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়।[১০২] সম্মেলনে উপস্থিত কাউন্সিলররা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সোহ্‌রাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতি অনুমোদন করেন। মওলানা ভাসানী এ সময় আরও একবার ভোটাভুটি দাবি করেন। দ্বিতীয়বার ভোট নেওয়া হলে সোহ্‌রাওয়ার্দীর পক্ষে আরও বেশি ভোট পড়ে। তিনি ৮০০ ভোট পান অন্যদিকে মওলানা ভাসানীর পক্ষে মাত্র ৩৫টি ভোট পড়ে।[১০৩] জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাসী মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই ঢাকার 'রূপমহল' সিনেমা হল-এ অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন।[১০৪]

আওয়ামী লীগ থেকে ভাসানীর পদত্যাগের ফলে অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতাসহ মফস্বলে ভাসানীর সমর্থকরা আওয়ামী লীগ ছেড়ে ভাসানীর দলে যোগদান করেন। এসময় অনেকেই ধারণা করেছিলেন আওয়ামী লীগ টিকবে না এবং ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড দলে পরিণত হবে। আওয়ামী লীগের এ চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে শেখ মুজিবুর রহমান পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। এসময় তিনি ১৯৫৫ সালে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি পুনর্বিন্যাস করেন এবং দলীয় ভাঙ্গন রক্ষা করার জন্য সারাদেশে সাংগঠনিক সফর শুরু করেন। ১৯৫৭ সালের ২৯ জুলাই ঢাকার ধূপখোলা মাঠ থেকে তার জনসভা কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। শেখ মুজিব ১৯৫৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জেলা কাউন্সিল অধিবেশন শেষ করার জন্য দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন। এসময় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আগস্টের প্রথম

সপ্তাহ থেকে থানায় থানায় স্বায়ত্তশাসনের জন্য দাবি সপ্তাহ উদযাপনে জনসভার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। শেখ মুজিবের দক্ষ সাংগঠনিক কর্মসূচির মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ভাঙ্গন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল।[১০৫]

এ সময় প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী বুদ্ধিমত্তার সাথে পাশ্চাত্য শক্তির সমর্থন আদায় করেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর জনপ্রিয়তায় প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা (১৮৯৯-১৯৬৯) ভীত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ক্ষমতা হারাবার ভয়ে এক নতুন কৌশল গ্রহণ করে। তাই রিপাবলিকান পার্টি ইস্কান্দার মির্জার ইঙ্গিতে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে। ফলে সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৯৫৭ সালের ১১ অক্টোবর পদত্যাগ করেন। এ সময় মুসলিম লীগ ও রিপাবলিকান পার্টি পৃথক নির্বাচন প্রথায় তাদের কর্মসূচি প্রদান করলে আওয়ামী লীগ ১৯৫৭ সালের ২ ডিসেম্বর যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও ৫ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে যুক্ত নির্বাচনের দাবিতে বিরাট জনসভার আয়োজন করে। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, "মুসলিম লীগ কয়েক হাজার লোক জড়ো করতে পারলে, আমি এক লক্ষ লোক জড়ো করতে পারবো যারা যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে।"[১০৬] ১৯৫৭ সালের ১৪ নভেম্বর পল্টন ময়দানের জনসভায় পৃথক নির্বাচনের সাম্প্রদায়িক দাবির সমালোচনা করে বলেন যে, হিন্দু-মুসলমান একসাথে যদি মন্ত্রীত্ব করা যায়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয়ে মিলে ভোট দিতে সমস্যা থাকবে কেন।[১০৭] এভাবে তিনি পাকিস্তানের নির্বাচন ব্যবস্থায় নিজের ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৫৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ এ দেশের সংখ্যালঘুদের কখনো সংখ্যালঘু মনে করে না বরং দেশের নাগরিক হিসেবেই গণ্য করে। তাছাড়া সংখ্যালঘুদের ভিন্ন নির্বাচন ব্যবস্থার বিরোধিতা করে আওয়ামী লীগ। ১৯৫৭ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইবরাহিম ইসমাইল চুন্দ্রিগড় (১৮৯৯-১৯৬০) জাতীয় পরিষদে পৃথক নির্বাচনী বিল উত্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।[১০৮] কিন্তু রিপাবলিকান পার্টি সমর্থন করায় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফলে ১৯৫৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর মালিক ফিরোজ খান নূন (১৮৯৩-১৯৭০) প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৪ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৮৬) ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রীকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সমর্থন জানান। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান খুবই কৌশলে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালের ২১ মার্চ প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের এগারোজন সদস্য একযোগে আওয়ামী লীগ থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে। এ সময় গভর্নর ঘোষণা প্রদান করেন যে আওয়ামী লীগ সরকারের টিকে থাকার বৈধতা হারিয়েছে। এমনি পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগকে সরকারে টিকিয়ে রাখার জন্য কৌশলে ন্যাপ নেতা মাহমুদ আলীর সাথে ১৯৫৮ সালের ২৩ মার্চ দীর্ঘ আলোচনা করেন। ২৪ মার্চ মাহমুদ আলী মওলানা ভাসানীর সাথে আলোচনা করে আওয়ামী লীগের কাছে নয়টি শর্তের কথা উল্লেখ করেন। এ সময় শেখ মুজিব শর্তগুলো মেনে নেন। এদিনই ন্যাপ প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ সরকারকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। এ সময় কৃষক প্রজা পার্টি নিশ্চুপ থেকে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা শুরু করে।[১০৯] মূলত যুক্ত নির্বাচনের কথা বিবেচনা

করে শেখ মুজিব প্রাদেশিক পরিষদে টিকে থাকার জন্য ন্যাপের সাথে সমঝোতা করেন। কিন্তু গভর্নর এ কে ফজলুল হকও আওয়ামী লীগকে বরখাস্ত করে কৃষক প্রজা পার্টির আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব প্রদান করেন। পরবর্তীতে গভর্নর পদ থেকে ফজলুল হককে বরখাস্ত করা হলে আবু হোসেন সরকারের স্থলে আবার আতাউর রহমান দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এ সময় আতাউর রহমানের সাথে শেখ মুজিবের সংগঠনের কার্যক্রম নিয়ে মতদ্বৈততা তৈরি হয়। ফলে শেখ মুজিব পদত্যাগ করেন এবং ১৯৫৮ সালের ২ এপ্রিল আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যুক্ত নির্বাচনের জন্য সর্বদলীয় আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে শেখ মুজিব ন্যাপের সাথে পাঁচদফা চুক্তি করে দু'দলের মধ্যে গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের মধ্যকার এ সমঝোঝা কে.এস.পি (কৃষক শ্রমিক পার্টি) এবং মুসলিম লীগ সুনজরে দেখেনি। তারা বলে যে, আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ মিলেমিশে দেশটাকে কমিউনিজমের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শেখ মুজিব রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই মূলত এ কৌশল গ্রহণ করেন। কিন্তু আতাউর রহমানসহ দলীয় অন্যান্য সদস্য শেখ মুজিবকে নানাভাবে দোষারোপ করে। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট শাসনের ব্যাপারে আগ্রহী হন কারণ গভর্নর শাসনে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। তাই শেখ মুজিব সাংগঠনিক তৎপরতাকে প্রাধান্য প্রদান করেছিলেন। আবার একই সাথে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রদান এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তের উচিত জবাব দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ ভিন্ন মতাদর্শী দল ও ব্যক্তির সাথে সমঝোতা করেন। মূলত পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার্থে মাহমুদ আলী এবং ভাসানীর সাথে তিনি একমত পোষণ করেন।[১১০]

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর জারিকৃত সামরিক শাসন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সময় শেখ মুজিব সামরিক শাসন বিরোধী রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। অর্থাৎ শেখ মুজিব রাজনীতির এই নতুন দুর্যোগে নিজেকে জাতীয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। ১১ অক্টোবর শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়।[১১১] প্রায় চৌদ্দ মাস জেলে থাকার পর ১৯৬০ সালের ৭ ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদন করে তিনি মুক্তি লাভ করেন। সামরিক শাসন ও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে শেখ মুজিব গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এ সময়ই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দ দ্বারা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি মহকুমায় এবং থানায় নিউক্লিয়াস বা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' গঠন করেন। ১৯৬২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। জেল থেকে মুক্তিলাভ করেই শেখ মুজিব আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন। ১৯৬২ সালের ৫ জুলাই আওয়ামী লীগের পল্টনের জনসভায় আইয়ুব সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন।[১১২]

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর (৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩) পর শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য নিজ বাসভবনে সভা আহবান করেন। এ সভায় আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও শেখ মুজিবুর রহমান যথাক্রমে

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর শেখ মুজিবুর রহমান অনুভব করেন এবং এর আগেও করতেন যে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এর প্রয়োজনীয়তা নেই। ইতিমধ্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম শুরু করা জরুরি বিষয় হয়ে ওঠে। তাই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেই শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[১১৩] ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। শেখ মুজিবুর রহমান এবং তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মিলে ৯৯ সদস্য বিশিষ্ট 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করেন। এ কমিটিতে শেখ মুজিবুর রহমান আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনের অংশ হিসেবে এ সময় আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব উক্ত সভায় বলেন,

> "আওয়ামী লীগের সামনে এমন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কাজ রয়েছে যা একমাত্র আওয়ামী লীগকেই করতে হবে। বাঙালি জাতির মুক্তিই আমাদের শেষ কথা। এ জন্য দীর্ঘ দিনব্যাপী আমাদের লড়াই করতে হবে এবং সেজন্যই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে সব রকমের ত্যাগের জন্য।"[১১৪]

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ১৯৬৪ সালের ৬ মার্চ ঢাকার গ্রীন রোডে তিন দিনব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার ফলে একদিকে আওয়ামী লীগ সংগঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে, অপরদিকে দলে শেখ মুজিবের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠা লাভ তার নিজস্ব রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণেই সম্ভব হয়। প্রতিটি সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক এবং শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রধান সংগঠনে পরিণত হওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রকৃত অর্থেই ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসের সম্মেলন সংগঠক হিসেবে আওয়ামী লীগ এবং নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় উন্নীত করে। ফলে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রিয় নেতা শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর দ্রুত শূন্যস্থান পূরণ করতে সক্ষম হন। অন্যদিকে এ সম্মেলন আওয়ামী লীগকে ষাটের দশকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত হতে দিক-নির্দেশনা দেয়। যারা এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিলেন তারা পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বায়ত্তশাসন এবং মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আওয়ামী লীগ মার্চ ১৯৬৪ সম্মেলনের পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকারী সংগঠনে রূপ নেয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষাকারী সংগঠনরূপে জনগণের কাছে গৃহীত হতে থাকে।[১১৫]

শেখ মুজিবুর রহমান ধীরে ধীরে জাতীয় রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হন। ১৯৬৪ সালের ৫ জুন ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইউনিয়ন, মহকুমা, জেলা কমিটি গঠন করা হয়। যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম হাতে নেওয়ার ফলে আওয়ামী লীগ খুব স্বল্পসময়ের মধ্যেই গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে। শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দসহ

বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক সফর, জনসভা ও বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের বৈষম্য, অধিকার ও উন্নয়নের দাবি জানাতে থাকে। ১৯৬৪ সালের ১২ জুলাই পূর্ববাংলাব্যাপী "জুলুম প্রতিরোধ দিবস" পালিত হয়। ঢাকার পল্টন ময়দানে এ উপলক্ষে ঐ দিন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান উক্ত সভায় দীর্ঘ এবং তেজদীপ্ত ও সাহসী ভাষণে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠীর স্বরূপ উম্মোচন করে উভয় অঞ্চলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেন এবং বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ফলে আওয়ামী লীগের জনসভাগুলি কানায় কানায় ভরে ওঠে সাধারণের উপস্থিতিতে। আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিব খুব কম সময়ের মধ্যেই পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের কাছাকাছি যেতে সক্ষম হন।[১১৬]

আইয়ুব খান তার সামরিক শাসনকে বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৬৫ সালে নির্বাচনের আয়োজন করে। ফলে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই বিরোধী দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে দমন-নিপীড়ন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আওয়ামী লীগ ৬ এপ্রিল প্রদেশব্যাপী 'বন্দী মুক্তি দিবস' পালন করে। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ঐ সময় দেশদ্রোহিতা মামলা চলতে থাকে। নির্বাচন পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ আবার সক্রিয় হয়ে ওঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করলে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা দায়ের করা হয়।[১১৭] এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু ও ভারতের গুজরাট সীমান্তবর্তী অঞ্চল কচ্ছেররান ও কাশ্মির ইস্যুতে ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। শেখ মুজিব ও তার দল ভারতীয় হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার দাবি জানায়। তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে অরক্ষিত রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।[১১৮] এ সময় শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ কার্যকর গণআন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে বিদ্যমান বিষয়গুলো তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দল সমূহের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ছয়দফা দাবি পেশ করেন। প্রস্তাবিত ছয়দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। বাঙালির সামগ্রিক অধিকার আদায় এবং স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় তার এই ছয়দফা ভিত্তিক আন্দোলন খুবই কার্যকরী হয়েছিল। ছয়দফা কর্মসূচির মাধ্যমেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে আন্দোলন ও সংগ্রামের বাস্তব পথ উম্মোচন হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ৬ দফাকে বিচ্ছিন্নকারী কর্মসূচি বা প্রস্তাব হিসেবে চিহ্নিত করে প্রত্যাখান করে। যদিও এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্তশাসন বিষয়টি পাকিস্তানি শাসকরা মেনে নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সহাবস্থান গড়ে তুলতে পারতো। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ছয়দফা কর্মসূচি মেনে না নেওয়ায় শেখ মুজিব ও তার দল কর্তৃক পরিচালিত ছয়দফা আন্দোলনই পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ করে। শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন এই স্বাধিকার আন্দোলনের প্রধান রাজনৈতিক নেতা। আন্দোলনের এই পর্বকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে ধরা হয়।[১১৯]

১৯৬৬ সালের ১ মার্চ শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তার সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ধারায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি নতুন ভাবে দলীয়

মতাদর্শ লাভ করে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।[১২০] শেখ মুজিব ছয়দফা আন্দোলনকে সফল করার জন্য এবং এর পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেশের অধিকাংশ জেলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন।[১২১] গ্রেফতারের পূর্বেই তিনি (২০ মার্চ-৭ মে) দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ৩২ টি জনসভায় ভাষণ দেন।[১২২] শেখ মুজিবের নেতৃত্বে প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে। বর্তমান বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে ছয়দফার পক্ষে আঞ্চলিকভাবে আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে।[১২৩] শেখ মুজিবের ছয়দফা ঘোষণা এবং আন্দোলন কেন্দ্রিক ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক গ্রুপের কার্যক্রম এসময় লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাড়িতে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের সম্মেলনের পর মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী, আওয়ামী লীগের একাংশ এবং এন ডি এফ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) এর একাংশ একটি সম্মিলিত বিরোধী মোর্চা গঠনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলের শুরু থেকেই বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ করছিলেন ছয়দফা ছেড়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য। ১৯৬৬ সালের ২ মে 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট' নামে তারা একটি মোর্চা গঠন করেন।[১২৪] তৎকালীন রাজনীতির অন্যতম নেতা মওলানা ভাসানীও এসময় ছয়দফাকে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেন।[১২৫] ছয়দফা আন্দোলন দমনের নামে পাকিস্তান সরকার গণগ্রেফতার শুরু করে। ১৯৬৬ সালের ৮ মে রাতে দেশরক্ষা আইনের ৩২(১)ক ধারা মোতাবেক শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়।[১২৬] ১৯৬৬ সালের ১০ মে'র মধ্যে সারা পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের ৩৫০০ জন নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়ে যান। সরকারের দমনমূলক কার্যক্রমের পূর্বেই শেখ মুজিব সাংগঠনিক কর্মসূচি ঠিক করে রেখেছিলেন। তার অনুপস্থিতিতে কর্মী বাহিনী যাতে কাজ চালিয়ে যেতে পারে সেভাবেই তার সংগঠনকে গড়ে তুলেছিলেন। শেখ মুজিব ছয়দফার পক্ষের জেলা পর্যায়ের ছাত্রলীগ নেতাদেরও সংগঠিত করেছিলেন, যাতে করে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতিতে তারা কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। ১৯৬৬ সালের ১৩ জুনের মধ্যে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় স্তরের নেতারাও গ্রেফতার হয়ে যায়। গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট থেকে জানা যায় ছয়দফা প্রচার করার মত শীর্ষস্থানীয় কোন আওয়ামী লীগ নেতা জেলের বাইরে ছিলেন না। কিন্তু শেখ মুজিবের নির্দেশে শ্রমিক-ছাত্র-সাধারণ মানুষ ছয়দফা আন্দোলন সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ছয়দফা বিরোধী গ্রুপটি দাবি করে যে, তাদের আওয়ামী লীগই সত্যিকার আওয়ামী লীগ, ছয়দফার পক্ষের আওয়ামী লীগ বিচ্ছিন্নতাবাদী।[১২৭]

১৯৬৬ সালে বিদ্যমান প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দলই পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষার তাগিদে ছয়দফার বিরুদ্ধাচারণ করতে শুরু করে। আওয়ামী লীগ (পি ডি এম পন্থি) ছয়দফার বিরুদ্ধে পাল্টা আট দফা দাবি প্রণয়ন করে। বস্তুত এই সময় থেকেই ছয়দফার আন্দোলনকে ভিত্তি করে ইউনিয়ন পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিরোধ এবং সরকারি নির্যাতন, জেল ও জুলুমের কঠিন বিপত্তি ঠেলে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের তরুণ কর্মীবৃন্দ বৃহত্তর গণআন্দোলনের জন্য তৈরি হয়ে ওঠেন। বলা

যায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের সকল স্তরে ছয়দফার পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয় এবং ছয়দফা আন্দোলন সর্বজনীনতা লাভ করে।[১২৮]

আন্দোলনের জনপ্রিয়তা এবং তীব্রতা দেখে আইয়ুব সরকার শঙ্কিত হয়ে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতি থেকে সরানো এবং বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি চিরতরে শেষ করার জন্য ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে 'আগরতলা মামলা' দায়ের করে।[১২৯] তবে বর্তমানে আগরতলা মামলা সম্পর্কে অনেক গবেষক বলছেন এ মামলা সত্য ছিল। এ মামলা বিষয়ে বিভিন্নমুখি বিতর্ক চলছে। ঐতিহাসিক আগরতলা মামলাকে এখনও মিথ্যা মামলা বলে যারা উল্লেখ করেন, তারা নিজেদের অজান্তে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য অভিযুক্তকে অসম্মান করেন। মামলাটির রাষ্ট্রীয় নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের প্রচারযন্ত্রে মামলাটির শিরোনাম বিকৃত করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বলে প্রচার করে। ফলে এখনও পত্রপত্রিকায় মামলাটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে মুদ্রিত ও প্রচারিত হচ্ছে। আজও মামলাটির প্রসঙ্গ এলে প্রায় সবাই 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বলে থাকেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ অন্যান্য যারা মামলাটিতে অভিযুক্ত ছিলেন 'ষড়যন্ত্র' শব্দটি তাদের জন্য খুবই পীড়াদায়ক। কারণ তারা ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন না। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্রপন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সম্মতি নিয়ে তারা একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠন করেছিলেন। তাদের পরিকল্পনা ছিল যে, একটি নির্দিষ্ট রাতে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে তারা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সবকটি ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের বন্দী করবে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবে।[১৩০]

তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৌশলগত কারণে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামী সবাই বিশেষ ট্রাইব্যুনালে নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেছিলেন। বাঙালি জাতিও মামলাটিকে মিথ্যা মামলা হিসেবে অভিহিত করে তা প্রত্যাহারের দাবি তুলেছিল। মামলার বিবরণ, ধারা ও গোটা কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে এ মামলার নাম 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হওয়া যৌক্তিক নয়। সরকারি ভাষ্য মতে ১২-১৫ জুলাই ১৯৬৭ তারিখের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সম্ভাব্য ভারতীয় সাহায্যের বিষয়ে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য পরিকল্পনাকারীরা আগরতলা যান। তবে সরকারি ভাষ্যমতে কোন ভারতীয় সাহায্য পূর্ব পাকিস্তানের কেউ গ্রহণ করেছে তার প্রমাণ পায়নি। তদুপরি মামলার বিবরণ সংবলিত অভিযোগে বিবৃত সভাগুলি ও কার্যাবলি যা মামলার মূল বিষয় ছিল, ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত মূলত করাচি, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় সংঘটিত হয়। সে কারণে মামলার নামের আগে 'আগরতলা' শব্দটি সংযোজনের যৌক্তিকতা খুবই কম। এ মামলার নামকরণে যদি কোন স্থানের নাম যুক্ত করা আদৌ প্রয়োজন মনে করা হয় তাহলে তা হওয়া উচিত করাচি। কারণ সরকার পক্ষের অভিযোগের বিবরণ অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমান

করাচিতে ১৯৬৪ সালের ১৫-২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাঁচজনসহ অভিযুক্তের সঙ্গে প্রথম বৈঠক করেন এবং পরিকল্পিত সশস্ত্র বিপ্লব সংক্রান্ত বেশিরভাগ সভা ও কার্য করাচিতেই সংঘটিত হয়। পরবর্তীকালে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য মামলাটি যখন পেশ করা হয় তখন সরকারিভাবে মামলাটির নামকরণ করা হয় 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। কিন্তু সরকারি প্রচারযন্ত্র, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, আইয়ুব খানের সমর্থকরা এবং কতিপয় সংবাদপত্র আগরতলা শব্দটি নিয়ে এত বেশি প্রচারণা চালান যে, তখন থেকেই মামলাটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত হয় এবং এ নামেই পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসের অংশ হয়।[১৩১] তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাঙালিরা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' মিথ্যা মামলা হিসেবে অভিহিত করলেও শেখ মুজিবসহ অন্যান্য আসামীরা মিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিপ্লবী সংস্থা গঠন করেছিলেন। তাই আগরতলা মামলা সত্য মামলা ছিল এ কথা নি:সন্দেহে বলা যায়।[১৩২] বর্তমানে এ মামলা সম্পর্কে নানামুখী মতামত থাকলেও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। শেখ মুজিবসহ আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত আসামিদের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে ব্যাপক বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি ছয়দফাসহ এগারো দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। দল, মত নির্বিশেষে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে রূপ নেয়। বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক নেতৃত্বের ভূমিকায় মূলত এ আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ ভঙ্গ, পুলিশ, ই পি আর (বর্তমানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) এর গুলিবর্ষণ, বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিলে আইয়ুব সরকার ১ ফেব্রুয়ারি গোল টেবিল বৈঠকের আহ্বান জানায় এবং শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দান করা হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান প্যারোলে মুক্তিদান প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৬৯ সালের ২২ ফ্রেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাখ্যান করে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তি দানে বাধ্য হয়। ২৩ ফ্রেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স (সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শেখ মুজিবকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রায় দশ লাখ ছাত্র জনতার এই সংবর্ধনা সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি রেসকোর্সের ভাষণে ছাত্র সমাজের এগারো দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ শেখ মুজিব রাওয়ালপিণ্ডিতে আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের ছয়দফা ও ছাত্র সমাজের এগারো দফা দাবি উপস্থাপন করে বলেন, গণঅসন্তোষ নিরসনে ছয়দফা ও এগারো দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও রাজনীতিবিদরা বঙ্গবন্ধুর দাবি অগ্রাহ্য করলে ১৩ মার্চ তিনি গোলটেবিল বৈঠক ত্যাগ করেন এবং ১৪ মার্চ ঢাকায় ফিরে আসেন। ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে

ক্ষমতাসীন হন। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ববাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। তিনি বলেন,

> "একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। ...একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ...জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি–আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান' এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।"[১৩৩]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্বে শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন। তাই নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় তিনি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০ সালের ৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন। পাকিস্তান সরকার ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। তাই ১৯৭০ সালের ১ এপ্রিল আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের সভা আয়োজন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৭০ সালের ৭ জুন রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ছয়দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

১৭ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তার দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে নৌকা প্রতীক পছন্দ করেন এবং ঢাকার ধোলাইখালে প্রথম নির্বাচনী জনসভার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। ২৮ অক্টোবর তিনি জাতির উদ্দেশ্যে বেতার, টিভি ভাষণে ছয়দফা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর গোর্কিতে উপকূলীয় এলাকায় ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটলে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারণা বাতিল করে দুর্গত এলাকায় চলে যান এবং আর্ত মানবতার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি গোর্কি উপদ্রুত মানুষের ত্রাণের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান।[১৩৪] ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন মাইলফলক হিসেবে ধরা হয় কারণ এ নির্বাচনে জয় লাভের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের রাজনীতি সর্বসাধারণের মাঝে পৌঁছে যায়। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে দলীয় আদর্শভিত্তিক রাজনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা পায়।[১৩৫]

১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মসূচি নির্ধারণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জন প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা ছয়দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগণের প্রতি অনুগত থাকার শপথ গ্রহণ করেন। ৫ জানুয়ারি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বাধিক আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে তার

সম্মতির কথা ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদ সদস্যদের এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। ২৮ জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। তিন দিন বৈঠকের পর আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দিয়ে দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের প্রতি ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানান। ১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে জনাব ভুট্টোর দাবির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "ভুট্টো সাহেবের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক্ষমতা একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ক্ষমতার মালিক এখন পূর্ববাংলার জনগণ।"[১৩৬] ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়।[১৩৭] বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের জরুরি বৈঠকে ৩ মার্চ দেশব্যাপি হরতাল আহ্বান করা হয়। ৩ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হবার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি দাবি জানান। ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন,

> "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খল মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন, "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। ... রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাহআল্লাহ।"[১৩৮]

তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান এবং ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এ সময় জনগণের কাছে একদিকে রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্দেশ যেত, অপরদিকে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর সড়ক থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ যেত, বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্দেশ মেনে চলতো। অফিস, আদালত, ব্যাংক, বীমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি ও শিল্প কারখানা সবই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মত চলেছে। ইয়াহিয়ার সব নির্দেশ অমান্য করে অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার গণমানুষের অভূতপূর্ব সাড়া ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মূলত ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসাবে বঙ্গবন্ধুই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। ১৬ মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। আলোচনার জন্য জনাব ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা হয়। ২৫ মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হবার পর সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা, রাইফেলস সদর দফতর ও রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার।[১৩৯] শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতারের পূর্বে ২৫ মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন,

"This may be my last message; from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved." [১৪০]

এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলায় নিম্নলিখিত একটি বার্তা পাঠান:

> "পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপোস নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।" [১৪১]

বঙ্গবন্ধুর এই বার্তা তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় সারাদেশে পাঠানো হয়। সর্বস্তরের জনগণের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসে বাঙালি জওয়ান ও অফিসাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাত ১:৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং এর তিন দিন পর তাকে বন্দি অবস্থায় পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়।[১৪২] তাই ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ.হান্নান (১৯৩০-১৯৭৪) শেখ মুজিবের প্রেরিত স্বাধীনতা ঘোষণা পত্রটি পাঠ করেন।[১৪৩] ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে (মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯২৫-১৯৭৫) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫) প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশ লাভ করে স্বাধীনতা। তার আগে ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের ফয়সালাবাদ (লায়ালপুর) জেলে বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার করে তাকে দেশদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের

রাষ্ট্রপতি। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি, কাজেই পাকিস্তানের কোন অধিকার নেই তাকে বন্দি করে রাখার। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বন্ধু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছে।[১৪৪]

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেদিনই বঙ্গবন্ধুকে ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডন পাঠানো হয়। ৯ জানুয়ারি লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ (১৯১৬-২০০৫) এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। লন্ডন থেকে ঢাকায় আসার পথে বঙ্গবন্ধু দিল্লিতে যাত্রা বিরতি করেন। বিমানবন্দরে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরি (১৮৯৪-১৯৮০) ও প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী (১৯১৭-১৯৮৪) বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছালে তাকে অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে লক্ষ জনতার সমাবেশ থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পান। নতুন আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতার সুফল মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু শুধু বাংলাদেশেরই নয় বিশ্বের ইতিহাসে এক ঘৃণ্যতম ঘটনা ঘটে যায়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক অফিসারদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।[১৪৫]

প্রান্তটীকা

১. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউ.পি.এল. ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৩
২. মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবন ও রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৪৭-১৫৮
৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩-১৪
৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১৬
৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-২৪
৬. তমিজউদ্দিন খান (১৮৮৯-১৯৬৩) ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছেন আঞ্চলিক নেতা হিসেবে। ব্রিটিশ আমলে সংগঠিত অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং তার কর্মকাণ্ডের জন্য ১৯২১-১৯২৩ সাল পর্যন্ত কারাগারে ছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মনোনয়নে ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তমিজউদ্দিন খান ১৯৩০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তিনি পূর্ববাংলায় ফজলুল হক মন্ত্রিসভার (১৯৩৭-১৯৪৮) মন্ত্রী ছিলেন। তাছাড়া তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতি ও জাতীয় পরিষদের স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তমিজউদ্দিন খান, *(The Test of Time: My Life and Days) কালের পরীক্ষা ও আমার জীবনের দিনগুলি*, (অনুবাদ রাজিয়া খান), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩।
৭. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-২৪
৮. ফকরুল আলম (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা ২০২০-২০২২*, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২২, পৃ. ১৫৫
৯. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-২৪
১০. কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলায় মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, ১ম খণ্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ১৪-১৬। ১৯৪৩ সাল থেকে শেখ মুজিব নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর ছিলেন তথাপিও তার স্পষ্ট রাষ্ট্র ধারণা ছিল না। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রথম দিকে অনেকের মত যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ ইউনাইটেড স্টেটস অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল নিয়ে এক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করা তার ভাবনায় ছিলনা। বস্তুত পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির জাতীয় মুক্তির প্রত্যাশা মূল কারণ হিসেবে কাজ করেছে। হারুন-অর-রশিদ, *৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ৪০-৪১। শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২৪১
১১. আবুল হাশিম, *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, (অনুবাদ শাহাবুদ্দীন মহম্মদ আলী), বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, চট্টগ্রাম-ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৯২
১২. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩২
১৩. শাহ মোহাম্মদ রেজা, *মুসলিম লীগের ৮০ বছর*, *বিচিত্রা*, ১৫ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ৩০ জানুয়ারি ১৯৮৭
১৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২
১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯-৪০
১৬. মোহাম্মদ সেলিম, *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় আন্দোলন*, *সশস্ত্র সংগ্রাম ও স্বাধীনতা*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ১৭৪
১৭. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯-৪০
১৮. ভোট গণনা শেষে সোহ্‌রাওয়ার্দী গ্রুপের নির্বাচিত ৫ জন সদস্য হল হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩), আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪), মওলানা রাগীব আহসান (১৯০৫-১৯৭৫), আহমদ হোসেন এবং মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লাল মিয়া) (১৯৩২-১৯৭১) শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী গ্রুপের পাঁচ জনই নির্বাচিত হন। শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫-৫০
১৯. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫-৫০।
২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১, ৬৬-৭২
২১. আহসানুল্লাহ, *অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন*, লায়ন্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৫৮-১৮৬
২২. হারুন-অর-রশিদ, *৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১। ফকরুল আলম (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা (২০২০-২০২২)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১
২৩. আহসানুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮-১৮৬
২৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬
২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২
২৬. ফকরুল আলম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭
২৭. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫-৯০
২৯. মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৪০-৪৩
৩০. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮-৯১
৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১
৩২. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১*, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২২০
৩৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯২
৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯৫
৩৫. Sheikh Hasina (Hon’ble Prime Minister, Government of the People’s Republic of Bangladesh), *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 1948-1950, vol-1,* Hakkani Publisher’s, 2020, Dhaka, p. 96
৩৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯৫
৩৭. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৮-২২২
৩৮. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৫৪-৫৮
৩৯. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬
৪০. Sheikh Hasina (Hon’ble Prime Minister, GOB), *ibid,* p. 36
৪১. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬।
৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯৮
৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯-১০১
৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১
৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯-১১৪
৪৬. ফকরুল আলম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮
৪৭. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯-১১৪
৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯-১২০
৪৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০-১২২
৫০. মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি*, *প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০-৫৮
৫১. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০-১৩২
৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২-১৩৭
৫৩. **পীর মানকী শরীফ (১৯২৩-১৯৬০)** উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একজন উল্লেখযোগ্য প্রগতিশীল ধর্মীয় নেতা। তার পুরো নাম পীর আমিনুল হাসনাত কিন্তু তিনি উল্লিখিত নামে অধিক পরিচিত। তিনি ১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তিনি নব্য গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারে ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান, *আমার দেখা নয়াচীন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ১৮৯
৫৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২-১৩৭
৫৫. **খান গোলাম মোহাম্মদ লুন্দখোর (১৯০৮-১৯৭৪)** উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৫৩ সালে ময়মনসিংহে আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিলে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন। তিনি ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত পিকিং শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে চীন সফর করেন। শেখ মুজিবুর রহমান, *আমার দেখা নয়াচীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬
৫৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০-২০৫
৫৭. Govt. of East Bengal, *Home Poll F/N. 606-48 PF, Part-3,* ফরিদপুর জেলের সুপার ১৮.২.১৯৫২ তারিখে পূর্ববাংলা সরকারের হোম সেক্রেটারি, ঢাকা কে লিখিত এক পত্রে উল্লেখ করেন, Security Prisoners (1) Sk. Mujibur Rahman and (2) Mohiuddin Ahmed, who are now detained in this jail have started hunger strike from this morning stating that they will fast upto death if they are not released unconditionally.
৫৮. Letter from M.S. Haider, superintendent of Police, D.I.B, Faridpur, Dated 27.2.1952 to Hussain, Esqr, Spl. Superintendent of Police, I.B, East Bengal, Dacca, Govt. of East Bengal, *Home Poll, F/N. 606-48 PF, Part-3* সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, মুক্তির আদেশ পাওয়ার পর শেখ মুজিব ২৫ ফেব্রুয়ারি বিকাল বেলা অনশন ভঙ্গ করেন। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, Security Prisoner Sk.

Mujibur Rahman broke his fast on receipt of the Government order for his release on the afternoon of 25.2.1952. He was let off from the jail on the morning of 27.2.1952.

৫৯. Letter from S.Wazed Ali D.I.B, Gopalgonj, Faridpur. Dated 22.4.1952 to the O/C. Watch I.B, Dacca. Govt. of East Bengal, *Home Poll. F/N. 606-48 PF, Part-4*

৬০. Govt. of East Bengal, *Home Poll. F/N. 606-48 PF, Part-4*

৬১. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০-২১২

৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২-২১৪

৬৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬-২১৮

৬৪. প্রগ্রেসিভ পেপারস লিমিটেড এর পক্ষ থেকে মিয়া মুহাম্মদ ইফতেখার উদ্দিনের সম্পাদিত *পাকিস্তান টাইমস* পত্রিকা ১৯৪৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ এর দশকে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার মাধ্যমে তৎকালীন সময়ের প্রভাবশালী ও সর্বাধিক প্রচারিত ইংরেজি পত্রিকায় পরিণত হয়। ১৯৯৬ সালে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। *ইমরোজ* পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত উর্দু ভাষার দৈনিক পত্রিকা। ১৯৪৭ সালে এ পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। উর্দু সাংবাদিকতায় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারণে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাছাড়া সমকালীন রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে তৎকালীন সময়ে উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। পত্রিকা দুটি প্রগতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী ভূমিকা পালন করলেও এর পরিচালকবৃন্দ কোন সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে তুলতে না পারায় পত্রিকা দুটি আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়। তারিক আলী, (অনুবাদ মাহফুজ উল্লাহ) *পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ জান্তা না জনতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৭

৬৫. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬-২২০

৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০-২২৩

৬৭. Govt. of East Bengal, *Home Poll. F/N. 606 PF, Part-4*. Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister of GOB), *Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 1951-1952, vol-2, ibid*, p. 66-67, 313, 396

৬৮. *ibid*, p. 340, 348-349, 353-354

৬৯. *ibid, vol-2*, p. 283-290, 300-385. Govt. of East Bengal, *Home Poll. F/N. 606 PF, Part-4 & 5*, শেখ মুজিব ও তার সঙ্গী অন্যান্য নেতাদের সংবর্ধনা জানানোর জন্য রংপুর আওয়ামী মুসলিম লীগ যে কমিটি গঠন করেছিল তা নিম্নরূপ :

১. ডা. মোজাহের উদ্দিন আহমদ–প্রেসিডেন্ট
২. আবুল হোসাইন– সেক্রেটারি
৩. এয়াকুব মাহফুজ–সদস্য
৪. মাজেদুল হক–সদস্য
৫. নুরুল হক বি.এল–সদস্য
৬. মিয়া আবদুল হাফিজ– সদস্য
৭. শাহ আবদুল বারি– সদস্য
৮. মাজেদুল হক– সদস্য GOEB, *Home Poll. F.N. 606-48 PF, Part-5*

৭০. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২২৩

৭১. চীন সরকারের উদ্যোগে ১৯৫২ সালের ২-১২ অক্টোবর পিকিং এ এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলন আহবান করা হয়। এ সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৫ জন যোগদান করেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান এ সম্মেলনে বাংলায় বক্তৃতা প্রদান করেন। শেখ মুজিবুর রহমান, *আমার দেখা নয়াচীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯

৭২. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০-২২৩

খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (১৯২৩-১৯৯৫) সাংবাদিক, লেখক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ। তিনি ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে কলকাতায় *দৈনিক আজাদ* ও *দৈনিক ইত্তেহাদে* সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করে। দেশ বিভাগ পরবর্তীকালে ঢাকা থেকে *সাপ্তাহিক যুগের দাবি* পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার প্রেক্ষাপটে তিনি ভারতে গমন করেন এবং যুদ্ধে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেন। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের (১৯৭৮-১৯৮১) কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন। ভাসানী যখন ইউরোপে, কতো ছবি কতো গান, মুজিববাদ, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা। শেখ মুজিবুর রহমান, *আমার দেখা নয়াচীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭

সৈয়দ ইউসুফ হাসান পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি উর্দু ভাষার কবি হিসেবে অধিক পরিচিত। ১৯৫২ সালে চীনের পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে শেখ মুজিবুরের সাথে যোগদান করেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান, *আমার দেখা নয়াচীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯

৭৩. Sheikh Hasina (Hon’ble Prime Minister of GOB), *ibid,* p. 282-284. শেখ মুজিবুর রহমান, *আমার দেখা নয়াচীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২২
৭৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *আমার দেখা নয়াচীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৪০
৭৫. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮-২৩৫
৭৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮-২৪০
৭৭. Sheikh Hasina (Hon’ble Prime Minister of GOB), *ibid,* p. 480-491
৭৮. Sheikh Hasina (Hon’ble Prime Minister of GOB), 1953, *vol-3, ibid,* p. 422-425
৭৯. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৪
৮০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫
৮১. Sheikh Hasina (Hon’ble Prime Minister of GOB), *ibid,* p. 434-457
৮২. *ibid, p. 458-460, 465-473*
৮৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫-২৫৫
৮৪. **ওয়াহিদুজ্জামান (১৯১২-১৯৭৬)** পূর্ব পাকিস্তানের একজন প্রভাবশালী মুসলিম লীগ নেতা। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে প্রার্থীতা করে তিনি পরাজিত হন। পরবর্তীতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের মন্ত্রী মনোনীত হন। শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৮
৮৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫-২৬০
৮৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫-২৫৯
৮৭. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস ১৯৪৯-১৯৭১*, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ৩৯-৪২
৮৮. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫-২৬১
৮৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১-২৬৭। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য থাকাবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান ও এ কে ফজলুল হকের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সময় তিনি ফজলুল হকের ভক্ত হয়ে যান। এ সম্পর্কে অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে উল্লেখ আছে, “তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতে শুরু করেছেন। দরকার না হলেও আমাকে ডেকে পাঠাতেন। তিনি খবরের কাগজের প্রতিনিধিদের বলেছেন, আমি বুড়া আর মুজিব গুড়া, তাই ওর আমি নানা ও আমার নাতি।” শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১-২৬৭
৯০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০-২৭৩
৯১. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, খোশরোজ কিতাব মহল লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৭৬-৭৮
৯২. শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫
৯৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫-২৮০
৯৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০-২৮৮
৯৫. S.A Karim, *Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy*, U.P.L. Publications, Dhaka, 2009, p.63 আওয়ামী লীগের ৩৫ জন সদস্য সালাম খানের নেতৃত্বে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন।
৯৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫-২৮০
৯৭. মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯-৮০
৯৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২-৮০
৯৯. ফকরুল আলম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১
১০০. Shahryar Iqbal (ed.), *Sheikh Mujib in Parliament 1955-58,* Agami Prokashoni, Dhaka, 1997, p. 107
১০১. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪-২৯৫
১০২. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০-৩১
১০৩. S.A Karim, *Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy, ibid,* p.80
১০৪.মিজানুর রহমান চৌধুরী, *রাজনীতির তিনকাল*, হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩২-৩৩
১০৫. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২-৯৩
১০৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪-২৯৫
১০৭.ফকরুল আলম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩
১০৮.**ইবরাহিম ইসমাইল চুন্দ্রিগড় (১৮৯৯-১৯৬০)** ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তাছাড়া তিনি দুই মাসের (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৫৭) জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১০
১০৯. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪-২৯৫
১১০.শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, ২৯০-২৯৪

১১১. Sheikh Hasina (Hon’ble Prime Minister of GOB), *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 1958-1959, vol-5, ibid,* p. 40-49

১১২. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯০-২৯৪

১১৩. মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৭

১১৪. মযহারুল ইসলাম, *ভাষা আন্দোলন ও শেখ মুজিব*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২১১

১১৫. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

১১৬. শহীদ আশরাফ (সম্পা.) *শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৭১, পৃ. ৭৬-৯১

১১৭. আব্দুল হক, *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ১৯৫৩-’৯৩*, ইউ পি এল, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১০২

১১৮. মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭

১১৯. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৫-২৯৬

১২০. হারুন-অর-রশিদ, *আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফার ৫০ বছর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১০৯

১২১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

১২২. মোহাম্মদ সেলিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২

১২৩. হারুন-অর-রশিদ, *আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফার ৫০ বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯

১২৪. *দৈনিক অবজারভার*, ঢাকা, ৩ মে ১৯৬৬

১২৫. *দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ৮ এপ্রিল ১৯৬৬

১২৬. মোহাম্মদ সেলিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২

১২৭. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১-১৫৩

১২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮-১৬০

১২৯. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬

১৩০. শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৫-১৬

১৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫-২০। আগরতলা মামলা যে সত্য ছিল তা বিস্তারিত জানতে কর্ণেল শওকত আলীর গ্রন্থ *সত্য মামলা আগরতলা* দ্রষ্টব্য।

১৩২. বক্তব্য, তোফায়েল আহমেদ (এম.পি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ) প্রামাণ্য চিত্র: টুঙ্গীপাড়া থেকে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান, ৭ মার্চ, ২০২০, বিটিভি ওয়ার্ল্ড থেকে প্রচারিত।

১৩৩. কাজী সিরাজুল ইসলাম, আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও মো: জাহিদ হোসেন (সম্পা.), *বাংলাদেশ : প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বিবৃতি, বাণী, নির্দেশ ও সাক্ষাৎকার-শেখ মুজিবুর রহমান*, বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩৭৩

১৩৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭

১৩৫. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮০-৮৫

১৩৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

১৩৭. *মর্নিং নিউজ*, ঢাকা, ২ মার্চ ১৯৭১

১৩৮. *দ্য ডন*, ৮ মার্চ ১৯৭১। হাসান হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০৩-৭০৫। হারুন-অর-রশিদ, *৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২-৩৭

১৩৯. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ঢাকা, ২৩ মার্চ ১৯৭১। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭৫-৭৮৯। হারুন-অর-রশিদ, *৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৮

১৪০. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৮

১৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৮-২৯৯

১৪২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২-৮

১৪৩. **এম.এ.হান্নান (১৯৩০-১৯৭৪)** ঢাকার জগন্নাথ কলেজে অধ্যয়নকালে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে চট্টগ্রামে জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে ছয়দফা আন্দোলনের সময় শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে সরাসরি আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলা বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৮ সালে তিনি চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ১৯৭০ সালে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে ‘সোয়াত’ নামক জাহাজ থেকে পাকিস্তানিদের অস্ত্র খালাসের বিরুদ্ধে ছাত্র, শ্রমিক জনতাকে নিয়ে প্রতিরোধ করেন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমান প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণা কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পাঠ করেন। বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের জন্য তাকে ২০১৩ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করা হয়। মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, *বাংলাপিডিয়া*

১৪৪. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২-৮

১৪৫. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০০-৩০২

২.২ আনোয়ারা খাতুন (১৯১৯-১৯৮৮)

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের স্বনামধন্য নারী নেতৃত্ব আনোয়ারা খাতুন। তিনি ১৯১৯ সালের ১৭ জানুয়ারি ঢাকা জেলার মিরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুর রহিম পেশায় ছিলেন একজন প্রকৌশলী। ১৯৩১ সালে তেরো বছর বয়সে আলী আমজাদ খানের সাথে আনোয়ারা খাতুনের বিবাহ দেওয়া হয়। তার স্বামী আলী আমজাদ খান ছিলেন আইনজীবী ও আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহ সভাপতি। আনোয়ারা খাতুন বিবাহের পর পড়াশোনা শেষ করেন এবং কিছুদিন শিক্ষাকতা করেন। তার স্বামী কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে প্রাকটিস করার কারণে তিনি এসময় স্বামীর সাথে কলকাতায় ছিলেন।[১] তিনি পারিবারিক সম্পর্কের সূত্র ধরেই রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তিনি ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ পূর্বকাল থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। আবার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। আনোয়ারা খাতুন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩), মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) ও শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে রাজনীতিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি প্রথম মুসলিম মহিলা হিসেবে ১৯৪৬ সালে তৎকালীন পূর্ববঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।[২] দেশভাগের পর ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা বাংলাকে দুইটা অংশে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। বাংলা বিভক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পূর্ববাংলার আইন সভার জন্য নেতা নির্বাচনের নির্দেশ দেন। ১৯৪৭ সালের ৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত নির্বাচনে খাজা নাজিমুদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪) ৭৫-৩৯ ভোটে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) কে পরাজিত করে সংসদীয় নেতা নির্বাচিত হন।[৩] এ নির্বাচনে আনোয়ারা খাতুন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর পক্ষে কাজ করেন।[৪]

খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীন পূর্ববাংলার প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করেন।[৫] এ মন্ত্রিসভায় পূর্ববর্তী সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার কোন সদস্যকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[৬] পূর্ববাংলার সামগ্রিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আনোয়ারা খাতুন সবসময় সজাগ থাকতেন। এরই প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলের নেতাদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা তৈরি হতে থাকে। খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সোহ্‌রাওয়ার্দী সমর্থক কাউকে তার মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত না করায় অন্যান্য নেতার মত আনোয়ারা খাতুন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।[৭] ফলে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হতে শুরু করে। স্বভাবতই নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতা ও ঐক্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়।[৮]

দেশভাগের পর মুসলিম লীগের (১৯০৬) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যায়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) বড় লাট হওয়ার ফলে চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে (১৮৮৯-১৯৭৩) পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচন করেন। তিনি পাকিস্তান মুসলিম লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দিয়ে একটি

'এডহক' কমিটি গঠন করেন। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম লীগকে অক্ষত রেখে বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ভেঙ্গে দেন। মূলত পূর্ব পাকিস্তানে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সমর্থক বেশি থাকায় এবং নাজিমুদ্দিন গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে নতুন করে মুসলিম লীগ গঠন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য মওলানা আকরম খাঁ-কে চিফ অর্গানাইজার করা হয়। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান ১১২ জন কাউন্সিল সদস্যের দস্তখত নিয়ে একটি রিক্যুইজিশন সভা আহ্বান করার দাবি করেন। কাউন্সিল সদস্যের মধ্যে আনোয়ারা খাতুন একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।[৯] মুসলিম লীগ 'এডহক' কমিটি গঠন করার পর পূর্ব পাকিস্তানের পুরানো মুসলিম লীগ কর্মীরা একত্রিত হতে থাকে।[১০]

সংস্কারপন্থি মুসলিম লীগ কর্মী আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) সাংগঠনিক তৎপরতার অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৪৪ সালের ৯ এপ্রিল তরুণ নেতা শামসুল হকের (১৯১৮-১৯৬৫) সুযোগ্য কর্তৃত্বাধীনে ঢাকার ১৫০ চক মোগলটুলীতে কর্মী শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে সোহ্‌রাওয়ার্দী-হাশিম জোট সমর্থক মুসলিম লীগ ও ছাত্র কর্মীবৃন্দ কলকাতা ও অন্যান্য স্থান হতে ঢাকায় এসে ১৫০ মোগলটুলীস্থ পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ কর্মী শিবিরের শক্তিবৃদ্ধি ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে লাগেন।[১১] যে কারণে খাজা নাজিমুদ্দিন-আকরম খাঁ জোট ১৫০ মোগলটুলী কর্মী শিবিরকে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।[১২] তাই কর্মী শিবিরের পক্ষ থেকে শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫), ফজলুল কাদের চৌধুরী (১৯১৯-১৯৭৩), আবদুস সবুর খান (১৯০৮-১৯৮২), আতাউর রহমান খান (১৯০৭-১৯৯১), খোন্দকার মোশতাক আহমদ (১৯১৮-১৯৯৬), শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫), কামরুদ্দীন আহমদ (১৯১২-১৯৮২) ও আনোয়ারা খাতুন প্রমুখ তরুণ নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কমিটি সভাপতির সাথে সাক্ষাৎ করে প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ রশিদ বই সরবরাহ করতে অনুরোধ জানান।[১৩] সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ অনুরোধ রক্ষা করতে অসম্মতি জানালে নারায়নগঞ্জ রহমতুল্লাহ ইনস্টিটিউটে মুসলিম লীগ কর্মীদের সম্মেলন আহ্বান করা হয়। খান সাহেব ওসমান আলী এম এল এ কে সভাপতি নির্বাচিত করে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়। নির্ধারিত স্থানে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে সম্মেলন পাইকপাড়া ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে স্থির হয় যে, জনাব আতাউর রহমান খান (১৯০৫-১৯৯১), আবদুস সালাম খান (১৯০৬-১৯৭২), ফজলুল কাদের চৌধুরী (১৯১৯-১৯৭৩), খয়রাত হোসেন (এমএলএ) (১৯১১-১৯৭২) ও মিসেস আনোয়ারা খাতুন করাচি মুসলিম লীগ প্রধান চৌধুরী খালিকুজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করবেন।[১৪] পরবর্তীতে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সিদ্ধান্ত হয় যে, দুইজন প্রতিনিধি আতাউর রহমান খান ও আনোয়ারা খাতুন করাচি গিয়ে চৌধুরী খালিকুজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। পুরানো মুসলিম লীগ কর্মীদের দাবি ছিল তারা মুসলিম লীগে কাজ করার অধিকার চায়।[১৫] চৌধুরী খালিকুজ্জামান প্রতিনিধিদ্বয়ের বক্তব্য আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করেন কিন্তু প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহে রসিদ বই সরবরাহ করার ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে অসম্মতি জানান। এভাবে নিষ্ঠাবান, দেশপ্রেমিক কর্মীবৃন্দ অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ে। ফলে মুসলিম লীগ আকরম খাঁ-নাজিমুদ্দিন জোটের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে।[১৬] দেশ বিভাগের পর মুসলিম লীগের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তিতে ব্যবহৃত রশিদ বই

সংগ্রহ ইস্যু থেকে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং মতপার্থক্যের সূচনা হয়। বিদ্যমান সূত্র ধরেই পরবর্তীতে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বিস্তার লাভ করে। আর এ মতপার্থক্যের দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফল ছিল বাংলাদেশের সৃষ্টি। মুসলিম লীগ নেতৃত্বের রাজনৈতিক অনৈক্যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যাপারে কর্মীদের মধ্যে মতানৈক্য তৈরি হলে আলী আমজাদ খানের বাড়িতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৫০ মোগলটুলীতে একটি বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে মওলানা ভাসানী আলী আমজাদ খানকে (আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহ সভাপতি) সভাপতি এবং ইয়ার মুহাম্মদ খানকে (১৯২০-১৯৮১) সম্পাদক করে একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করেন।[১৭] মূলত মুসলিম লীগ নেতৃত্ব থেকে কর্মী শিবিরের তরুণ নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্য অসহযোগিতা উপলব্ধি করে স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মী সম্মেলন আহ্বান করেন। মুসলিম লীগ সরকারের ভয়ভীতি, ত্রাস ও নির্যাতনকে উপেক্ষা করে জনাব কে এম বশীর হুমায়ুনের কে এম দাস লেনস্থ বাসভবন 'রোজ গার্ডেনে'র হল কামরায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ জুন ১৯৪৯ রোজ গার্ডেন হল কামরায় সম্মেলন শুরু হয়। আনোয়ারা খাতুন রোজ গার্ডেন সম্মেলনে উপস্থিত থেকে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১৮] আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের তরুণ নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। আর এ তরুণ নেতৃত্বের সার্বক্ষণিক নারী কর্মী সংগঠক ছিলেন আনোয়ারা খাতুন। তবে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের পেছনে কেবল একদল তরুণ কর্মীর সাথে মুসলিম লীগের আদর্শগত এবং ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বই নয়, বাঙালি জাতির সংস্কৃতি ও ভাষা সংরক্ষণ করা এবং এর প্রতি প্রদর্শিত অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঙালির একটি জোরালো প্রতিরোধ প্রচেষ্টা কাজ করেছিল।[১৯] একজন নারী নেত্রী হিসেবে আনোয়ারা খাতুন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের এ প্রচেষ্টায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কারণ 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করার সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আদর্শ ভিত্তিক দলীয় রাজনীতির গোড়াপত্তন হয়।

আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর নব্যগঠিত সংগঠনের সাংগঠনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায়ও আনোয়ারা খাতুন অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। কারণ প্রতিষ্ঠাকালীন নারী সদস্য হিসেবে সংগঠনের পরবর্তী সকল কার্যক্রমে তিনি অংশগ্রহণ করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর সাংগঠনিক কর্মপন্থা ও সরকারের সমালোচনার জন্য দলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো। আনোয়ারা খাতুন বেশির ভাগ সম্মেলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। তার সাংগঠনিক অবদানের কথা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন,

> "...এই সময় একজনের অবদান অস্বীকার করলে অন্যায় করা হবে। বেগম আনোয়ারা খাতুন (এম এল এ) এ প্রতিষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট কাজ করতেন। দরকার হলে টাকা পয়সা দিয়েও সাহায্য করতেন।"[২০]

'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠনের পর প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি সংকটকালে আনোয়ারা খাতুন দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বসহ পুরানো নেতারা যখন দল থেকে পদত্যাগ করছিলেন তখনও তিনি দলের সাথে

ছিলেন। যখন এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) স্বল্প সময়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের সদস্যপদ থাকার পর ব্যক্তিগত কারণে এ দল ত্যাগ করেন তখন অনেক পুরানো নেতা গ্রেফতারের ভয়ে বিবৃতি দিয়ে পদত্যাগ করেন। এরূপ সংকটকালীন সময়ে অন্যান্য ত্যাগী নেতাদের মতো আনোয়ারা খাতুন 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র সংগঠনিক কাজ দক্ষতার সাথে চালিয়ে গেছেন। দলীয় স্বার্থে সবসময় নেতাদের পাশে ছিলেন। 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের মতাদর্শে বিশ্বাসী থেকেছেন এবং আন্তরিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।[২১] আওয়ামী মুসলিম লীগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও আলোচনা তার নিজ বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।[২২]

১৯৪৯ সালের ২৩ অক্টোবর মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে লিয়াকত আলী খানের পূর্ব পাকিস্তান সফরে বাঁধা প্রদান এবং তার দ্বারা পরিচালিত সরকার বাঙালি পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর যে অমানবিক কর্মকাণ্ড করেছেন তার সমালোচনা করার উদ্দেশ্যে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের জনসভা আহ্বান করা হয়।[২৩] শেখ মুজিবুর রহমান এ সভার অব্যবহিত পূর্বে গেফতার হন। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করানোর জন্য আনোয়ারা খাতুনের ভাই পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন। এ ঘটনা জানার পর আনোয়ারা খাতুন ও তার স্বামী আলী আমজাদ মিলে তাদের বাসা থেকে ভাইকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, আনোয়ারা খাতুন নিজের পরিবার থেকেও দলীয় নেতা কর্মীদের স্বার্থে অগ্রাধিকার দিতেন। শেখ মুজিবকে গ্রেফতারের পর প্রথমে লালবাগ থানায় জিজ্ঞাসাবাদের পর ঢাকা কোতয়ালী থানায় নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন,

> "...আমাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার দেখাল এবং সন্ধ্যার পরে কোতয়ালী থানায় নিয়ে গেল। সন্ধ্যার পরে আনোয়ারা খাতুন এম এল এ, আতাউর রহমান খান সাহেব আমার বিয়াই দত্তপাড়ার জমিদার শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরী এম এল এ আমাকে দেখতে থানায় এসেছিলেন।"[২৪]

আনোয়ারা খাতুন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে দলীয় নেতাকর্মীদের যে কোন সংকটকালীন সময় যোগাযোগ রাখতেন। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করতেন। বিভিন্ন নেতাকর্মী গ্রেফতার হলে তাদের দেখাশোনাসহ জেল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতেন। আবার কোন নেতা অসুস্থ হলে অর্থ দিয়েও সাহায্য করতেন। একবার মওলানা ভাসানী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান খবর পেয়ে মওলানা ভাসানীকে দেখতে আসেন। সরকারের পক্ষ থেকে খরচ বহন করতে অস্বীকৃতি জানালে শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্নভাবে চিকিৎসা ব্যয় জোগাড় করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে চিকিৎসা ব্যয় সংকটের কথা জানতে পেরে আনোয়ারা খাতুন মাঝে মাঝে শেখ মুজিবুর রহমানকে অর্থের ব্যবস্থা করে দিতেন।[২৫] এভাবে আনোয়ারা খাতুন অর্থ সাহায্যসহ বিভিন্নভাবে দলীয় নেতাকর্মীদের সাহায্য করতেন। তার বাড়িতে দলীয় নেতাদের অবস্থান করানো সহ থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। আনোয়ারা খাতুন কেন্দ্রীয়

রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতেন। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ঢাকায় আসেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় কাজ করার জন্য। এসময় তিনি প্লেন থেকে নেমে প্রথমেই বেগম আনোয়ারা খাতুনের বাসায় যেয়ে দুপুরের খাবার খান। সরকারি বিধি নিষেধের কারণে টাঙ্গাইলের নির্ধারিত জনসভায় যেতে না পারায় সোহ্‌রাওয়ার্দী ঢাকায় অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতিতে তাকে নিজ বাসায় রাখার সাহস আনোয়ারা খাতুনের ছিল। কিন্তু আনোয়ারা খাতুনের বাসা খুবই ছোট ছিল। এ প্রসঙ্গে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

> "...শহীদ সাহেব জাহাজ ছেড়ে নেমে আসলেন, আমিও তার মালপত্র নিয়ে সাথে সাথে এলাম। কোথায় থাকবেন? আর কেইবা জায়গা দেবেন? কোন হোটেলও নাই। বেগম আনোয়ারার সাহস আছে, কিন্তু তাদের বাড়িটায় জায়গা নাই।"[২৬]

বেগম আনোয়ারা খাতুন নিজ সাংগঠনিক যোগ্যতায় তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের আস্থাভাজন হতে পেরেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান অল পাকিস্তান জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগের আহবায়ক হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর অনুরোধে ১৯৫৩ সালের ২৯ জুলাই আনোয়ারা খাতুনের কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। এই চিঠিতে অল পাকিস্তান জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য (আনোয়ারা খাতুন) মনোনীত হওয়ার কথা জানান। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র নারী সদস্য হিসেবে তিনি এ কমিটিতে মনোনয়ন পেয়েছিলেন।[২৭]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা শুরু করে। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ১৯৪৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সংবিধান সভায় মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন।[২৮] ১৯৪৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হলে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১) একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব করলে তা নাকচ হয়ে যায়।[২৯] তাই পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস যুক্তভাবে সর্বদলীয় সভা আহবান করে।[৩০] ভাষা আন্দোলনের পুরোধা অধ্যাপক আবুল কাসেম (১৯২০-১৯৯১) এবং আন্দোলনের সূচনাকারী সংগঠন তমদ্দুন মজলিশের সাথে আনোয়ারা খাতুন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।[৩১] ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত সভায় পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস (১৯৪৭), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ লীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ছাত্রসংসদ এবং কলেজ প্রতিনিধিবৃন্দকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্ব কমিটি গঠন করা হয়। এ সভায়ই 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এ সম্পর্কে অলি আহাদ তার গ্রন্থে বলেন,

> "পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে সোহ্‌রাওয়ার্দী সমর্থক মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যদের তরফ হইতে জনাব তফাজ্জল আলী, জনাব আলী আহমদ খান ও মিসেস আনোয়ারা খাতুন কমিটির সহিত যোগাযোগ রক্ষা

করিতেন। তবে একমাত্র মিসেস আনোয়ারা খাতুনই ১১ মার্চের হরতাল সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য সর্বোতভাবে সহায়তা করিয়াছেন।"[৩২]

'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে'র সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১১ মার্চ বাংলা ভাষা দাবি দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১১ মার্চ আয়োজিত সধারণ ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত করার আহ্বান জানিয়ে ৩ মার্চ ১৯৪৮ ঢাকা থেকে যে সকল নেতৃবৃন্দ বিবৃতি প্রদান করেন তার মধ্যে বেগম আনোয়ারা খাতুন (এমএলএ এবং সম্পাদিকা পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি) উল্লেখযোগ্য একজন বিবৃতিকারী ছিলেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের রাজপথের আন্দোলনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৩৩] সর্বদলীয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১১ মার্চ 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' পালনকালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক শত শত নেতা কর্মী নির্যাতনের স্বীকার হয় এবং গণগ্রেফতার শুরু করে। তাছাড়া ১১ মার্চ ভাষার দাবিতে ঢাকায় হরতাল পালন করার সময় ব্যাপক পুলিশী নির্যাতনে অসংখ্য মানুষ হতাহত হয়। শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদসহ গ্রেফতার করা হয় সরকারি হিসেবে ৬৫ জনকে।[৩৪]

১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ দুপুর ১ টায় পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন বসলে ২৯ ফেব্রুয়ারি ও ১১ মার্চের ঘটনা নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা হয়। অধিবেশনে ভাষার প্রশ্ন আলোচনায় অংশ নেন ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১), আনোয়ারা খাতুন, মওলানা ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬), খাজা নাজিমুদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪), মনোরঞ্জন ধর (১৯০৪-২০০০), এ এম মালিক (১৯০৩-১৯৭৭), শামসুদ্দীন আহমেদ (১৮৮৯-১৯৬৯), মাহমুদ আলী (১৯১৯-২০১৬), এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) প্রমুখ।[৩৫] অধিবেশন চলাকালে অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে আনোয়ারা খাতুন বলেন, "গত ১১ মার্চ তারিখে যা হয়েছে তা; আজ পুলিশ মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছে; গলা টিপে ধরেছে; তার প্রতিকার চাই। ঐ সমস্ত চোরামী এখানে চলবেনা। আমরা চাই প্রধানমন্ত্রী সেখানে গিয়ে দেখে আসুক।" আনোয়ারা খাতুনের এই বলিষ্ঠ দাবিকে সমর্থন করে শামসুদ্দীন আহমদ বলেন যে, "পুলিশ যখন মেয়েদের গায়ে হাত তুলেছে তখন এই মুহূর্তে সকলের পদত্যাগ করা উচিৎ।" তাছাড়া অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগ পার্টি ও সরকারের দমন নিপীড়ন ও গণগ্রেফতারের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ শুরু করেন।[৩৬] ফলে আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে। তাই খাজা নাজিমুদ্দিন ঘাবড়িয়ে গিয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলাপ করে চুক্তি করতে বাধ্য হয়।[৩৭]

পূর্ব পাকিস্তানের জন-মানুষের কল্যাণে সকল প্রকার উদ্যোগে আনোয়ারা খাতুন সক্রিয় থাকতেন। ১৯৫০ সালের ১৭ আগস্ট ঢাকায় একটি ছাত্র কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা শহরে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৩৮] আনোয়ারা খাতুন (এম এল এ) নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে সমর্থন প্রদান করে বিবৃতি প্রদান করেন। তাছাড়া সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করতে জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানান।[৩৯]

আনোয়ারা খাতুন পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ এবং রাজনীতির কল্যাণে সবসময়ই নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের সময় নারী আন্দোলনের সূচনা পর্ব চললেও দীর্ঘ সময় ধরে পূর্ব পাকিস্তানে যারা রাজনৈতিক সংগঠনে, নারী শিক্ষা প্রসারে, নারী সমাজকে সংগঠিত করে, নারী আন্দোলন সংগঠনে কাজ করেছিলেন তাদের মধ্যে আনোয়ারা খাতুন ছিলেন অন্যতম। এসময় তিনি ভাষা আন্দোলনে সকল স্তরের নারীদের আহবান করেন।[৪০] তিনি ভাষা আন্দোলনের সকল পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে চুক্তির পর ভাষা আন্দোলনের গতি কিছুদিন ধীর হলেও খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। কেননা ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি আপরাহ্নে ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে।" তিনি আরো বলেন, "পরীক্ষামূলক একুশটি কেন্দ্রে বাংলা ভাষাকে আরবি হরফে লেখার প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে ও জনগণ স্বীয় উদ্যোগে নতুন কেন্দ্র খুলিতেছে।" ছাত্র জনতার তীব্র আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করে ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ তদানিন্তন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি বেমালুম ভুলে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন জনসভায় উপরোক্ত উক্তি করেন। তার এই ঘোষণার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ৩০ জানুয়ারি ১৯৫২ ছাত্র ধর্মঘট ও সভা আহ্বান করে। ছাত্রসভায় ৪ ফ্রেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘট, ছাত্রসভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সাধারণ সভায় মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে কাজী গোলাম মাহবুবকে (১৯২৭-২০০৬) আহবায়ক করে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। ৪০ সদস্য বিশিষ্ট এ পরিষদে আনোয়ারা খাতুন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের একমাত্র মহিলা সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।[৪১] 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে'র সদস্য হিসেবে তিনি সকল দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া এ পরিষদ গঠন পরবর্তীকালের সকল কর্মসূচিতে আনোয়ারা খাতুন অংশগ্রহণ করেন এবং তার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন।[৪২]

১৯৫২ সালের প্রথম থেকেই ভাষা আন্দোলন জোরালো হতে থাকে। ১৯৫২ সালের ২০ ফ্রেব্রুয়ারি রাতে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগে'র ৯৪ নবাবপুর রোডের ঢাকা অফিসে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে'র সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৪৩] এ বৈঠকে কমিটির সদস্য হিসেবে আনোয়ারা খাতুন (এম এল এ) উপস্থিত ছিলেন।[৪৪] এ সভা আহ্বানের প্রধান কারণ ছিল ঢাকা শহরে ২০ ফ্রেব্রুয়ারি থেকে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারির প্রতিবাদে কর্ম নির্ধারণ করা। এমনই পরিস্থিতিতে পরদিন ২১ ফ্রেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল বের করা হবে কিনা এ নিয়ে সংগ্রাম পরিষদের সভায় আলোচনা ও বিতর্ক হয়।[৪৫] সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে আতাউর রহমান (১৯০৭-১৯৯১), শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫), খয়রাত হোসেন (১৯০৯-১৯৭২), আনোয়ারা খাতুন, আবুল কাশেম (১৯২০-১৯৯১), শামসুল হক চৌধুরী (১৯৩০-২০০৫), খালেক নওয়াজ খান (১৯২৬-১৯৭১) প্রমুখ ১৪৪ ধারা অমান্য করার বিরুদ্ধে ছিলেন।[৪৬] এ সময় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা না ভাঙ্গার পক্ষ

বিপক্ষের গ্রুপের মধ্যে মত দ্বৈততার সৃষ্টি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবদুল মতিনের নেতৃত্বে সাধারণ ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে।[৪৭] ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ঢাকার জেলা প্রশাসক শামসুল হক কোরায়শী প্রয়োজনীয় ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় না দিয়ে পুলিশকে বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর গুলি চালানোর আদেশ দেন।[৪৮] পুলিশের গুলি শুরু হয় বেলা তিনটায়, নিহত হন আবুল বরকত (১৯২৭-১৯৫২), জব্বার (১৯১৯-১৯৫২), সফিউর রহমান (১৯১৮-১৯৫২), সালাম (১৯২৫-১৯৫২) ও আরো অনেকে যাদের নাম জানা যায়নি। ২১ ফেব্রুয়ারি গুলি বর্ষণের পর মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ২০ নম্বর শেডের মধ্য থেকে মাইকে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ এবং আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা বলে প্রচার কাজ শুরু হয়েছিল।[৪৯] তাছাড়া ঐ সময় গুলিতে হতাহত ছাত্রদের রক্তাক্ত জামা কাপড় তুলে ধরে পুলিশী নির্যাতনের নিদর্শনস্বরূপ সেগুলি সমাবেত জনতার সামনে প্রদর্শন করা হচ্ছিল।[৫০] এ সময় পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের অধিবেশন চলছিল। পুলিশের গুলি বর্ষণের ব্যাপারে ব্যাখ্যা চেয়ে পরিষদ সদস্য আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৮৬) একটি মূলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করলে খয়রাত হোসেন ও বেগম আনোয়ারা খাতুন তা সমর্থন করেন।[৫১] এভাবে প্রথমে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এবং পরে খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮) এবং কংগ্রেসের সকল সদস্য অধিবেশন কক্ষ থেকে এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে 'ওয়াক আউট' করেন।[৫২]

১৯৫২ সালের ২২ ফ্রেব্রুয়ারি বিকাল ৪টা ৫ মিনিটে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৮৬), খয়রাত হোসেন (১৯১১-১৯৭২), ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১), শামসুদ্দীন আহমেদ (১৮৮৯-১৯৬৯), হাবিবুল্লাহ বাহার (১৯০৬-১৯৬৬), আবদুস সালাম (১৯০৬-১৯৭২) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব দাবির আলোকে প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[৫৩] এ অধিবেশনের আলোচনার এক পর্যায়ে আবদুস সালাম ও শামসুদ্দীন আহমেদ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। এরপর খয়রাত হোসেন নুরুল আমীনের প্রস্তাবের সংশোধনী হিসেবে যোগ করতে বলেন যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নটি সম্পর্কে সংবিধান সভার পরবর্তী অধিবেশনেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু স্পিকার তার এই প্রস্তাব এই যুক্তিতে অগ্রাহ্য করেন যে, কোন সদস্য একই বিষয়ে দুইবার সংশোধনী উত্থাপন করতে পারেন না। খয়রাত হোসেনের এই সংশোধনী প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়ে যাওয়ার কিছু পরে আনোয়ারা খাতুন ঐ একই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। খয়রাত হোসেনের পর মনোরঞ্জন ধর তার সংশোধনী প্রস্তাবে তার প্রস্তাবিত সংশোধনী হিসেবে মূল প্রস্তাবটিতে যোগ করতে বলেন, "যারা সাধারণ ও মুসলিম অংশ হিসেবে পরিষদের দ্বারা পাকিস্তান সংবিধান সভায় নির্বাচিত হয়েছেন তাদেরকে এই পরিষদের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হোক যাতে তারা এই প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলা ভাষার দাবিকে এগিয়ে নেন এবং গণপরিষদের সাধারণ অধিবেশনে ও সংবিধান প্রণয়ন সম্পর্কিত গণপরিষদের সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোতে সবধরণের প্রাপ্ত সমর্থন সংগঠিত করেন।"[৫৪]

নিজের সংশোধনীর স্বপক্ষে বক্তৃতা দানের সময় মনোরঞ্জন ধর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নে মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার সদিচ্ছার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন যে, তারা যদি সত্যি সত্যিই বাংলাকে

রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতি হতেন তাহলে ২১ ফেব্রুয়ারি যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তেমনটি হতো না। মনোরঞ্জন ধর এর সংশোধনীর সমর্থন এবং প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর (১৮৯৩-১৯৭৪) বক্তৃতার পর আনোয়ারা খাতুন তার সংশোধনীর পক্ষে বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে নাজিমুদ্দিনের স্বাক্ষরিত চুক্তি ও তার বরখেলাপের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন 'bluff' দেওয়ার অভ্যাস রপ্ত করা। ছাত্রছাত্রী এবং জনসাধারণের উপর পুলিশ ও মিলিটারীর গুলি এবং নির্যাতনের উল্লেখ করেন এভাবে যে, ঘটনা দেখে মনে হয় তখনও দেশটি পূর্ণ স্বাধীনতা পায়নি। পুলিশী জুলুমই তার প্রমাণ। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন যে, এ অত্যাচার থেকে মেয়েরা পর্যন্ত রক্ষা পায়নি। যে জাতি মাতৃ জাতির সম্মান দিতে জানেনা সে জাতির ধ্বংস অপরিহার্য্য। এ অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। মিলিটারি মেয়েদের গাড়ীতে করে নিয়ে কুর্মিটোলায় ছেড়ে দিয়েছে এবং পুলিশের লাঠিচার্জে মেয়েরা আহত হয়েছে। তিনি Ministry কে সাবধান করে বলেন যে, "যদি দেশের মঙ্গল চান তাহলে এই পন্থা ত্যাগ করুন। পুলিশ এবং মিলিটারি দিয়ে দেশ জনগণের ন্যায্য দাবি দমিয়ে রাখা যায় না। ... এটা শুধু ছাত্রদের দাবি নয়, এটা গোটা পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের অন্তরের কথা।"[৫৫] এরপর আনোয়ারা খাতুন সরকারকে যে পদক্ষেপগুলি তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করার দাবি জানান সেগুলি হলো,

১। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের বিনা শর্তে মুক্তি প্রদান।

২। পুলিশ এবং মিলিটারীর নির্যাতনে যারা নিহত ও আহত হয়েছেন তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ দান।

৩। এই সব হত্যা, নির্যাতন দুষ্কৃতির জন্য দায়ী অফিসারদের প্রকাশ্যে বিচার করা এবং

৪। সরকার কর্তৃক অন্যদের উপর নির্যাতনের নীতি বন্ধ করা।[৫৬]

পূর্ববঙ্গের ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন চলাকালীন ভিন্ন ভিন্ন নেতার আনীত প্রস্তাব ও সংশোধনী বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন আলোচনা করেন। তিনি আনোয়ারা খাতুনের প্রস্তাব ও সংশোধনী বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন, বেগম আনোয়ারা খাতুনের সংশোধনীর প্রস্তাবকে তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেন না কারণ এই বিষয়টি গণপরিষদের পরবর্তী বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপিত হবে কিনা সেটা নির্ধারণের কোন এখতিয়ারও তাদের নেই। আনোয়ারা খাতুনের সংশোধনীতে আছে যে, পাকিস্তান সংবিধান সভার পরবর্তী অধিবেশনে এ বিষয়ে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিৎ। এই পরিষদ নির্ধারণ করতে পারেনা কখন এটা সংবিধান সভা কর্তৃক উপস্থাপিত হবে। নিজের বক্তৃতার সময় বেগম আনোয়ারা খাতুন আরও অনেক বিষয়ে কতকগুলি দাবি উত্থাপন করেছেন এবং নূরুল আমীন উল্লেখ করেন একই দাবি কর্মপরিষদ নামে কমিউিনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত একটি সাইক্লোস্টাইল করা প্যাম্ফলেটে দেখেছেন। নূরুল আমীন আরও বলেন যে, এ দাবিগুলো হুবহু তাই যা বেগম আনোয়ারা খাতুন কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছে।[৫৭]

কর্ম পরিষদের এই উল্লেখের প্রতিবাদ করে মনোরঞ্জন ধর নূরুল আমীনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আনোয়ারা খাতুন যখন প্রস্তাব পেশ করেন তখন আপাত দৃষ্টিতে এই প্রস্তাবের বর্হিভূত কিছু বিষয় অন্যেরা আলোচনা করতে

চেয়েছিলেন। পরিষদের মাননীয় নেতা সে সময় এই প্রস্তাবগুলোর বিরোধিতা করেছিলেন। এখন তিনি পরিষদের সামনে নিয়ে আসা একটি কমিউনিস্ট প্যাম্ফলেট সম্পর্কিত কতগুলি বিষয় পরিষদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন।[৫৮]

এভাবে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ বাঙালির ভাষার দাবি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আনোয়ারা খাতুন এ ব্যবস্থাপক পরিষদের একজন নারী সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার পক্ষে জোরালো দাবি উত্থাপন করেন। ভাষা আন্দোলনের পর্যায়ে দেশে চরম উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করে। বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বাসভবনে 'সিভিল লিবার্টি কমিটি' গঠন করা হয়। আনোয়ারা খাতুন এ কমিটির পক্ষ থেকে দশ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু নূরুল আমীন পরিকল্পিতভাবে প্রতিনিধিদলকে সাক্ষাৎকারের সময় না দেওয়ায় কোন আলোচনা সম্ভব হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বজনীন রাজনীতির গৌরবময় পর্যায় তথা ভাষা আন্দোলনে আনোয়ারা খাতুন ধারাবাহিকভাবে ভূমিকা পালন করেন। পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে এবং পরিষদের বাইরে তিনি ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[৫৯] ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য নীতি ও নিপীড়ন পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করে। পূর্ব পাকিস্তানে আসন্ন প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালের ১২-১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে আওয়ামী মুসলিম লীগের দ্বিতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে যুক্তফ্রন্ট তথা মুসলিম লীগ বিরোধী নির্বাচনী জোট গঠন করা হয়।[৬০] ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে তথা যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আনোয়ারা খাতুন আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে ঢাকা সিটি পশ্চিম এলাকা থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তৎকালীন নারী নেত্রীরা তার নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন। বেগম আজিজা ইদ্রিস ঢাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেগম আনোয়ারার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার কাজ করেন।[৬১] আনোয়ারা খাতুনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও নির্বাচনী জোটের কারণে এ নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করেন। এ নির্বাচনে আনোয়ারা খাতুনের জয় ছিল তার রাজনৈতিক জীবনের বড় অর্জন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের এই ধারায় আঞ্চলিক মহিলা রাজনীতিবিদ হিসেবে আনোয়ারা খাতুনের ভূমিকা লিপিবদ্ধ করা এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[৬২]

১৯৫৪ সালের ১৯ মে পাকিস্তান মার্কিন সামরিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনের পর পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন পর্বের সূচনা হয়। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া ভীষণ আকার ধারণ করেছিল।[৬৩] এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে ঐক্যের প্রশ্নে আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যে ভাঙ্গনের পরিস্থিতি তৈরি হয়। আবদুস সালাম খান (১৯০৬-১৯৭২), এ কে ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) এ কে ফজলুল হককে চান না, তবে যুক্তফ্রন্টের ঐক্যের বিরোধী নন। এ সময় হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) ও মওলানা ভাসানীর (১৮৮০-১৯৭৬) বক্তব্যের ভেতর দিয়েও পারস্পরিক বিরোধিতার আভাস পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এ সময় আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে কৃষক শ্রমিক পার্টির সম্পর্কের

পুরোপুরি অবনতি হয়।[৬৪] কারণ ১৯৫৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি দলের সভায় ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন যার মূল কারণ ছিল যুক্তফ্রন্টের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা এ কে ফজলুল হক ঘোষণা করেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্টের কেউ নন, তিনিই নেতা। অথচ যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃবৃন্দরা চেষ্টা করতে থাকে যে সোহ্‌রাওয়ার্দী যাতে প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন। শেখ মুজিবুর রহমান এসময় কৃষক প্রজা পার্টির নেতাদের উদ্দেশ্যে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর পক্ষে প্রতিবাদ করতে থাকে।[৬৫] অনাস্থার পক্ষে একশত তের জন সদস্যের দস্তখত থাকা সত্ত্বেও ফজলুল হকের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি।[৬৬] আওয়ামী মুসলিম লীগের এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব যখন চরমে, তখন সামনে ছিলো পাকিস্তান গণপরিষদের নির্বাচন। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক ইউনিটগুলো ভেঙ্গে ফেলে ১৯৫৫ সালের ২৭ মার্চ এক ইউনিট ঘোষণা করেন। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৫৫ সালের ২০ এপ্রিল পল্টনের জনসভা থেকে স্পষ্ট হয় যে, আওয়ামী মুসলিম লীগ বাস্তবেই দ্বিখণ্ডিত। কারণ ১৯৫৫ সালের ২১ এপ্রিল আওয়ামী মুসলিম লীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ দিনটি ছিলো আওয়ামী মুসলিম লীগের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দিন। ওয়ার্কিং কমিটির এ সভায় হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সভাপতিত্ব করেন।[৬৭] যুক্তফ্রন্ট নিয়ে তর্ক বিতর্কের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানে 'মারী কনভেনশন'-এ যোগ দেওয়া নিয়ে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়।[৬৮] মূলত সংবিধান, গণপরিষদ ও এক ইউনিট প্রশ্নে সকল রাজনৈতিক দলের কনভেনশন অনুষ্ঠানের বিষয়কে ঘিরেই আলোচনা আবর্তিত হচ্ছিল। সোহ্‌রাওয়ার্দী এর কয়েকদিন আগে থেকেই সবাইকে এই কনভেনশনের তাৎপর্য সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথমে বেশ উৎসাহ নিয়েই এতে যোগদানের প্রস্তাব দিলেও আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে এর বিরোধিতা শুরু হয়। এ গ্রুপের বক্তব্য ছিল যে, মওলানা ভাসানী শুরু থেকেই 'মারী কনভেনশনে'র বিরোধিতা করে আসছেন। তিনি তিনদিন আগেই কলকাতায় বসে 'মারী কনভেনশন' বিরোধী বিবৃতিদেন। তার বক্তব্য ছিল, পূর্ববঙ্গে পার্লামেন্টারি শাসন ও রাজবন্দিদের মুক্তি দেওয়া না হলে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' 'মারী কনভেনশন' এ যোগ দেবে না। পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালের ২৪ এপ্রিল শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রচেষ্টায় মওলানা ভাসানীর ওপর থেকে পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধ উঠে যায় এবং ১৯৫৫ সালের ২৫ এপ্রিল মওলানা ভাসানী ঢাকায় এসে পৌঁছান। ১৯৫৫ সালের ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' এর ওয়ার্কিং কমিটির সভায় মওলানা ভাসানী 'মারী কনভেনশন' এ যোগদানের পক্ষে রায় দেন। ভিন্ন ভিন্ন মতামত থাকা সত্ত্বেও ২১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় 'মারী কনভেনশন' এ যোগদানের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। এ সিদ্ধান্তের সাথে আরেকটি সিদ্ধান্ত অনুসারে আনোয়ারা খাতুন সহ মোট আট জনকে আওয়ামী মুসলিম লীগের সকল বিভাগ থেকে বহিস্কার করা হয়। ১৯৫৫ সালের ২১ এপ্রিলের ওয়ার্কিং কমিটিতে আবদুস সালাম খানের পক্ষাবলম্বন তথা 'মারী কনভেনশনে' যোগদানের বিরোধিতা করার কারণেই আনোয়ারা খাতুন আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কৃত হন। এ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক

বহিস্কারের সাথে সাথে আট জনের দলীয় প্রাথমিক সদস্য পদও কেড়ে নেওয়া হয়। এভাবেই আনোয়ারা খাতুন আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে প্রাথমিক সদস্যপদ হারান।[৬৯]

১৯৫৫ সালের ২১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির এ সিদ্ধান্তে আনোয়ারা খাতুন খুবই মর্মাহত হন। মূলত এ ঘটনার পর থেকে আনোয়ারা খাতুন রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন ধারার অনুসারী হয়ে ওঠেন।[৭০] তিনি প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে থাকলেও পাকিস্তান সরকারের রোষাণলে পড়েছিলেন। পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পর পূর্ব পাকিস্তানে নিপীড়নমূলক বিভিন্ন আইন ও নীতি প্রয়োগ করেন। এরই দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানে ৪৩ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৯৫৯ সালের ৭ আগস্ট দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উত্থাপন করে তাদের বিরুদ্ধে EBDO (Election Bodies Disqualification Order, 1959) জারি করে। এদের মধ্যে প্রাক্তন পরিষদ সদস্য বেগম আনোয়ারা খাতুনকে আটাশ নম্বর ব্যক্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়।[৭১] আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হিসেবে তিনি সবসময় দলীয় স্বার্থে সোচ্চার ছিলেন। তিনি ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের (পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ) কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা মহিলা সদস্য। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আনোয়ারা খাতুন আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু মারী চুক্তিতে যোগদানের বিপক্ষে মতামত প্রদানের কারণে ১৯৫৫ সালে তাকে দলচ্যুত করা হয়। বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনে তার সরব উপস্থিতি তাকে একজন যোগ্য নেত্রীতে পরিণত করে। আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে আনোয়ারা খাতুন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আইনসভার ভেতরে ও বাইরে বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সময়ে ভাষা আন্দোলনের কয়েকটি গোপন আলোচনা, বৈঠক তার ঢাকাস্থ ২৩ নম্বর গ্রীন রোডের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া ভাষা আন্দোলন পরিচালনার অর্থসংগ্রহ কর্মসূচিতেও আনোয়ারা খাতুনের ভূমিকা ছিল। ভাষা আন্দোলনে মেয়েদের রাজপথের আন্দোলনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আনোয়ারা খাতুন আজীবন সংগ্রাম করেছেন।[৭২] ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০) নারী শিক্ষা বিস্তারসহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় জোরালোভাবে কাজ শুরু করেন।[৭৩] তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে 'শান্তি কমিটি' গঠন করেন। এসময় আনোয়ারা খাতুন 'শান্তি কমিটিতে' যোগ দেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় কাজ করেন।[৭৪] এ 'শান্তি কমিটি'তে আনোয়ারা খাতুনের সংশ্লিষ্টতা ও কাজ প্রসঙ্গে সুফিয়া কামাল তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন,

> "যখন ঢাকায় এলাম 'নারী শিক্ষা মন্দির' এর প্রতিষ্ঠাত্রী লীলা নাগ (লীলা রায়) আমাদের লীলাদি তখন হিন্দু মুসলমান মহিলাদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন 'শান্তি কমিটি'। তার ডাকে তার সাথে যোগ দিলাম। তখনকার দিনের এমএলএ আনোয়ারা খাতুন, ইনুদি, ডলিদি, আরও অনেক মহিলা এসে ঢাকার শহরতলী ছাড়িয়ে দূর গ্রাম, বন্দরগঞ্জে 'শান্তি কমিটি'র কাজে যোগ দিলেন।"[৭৫]

নারী সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি'র সম্পাদিকা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।[৭৬] পাকিস্তান আমলে নারীর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায়ও আনোয়ারা খাতুন সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে বঙ্গীয় মুসলিম বিবাহ আইন ও তালাক রেজিস্ট্রেশন বিলের সংশোধনী (স্ত্রী সরাসরি স্বামীকে তালাক দিতে পারবে এ আইন সংশোধন করে স্বামী যাতে তার বিরোধিতা করতে পারে সেজন্য দুই মাসের নোটিশ দেওয়ার ব্যবস্থা করে বিল উত্থাপন করা হয়) নিয়ে আলোচনার সময় আনোয়ারা খাতুন-সহ আটজন মহিলা নেত্রী আইন পরিষদে উপস্থিত হন এবং উত্থাপিত বিলের প্রতিবাদ করেন। মূলত নারী নেত্রীদের প্রতিবাদের কারণে বিলটি স্থগিত রাখা হয়।[৭৭] জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এবং জেনেভা সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি একজন সমাজসেবী ছিলেন এবং জনকল্যাণে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। বর্তমান গ্রীন রোডের পূর্বনাম ছিল কুলি রোড। আনোয়ারা খাতুন ও তার স্বামীর চেষ্টায় কুলি রোডকে সংস্কার করে গ্রীন রোড নামকরণ করেন।[৭৮] এই প্রথিতযশা রাজনৈতিক নেত্রী ১৯৮৮ সালের ৩০ নভেম্বর ঢাকার গ্রীন রোডে তার নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৭৯]

প্রান্তটীকা

১. সাঈদা জামান, *বাংলাদেশের নারী চরিতাভিধান*, দি রয়েল পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১১
২. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউ পি এল, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩০৬
৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ প্রথম খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৪০৬। অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, খোশরোজ কিতাব মহল লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৭০-৭১
৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭
৫. মোহাম্মদ হাননান, *বাঙালির ইতিহাস*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৩৯
৬. Khalid Bin Sayeed, *The Political System of Pakistan,* Oxford University Press, Dhaka, 1967, p. 65
৭. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯
পূর্ববাংলার নেতৃবৃন্দ আশা করেছিল সোহ্‌রাওয়ার্দী কেবিনেটের সদস্য মোহাম্মদ আলী চৌধুরী (বগুড়া) আহমদ হোসেন (রংপুর), আবদুল গোফরান (নোয়াখালী) পূর্ববাংলার মন্ত্রিসভায় স্থান পাবে। অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯
৮. Khalid Bin Sayeed, *ibid,* p. 65
৯. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯১
১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২
১১. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০-৭১
১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯-৭২
১৩. **আবদুস সবুর খান (১৯০৮-১৯৮২)** ১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। একই বছর তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৪৬ সালে খুলনা থেকে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভায় যোগাযোগ মন্ত্রী (১৯৬২-১৯৬৯) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯-১৯৭১ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগ (কাইয়ুম গ্রুপ) এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আবদুস সবুর খান বাঙালির স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে এবং মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি বিরোধী ভূমিকা পালন করেন। মোঃ আজম বেগ, *বাংলাপিডিয়া*
ফজলুল কাদের চৌধুরী (১৯১৯-১৯৭৩) চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগ চট্টগ্রাম জেলা শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি মনোনীত হন এবং এ পদে থেকেই ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে এম এল এ নির্বাচিত হন। তিনি আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভায় কৃষি ও পূর্ত মন্ত্রী, শিক্ষা ও তথ্য এবং শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হন। ফজলুল কাদের চৌধুরী ১৯৬৬ সালে মুসলিম লীগ (কনভেনশন) থেকে বহিষ্কৃত হন। তিনি শেখ মুজিব উত্থাপিত ছয়দফার বিরোধিতা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনীর পক্ষে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। সিমিন হোসেন রিমি, *তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী ১৯৪৭-১৯৪৮*, প্রতিভাস, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২২০
১৪. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯-৭২
১৫. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২
১৬. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১
১৭. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪, (প্রথম সংস্করণ ১৯৭৫), পৃ. ২৩২-৩৩
১৮. মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*, প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৪০-৪৪
১৯. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস ১৯৪৯-১৯৭১*, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৩, পৃ. ১১-১৪
২০. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯
২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯-১৪৫, ১৬৬-১৬৭
২২. সুপা সাদিয়া, *বায়ন্নর ৫২ নারী*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৩
২৩. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
২৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭
২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯
২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮
২৭. Sheikh Hasina (Hon’ble Prime Minister, The Government of the People’s Republic of Bangladesh), *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation*

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 1953, vol-3, Hakkani Publishers, Dhaka, 2020, p. 310-312

২৮. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

২৯. গণপরিষদ বিতর্ক, উদ্ধৃত হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৫৪-৫৮

৩০. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

৩১. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

৩২. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় উপস্থিত ছিলেন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭), আজিজ আহমদ, অজিত কুমার গুহ (১৯১৪-১৯৬৯), আবুল কাশেম (১৯২০-১৯৯১), সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪), শামসুদ্দিন আহমদ (১৮৮৯-১৯৬৯), কাজী গোলাম মাহবুব (১৯২৭-২০০৬), নাইমউদ্দিন আহমদ, তফাজ্জল আলী, আলী আহমেদ, মহীউদ্দিন, আনোয়ারা খাতুন (১৯১৯-১৯৮৮), শামসুল আলম, শওকত আলী, আব্দুল আওয়াল, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শামসুল হক, শহীদুল্লা কায়ছার (১৯২৭-১৯৭১), লিলি খান, তাজউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য। কামরুদ্দীন আহমেদ এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ২২০

৩৩. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

১৯৪৮ সালের ৩ মার্চের বিবৃতিদানকারীরা ছিলেন,

জনাব শামসুল আলম	আহবায়ক, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ
অধ্যাপক এম.এ.কাশেম	সেক্রেটারি, তমদ্দুন মজলিস
নাইমউদ্দিন আহমদ	আহবায়ক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ
তফাজ্জল আলী	এম এল এ
আনোয়ারা খাতুন	এম এল এ (সম্পাদিকা, পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি)
আলী আহমদ খান	এম এল এ
কামরুদ্দীন আহমদ	প্রাক্তন অফিস সম্পাদক, ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ
শামসুল হক	সংগঠক, মুসলিম লীগ (পূর্ববঙ্গ)
এ. সালাম	সম্পাদক, *দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান*
এস.এম. বজলুল হক	সম্পাদক, কাফেলা
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	সহ সভাপতি, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল
মোঃ তোয়াহা	সহ সভাপতি, ফজলুল হক মুসলিম হল
অলি আহাদ	আহবায়ক, ঢাকা নগর মুসলিম ছাত্রলীগ
আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী	সম্পাদক, *ইনসান*

বিবৃতির কিয়দংশ ছিল “For some time past considerable agitation is going on to make Bengali as the (i) official language of East Pakistan (ii) as one of the State Languages of the Central Pakistan (iii) as one of the languages of Pakistan consembly”

“Bengali is the mother tongue of the two third population of the whole of Pakistan. It is a matter of shame that agitation has become necessary to establish this language in the life of the state... ... ... To record a protest against these, the East Pakistan Muslim Students League & the Tamaddun Majlish have declared a general strike on Thursday, March 11. We appeal to all political, cultural and educational institutions & all students & citizens irrespective of cast & creed of East Pakistan to observe this strike according to the programme of this joint State Language sub-committee peacefully & with discipline... ... ... Our agitation should not be mistaken in Central Pakistan & in the consembly. We believe that if instead of treading down this democratic demand, the Bengali Language is conceded, it will be the basis of Unity of East & West Pakistan.” অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪১

৩৪. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮-৪১

৩৫. **মনোরঞ্জন ধর (১৯০৪-২০০০)** ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালের চট্টগ্রামে ব্রিটিশ অস্ত্রাগার আক্রমণ ও লুণ্ঠনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মনোরঞ্জন ধর আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ববাংলা আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে আইন পরিষদে এবং পরিষদের বাহিরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে মনোরঞ্জন ধর অংশগ্রহণ করেন এবং মুজিবনগর সরকারের উদ্যোগে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত সর্বদলীয় উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য

ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচনে (১৯৭৩) তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং সরকারের আইন, সংসদ ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। মনোরঞ্জন ধর সাপ্তাহিক *গণ অভিযান* পত্রিকার সম্পাদক (১৯৩৮-১৯৪০) ছিলেন। তাছাড়া সমাজসেবক হিসেবেও তিনি পল্লী উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মোঃ আলী আকবর, *বাংলাপিডিয়া*। তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩-৬৭

৩৬. *East Bengal Assembly Proceedings, Vol-1, No-1,* 15 March 1948.

৩৭. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২-৯৩

৩৮. *দৈনিক নওবেলাল*, ঢাকা, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫০

৩৯. *পাকিস্তান অবজারভার*, ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫০

৪০. সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ, সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনা পরিষদ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৭৪

৪১. মফিদা বেগম, *আওয়ামী লীগ রাজনীতি নারী নেতৃত্ব ১৯৪৯-২০০৯*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৭৬। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬-১৬৭

৪২. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫

৪৩. S A Karim, *Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy*, U.P.L. Publications, Dhaka, 2009, p. 38. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭-১০৮

৪৪. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫

৪৫. মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪-৫৫

৪৬. **শামসুল হক চৌধুরী (১৯৩০-২০০৫)** ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ এর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র থাকাকালীন ভাষা আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা অমান্য করার বিপক্ষে ছিলেন। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী প্রচারণায় তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাছাড়া ছয়দফা আন্দোলনেও তিনি যোগদান করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। ২০২১ সালে ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য তাকে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

৪৭. মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪-৫৫

৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮-৬০

৪৯. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০

৫০. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, *৩য় খণ্ড*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৫০

৫১. মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

৫২. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮-২৯

আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮) ময়মনসিংহ জেলার ধানিখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০–২২) যোগদান করে কংগ্রেসের আহবানে বি.এ পরীক্ষা বর্জন করেন। কলকাতার *দৈনিক মোহাম্মদী*, সাপ্তাহিক *দি মুসলমান*, এবং মওলানা আকরম খাঁর *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার সহকারি সম্পাদক এবং সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের মনোনয়নে ময়মনসিংহ জেলা থেকে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে আইন পরিষদের সদস্যপদ ও মুসলিম লীগ সংসদীয় দল ত্যাগ করেন। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় পাকিস্তান সরকারের দমন নীতির প্রতিবাদে 'সিতারা এ খেদমত' ও 'সিতারা এ ইমতিয়াজ' খেতাব বর্জন করেন। শহিদুল ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭

৫৩. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭-২৮০

৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭-২৮০

৫৫. *East Pakistan Legislative Assembly Proceedings*, 22 February 1952. ফরিদা ইয়াসমিন, *ভাষা আন্দোলন ও নারী*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩৭-৩৮। *জনকণ্ঠ*, ঢাকা, বায়ান্নর ভাষাকন্যা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৪০। বীণা রাণী, *জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারী*, এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃ. ৩৯-৪০

৫৬. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭-২৮৫

৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭-২৮০

৫৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০-২৮৫

৫৯. *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ (জাতীয় আরকাইভস, আগারগাঁও, ঢাকা)

৬০. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৯

৬১. *দৈনিক আজাদ*, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪। মেহেরুন্নেসা মেরি, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৯। ওবায়েদুল্লাহ মামুন, *ভাষা আন্দোলনে নারী*, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩১।

৬২. ওবায়েদুল্লাহ মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে বেগম নূরজাহান মুরশিদ, আমেনা বেগম, সেলিনা বানু, শামসুন নাহার মাহমুদ, বদরুন্নেসা আহমদ, দৌলতুন্নেসা খাতুন, রাজিয়া বানু, তফতুন্নেসা, মেহেরুন্নেসা এ নারীদের বিজয় সাফল্যে নারী সমাজের মধ্যে আলোড়ন ও আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে। মফিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩-৮৪

৬৩. মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

৬৪. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৭

৬৫. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৮৬-২৮৮

৬৬. S A Karim, *ibid*, p. 63.

৬৭. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৯

৬৮. **মারী কনভেনশন** ঃ ৭ জুলাই ১৯৫৫ পশ্চিম পাকিস্তানে দ্বিতীয় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে গণপরিষদের সদস্যগণ সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত একটি চুক্তি সম্পাদন করেন যা মারী চুক্তি নামে খ্যাত। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান ও আবুল মনসুর আহমদ অংশগ্রহণ করেন। এ চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, সকল ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যাসাম্য (পার্লামেন্টে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি), যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা কার্যকর এবং বাংলা ও উর্দু রাষ্ট্রভাষা হবে এ সকল বিষয় নির্ধারণ করা হয়। আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৮৫-২৮৭

৬৯. *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ২২ এপ্রিল ১৯৫৫। আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৯
মারী কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনোয়ারা খাতুন-সহ আবদুস সালাম খান (১৯০৬-১৯৭২) আনোয়ারা খাতুন (এমএলএ), খালেক নওয়াজ (এমএলএ) (১৯২৬-১৯৭১), আব্দুল আউয়াল (এমএলএ), আলমাস আলী (এমএলএ), হাশিমুদ্দিন (এমএলএ), জহিরুল হক ও আবুল হোসেন (এমএলএ) সহ মোট আট জনকে আওয়ামী মুসলিম লীগের সকল বিভাগ থেকে বহিস্কার করা হয়। আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৯

৭০. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৭

৭১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১২। শেখ হাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট*, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৬১-৬৩।
আইয়ুব খান নিজের ক্ষমতাকে পোক্ত করার জন্য নিপীড়নমূলক আইন প্রণয়ন করেন। ১৯৫৯ সালের ৭ আগস্ট নির্বাচিত সংস্থাসমূহ (অযোগ্যতা) আদেশ EBDO (Election Bodies Disqualification Order, 1959) জারি করেন। এ আদেশ বলে আইয়ুব খানের সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন নির্বাচিত সংস্থার সদস্য ছিলেন এমন ব্যক্তিদেরকে 'অসদাচরণের' দায়ে অভিযুক্ত করা হত। অভিযুক্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ:

মো: আতাউর রহমান	প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী
মো: আবু হোসেন সরকার	প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী
মো: ইউসুফ আলী চৌধুরী	প্রাক্তন মন্ত্রী
মো: মনসুর আলী	প্রাক্তন মন্ত্রী
মো: মশিউর রহমান	প্রাক্তন মন্ত্রী
প্রফেসর মোজাফফর আহমদ	এম পি এ ত্রিপুরা
বেগম আনোয়ারা খাতুন	এম পি এ ঢাকা প্রমুখ।

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২-১৫

৭২. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩-১৪

৭৩. **লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০)** পূর্ববাংলার নারী শিক্ষা ও আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত (বিয়ের পর লীলা রায়) আসামের গোয়াল পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলায়। নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় জনমত গঠনে আজীবন কাজ করেছেন। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে নারী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে 'দীপালি সংঘ' নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া এ সময় তিনি দীপালী স্কুল, নারী শিক্ষা মন্দির ও শিক্ষা ভবন নামে স্কুলসহ বারোটি ফ্রি প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৭-২৮ সাল মধ্যবর্তী সময়ে নারীদের সামগ্রিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় 'মহিলা আত্মরক্ষা ফান্ড' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি '*জয়শ্রী*' নামক সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। 'লবন সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে তিনি ঢাকা মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি গঠন করেন। পরবর্তীতে লীলা নাগ পশ্চিম বাংলায় চলে যান এবং ভারতীয় রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৬ সালে বাংলা থেকে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালের কলকাতা ও নোয়াখালীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যার্থে 'ন্যাশনাল সার্ভিস ইন্সটিটিউট' নামক জনকল্যাণমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। আমৃত্যু লীলা নাগ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাসহ নারীদের সামগ্রিক কল্যাণে যুক্ত ছিলেন। তপন কুমার দে, *বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের জীবনকথা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩-২১৫

৭৪. সুফিয়া কামাল, *এ কালে আমাদের কাল*, সাজেদ কামাল (সম্পা.), *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৫৯২। মালেকা বেগম (সম্পা.), *রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৪

৭৫. সুফিয়া কামাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯২। কামরুদ্দীন আহমদ, *মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪-৭৬

৭৬. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
৭৭. মালেকা বেগম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬
৭৮. সাঈদা জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১
৭৯. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

২.৩ বেগম বদরুন্নেসা আহমদ (১৯২৪-১৯৭৪)

বাংলাদেশের নারী নেতৃত্বের অন্যতম পথিকৃৎ বেগম বদরুন্নেসা আহমদ। তিনি ছিলেন বাঙালি নারীর অধিকার আদায়ে এক সক্রিয় নেতৃত্ব। বেগম বদরুন্নেসা আহমদ ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ কলকাতায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম সৈয়দ আবদুল মুক্তাদির ও মাতা সৈয়দা মাহমুদা খাতুন। তিনি কলকাতার সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠা ১৯০৯) থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন।[১] বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার (১৮৮০-১৯৩২) প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার মাধ্যমে বেগম বদরুন্নেসা আহমদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়।[২] শিশুকাল থেকেই তার মধ্যে সমাজের মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভূতি তৈরি হয়। বেগম বদরুন্নেসা আহমদ সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯৪২ সালে প্রবেশিকা (ম্যাট্রিক) পাস করে লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে (প্রতিষ্ঠা ১৯৩৯) ভর্তি হন এবং ১৯৪৪ সালে আই.এ পাস করেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সিলেটের এম.সি কলেজ থেকে ১৯৫৩ সালে প্রাইভেট বি.এ পাস করেন। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এডুকেশনে এম.এড এবং ১৯৬৩ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।[৩] তৎকালীন সময়ে ছাত্রীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ তেমনভাবে প্রচলন না থাকলেও স্কুল জীবনেই তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন এবং বক্তৃতা প্রদান করতেন। তাছাড়া কলকাতায় ছাত্রী অবস্থায় মুসলিম মহিলাদের সভা সমিতিতে যোগদান করতেন। তিনি স্কুল জীবন থেকেই রাজনীতিবিদ হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন।[৪]

১৯৪৭ সালে বন বিভাগের সরকারি কর্মকর্তা নুরুদ্দিন আহমদের সাথে বেগম বদরুন্নেসা আহমদের বিবাহ হয়। এ সময় নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পরিবেশ সামগ্রিকভাবে অনুকূল ছিলনা তবুও বেগম বদরুন্নেসা আহমদ তার স্বামীর প্রত্যক্ষ ও সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং শ্বশুর বাড়ির অনুপ্রেরণায় সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন।[৫] তবে দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে এসে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করেন। বেগম বদরুন্নেসা আহমদ বিবাহের পরেই মূলত রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন।[৬]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বশীল একমাত্র রাজনৈতিক দল 'মুসলিম লীগে'র (১৯০৬) রাজনৈতিক কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যায়। তাই মুসলিম লীগের প্রগতিশীল তরুণ নেতৃত্বের প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সুসংগঠিত বিরোধী দল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' (১৯৪৯) প্রতিষ্ঠা হয়।[৭] মূলত মুসলিম লীগের দলীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্যের পাল্টা প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' যাত্রা শুরু করে। এ সময় রাজনীতিতে নারী সমাজের অংশগ্রহণ ছিল খুবই সীমিত। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পরই তিনি ১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন।[৮] আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদানের পর তিনি দলের জন্য নিরলস পরিশ্রম শুরু করেন। তিনি তার বক্তৃতার মাধ্যমে এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা দিয়ে মানুষের মাঝে তার অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম

হন।[৯] ধর্মভিত্তিক রাজনীতির স্থলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির এ ধারায় বেগম বদরুন্নেসা আহমদ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির পটপরিবর্তনের ধারায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করে একজন উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক নেতৃত্বের স্থান অধিকার করেছেন।[১০] আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পরই বিভিন্ন স্থানে দলীয় সভা-সমাবেশ আহ্বান করা হয়। এ দল কর্তৃক আয়োজিত সভা-সমাবেশে সকল স্তরের নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান করা হতো।[১১] বেগম বদরুন্নেসা আহমদ এ সময় আওয়ামী মুসলিম লীগের জনসভায় অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদর্শন করেন।[১২]

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ভাষা আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অঞ্চলের নারীরা অংশগ্রহণ করে। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি অপরাহ্নে ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪) দ্ব্যার্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, “উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে।” বিশেষ করে তার এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা পায় এবং আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে সমগ্র দেশে হরতাল, ধর্মঘটসহ সভা-সমাবেশ করা হয়। এ সময় থেকে ভাষা আন্দোলন চূড়ান্তরূপ লাভ করে।[১৩] সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহবানে সিলেটে ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রধর্মঘট ও শোভাযাত্রা বের করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে সিলেটের জনসাধারণ রেডিও পাকিস্তানের খবরে ঢাকায় নিহত ছাত্র জনতার সংবাদে শোকাভিভূত হয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি শহরে হরতাল পালন করে। তাছাড়া সিলেটের গোবিন্দ পার্ক নামক স্থানে তৎকালীন বার এসোসিয়েশনের সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে যোগ দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্নে উত্তাল গণভোটের পর এই প্রথম আবার সিলেটের মেয়েরা মিছিলে অংশগ্রহণ করে।[১৪] ভাষা আন্দোলনের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে সিলেটে অবস্থান করে বেগম বদরুন্নেসা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সিলেট শহরে ছাত্র-ছাত্রী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আহূত প্রতিবাদ সভা-সমিতিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি নারীদেরকে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি সিলেটের এম.সি কলেজে (মুরারিচাঁদ কলেজ, প্রতিষ্ঠা ১৮৯২) অধ্যয়নরত ছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলনকারীরা শোভাযাত্রা করে সিলেট জেলার সমস্ত এলাকায় প্রদক্ষিণ করেন। এ সময় তিনি ভাষা আন্দোলনের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সকলের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন এবং স্থানীয় সমাজসেবা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মাঝে নিজের অবস্থান তৈরি করেন। ভাষা আন্দোলনে সিলেট অঞ্চলের এ কর্মকাণ্ডের বিচারে বেগম বদরুন্নেসাকে একজন আঞ্চলিক নেতৃত্ব হিসেবে মূল্যায়ন করা যায়।[১৫] তিনি ১৯৫৩ সালে সমাজ সেবার জন্য রাণী এলিজাবেথের ‘কোরনেশন’ মেডেল লাভ করেন।[১৬]

১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং ১৯৫২ সালে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের দিন ধার্য করে।[১৭] মূলত দলত্যাগী ও নতুন প্রজন্মের নেতারা মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে

মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রতীক হিসেবে বেছে নেয় নৌকা।[১৮] স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের অনুরোধ, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের নৈতিক ও আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে বদরুন্নেসা আহমদ ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে প্রার্থীতা করতে সম্মত হন। তাছাড়া তার দৃঢ়তা, কর্মোদ্যোগ ও আত্মবিশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী তাকে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রার্থী মনোনয়ন করেন। তার নির্বাচনী প্রচারণায় স্থানীয় নারী নেত্রীবর্গ অংশগ্রহণ করেন।[১৯] খুলনায় ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী রোকেয়া মাহবুব (১৯৩৫-২০২২) নির্বাচনী প্রচারণার কাজ করেন।[২০] তাছাড়া বেগম বদরুন্নেসা যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে নিজে সরাসরি নির্বাচনী এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারণার কাজে অংশগ্রহণ করেন। বেগম বদরুন্নেসা কুষ্টিয়া-যশোর-ফরিদপুর-খুলনা নির্বাচনী অঞ্চল থেকে মুসলিম লীগ প্রার্থী আয়েশা সরদারকে (১৯২৭-১৯৮৮) বিপুল ভোটে পরাজিত করে প্রথম বারের মত প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য (এমএলএ) নির্বাচিত হন।[২১] পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে। দেশে সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে ৯২ (ক) এবং ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।[২২] বেগম বদরুন্নেসা এ ধারা ভঙ্গ করে কুষ্টিয়ার বস্ত্রকল মোহিনী মিলের শ্রমিকদের দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ও সমর্থন জানিয়ে শ্রমিকদের আহূত জনসভায় বক্তব্য রাখেন এবং মিছিলের নেতৃত্ব দেন। জনসভায় বক্তৃতা প্রদানের সময় মজুরদের ন্যায্য দাবি দাওয়ার কথা তুলে ধরেন এবং তাদের অধিকার আদায়ের স্বপক্ষে তার মনোভাব ব্যক্ত করেন। ধারা ৯২ (ক) এবং ১৪৪ ভঙ্গ করার দায়ে তদানীন্তন সরকার তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করে। এ সময় বেগম বদরুন্নেসা গ্রেফতার এড়াতে কলকাতায় বাবা মায়ের কাছে চলে যান। একমাস পর বিমানযোগে দেশে ফেরার পর তাকে তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে একমাস কারাবন্দি থাকার পর বেগম বদরুন্নেসা মুক্ত হন।[২৩]

জেল থেকে মুক্তির পর বেগম বদরুন্নেসা গোপনে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চালিয়ে যান। বেগম বদরুন্নেসার কর্মকাণ্ড তৎকালীন নারী সমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণীত ও প্রভাবান্বিত করে। বিশেষ করে তিনি সমাজে নারীকে যোগ্য অবস্থান প্রদানে এসময় নিরলস পরিশ্রম করতে থাকেন।[২৪] তাছাড়া এসময় তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা-কর্মীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। ১৯৫৫ সালের ৫ ও ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি শেখ মুজিবকে পত্র প্রেরণ করেন যেখানে উল্লেখ ছিল, তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছেন। ১৯৫৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত কাউন্সিল মিটিং এর তারিখ নির্ধারণের ব্যাপারে তার মতামত শেখ মুজিবকে অবগত করেন। তাছাড়া রাজনৈতিক যে কোন প্রেক্ষাপটে পারিবারিক সমস্যা থাকলেও কাজ করে যাওয়ার ব্যাপারে বদরুন্নেসার মতামত প্রদান করেন।[২৫] ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ সালে বদরুন্নেসা তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাদের করণীয় সম্পর্কে চিঠির মাধ্যমে অবগত করেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর গঠিত মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তার মতামত ব্যক্ত করেন। এ পত্রের মাধ্যমে দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতা দখল নয় বরং গণতান্ত্রিক উপায়ে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শেখ মুজিবকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেন। বিদ্যমান

রাজনৈতিক সংকটে স্থিরভাবে ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ করেন।[২৬] এছাড়াও যেকোন ব্যক্তিগত সংকটেও শেখ মুজিবের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ১০ এপ্রিল ১৯৫৫ সালে পত্রের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে বেকসুর খালাস দেওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন। এ পত্রের মাধ্যমে বদরুন্নেসা আওয়ামী লীগের দলীয় শৃঙ্খলা সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার দলীয় চরিত্র নিয়েও তার মতামত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক অবস্থান এবং সালাম খানসহ তার পক্ষাবলম্বনকারী নেতৃবৃন্দের কার্যক্রম সম্পর্কে শেখ মুজিবকে অবগত করেন। এর মাধ্যমে বদরুন্নেসার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা প্রকাশ পায়।[২৭]

১৯৫৫ সালের ২৮ মে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ (১৮৯৫-১৯৫৬) গণপরিষদ অধ্যাদেশ জারি করেন। এই আদেশের বলে পাকিস্তানের দুই অংশ থেকে ৪০ জন করে মোট আশি জন সদস্য রাখার বিধান করা হয়। ১৯৫৫ সালের ৩১ মে পাঞ্জাবের মারিতে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের ভোটে কেন্দ্রীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সংরক্ষিত ৪০ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের (১৯৪৯) আতাউর রহমান খান (১৯০৭-১৯৯১) - শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) গ্রুপের তেরো জন, আবদুস সালাম খান (১৯০৬-১৯৭২) গ্রুপের দুই জন, কৃষক শ্রমিক পার্টির (১৯৫৩) দশ জন, নেজামে ইসলাম পার্টির (১৯৫৩) দুই জন ও গণতন্ত্রী দলের (১৯৫২) দুই জন নির্বাচিত হন।[২৮] পূর্ব পাকিস্তান থেকে কেন্দ্রীয় গণপরিষদে মনোনীত কমিউনিস্ট পার্টির একমাত্র সদস্য ছিলেন সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪)।[২৯] তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়নে পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (১৯০৯-১৯৬৩) মুসলিম লীগ থেকে এবং ফজলুর রহমান (১৯০৫-১৯৬৬) স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। অমুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৯ টি আসনের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস ৪টি, তফসিলি ফেডারেশন ৩টি এবং ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি (১৯৫৩) ২টি আসন পান। ১৯৫৫ সালের ৫ আগস্ট স্পিকার পদে কৃষক শ্রমিক পার্টির আবদুল হাকীম (১৯০১-১৯৬৮) আওয়ামী লীগের মশিউর রহমানকে (১৯১৭-১৯৭১) ১৭০ ভোটে হারিয়ে দেন। ডেপুটি স্পিকার পদে আওয়ামী লীগের বেগম বদরুন্নেসা আহমদকে ১৭১-৯৯ ভোটে হারান যুক্তফ্রন্টের শাহেদ আলী পাটোয়ারি (১৮৯৯-১৯৫৮)। বেগম বদরুন্নেসা ডেপুটি স্পিকার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গেলেও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তার ভূমিকা সকলের মাঝে পৌঁছে যায়।[৩০] এসময় বদরুন্নেসা আহমদ আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতেন এবং দলীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তিনি এসময় পারিবারিক অনেক কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে দলের প্রয়োজনে কাজ করেন।[৩১] ২৩ জুলাই ১৯৫৫ সালে এক পত্রের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে একদিন তাকে নিয়ে দেশের মানুষ গর্ব করবে। মূলত এ সময় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীকে শেখ মুজিবের দেওয়া চ্যালেঞ্জের প্রশংসা করে এভাবে বলেছিলেন। তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে সর্বাবস্থায় যোগাযোগ রাখতেন।[৩২] নারী প্রগতি আন্দোলনের এই সক্রিয় কর্মী ১৯৫৭ সালে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স ভ্রমণ করেন।[৩৩] তাছাড়া নারীদের কল্যাণে বিভিন্নমুখী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে আমেরিকার নিউইয়র্ক এ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের Commission on the Status of Women (CSW-1946) এর ১১তম সভায়

তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। সম্মেলনে নারী শিক্ষা ও কর্মসুযোগ এবং তাদের রাজনৈতিক অধিকার তার বক্তব্যে বিশেষভাবে স্থান পায়। তিনি বলেন যে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করতে পারলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে যা ছাড়া নারী সমাজের জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ সম্ভব নয়। বিশেষকরে কৃষি প্রধান এই দেশের গ্রাম পর্যায়ের নারীদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

হস্ত ও কুটির শিল্পের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেছিলেন, এ শিল্পের উন্নয়নে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো (শিক্ষা, ঋণ সুবিধা, কাঁচামাল সরবরাহ এবং বিপণনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত দিকনির্দেশনা) দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে বদরুন্নেসা বলেন, নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা কঠিন কোন সমস্যা নয় বরং নারীকে সকল ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তার মতে পশ্চিমা দেশে অনেক দিনের আন্দোলনের পর যে নারী অধিকার অর্জিত হয়েছে আমাদের দেশে সেটি একটা প্রজন্মের মধ্যেই প্রসারিত হয়েছে।[৩৪]

১৯৫৮ সালে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের সরকার বদরুন্নেসা আহমদের স্বামী নুরুদ্দীন আহমেদকে বন বিভাগের চাকুরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেন। তবুও তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। এক্ষেত্রে তার স্বামী তাকে উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছেন।[৩৫] বদরুন্নেসা আহমদ ১৯৫৯ সালে তদানীন্তন 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি' এর সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।[৩৬] ১৯৬০ সালে তৎকালীন মুসলিম গার্লস স্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে তার পেশা জীবন শুরু হয়। সে সময় তিনি *Women's Health* (প্রতিষ্ঠা ১৯৬০) নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন।[৩৭] ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকার লালমাটিয়া মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি একই কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন।[৩৮]

বেগম বদরুন্নেসা আহমদ স্বপরিবারে ১৯৬১ সাল থেকে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রোডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ির পাশে বসবাস শুরু করেন। রাজনৈতিক নেতার প্রতিবেশী থাকাকালীন সময়ে তিনি শিক্ষকতার পাশাপাাশি গোপনে রাজনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখেন।[৩৯] বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের (১৯৩০-১৯৭৫) সুখ-দুঃখের সাথী ছিলেন তিনি।[৪০] বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের কারাবন্দী সময়ে বদরুন্নেসা আহমদ বেগম ফজিলাতুন্নেসার পাশে থেকে সান্তনা ও পরামর্শ দিতেন।[৪১] ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১ মার্চ সংবিধান ঘোষণা করেন এবং ৮ জুন থেকে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন।[৪২] সংবিধানে নারীর অধিকার সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন না হলেও নারী সমাজ তাৎক্ষণিক কোন সংগঠিত আন্দোলন করতে পারেনি। তবে সামাজিক সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে নেতৃস্থানীয় মহিলারা অংশগ্রহণ করে। ১৯৬২ সালের হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পুনর্বিবেচনা ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের চাহিদার সাথে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গতি বিধানের জন্য ঢাকার ৮ জন নেতৃস্থানীয় মহিলা সরকারের নিকট আবেদন জানিয়ে বিবৃতি দেন। বদরুন্নেসা আহমদ বিবৃতিদানকারীদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন।[৪৩]

১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশনে শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন।[৪৪] ১৯৬৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করে শেখ মুজিবুর রহমান তার লাহোর ত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করেন এবং লাহোর সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের বিবেচনার্থে দেওয়া তার ছয়দফা সাংবাদিকদের নিকট প্রকাশ করেন। ১৯ মার্চ ১৯৬৬ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ছয়দফাকে সাংগঠনিক কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে এবং ২০ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় অনুমোদিত হয়।[৪৫] এরপর শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃত্ব সারাদেশ জুড়ে ছয়দফার প্রচার শুরু করেন। ১৯৬৬ সালে ছয়দফা ঘোষণার প্রেক্ষাপটে রাজপথে নামেন বদরুন্নেসা আহমদ। ছয়দফা বাস্তবায়নের সকল কর্মসূচিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।[৪৬] ছয়দফা কর্মসূচি সকলের মাঝে প্রচার এবং জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (খুলনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর) সফর করেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন। এসময় তিনি আওয়ামী লীগের ছয়দফা দাবি বিশ্লেষণ করেন এবং এ দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকলকে আহবান করেন। তাছাড়া বদরুন্নেসা আহমদ শিক্ষিত মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে দেশ ও জাতির গঠনমূলক কাজে উদ্যোগী হওয়ার আহবান জানান।[৪৭] ছয়দফা সকলের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করে ফলে আইয়ুব-মোনায়েম সমর্থকগোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ছয়দফার প্রচারণার এক পর্যায়ে ৮ মে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়। তাছাড়া ১৯৬৬ সালের ১০ মের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রায় ৩৫০০ নেতাকর্মী গ্রেফতার হন।[৪৮] আওয়ামী লীগের এই দুঃসময়ে নারী নেত্রী বদরুন্নেসা আহমদ ছয়দফা বাস্তবায়ন ও বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। তিনি মহিলাদের সংগঠিত করে সভা সমাবেশে অংশগ্রহণ করান এবং পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন বেগবান করে তোলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করেন। সম্পাদিকার দায়িত্ব পালনকালে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের তাদের স্বামী বা পিতার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সভা-সমাবেশে নিয়ে আসতেন এবং নিরাপদে তাদের পৌঁছে দিতেন।[৪৯] চট্টগ্রাম মহিলা আওয়ামী লীগের আমন্ত্রণে ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম সফর করেন এবং মহিলা আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেত্রীদের সাথে সভা করেন। এসময় তিনি চট্টগ্রামে মহিলা আওয়ামী লীগ প্রসারের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।[৫০] শেখ মুজিবকে রাজনীতি থেকে বিদায় এবং ছয়দফা আন্দোলন প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে ১ নম্বর আসামী করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে 'আগরতলা মামলা' দায়ের করে। ১৭ জানুয়ারি এ মামলার প্রধান আসামী শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হলে সারাদেশে প্রতিবাদ কর্মসূচি ও ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়।[৫১] এ সময় বদরুন্নেসা আহমদ শেখ মুজিবকে মুক্তির দাবি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।[৫২] পাকিস্তানি সরকারের শোষণের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য বেগম বদরুন্নেসা আহমদ ১৯৬৮ সালে সমমনা বরেণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে 'গণসংস্কৃতি পরিষদ' গঠন করেন। এ সাংস্কৃতিক পরিষদ গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক

কর্মকাণ্ডের আড়ালে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং জনমত গড়ে তোলা।[৫৩] কারণ স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের সরকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। তাছাড়া তৎকালীন সরকার সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিনা কারণে কর্মী-কলাকুশলীদের গ্রেফতার করতে থাকে।[৫৪] বেগম বদরুন্নেসা একজন রাজনীতি সচেতন নেত্রী হিসেবে সংস্কৃতির ছায়াতলে এসময় রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিচালনা করেন। কর্মকাণ্ড বিচারে বেগম বদরুন্নেসাকে একজন গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক নেত্রী হিসেবে গবেষণা অভিসন্দর্ভে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।[৫৫]

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে মহিলাসমাজ স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করেছেন। আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন সংগঠনের ছায়াতলে সংঘবদ্ধ হয়েছেন। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। রাজনৈতিক দল, মত ও আদর্শের ঊর্দ্ধে সকল শ্রেণি ও স্তরের মহিলা সমাজ এ সংগঠনের সদস্য হন। বেগম বদরুন্নেসা আহমদ 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদে'র একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।[৫৬] গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে নারী সমাজ প্রকাশ্য কর্মসূচি গ্রহণ করে। ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (১৯৪২-১৯৬৯) শহীদ হলে আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ২২ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে আসাদ স্মরণে এক বিশাল শোক মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলা থেকে শুরু করে সারা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। ছাত্র-ছাত্রীদের এ বিশাল শোক মিছিলে নারী সমাজ অংশগ্রহণ করে। ২৪ জানুয়ারির হরতাল ঢাকা শহরে অতি দ্রুত গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ বেগম সুফিয়া কামালের (১৯১১-১৯৯৯) ঢাকার বাস ভবনে নেতৃস্থানীয় মহিলাদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেগম সুফিয়া কামালের সভা নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ২৭ জানুয়ারি বেলা ১১ টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ঢাকার নারীদের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠানের আহবান জানানো হয় এবং সভা শেষে একটি শোক মিছিলের প্রস্তাব নেওয়া হয়। সে প্রস্তাব অনুযায়ী নারীরা সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বটতলা থেকে একটি মশাল মিছিল বের করেন এবং ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে।[৫৭] উক্ত সভায় বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন (১৯৩২-২০১৩), বেগম রেবেকা মহিউদ্দিন (১৯৩৯-২০১৮), আজিজা ইদ্রিস (১৯২৬-), লায়লা কবির (১৯৫০-), কামরুন্নাহার লাইলী (১৯৩৭-১৯৮৪), হুসনে আরা ইসলাম, ফরিদা হাসান, বদরুন্নেসা আহমদসহ ৪০ জন নেতৃস্থানীয় মহিলা এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করে পূর্ব পাকিস্তানের নারী সমাজকে গণসংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণের আবেদন জানান।[৫৮]

১৯৬৯ সালে বেগম বদরুন্নেসা আহমদকে সভাপতি এবং সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে (১৯৩৫-) সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'আওয়ামী মহিলা লীগ' গঠন করেন।[৫৯] এ সংগঠনের দায়িত্ব পাওয়ার সাথে সাথে বেগম বদরুন্নেসা নতুন সংগঠনের শক্তিশালী ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় নিরলস পরিশ্রম শুরু করেন। যখন আওয়ামী লীগই ছিল সারাদেশের মানুষের একমাত্র রাজনৈতিক দল তখনই তিনি মহিলা আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে সারাদেশব্যাপী নারীদের সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[৬০] এসময় তিনি চট্টগ্রাম, সিলেট, গোপালগঞ্জ,

খুলনা, কুষ্টিয়া, গাজীপুরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাংগঠনিক সফর করেন।[৬১] তিনি ১৯৬৯ সালের ৩০ আগস্ট কুষ্টিয়ার তৎকালীন আওয়ামী মহিলা লীগের কর্মী হাসিনা বেগমের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণ করেন। এ সভার মাধ্যমে বদরুন্নেসা আহমদ কুষ্টিয়া 'আওয়ামী মহিলা লীগ' এর শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সভায় বক্তৃতাকালে তিনি মহিলাদের আওয়ামী লীগে যোগদান এবং দেশের কল্যাণে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন। এরপর খুলনা অঞ্চলে 'আওয়ামী মহিলা লীগে'র সাংগঠনিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৬৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর খুলনায় গমন করেন। খুলনার তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মোহসিনের বাসভবনে মহিলাদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান মহিলা আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক সাব কমিটির সভানেত্রী হিসেবে বদরুন্নেসা আহমদ এ সমাবেশে 'আওয়ামী মহিলা লীগে'র আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন।[৬২] দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত সাংগঠনিক সফরের অংশ হিসেবে ১৯৬৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বদরুন্নেসা আহমদ কুষ্টিয়া সফর করেন। এদিন তার সভাপতিত্বে 'কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী মহিলা লীগ' এর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির বক্তৃতায় তিনি দেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন এবং এ সংগঠনে সকল স্তরের মহিলাদের অংশগ্রহণের আহবান জানান।[৬৩] উপরিউল্লিখিত সাংগঠনিক সফরের মাধ্যমে নারী সমাজের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করেন এবং সমাধানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাই তিনি আওয়ামী মহিলা লীগের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সমস্যাগ্রস্থ, শিক্ষিত নারী কর্মীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন।[৬৪] তিনি বাংলাদেশের নারী সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার জন্য এবং অওয়ামী লীগের বক্তব্য তাদের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করতে শুরু করেন। আওয়ামী মহিলা লীগকে শক্তিশালী করার জন্য বাঙালি নারীদের নিয়ে বিভিন্ন রকম সচেতনামূলক কর্মসূচির আয়োজন করেন। মূলত বাঙালি নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন।[৬৫]

নারী সমাজকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্মসূচিতেও বেগম বদরুন্নেসা আহমদ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতেন। স্বাধীনতার পূর্বে তথা পাকিস্তান পর্বের সর্বশেষ আওয়ামী লীগের কমিটি গঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৪ জুন মতিঝিলের ইডেন হোটেল প্রাঙ্গনে। এ কমিটিতে শেখ মুজিবুর রহমান তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন। বেগম বদরুন্নেসা আহমদকে সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক (নবনির্বাচিত) সম্পাদক হিসেবে এ কমিটিতে মনোনয়ন দেওয়া হয়।[৬৬] বদরুন্নেসা আহমদ ১৯৬৯-১৯৭২ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার আহবানে সাড়া দিয়ে সকল স্তরের নারী সমাজ এ সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।[৬৭] তাছাড়া এ সময় স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সকল স্তরের নারীদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি তিনি নিজেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের উৎখাতে বাঙালির আন্দোলন সফলতা লাভ করে। আইয়ুব খানের পতনের পর ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান (১৯১৭-১৯৮০) ক্ষমতা গ্রহণ করেন। জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে যথাশীঘ্র সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।[৬৮]

ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৬৯] ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে ১২ নভেম্বর ১৯৭০ পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যায় এক প্রলয়ংকারী সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস। এ ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয় প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ। পূর্ব পাকিস্তানের শোকবিহবল পরিবেশে সারাদেশ থেকে ছাত্র, যুবক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাথে নারীরাও আর্তমানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।[৭০] সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে পরিচালিত ত্রাণ কার্যে বদরুন্নেসা আহমদ অংশগ্রহণ করেন।[৭১] পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত হয় ১৬২টি সাধারণ এবং ৭টি মহিলা আসন।[৭২] ১৯৭০ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে সংরক্ষিত সাতটি নারী আসনের একটির বিপরীতে বদরুন্নেসা আহমদ এম এন এ নির্বাচিত হন। এ নির্বাচনে তিনি সরাসরি নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য বদরুন্নেসা আহমদ সাধারণ আসনে প্রার্থীতা করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করেন এবং তার ইচ্ছার কথা জানান। কিন্তু পূর্বেই প্রদত্ত নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থী বাছাই করার কারণে বদরুন্নেসাকে সাধারণ আসনে প্রার্থীতা করার সুযোগ দিতে পারেন। এ নির্বাচনে প্রার্থীতা করার জন্য তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার তার স্বামীকে দ্বিতীয়বারের মত বরখাস্ত করে। কিন্তু সকল প্রতিকূলতায় বেগম বদরুন্নেসার স্বামী তাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন।[৭৩]

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনে বিজয় অর্জনের পর ৩ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দলীয় নব নির্বাচিত (১৫১ জন জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২৬৭ জন সদস্য) জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের শপথপাঠ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।[৭৪] নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে আইনানুগভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের অধিকার অর্জন করে।[৭৫] স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগের বিজয়ে ইয়াহিয়া খান সহ পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারি-বেসরকারি মহল অসন্তুষ্ট হয় এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নতুন কৌশল গ্রহণ করতে থাকে।[৭৬] ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ ১৯৭১ এক ঘোষণা জারির মাধ্যমে ৩ মার্চ ১৯৭১ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।[৭৭] ইয়াহিয়া খানের এ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ঘোষণায় বাঙালি জাতি এতটাই ক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী হয়ে উঠে যে, সশস্ত্র সংগ্রাম ও যুদ্ধ করে হলেও স্বাধীনতা লাভের জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে যায়। ২৫ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত বাঙালির প্রতিবাদ আন্দোলন অব্যাহত থাকে।[৭৮] কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সারা বিশ্ববিবেককে বিস্মিত ও হতবিহবল করে পৈশাচিক গণহত্যার মাধ্যমে বাঙালির দাবিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ২৫ মার্চ ১৯৭১ কালো রাত্রিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হাজার হাজার নিরীহ নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত বাঙালিকে হত্যা করে।[৭৯] এর প্রতিবাদে শুরু হয় বাঙালির সর্বাত্মক যুদ্ধ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের এ মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তার সাংগঠনিক তৎপরতা ও জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার অনুপ্রেরণা দান করার অসাধারণ শক্তি ছিল। ভারতে গমন করার পূর্বেই বেগম বদরুন্নেসা আহমদ মুক্তিযুদ্ধের প্রথমিক পর্যায়ের বিভিন্ন

কর্মসূচিতে যোগদান করেন।[৮০] তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান গার্লস গাইড অ্যাসোসিয়েশনের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মালেকা খানের সাথে ফাস্ট এইড, সিভিল ডিফেন্স ও হোম নার্সিং কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন।[৮১] তাছাড়া অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসেবে সাধারণ ছেলে মেয়েদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারে বদরুন্নেসা আহমদ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। মালেকা খানের বর্ণনা মতে,

> "বদরুন আপা আমাকে সাথে নিয়েই কবি সুফিয়া কামালের সাথে দেখা করতে গেলেন। উৎসাহিত হয়ে ফিরে এলাম বদরুন আপার বাড়িতে সেখানে বসেই ট্রেনিং কর্মসূচির নকশা তৈরি করে ফেললাম। আপার পরামর্শ মতে আপাতত স্থান ঠিক হল জিগাতলা প্রাইমারি স্কুল, শংকর প্রাইমারি স্কুল, রায়ের বাজার বয়েজ হাইস্কুল ও আজিমপুর গার্লস হাইস্কুল। ... সুফিয়া খালাম্মার আশীর্বাদ আর বদরুন আপার সহযোগিতায় ১৮ মার্চ আমি নিজে ট্রেনিং শুরু করলাম"[৮২]

১৯৭১ সালের ১৭ মার্চ মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে তিনি এবং সাধারণ সম্পাদক সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে পল্টন ময়দানে কুচকাওয়াজ করার পর এক জঙ্গী লাঠি মিছিল বের করে।[৮৩] ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিজ বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধু যখন গ্রেফতার হন সেসময় বদরুন্নেসা পার্শ্ববর্তী তার বাড়িতেই ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার পর নিজেকে নিরাপত্তাহীন মনে করেন। যেহেতু বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠজন সেহেতু তার উপর পাক বাহিনীর নজর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। এ কারণেই ২৬ মার্চ বদরুন্নেসা আহমদ নিজের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন এবং পাশে কয়েকটি বাড়িতে আশ্রয় চাইলে একজন মাত্র রাজি হন। পরবর্তীতে তাকে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে চিহ্নিত করে খবর প্রকাশিত হওয়ায় পাক সেনারা তাকে খুঁজতে থাকে।[৮৪] এসময় তিনি সিদ্ধান্ত নেন ভারতে চলে যাবেন এবং সেখানে যেয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেই কাজ করবেন। এর আগেই অবশ্য তার বড় মেয়ে এবং এক ছেলে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিল। তিনি কুমিল্লা সীমান্ত দিয়ে আগরতলা এবং কলকাতা হয়ে মুজিবনগর গমন করেন। ভারতে অবস্থানকালে মুজিবনগর সরকারের মহিলা পুনর্বাসন কার্যকলাপ ও মহিলা সংগঠনের সভানেত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৮৫] তাছাড়া তিনি মুজিবনগর সরকারের সাথে যুক্ত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার জনগণ, বিশেষ করে নারী সমাজকে সংগঠিত ও স্বাধীনতা যুদ্ধে সম্পৃক্ত করতে অসামান্য ভূমিকা রাখেন। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের (১৯২৫-১৯৭৫) নির্দেশে শরণার্থী আশ্রম পরিদর্শন শেষে রিপোর্ট পেশ করা, শরণার্থীদের মাঝে চিকিৎসাসহ ত্রাণ সামগ্রীর সুষ্ঠ বিতরণ, শরণার্থীদের থেকে নারী মুক্তিযোদ্ধা নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা তার প্রধান দায়িত্বে পরিণত হয়। তাছাড়া কিছু সংখ্যক নারীদেরকে নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সেবা প্রদানের জন্য তাদেরকে হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ প্রদান করেন। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে তিনি *ইত্তেফাক* পত্রিকাতে প্রবন্ধ লেখেন।[৮৬] সাংগঠনিক দৃষ্টিতে দেখলে এই কার্যক্রমসমূহ ছিল যথেষ্ট গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। যথাযথভাবে এ দায়িত্বসমূহ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তাকে কখনো প্রণোদক, কখনো পরামর্শক, কখনো বা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে।[৮৭] তিনি বাংলাদেশ সারদা মহিলা সেবা সংঘ, ত্রিপুরা রাজ্য ও রামকৃষ্ণ মিশনের যৌথ পরিচালনায় মহিলা শিশু পুনর্বাসন ও

আশ্রয়স্থলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে পাক সামরিক জান্তার নৃশংসতার বিরুদ্ধে এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জনমত গঠনের জন্য ব্যাপক প্রচারণা, সভা, সমাবেশ করেন।[৮৮] আহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের খোঁজ-খবর এবং সকল শরণার্থী শিবির ও যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করার জন্য ফোরকান বেগম (১৯৫০-) এর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১০ জুলাই গঠিত হয় মহিলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।[৮৯] এ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা।[৯০] বেগম বদরুন্নেসা আহমদ মহিলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনিসহ এ বাহিনীর অন্যান্য সকল সদস্য অপরিচিত ও অনিশ্চিত পরিবেশে কাজ করে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন।[৯১] তার সহযোদ্ধাদের মধ্যে নূরজাহান মুরশিদ (১৯২৪-২০০৩) অন্যতম একজন ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে বদরুন্নেসা আহমদের দক্ষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "মুক্তিযুদ্ধে আমার দক্ষ সহযোদ্ধা হিসেবে আমি বেগম বদরুন্নেসাকে পেয়েছিলাম।[৯২] বেগম বদরুন্নেসার স্বামী নুরুদ্দিন আহমেদ প্রবাসে থাকা সরকারের কৃষি সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। তার দুই পুত্র গর্জন ও রক্তন সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিং নেয় এবং বড়মেয়ে নাসরীন আহমাদ শিলু (পেশাভিত্তিক আইডি নং-১৮৩৭) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ইংরেজি সংবাদ পাঠ ও নাট্যকর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। বদরুন্নেসা আহমদ (পেশাভিত্তিক আইডি নং-১২৮৫) নিজেও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ইংরেজি সংবাদ পাঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৯৩] বেগম বদরুন্নেসাসহ তার পরিবারের সকল সদস্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে যা ছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে এক অনন্য উদাহরণ। স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরো সময়টাতে তিনি অদম্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।[৯৪]

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যাপক আকারে পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু সরকার ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ, বিশেষ করে মহিলাদের পূনর্বাসনে প্রতিষ্ঠা করে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউণ্ডেশন।[৯৫] বদরুন্নেসা আহমদ এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক মনোনীত হন। দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় প্রতিষ্ঠানটির শাখা প্রতিষ্ঠা করেন।[৯৬] বেগম বদরুন্নেসা নিজ উদ্যোগে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুদ্ধাহত মহিলাদের উদ্ধার ও পুনর্বাসনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন।[৯৭] তিনি নিজে এবং তৎকালীন নারী কর্মীদের (সুফিয়া কামাল, মালেকা খান, নীলা নাগ, মালেকা বেগম) সহযোগিতায় খুব দ্রুত নারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।[৯৮] বিশেষ করে দেশের বিভিন্ন স্থানের ক্যান্টনমেন্টে বন্দি যুদ্ধাহত নারীদের উদ্ধার করে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন।[৯৯]

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে বদরুন্নেসা আহমদের সহযোগিতায় বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা গঠন করা হয়। সমমনা কিছু মহিলা নিয়ে সুফিয়া কামাল ও বদরুন্নেসা আহমদ ১২ জনের একটি নির্বাহী পরিষদ গঠন করে সংস্থাটির যাত্রা শুরু করান। এ নির্বাহী পরিষদে সহ সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বদরুন্নেসা আহমদ।[১০০]

১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর গণপরিষদ বাংলাদেশের সংবিধান সত্যায়ন করে। গৃহীত এই সংবিধান মোতাবেক ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৩টি আসন লাভ করে।[১০১] ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনে বদরুন্নেসা আহমদ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালের ১৮ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে শপথ গ্রহণ করেন।[১০২] শেখ মুজিব তার মন্ত্রিসভায় দুইজন নারীকে (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বেগম বদরুন্নেসা আহমদ এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে বেগম নূরজাহান মুরশিদ) অন্তর্ভুক্ত করেন। সে সময় নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে শেখ মুজিব বলেন, "নারীদেরও পুরুষের মতো সমান অধিকার এবং তা রাজনীতির ক্ষেত্রেও, আওয়ামী লীগ যেমন অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করে, তেমনি নর-নারীর সমান অধিকারেও বিশ্বাস করে। আওয়ামী লীগেও নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা দরকার।" তৎকালীন বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে শেখ মুজিব বেগম বদরুন্নেসাকে তার মন্ত্রিসভায় উপযুক্ত মনে করেন।[১০৩] নতুন মন্ত্রিসভায় (১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে গঠিত) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার প্রথম মহিলা প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে বেগম বদরুন্নেসা কলেজের অধ্যাপনা থেকে নিজেই অব্যাহতি নেন। তার দৃষ্টান্ত সামনে রেখে স্বাধীন দেশে আওয়ামী লীগ সরকার সরকারি কর্মকর্তাদের স্ত্রীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের উপর পাকিস্তান আমলের নিষেধাজ্ঞা চালুর রেওয়াজ তুলে নেন।[১০৪] বদরুন্নেসা আহমদ স্বল্পসময়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বভার অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করেন। অসুস্থ অবস্থায় দেশের বিভিন্ন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। তিনি কুষ্টিয়ায় কয়েকটি বিদ্যালয় ও একটি মহিলা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে জীবনের কর্মময় মুহূর্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করায় তার জীবনের লক্ষ্য পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পারেননি।[১০৫] তিনি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সহ সভানেত্রী ও মহিলা সমিতির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১০৬] তাছাড়া ১৯৭২-১৯৭৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী ছিলেন।[১০৭] সদ্যস্বাধীন দেশের সংসদ সদস্য হিসেবে সংসদে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে গণপরিষদে উত্থাপিত সংসদ অধিবেশনে খসড়া সংবিধান বিলের উপর আলোচনাকালে তিনি বলেন,

> "আমাদের জীবনে যে বৈষম্য আছে তার প্রতিকারে বিবাহ আইন, বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ও উত্তরাধিকার আইনের সংশোধনের প্রয়োজন আছে। বেশ কিছু মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রধান দেশের উদাহরণ দিয়ে বলেন, আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, সুতরাং বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা দূরীকরণে অসুবিধা হবে না বলে আমি বিশ্বাস করি। নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ও সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"[১০৮]

গণপরিষদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বদরুন্নেসা আহমদ প্রথম মতামত প্রকাশ করে সংবিধানে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থাকে 'যুগোপযোগী' মনে করেন। এ মতামতের কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন, "আমরা

সমান নই, আমরা সমানের দাবি তুলেছি। সুতরাং আমাদের আসন সংরক্ষণের দরকার আছে।” যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে সেই সময় প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে মহিলা সদস্য নির্বাচনের অসুবিধা ছিল এবং আগামী দিনের সংসদ ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে তিনি তখন আশা পোষণ করেছিলেন। তবে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে মহিলা সংরক্ষিত আসন থাকা স্বত্বেও তিনি নিজে কুষ্টিয়ায় সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনোনয়ন চেয়েছিলেন কিন্তু ব্যক্তিগত যোগ্যতা থাকা স্বত্বেও মনোনয়ন না পাওয়ায় তিনি মনোক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। তবে দলনেতার অভিমত ও যুক্তি তথা দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।[১০৯]

বেগম বদরুন্নেসা আহমদ আজীবন দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর (১৮৯২-১৯৬৩) স্নেহভাজন হতে পেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পাশাপাশি বাড়ি (ধানমণ্ডি) থাকায় তারা যেন একই পরিবারভুক্ত ছিলেন। যে কোন সময়ে যে কোনো পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ নিতেন এবং দিতেন।[১১০] রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সবসময় বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করতেন এবং প্রত্যক্ষ উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন।[১১১] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তার মতামত প্রদান করে পাঁচটি চিঠি প্রদান করেন।[১১২] বদরুন্নেসা আহমদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় বঙ্গবন্ধু খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই মুক্তিসংগ্রাম এবং স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তরকালে জাতীয় পুনর্গঠনে বদরুন্নেসা আহমদের ভূমিকার জন্য বঙ্গবন্ধু তার মৃত্যুর পর তাকে ‘বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম বীর’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং তার নামানুসারে ঢাকার বকশিবাজারে মহিলা কলেজের নামকরণ করেন “বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়”।[১১৩] বেগম বদরুন্নেসা আহমদ বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের উল্লেখযোগ্য এক নারী নেতৃত্ব। তিনি নারী মুক্তি আন্দোলন, নারীর ক্ষমতায়ন তথা নারীদের রাজনৈতিক সচেতনতা প্রদানে অন্যতম দিকপাল। ক্ষণজন্মা নারী স্বল্পসময়ে নারীদের সংগঠিত করে নারীর ক্ষমতায়নে ও আলোকিত নারী নেতৃত্ব তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।[১১৪] বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী থাকাবস্থায় বেগম বদরুন্নেসা আহমদ দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৪ সালের ২৫ মে পরলোক গমন করেন।[১১৫] রাজনীতি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য তাকে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার হিসেবে খ্যাত ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

প্রান্তটীকা

১. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ (বেগম বদরুন্নেসা আহমদের কন্যা), প্রো-উপাচার্যের (শিক্ষা) কার্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০, (ড. নাসরীন আহমাদ, ৩ জুলাই ১৯৪৯ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা। তার পিতা নূরুদ্দীন আহমেদ ও মাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বেগম বদরুন্নেসা আহমদ। তিনি ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ২০১২ সালে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) মনোনীত হয়ে ২০২০ সাল পর্যন্ত এ পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে (জুন-ডিসেম্বর পর্যন্ত) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী এবং সংবাদ পাঠিকা (জেরিন আহমদ ছদ্ম নামে) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২. বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের জমিদার সাবির পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সে যুগের প্রথানুযায়ী মেয়েরা কঠোর পর্দার মধ্যে জীবন যাপন করতো। আর এই নারীদের জীবনকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য বেগম রোকেয়া আজীবন সাধনা করেছেন। তার স্বামীর মৃত্যুর পর তারই প্রেরণাপ্রসূত হয়ে ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে ভারতের ভাগলপুরে প্রথম সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে পারিবারিক সমস্যার কারণে ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ আট জন ছাত্রী নিয়ে কলকাতার ১৩ নং ওয়ালীউল্লাহ লেনে উপরিউক্ত স্কুল নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। নারী শিক্ষার অন্ধকার যুগে তিনি মহল্লার বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রী সংগ্রহ করতেন। তার ঐকান্তিক সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে মাত্র সাত বছরের মধ্যে স্কুলটি ইংরেজি স্কুলে পরিণত হয়। নারীদের শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসার পরই অর্থাৎ স্কুল প্রতিষ্ঠার পর বেগম রোকেয়া সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯১৬ সালে কলকাতায় 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতীনে ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এ সমিতি নারী শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও নারীর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার নেতৃত্বে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এভাবে তিনি মুসলমান নারীকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, সম্ভ্রমে উজ্জ্বল, যুগপোযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত, অর্থনীতিতে আত্মনির্ভরশীল এবং সমাজ ও সংসারের সর্বক্ষেত্রে মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই তিনি নারী জাগরণের প্রধান অগ্রদূত। ফরিদা আখতার (সম্পা.), *শত বছরে বাংলাদেশের নারী*, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৭-৮

৩. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*

৪. মেহেরুন্নেসা মেরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা, প্রথম খণ্ড*, ন্যাশনাল পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১১৯। সাক্ষাৎকার, নাসরীন আহমাদ (বেগম বদরুন্নেসা আহমদের কন্যা), ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০, প্রো-উপাচার্যের (শিক্ষা) কার্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

৭. মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগের উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৬, ঢাকা, পৃ. ৪০-৪৫

৮. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

৯. মেহেরুন্নেসা মেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

১০. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৭

১১. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস ১৯৪৯-১৯৭১*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৩-৩৫

১২. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*

১৩. বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৩০৩-৩৩৭

১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮। মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৫৮

১৫. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*

১৬. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

১৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা। মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১০২

১৮. Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature, 1947-58,* University of Dhaka, 1980, p. 85-88

১৯. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পা.), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, *২য় খণ্ড*, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ.২০, ৭২। আনোয়ার হোসেন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১*, প্রগতিশীল প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২২২

২০. **রোকেয়া মাহবুব (১৯৩৫-২০২২)** খুলনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের খুলনা শাখার সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এসময় তিনি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎকালীন নারী নেতৃত্বের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ

করেন। ১৯৫২ সালে খুলনার করোনেশন স্কুলের ছাত্রী থাকাবস্থায় ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। খুলনা অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় নারী ভাষা আন্দোলন কর্মীদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বদরুন্নেসার পক্ষে খুলনা অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্বাচনী প্রচারণার কাজ করেন। *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৪ জুন ২০২২

২১. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০, ৭২। আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২
বেগম আয়েশা সরদার (১৯২৭-১৯৮৮) যশোর জেলার খানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী এবং সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি যশোর সম্মিলনী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। তিনি ১৯৪২ সালে 'যশোর নারী শিক্ষা আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৮ সালে 'যশোর মাতৃ ও শিশু মঙ্গল কেন্দ্রে'র সম্পাদক এবং 'আপওয়া'র সহ সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি যশোরে ১৯৫২ সালের ২৯ মে 'পাকিস্তান নারী সমাজকল্যাণ সেবা সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সেবা সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৫৮ সালে তিনি যশোর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং ঐ বছরে যশোর জেলা মুসলিম লীগ মহিলা কমিটির সভাপতি পদে আসীন হন। ১৯৬২ সালে যশোর জেলা পরিষদে ও খুলনা বিভাগীয় পরিষদে সদস্য মনোনীত হন এবং একই বছরে কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি প্রথম বি.ডি (বেসিক ডেমোক্রেসি) মহিলা সদস্য, যশোর পৌরসভার নির্বাচিত কমিশনার এবং ১৯৬৭ সালে খুলনা অঞ্চলের শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ও 'যশোর ইভাকুইজ সমিতি'র সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। এছাড়া তিনি প্রায় ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৭৭ সালে ঢাকা পৌর কর্পোরেশনে কমিশনার পদে মনোনীত হন। সমাজসেবার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান রাখার জন্য তিনি ১৯৫৩ সালে রাণী এলিজাবেথ 'করোনেশন' মেডেল প্রাপ্ত হন। ১৯৬২ সালে 'তমঘা-ই-খিদমত' খেতাব পান। সাঈদা জামান, *বাংলাদেশের নারী চরিতাভিধান*, দি রয়েল পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৬-২৭

২২. Gazette of Pakistan (Extraordinary) 1954, *Notificatoin No. 51/2/54 Police I Karachi,* May 30, 1954, Proclamation, p.1085.

২৩. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*

২৪. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

২৫. Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister, The Government of the People's Republic of Bangladesh), *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 1954-1957, vol-4,* Hakkani Publishers, Dhaka, 2020, p. 229-230

২৬. Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister of GOB), *ibid,* p. 237-238

২৭. *ibid,* P. 249-250

২৮. মহিউদ্দিন আহমেদ, *আমার জীবন আমার রাজনীতি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৩১-২৩৫

২৯. **সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪)** বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৬-১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে বামপন্থি রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হওয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে কারাবরণ করেন। জেলে থাকাবস্থায়ই তিনি ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে কেন্দ্রীয় গণপরিষদে কমিউনিস্ট পার্টির একমাত্র সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৭২-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। মহিউদ্দিন আহমেদ, *আমার জীবন আমার রাজনীতি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৩১-২৩৫। সিমিন হোসেন রিমি, *তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী, ১৯৪৯-১৯৫০*, প্রতিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২২৬

৩০. মহিউদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ২৩১-২৩৫
আবদুল হাকীম (১৯০১-১৯৬৮) বাংলাদেশের প্রখ্যাত আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন তিনি ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর আবদুল হাকীম পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন এবং আইন পেশায় নিয়োজিত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি কৃষক শ্রমিক পার্টির পক্ষ থেকে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে পূর্ববাংলা যুক্তফ্রন্টের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালের ৫ আগস্ট পূর্ববাংলার প্রাদেশিক পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হন। শামিমা আক্তার, *বাংলাপিডিয়া*। মহিউদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১-২৩৫

৩১. Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister of GOB), *ibid,* p. 257

৩২. *ibid,* p. 306

৩৩. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬-৯০

৩৫. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*

৩৬. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বেগম রানা লিয়াকত আলী খানের (১৯০৫-১৯৯০) উদ্যোগে অল পাকিস্তান উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন (আপওয়া) গঠিত হয়। এই সংগঠনটির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানে উদ্বাস্তু সংকট মোকাবেলা করা। পরবর্তীতে বেগম রানা লিয়াকত আলী খানের সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানেও 'আপওয়ার' শাখা 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের পর এই সংগঠনটির ঢাকা শাখার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'বাংলাদেশ মহিলা সমিতি'। মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১২১-১২২

৩৭. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*

৩৮. লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, ঢাকায় সংরক্ষিত প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষের তালিকা ফলক থেকে সংগৃহীত

৩৯. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*

৪০. **বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব (১৯৩০-১৯৭৫)** গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার স্বামী শেখ মুজিবুর রহমান তার চাচাতো ভাই ছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি পিতা-মাতাকে হারান এবং হবু শ্বশুর ও শাশুড়ির কাছে বড় হন। ১৯৩৮ সালে মাত্র ৮ বছর বয়সে তার বিবাহ দেওয়া হয়। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দুর্ভিক্ষের সময় স্বামীর সাথে সহযোগিতা করেছেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের প্রচারণা ও সার্বিক কর্মকাণ্ডে বেগম মুজিব একান্তভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করতে ফজিলাতুন্নেসা রাস্তায় নেমে লিফলেট বিতরণ করেন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে অন্যতম সংগঠক হিসেবে কাজ করেছেন। শেখ মুজিবের অবর্তমানে তার বিরুদ্ধে আনীত মামলা পারিচালনায় জেলে নিয়মিত দেখা করে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে শেখ মুজিবকে অবগত করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ নিয়ে আসতেন এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা কর্মীদের কাছে পৌঁছে দিতেন। তাছাড়া শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে সকল সংকট মোকাবেলা করে ঘর-সংসার ও বাচ্চাদের লালন পালন করেছেন। তার দাদার থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি হতে অর্জিত অর্থ তিনি শেখ মুজিবের প্রয়োজন ও দলীয় কাজে ব্যয় করতেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি পর্যায়ে ভয়াবহ সংকটে থেকে স্বাধীনতার পক্ষে সকল প্রকার সহযোগিতা করেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বিপথগামী সেনাবাহিনীর হাতে স্বপরিবারে নিহত হন। *দৈনিক যুগান্তর*, ঢাকা, ৪ আগস্ট ২০২২। সুপা সাদিয়া, *'৭১ এর একাত্তর নারী*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৬৩-২৬৮

৪১. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*

৪২. *দি পাকিস্তান অবজারভার*, ঢাকা, ১২-১৫ জুলাই ১৯৬২

৪৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৬ আগস্ট ১৯৬২

৪৪. Shyamoli Ghosh, *The Awami League 1949-71*, Academic Publisher, Dhaka, 1990, p.105-146

৪৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, মার্চ ৩-২৫ ১৯৬৬। আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯-১৪৬

৪৬. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

৪৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

৪৮. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯-৪৬

৪৯. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*

৫০. সাক্ষাৎকার, রাশেদা আমিন, সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ও প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা সাংবাদিক ফোরাম, নর্থ রোডের বাসভবন, ধানমন্ডি, ঢাকা, ২০ এপ্রিল ২০২২

৫১. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৯৫-৯৬

৫২. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

৫৩. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*। *The Daily Star*, Dhaka, 17 November 2017.

বেগম বদরুন্নেসা প্রতিষ্ঠিত 'গণসংস্কৃতি পরিষদে'র সদস্য যারা ছিলেন তাদের মধ্যে এহতেশাম হায়দার চৌধুরী (১৯২৭-২০০২), আমিনুল হক বাদশা (১৯৪৪-), মুস্তাফা সারওয়ার (১৯৩৫-২০০৪), এম.এ হামিদা ও তাসলিমা উল্লেখযোগ্য।

আবু নূর মোহাম্মদ এহতেশামুর রহমান যিনি এহতেশাম হায়দার চৌধুরী নামে অধিক পরিচিত। ১৯২৭ সালের ১২ অক্টোবর ঢাকার বংশালে জন্মগ্রহণ করেন। চলচিত্র পরিবেশক হিসেবে কর্মজীবন শুরুর পর বাংলাদেশ চলচিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ১৯৫৯ সালে "এ দেশ তোমার আমার" চলচিত্র নির্মান করেন। পরবর্তীকালে রাজধানীর বুকে (১৯৬০) চকোরী (১৯৬৭), সাগর (১৯৬৫) প্রভৃতি নামে চলচিত্র নির্মাণ করেন। তিনি ২০০২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। *দি ডন*, ঢাকা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০২।

আমিনুল হক বাদশা ১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের (বর্তমান জহুরুল হক হল) ছাত্রলীগ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এসময় আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং এর প্রেক্ষিতে কারাবরণও করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের সদস্য ছিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সংবাদ পাঠক আমিনুল হক বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সের (বি এল এফ) সদস্য ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ সালে আগরতলা

মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি তার প্রেস সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালে আমিনুল হক বাদশা মুজিবনগরে বাংলাদেশ মিশনের বহিঃপ্রচার বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালের পর সামরিক শাসনের কারণে লন্ডনে চলে যেতে বাধ্য হন। তিনি ঢাকার পত্রিকা *ইন্ডিপেনডেন্ট* এটিএন বাংলা (ইউকে), লন্ডনের *দৈনিক নতুন দিন*, কলকাতার *দৈনিক আজকালে* দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রবীণ সদস্য আমিনুল হক ছায়ানটের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ঢাকা, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

মুস্তাফা সারওয়ার (১৯৩৫-২০০৪) ১৯৪৮ সালে নারায়নগঞ্জ ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক মনোনীত হন। ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সংগঠনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নারায়নগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রেফতার হন। তাছাড়া এ সময় তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন সফল রাজনৈতিক, কলাম লেখক, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও সমাজসেবক হিসেবে নিজের পরিচয়কে সমৃদ্ধ করেছেন। এম আর মাহবুব, *যারা অমর ভাষা সংগ্রামে*, অনিন্দ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৬৯-২৭০

৫৪. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২১-২৪

৫৫. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*। *The Daily Star*, Dhaka, 17 November 2017

৫৬. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০-১৬১

৫৭. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি ১৯৬৯

৫৮. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি ১৯৬৯,

উক্ত সভায় বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন (১৯৩২-২০১৩), বেগম রেবেকা মহিউদ্দিন (১৯৩৯-২০১৮), আজিজা ইদ্রিস (১৯২৬-), লায়লা কবির (১৯৫০-), কামরুন্নাহার লাইলী (১৯৩৭-১৯৮৪), হুসনে আরা ইসলাম, ফরিদা হাসান, বদরুন্নেসা আহমদসহ ৪০ জন নেতৃস্থানীয় মহিলা এক যুক্ত বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের নারী সমাজকে গণসংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণের আবেদন জানিয়ে বলেন যে, সরকার সমগ্র দেশে আজ গণহত্যা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির বর্বরনীতি অনুসরণ করে চলেছেন। গত দুইমাস ঢাকা, চট্রগ্রাম, হাতিরদিয়া, নড়াইল, রাওয়ালপিন্ডি, পেশোয়ার, করাচি ও লাহোরে গোলাগুলিতে অসংখ্য ছাত্র জনতাকে আহত করা হয়েছে। ঢাকায় ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানের হত্যা এই নৃশংস বর্বরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পুলিশ, ই পি আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস বর্তমানে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড) বাহিনীর হিংস্র আক্রমণ থেকে ছাত্রীদেরকেও রেহায় দেওয়া হয় নাই। আমরা সরকারের এই হিংস্র নীতির তীব্র নিন্দা, গণহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও নিহত শহীদ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দানের দাবি জানাচ্ছি। আমরা ইহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে, কোন দেশের কোন মানুষের ন্যায় সঙ্গত গণতান্ত্রিক দাবি পেশী শক্তিবলে দাবিয়ে দেওয়া যায় নাই। পাকিস্তানের মানুষের অধিকার সংগ্রামকে রক্তের গঙ্গা বইয়ে ভাসিয়ে দেওয়া যাবে না। আমরা ছাত্রসমাজের ১১ দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সমস্ত সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি এবং আগামীকাল সাধারণ হরতালকে সফল করে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। পূর্ব পাকিস্তানের নারী সমাজের প্রতিও আমরা আজিকার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি।

কামরুন্নাহার লাইলী (১৯৩৭-১৯৮৪) পিরোজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। *অবরুদ্ধ পত্রিকায়* (১৯৫৭) সম্পাদক হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু হয়। তাছাড়া তিনি *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকার মহিলা বিভাগের সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩ সালে আইন বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করে ঢাকা জেলা বারে আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের প্রথম মহিলা সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। কলেজে অধ্যায়নকালীন কামরুন্নাহার লাইলী রাজনীতিতে যোগদান করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ছিলেন এবং এসময় তিনি ডাকসুর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে চালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। কামরুন্নাহার লাইলী ছাত্রাবস্থায়ই পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। তিনি ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'র (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন এবং ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ন্যাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি পাক-চীন মৈত্রী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রথমে ভাইস প্রেসিডেন্ট পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। কামরুন্নাহার লাইলী সমাজ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি অসংখ্য মহিলাদের আইনী সহায়তা এবং অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করেছেন। ফরিদা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

বেগম জোহরা তাজউদ্দিন (১৯৩২-২০১৩) ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কিশোরী বয়স থেকেই সমাজের জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভব করেন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সাথে বিবাহের পর স্বামীর রাজনৈতিক সহযোদ্ধায় পরিণত হন। ১৯৬৮ সালে গঠিত রাজবন্দী সাহায্য কমিটির যুগ্ম আহবায়ক নির্বাচিত হন। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে সকল স্তরের নারীরা অংশগ্রহণ করে। এ সময় তিনি তৎকালীন নারী নেত্রীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতেন এবং নারীদের দ্বারা আহুত সরকার বিরোধী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং বিবৃতি প্রদান করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তার স্বামীর সাথে

থেকে সকল প্রকার সাংগঠনিক সহযোগিতা প্রদান করতেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে নিহত হলে এবং একই বছর ৩ নভেম্বর জোহরা স্বামীসহ জাতীয় চার নেতা নিহত হওয়ায় আওয়ামী লীগের মহাসংকটকালীন সময়ে তিনি দলের হাল ধরেন। ১৯৭৭ সালে তিনি আওয়ামী লীগের আহবায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা তাকে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মনোনীত করলে আমৃত্যু একই পদে দায়িত্ব পালন করেন। *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর ২০২১। সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫-২৬২

বেগম রেবেকা মহিউদ্দিন (১৯৩৯-২০১৮) ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, ভাষাসৈনিক ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মহিউদ্দিন আহমেদের সহধর্মিনী ছিলেন। বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে রেবেকা মহিউদ্দিন সবসময় স্বামীর সাথে ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর থেকেই তিনি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বিশেষ করে গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে অন্যান্য মহিলা নেত্রীদের সাথে রাজপথের আন্দোলনে যুক্ত তথা সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ এবং বিবৃতি প্রদান করেন। তাছাড়া নারী সমাজকে তাদের আন্দোলনে যোগদানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সংগঠক হিসেবে সক্রিয় দায়িত্ব পালন করেন। *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ঢাকা, ১০ এপ্রিল ২০১৯। *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি ১৯৬৯।

রাইসা হারুণ একজন নারী আন্দোলন কর্মী। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সংগঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৬২ সালে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে সকল দল-মত নির্বিশেষে মহিলা সংসদ গঠিত হয়। এ সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন সুফিয়া কামাল ও রাইসা হারুণ সম্পাদিকা মনোনীত হন। এই মহিলা সংসদ নারীদের যুগোপযোগী দাবি-দাওয়া আদায়ে আন্দোলন করত। ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পুনর্বিবেচনা ও দাবি অনুযায়ী পরিবর্তনের জন্য সরকারের নিকট যারা আবেদন জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেন রাইনা হারুণ তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯। মেহেরুন্নেসা মেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

লায়লা কবির ১৯৫০ সালে ভারতের কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু পৈত্রিক নিবাস বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। নারী আন্দোলনের সংগঠক, সমাজসেবক ও লেখক রোকেয়া রহমান কবীর তার মাতা। লায়লা কবির তার মায়ের অনুপ্রেরণায় নারী আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত হন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে নারী নেত্রীদের ডাকে স্বৈরাচার বিরোধী কর্মসূচিতে যোগদান করেন। লায়লা কবির ইংরেজি সাহিত্যের একজন স্বনামধন্য লেখক। সাঈদা জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮

হোসনে আরা ইসলাম ১৯২৯ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর শ্বশুর বাড়ি চট্টগ্রামে বসবাস শুরু করে। কিশোরী বয়স থেকেই সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জড়িত ছিলেন। বিবাহের পর স্বামীর উৎসাহ ও পরামর্শে বামপন্থি রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হন। এক্ষেত্রে তিনি মতিয়া গ্রুপের অনুসারী ছিলেন। ১৯৬৮-৬৯ সালে ইডেন কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। এসময় তৎকালীন মহিলা নেত্রীদের সাথে থেকে গণঅভ্যুত্থানের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে ধানমণ্ডি গার্লস স্কুল মাঠে অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২৫ মার্চের পর কুমিল্লা সীমান্ত দিয়ে ভারতের আগরতলায় গিয়ে মতিয়া চৌধুরী, মালেকা বেগম, ডা. রত্নাসহ অন্যান্য নেত্রীদের সাথে দেখা করেন এবং তাদের সাথে কলকাতায় যান। এসময় হোসনে আরা ইসলাম কলকাতায় বাসা ভাড়া করেন। তার বাসা মুক্তিযোদ্ধাদের মিলন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হত। মুক্তিযুদ্ধে তার ছেলে এবং মেয়ে সরাসরি যোগদান করেছিলেন। আ. শ. ম. বাবর আলী, *মুক্তিযুদ্ধে শত নারী*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৭৭-১৭৮

ফরিদা হাসান বাংলাদেশের একজন নারী প্রগতিশীল কর্মী। জীবনের প্রথম থেকেই তিনি নারী নেত্রীদের সাথে থেকে স্বৈরাচার বিরোধী কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬১ সালে ছায়ানট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম সদস্য ছিলেন। গণঅভ্যুত্থানের সময় সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে পরিচালিত মশাল মিছিলে (১৯৬৯ সালের ২৭ জানুয়ারি) অংশগ্রহণ করেন এবং গণআন্দোলনে নারীদেরকে আহবান করে বিবৃতি প্রদান করেন। আবদুল হাই, *বাংলাপিডিয়া*। *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ২৫ নভেম্বর ১৯৬৮। *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ২৫-২৮ জানুয়ারি ১৯৬৯।

৫৯. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

সাজেদা চৌধুরী ১৯৩৫ সালের ৮ মে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। তৎকালীন সময়ে মেয়েদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ না থাকলেও স্বামীর (চট্টগ্রামের তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা ও ভাষা সৈনিক গোলাম আকবর চৌধুরী) উৎসাহে তিনি সামাজিক ও নারী আন্দোলনের সাথে (আপওয়া) যুক্ত হন। ১৯৬১ সালে আপওয়ার চট্টগ্রাম জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও পরে সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালে সাজেদা চৌধুরী স্বপরিবারে ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। এ সময় সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে চলমান রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় সাজেদা চৌধুরী শেখ মুজিবুরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং মহিলা আওয়ামী লীগের প্রসারে কাজ করেন। ১৯৬৯ সালে ঢাকার ফুলার রোডের জনসভায় শেখ মুজিব মহিলা আওয়ামী লীগ গঠন করেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান মহিলা আওয়ামী লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মহিলা আওয়ামী লীগের দায়িত্ব গ্রহণের পর সারাদেশে এর শাখা স্থাপন করেন এবং নারীদেরকে রাজনীতি সচেতন করে তোলেন। এভাবে তিনি বাংলাদেশের রাজনীতির প্রতিটি পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এম এল এ নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করেন মুক্তিযুদ্ধে মহিলাদের সংগঠিত করে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার ইন্দিরা রোডে তার বাসভবনে মহিলাদের রাইফেল ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মহিলাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতে মহিলাদের ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয় যা ছিল মুজিবনগর সরকার কর্তৃক অনুমোদিত একমাত্র মহিলা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প (গোবরা ক্যাম্প)। সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী গোবরা ক্যাম্পের পরিচালক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সংসদীয় নির্বাচনে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠিত হলে তিনি জাতীয় মহিলা ফ্রন্টের প্রধান নির্বাচিত হন। ১৯৭৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং পরবর্তীতে ১৯৮৭-১৯৯২ সাল পর্যন্ত নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালের সংসদীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এভাবেই তিনি আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অব্যাহত দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০ সালে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য তাকে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করা হয়। সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০-২১২। সাঈদা জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০

৬০. মেহেরুন্নেসা মেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯

৬১. সাক্ষাৎকার, খালেদা খানম, বাংলাদেশের প্রথম নারী হুইপ। সংরক্ষিত নারী আসন, জাতীয় সংসদ-১৯৯৬, নিজ বাসভবন, (স্মরণীকা) লালমাটিয়া, ঢাকা, ২৬ জানুয়ারি ২০২২

৬২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

৬৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

৬৪. সাক্ষাৎকার, খালেদা খানম, বাংলাদেশের প্রথম নারী হুইপ। *প্রাগুক্ত*

খালেদা খানম ১৯৪৯ সালে শরীয়তপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রাম কলেজে পড়াশোনা করার সময় তিনি যাত্রিকের (চট্টগ্রাম কলেজে ছাত্রলীগের নাম ছিল যাত্রিক) সদস্য হন। ১৯৬৭ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম কেন্দ্রিয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে মহিলা সম্পাদিকা পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। একইসাথে তার অঞ্চলের মেয়েদেরকে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তাছাড়া তার অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতার পর সদ্যস্বাধীন দেশের পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত হন এবং জাতীয় সংসদের প্রথম নারী হুইপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আয়েশা খানম (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ দিনের স্মৃতি*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৭২-৭৩

৬৫. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*

৬৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৭ জুন ১৯৭০

৬৭. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*

৬৮. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৩-৮৭

৬৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯২-৯৩

৭০. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭, ২৪৪

৭১. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭

৭২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৯ জুলাই ১৯৭০

৭৩. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*

৭৪. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৫৪১

৭৫. আব্দুল ওয়াহেদ তরফদার, *৭০ থেকে ৯০: বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট*, পাণ্ডুলিপি, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৩

৭৬. *মর্নিং নিউজ*, ঢাকা, ২ মার্চ ১৯৭১

৭৭. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৯-৬৮

৭৮. *দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ৬ মার্চ ১৯৭১

৭৯. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৯-৮১

৮০. মেহেরুন্নেসা মেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯

৮১. **মালেকা খান** বাংলাদেশের অন্যতম একজন সমাজ সেবক, লেখক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি 'পূর্ব পাকিস্তান গার্লস গাইড অ্যাসোসিয়েশনে'র অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত স্বরূপ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি কামরুন্নেসা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে সেখানকার মিছিলে যোগ দেন এবং মিছিল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। শেখ মুজিবের ডাকা অসহযোগ আন্দোলনের আহবানে সাড়া দিয়ে পেশাগত অভিজ্ঞতার আলোকে ফার্স্ট এইড, সিভিল ডিফেন্স ও হোম নার্সিং কার্যক্রম শুরু করেন। এক্ষেত্রে যুদ্ধের শুরুতে বেগম বদরুন্নেসা আহমদ ও সুফিয়া কামালের সর্বাত্মক সহযোগিতায় কাজ চালিয়ে যান। ঢাকার জিগাতলা, শংকর প্রাইমারি স্কুল, রায়ের বাজার, আজিমপুর গার্লস হাইস্কুলে মালেকা খান এবং তার সহযোগীরা মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। মূলত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা দেশের জন্য কাজ করতে এগিয়ে আসেন। তার শ্বশুর বাড়ি মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার হত। মালেকা খান জীবনের মায়া ত্যাগ করে

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তি বাহিনীর বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ করতেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যোদ্ধাহত নারী ও শিশুদের পুনর্বাসনে বেগম বদরুন্নেসা আহমদ, সুফিয়া কামালসহ অন্যান্য নারী নেত্রীদের সাথে কাজ করেন। https://www.youtube.com/watch?v=2mDlRV6wiOg. https://www.youtube.com/watch?v=GPyvwpu2Ejo. সুপা সাদিয়া, *বায়ান্নর ৫২ নারী*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৫৯-৬০

৮২. সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪২-২৪৪। সাক্ষাৎকার মালেকা খান (https://www.youtube.com/watch?v=GPyvwpu2Ejo)

৮৩. নাজিমুদ্দীন মানিক, *একাত্তুরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলো*, প্রিয় বুক সেন্টার, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৪৩

৮৪. আ.শ.ম. বাবর আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

৮৫. মেহেরুন্নেসা মেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯

৮৬. আ.শ.ম. বাবর আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮

৮৭. রোকেয়া কবীর, *মুজিব মেহদী*, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭৩

৮৮. মোহীত উল আলম, আবু মো. দেলোয়ার হোসেনের সম্পাদনায়, *মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা ১৯৭১*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৯৬

৮৯. **ফোরকান বেগম** (১৯৫০-) নারায়নগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার পুটিনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৪ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় ও চাকুরি জীবনে দেশি বিদেশি বহু প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। তাছাড়া সমাজসেবী হিসেবে আন্তর্জাতিক পুরস্কারও লাভ করেছেন। ফোরকান বেগমের সবচেয়ে বড় পরিচয় হল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও গেরিলা নেত্রী। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই তিনি বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে চালিত প্রতিটি আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ (আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে) ফোরকান বেগমের নেতৃত্বে সশস্ত্র মহিলা মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা শেখ মুজিবের হাতে তুলে দেন। ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চ লাইটের পর তিনি নিজ গ্রামে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের কাজ করেন। ভারতের আগরতলায় মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা হলে ১৯৭১ সালের মে মাসে ফোরকান বেগম ভারতে চলে যান। ১৯৭১ সালের ১০ জুলাই আওয়ামী লীগ নেত্রী ও ছাত্রীর সমন্বয়ে আওয়ামী মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী নামে একটি বাহিনী গড়ে ওঠে। সেখানে তিনি প্রথমে যুগ্ম সম্পাদিকা এবং পরবর্তীতে সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি এ সংগঠনের আহবায়কও ছিলেন। এ সময় মুক্তিযুদ্ধে তার বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন সিনেটর অ্যাডওয়ার্ড কেনেডি তাকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সৈনিক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ফোরকান বেগম, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী*, সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. লেখক পরিচিতি অংশ। সুপাসাদিয়া, *৭১ এর একাত্তর নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৭৮

৯০. ফোরকান বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১-৮৩ ও ১৩৮

৯১. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তিমঞ্চে নারী*, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৭

৯২. আয়শা খানম (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ দিনের স্মৃতি*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা ২০০১, পৃ. ১৭৫

৯৩. মোহীত উল আলম, আবু মো. দেলোয়ার হোসেনের সম্পাদনায়, *প্রাগুক্ত* পৃ. ১৯৬

৯৪. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*।

৯৫. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০০-৩০৩।

১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি গঠিত 'বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা'র নির্বাহী পরিষদের ১২ জন সদস্য নিম্নরূপ:

সুফিয়া কামাল	সভাপতি
বেগম বদরুন্নেসা আহমদ	সহ সভাপতি, এমপি
বেগম মেহের কবির	সহ সভাপতি
বেগম হাসনা হাজারি	কোষাধ্যক্ষা
মিসেস ফিরোজা খাতুন	সদস্য
মিসেস তসলিমা আবেদ	সদস্য, এমপি
ড. নুরুন্নাহার জহুর	সদস্য
ড. হালিমা খাতুন	সদস্য
অধ্যাপক আয়শা নোমান	সদস্য
শিল্পী সুফিয়া শহীদ	সদস্য
মিসেস শামসুন্নাহার	সদস্য
অ্যাডভোকেট মেহেরুন্নেসা আহমেদ	সদস্য, সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৯।

৯৬. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*

৯৭. *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮।
বেগম বদরুন্নেসা যুদ্ধাহত মহিলাদের পুনর্বাসনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি নিজে এবং তৎকালীন নারী কর্মীদের সহযোগিতায় খুব দ্রুত নারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। নারী কর্মী মালেকা খান তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে, "বর্বর পাক বাহিনীর দ্বারা পাশবিক অত্যাচারে নির্যাতিত বোনদের উদ্ধার করার কাজে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করছি। সাংসদ বদরুন্নেসা আহমদ (বদরুন আপা) আমাকে খবর পাঠালেন যে, গার্লস গাইড অফিসে আমার কাজ সেরে তার বাসায় যাওয়ার জন্য। গিয়ে দেখি দুটি জিপ গাড়ী দাড়িয়ে আছে। ক্যান্টনমেন্ট তখন ছিল ভারতীয় সৈন্যদের অধীনে। আমাকে আপা বলেছিলেন সাথে দু'তিনটা পরনের শাড়ী নিয়ে যেতে। আমার কাপড়-চোপড় অফিসেই ছিল। তাই সাথে নিয়ে নিলাম। আপা দাঁড়িয়ে থেকে ব্যবস্থা করলেন একটা জিপের, সেই জিপে আমি আর একজন ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা রওয়ানা হলাম। আজও মনে আছে, মেয়েদের যখন উদ্ধার করতে গেলাম মনে হয়েছে না জানি কত দিন ওরা ধুলায় গড়াগড়ি করেছে। গায়ে কাপড় আছে কি নেই, সে যে কী বীভৎস অবস্থা। ... নি:শব্দে ক্যান্টনমেন্টের একতলা বাড়ি থেকে মেয়েদের আনা হয়েছিল। ... অপেক্ষারত খালাম্মা (সুফিয়া কামাল) আর বদরুন আপা নিজেরাই ঐ মেয়েদের জিপ থেকে নামিয়ে নিয়ে যান।" *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮

৯৮. মালেকা বেগম ১৯৪৪ সালে পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু তার শৈশবকাল কাটে পুরানো ঢাকার ওয়ারীতে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। মালেকা বেগম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী থাকাবস্থায় সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য হয়ে রোকেয়া হলের ছাত্রী সংসদে (১৯৬২-১৯৬৮) সহ সভানেত্রী এবং একই সময়ে ডাকসুর সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৬৮-১৯৬৯ সালে তিনি সরাসরি নারী আন্দোলনে যোগদান করেন। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদসহ অন্যান্য নেতাদের মুক্তির দাবিতে পরিচালিত আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হলে মালেকা বেগম এ সংগঠনের আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ' গঠিত হলে ২২ বছর এ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন। বাংলাদেশের নারী সমাজের উন্নয়নে স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে মালেকা বেগম সবসময় নারীর উন্নয়ন, সমতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সাথে যুক্ত আছেন। তিনি ষাটের দশক থেকে লেখা শুরু করেছেন এবং বর্তমানে তার গ্রন্থ সংখ্যা ২০। সুপা সাদিয়া, *৭১ এর একাত্তর নারী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪-১৮৮। আ. শ. ম. বাবর আলী, *মুক্তিযুদ্ধে শতনারী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮

৯৯. *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮

১০০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৯।

১০১. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৭

১০২. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

১০৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৭ মার্চ ২০২০

১০৪. *সাক্ষাৎকার*, *খালেদা খানম*, *প্রাগুক্ত*

১০৫. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯-৯০

১০৬. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*। ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯-৯০

১০৭. **বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি :** ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে শান্তি ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ ২৫ বছর মেয়াদী একটি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যেটাতে স্বাক্ষর করেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সফরের সময় এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটিতে মোট ১২টি ধারা ছিল। মূলত দু'দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিবিড় ও স্থায়ী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি গঠিত হয়। ১৯৯৭ সালের ১৯ মার্চ চুক্তিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে। তারেক শামসুর রহমান, *বাংলাপিডিয়া*

১০৮. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*। ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯-৯০

১০৯. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯-৯০

১১০. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*

১১১. আ.শ.ম. বাবর আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

১১২. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*

১১৩. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯-৯০

১১৪. বক্তব্য, জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী (বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার হিসেবে ৩০ এপ্রিল ২০১৩ থেকে অদ্যাবধি দায়িত্বরত) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ৮ মার্চ ঢাকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯ উপলক্ষে বেগম বদরুন্নেসা আহমদ ট্রাস্ট আয়োজিত নারী সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্য।

১১৫. সাক্ষাৎকার, ড. নাসরীন আহমাদ, *প্রাগুক্ত*

২.৪ নূরজাহান মুরশিদ (১৯২৪-২০০৩)

বাংলাদেশের মহিলা রাজনৈতিক নেতৃত্বের অন্যতম নেত্রী নূরজাহান মুরশিদ। তিনি ১৯২৪ সালের ২২ মে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানার তারা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আইয়ুব হোসেইন বেগ ও মাতা ক্ষতিমুন্নেসা।[১] নূরজাহান মুরশিদের বাবা ব্রিটিশ পুলিশ সার্ভিসের মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার পুলিশ প্রধান ছিলেন। তিনি তার বাবার কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর কলকাতা ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন থেকে ১৯৩৮ সালে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যাল (প্রতিষ্ঠা ১৮৫৭) থেকে ১৯৪৫ সালে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।[২] খেলাধুলায় নূরজাহান মুরশিদ দক্ষ ও পারদর্শী থাকায় এ সময়ে তিনি স্পোর্টস কমিটিতে কাজ করেন।[৩] চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে নূরজাহান মুরশিদ রেণু চক্রবর্তী (স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পশ্চিম বাংলার মূখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের ভগিনী) নামের কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রীর কাছে বামপন্থি রাজনৈতিক আদর্শ এবং কমিউনিজম সম্পর্কে অনুশীলনে অংশ নিয়েছিলেন।[৪] বাম আদর্শের প্রতি তার এই আগ্রহ এবং বামপন্থি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থেকে বোঝা যায় যে তার সামাজিক দায়বদ্ধতা কেবল মেয়েদের কল্যাণের জন্য নয়, নারী-পুরুষের এবং শ্রেণি নির্বিশেষে সবার উন্নতির জন্যই নিবেদিত হয়েছিল।

চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে নূরজাহান মুরশিদ জড়িয়ে পড়েন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে। মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৭) শান্তির জন্য অনশন শুরু করলে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর (১৮৯২-১৯৬৩) সাথে তিনি কাজ শুরু করেন। এমনকি এসময় নূরজাহান মুরশিদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে থেকে কয়েকবার গান্ধীজীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। কলকাতায় পোস্ট গ্রাজুয়েট মুসলমানদের জন্য বিবেকানন্দ রোডে অবস্থিত মন্নুজান হোস্টেলের দায়িত্ব পালনকালে তিনি মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কালচার সেন্টার গঠন করেন। এই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। তবে মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে এ সংগঠনের রাজনৈতিক ধারা ভিন্ন ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হলে নূরজাহান মুরশিদ পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন বাঁধা হয়ে দাড়ায় তার চাকরি।[৫] তিনি তার বন্ধু সুকুমারী ভট্টাচার্যকে (১৯২১-২০১৪) সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ঢাকা চলে আসেন।[৬] অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ঘোষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানে প্রথম মুসলিম মহিলা হিসেবে কাজ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও তিনি একই পেশায় নিয়েজিত ছিলেন। পরবর্তীতে এ প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রাম প্রযোজক পদে দায়িত্ব পালন করেন।[৭] এ পদে দায়িত্ব পালনের সময় শামসুল হুদা চৌধুরী (১৯২০-২০০০), লায়লা আর্জুমান্দ বানু (১৯২৯-১৯৯৫), লায়লা ছামাদ (১৯২৮-১৯৮৯), কামাল লোহানী (১৯৩৪-২০২০), আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-২০২০), কামাল হোসেন (১৯৩৭-), সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৩৬-) প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়।[৮] পরবর্তীতে নূরজাহান মুরশিদ বাংলাদেশের বরিশালে সাউদুন্নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন এবং ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন,

কামরুন্নেসা বিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠা ১৯২৪), ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল (প্রতিষ্ঠা ১৯৫২), হলিক্রস কলেজে (প্রতিষ্ঠা ১৯৫১) শিক্ষকতা করেন।[৯]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই কমিউনিস্ট ও বামপন্থিরা ঠিক করে যে, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও সেই ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তোলাটা এদেশে ভবিষ্যতে একটি বড় কাজ হয়ে দাঁড়াবে। আর সেই লক্ষ্য সামনে নিয়েই ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় বেচারাম দেউড়িতে একটি যুব সম্মেলনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে গণতান্ত্রিক যুবলীগ।[১০] তাতে কমিউনিস্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক, রেভোলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি (আর.এস.পি), জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও অংশ নেন মুসলিম লীগের তরুণ কর্মীদের একাংশ।[১১] বস্তুত, মধ্যচল্লিশের দশক থেকেই বাংলার মুসলিম লীগে দুটি ধারা প্রবাহিত ছিল। তার একটি ধারায় যুক্ত ছিলেন তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) ও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর (১৮৯২-১৯৬৩) অনুসারী। এই অংশ পাকিস্তান দাবির ব্যাপারে যেমন একনিষ্ঠ ছিল, তেমনি ভূমি-সংস্কার, কৃষকদের দাবি-দাওয়াসমূহ সমর্থন ও বাস্তবায়নের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। বস্তুত, তখন বাংলার মুসলিম তরুণ-তরুণীদের মাঝে প্রগতিশীলতার দিকে যে স্বাভাবিক ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভীত হিসেবে কাজ করেছে। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি এই ধারার সাথে শুধু যে যোগাযোগই রাখত তা নয়, তা যাতে অগ্রসর হয় এবং মুসলিম লীগের মধ্যে তা যাতে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে তার জন্য প্রচেষ্টা চালাত। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারত বিভক্তির পর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিও বিভক্ত হয়। ১৯৪৮ সালে ৬ মার্চ পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির শাখা হিসেবে 'পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হয়।[১২] কমিউনিস্ট নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলন (তেভাগা, নাচোল ও হাজং আন্দোলন) চলছিল তাই পূর্ব পাকিস্তান সরকার আন্দোলন দমন করতে ব্যাপক দমনমূলক ও হিংসাত্মক কর্মপন্থা গ্রহণ করে।[১৩] এ সময় অসংখ্য কমিউনিস্ট নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করায় পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত কমিউনিস্ট তথা বামপন্থিরা অন্যদলের মধ্যে ঢুকে পার্টির আদর্শ বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[১৪] প্রগতিশীল এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে প্রথম থেকেই নূরজাহান মুরশিদের যোগাযোগ ছিল।[১৫]

১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (ইংরেজি) খান সারওয়ার মুরশিদের (১৯২৪-২০১২) সাথে নূরজাহান মুরশিদের বিবাহ হয়।[১৬] রাজনীতিবিদ মৌলবী ওয়াকিল আলী আহমদ খান (বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বিলির সদস্য) নূরজাহান মুরশিদের শ্বশুর ছিলেন। শ্বশুরের আগ্রহের কারণেই তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। মূলত শ্বশুর বাড়ির রাজনৈতিক পরিবেশই তাকে ধীরে ধীরে রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। ১৯৫০ সালের শুরুতেই নূরজাহান মুরশিদ সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং দেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করেন।[১৭] ১৯৫১ সালে তিনি বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডাক্তার ক্লাবের উদ্যোগে অভিনীত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬-১৯৩৮) 'বিজয়া' নাটকে বিজয়ার ভূমিকায় অভিনয় করেন।

মূলত তার শ্বশুর বাড়ির সদস্যরা সংস্কৃতমনা হওয়ায় তিনি রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিলেন।[১৮]

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার প্রতিটি পর্যায়ে নূরজাহান মুরশিদ সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫০ সালে ঢাকায় প্রচণ্ড আকারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়।[১৯] দাঙ্গার বিরুদ্ধে লীলা রায়ের (১৯০০-১৯৭০) নেতৃত্বে বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯) ও ওয়ারি মহিলা সমিতির (১৯৫৪) মহিলারা প্রতিরোধ আন্দোলন ও ত্রাণ কার্য পরিচালনা করে।[২০] ১৯৫০ সালে দাঙ্গা প্রতিরোধের পর যুঁইফুল রায় (১৯১৬-১৯৯৭) নতুন উদ্যমে বিদ্যমান মহিলা সমিতিকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন।[২১] মুসলিম প্রগতিকামী মহিলাদের সঙ্গে যুঁইফুল রায় ও অন্যান্য নেত্রীর যোগাযোগের মাধ্যম ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৭-১৯৭১)। এ সময় বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), যুঁইফুল রায় (১৯১৬-১৯৯৭), রোকেয়া রহমান কবীর (১৯২৫-২০০০), বেগম রেবেকা মহিউদ্দিন (১৯৩৯-২০১৮), রাইসা হারুন, নূরজাহান মুরশিদ প্রমুখ প্রগতিবাদী মহিলা নারী সমাজকে সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন।[২২] নূরজাহান মুরশিদ আজীবন মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভূমিকা রেখে এসেছেন। তিনি এদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের একেবারে সূচনা থেকে তার অগ্রগতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে পালন করেছেন ইতিবাচক ভূমিকা। অসাম্প্রদায়িকতা ও গণতান্ত্রিক ভাবধারায় দৃঢ়ভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন তিনি প্রথম থেকেই। এদেশের বামপন্থি আন্দোলনের প্রতিও তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল।[২৩]

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ধারায় ভাষা আন্দোলনকে গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠার এ সর্বজনীন আন্দোলনে দল-মত নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে একত্রিত হয়েছিল। এ আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের নারী সমাজ বিশেষ করে তৎকালীন নারী নেত্রীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[২৪] পূর্ব পাকিস্তানে এ সময় নারী আন্দোলন পরিপূর্ণ অবস্থায় না থাকলেও নূরজাহান মুরশিদ ও অন্যান্য নারী নেত্রীরা নারীদেরকে সংগঠিত করতে থাকেন এবং ভাষা আন্দোলনে যোগদানে আহবান করেন।[২৫] ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে মেয়েদের সংগঠিত করে আন্দোলনে শামিল করার ক্ষেত্রে যারা অগ্রণী ছিলেন বেগম নূরজাহান মুরশিদ ছিলেন তাদের অন্যতম। ভাষা আন্দোলন সংগঠিত করার লক্ষ্যে পুরান ঢাকার অভয়দাস লেনের এক বাড়িতে মহিলাদের সভা করার ক্ষেত্রে যারা সেদিন অগ্রণী ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলে গুলি বর্ষণের খবর শহরের মহিলা সমাজের উপর চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই ১৯৫২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পুরানা পল্টনে ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার উপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে মহিলাদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় নূরজাহান মুরশিদ এবং লায়লা সামাদ ভাষা আন্দোলনে শহীদদের লক্ষ্য পূরণে কাজ করে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা ও শোক জানিয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। শিশু রক্ষা সমিতি, ওয়ারি মহিলা সমিতি ও অন্যান্য সমিতির কর্মী সদস্যরা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলো।[২৬] এসময় সরকারি দমন নীতি উপেক্ষা করে বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), কামরুন্নাহার লাইলি (১৯৩৭-১৯৮৪), হালিমা খাতুন (১৯৩২-২০০৮), আফসারী খানম, নূরজাহান মুরশিদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পাড়ায় পাড়ায় 'সর্বদলীয়

ভাষা সংগ্রাম পরিষদে'র লিফলেট বিলি করা, মহিলাদের সভা করা, মহিলাদের মধ্যে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক বক্তব্য পৌঁছানো ইত্যাদি কাজে তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বজনীন রাজনীতির পর্যায়ে মহিলাদের ঐক্যবদ্ধতায় নূরজাহান মুরশিদ একজন অংশীদার হিসেবে বিবেচ্য।[২৭]

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রচণ্ড দাবির মুখে ১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়। ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ থেকে ১২ মার্চ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। ভাষা, শিক্ষা সংস্কৃতি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজবন্দিদের মুক্তি, দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা ইত্যাদি দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এ দেশের নারী সমাজ ব্যাপক উৎসাহের সাথে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে সাধারণ নির্বাচনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে নূরজাহান মুরশিদ প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তার নির্বাচনী এলাকা ছিল ঢাকা-নারায়নগঞ্জ। এ নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন মুসলিম লীগের শামসুন্নাহার আহমেদ।[২৮] যুক্তফ্রন্টে মনোনয়ন পাওয়া মহিলা প্রার্থীদের পক্ষে নারী সমাজের তৎকালীন নেত্রীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ড. হালিমা খাতুন (১৯৩২-২০০৮) নূরজাহান মুরশিদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন এবং তার পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সংঘবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে অন্যান্য নারীদের সক্রিয় প্রচারণায় নূরজাহান মুরশিদসহ মনোনীত অন্যান্য নারী প্রার্থী মুসলিম লীগের প্রার্থীদের পরাজিত করে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জয়লাভ করেন।[২৯] ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে ১৯৫৪ সালের আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য নূরজাহান মুরশিদ, বেগম রাজিয়া বানু (১৯৫৮-২০১০) ও দৌলতুন্নেসা খাতুনকে (১৯১৮-১৯৯৭) প্রাদেশিক পরিষদের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়।[৩০]

১৯৫৭ সালে মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের তৃতীয় অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের মধ্যে নূরজাহান মুরশিদ যোগদান করেন। একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি উদ্যোগে 'সোসাল ওয়ার্ক কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয় যেখানে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে গঠিত এ কমিটির সভানেত্রী ছিলেন পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদের স্ত্রী এবং সহ সভানেত্রী ছিলেন নূরজাহান মুরশিদ। মূলত সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্য এ কমিটি গঠন করা হয়েছিল।[৩১] ১৯৫৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অষ্টম অধিবেশনে যোগদান করেন। এভাবেই নূরজাহান মুরশিদ সমাজ ও নারীর অবস্থার উন্নয়নে বৈশ্বিক কর্মসূচিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন।[৩২]

পাকিস্তান আমলে নারীর আইনগত অধিকার ও পরিবারে নারীর অবস্থান উন্নত করার লক্ষ্যে যখন সুফিয়া কামালের সক্রিয় নেতৃত্বে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয় তখন প্রতিটি পদক্ষেপে অন্যান্য নারী নেতৃত্বের সাথে নূরজাহান মুরশিদও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬২ সালে মহিলা প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনী আইন সংশোধনীর প্রতিবাদে সুফিয়া কামাল, নূরজাহান মুরশিদ, লায়লা সামাদ, ড. হালিমা খাতুন প্রমুখ নারী নেত্রী মহিলা সম্মেলন আহবানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সভা ও হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিবৃতি প্রদান করেন। ১৯৬২ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন করে নারী স্বার্থ রক্ষামূলক যে ধারা (ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, ইসলামী বিধানাবলীর বাস্তবায়ন এবং শরিয়তের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য 'পারিবারিক আইন-১৯৬১' বাতিল করতে হবে) যুক্ত হয়েছিল একটি প্রতিক্রিয়াশীল মহল যখন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে তখন এই নারী স্বার্থ রক্ষাকারী অর্ডিন্যান্স বানচালকারীদের বিরুদ্ধে বিবৃতি, সভা-সমাবেশ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সীমিত আকারে হলেও একটা প্রতিবাদ আন্দোলন করেছিলেন সুফিয়া কামাল, বেগম রোকেয়া আনোয়ার, হাজেরা মাহমুদ, আমেনা বেগম, কামরুন্নাহার লাইলী, রাইসা হারুন, বদরুন্নেসা আহমদ, লুলু বিলকিস বানু, জোবেদা খানম, নূরজাহান মুরশিদ প্রমুখ নারী নেত্রী।[৩৩]

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। ছয়দফা নিয়ে এ সময় আওয়ামী লীগের অনেক নেতা কর্মীর মধ্যে মতদ্বৈততা লক্ষ্য করা যায়। তবে ছয়দফার প্রতি আওয়ামী লীগের তরুণ নেত্রীবৃন্দের পূর্ণ সমর্থন ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই ছয়দফা এবং ছয়দফা প্রণয়নকারীদের কঠোরভাবে দমনের হুমকি দিতে থাকে। শীর্ষস্থানীয় প্রবীণ নেতাদের বাঁধা স্বত্ত্বেও ১৩ মার্চ অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয়দফা অনুমোদন করা হয়। তবে কাউন্সিল অধিবেশনেও ছয়দফার অনুমোদন নিতে হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৩৪] ১৯৬৬ সালের ১৮ ও ১৯ মার্চ সৈয়দ নজরুল ইসলামের (১৯২৫-১৯৭৫) সভাপতিত্বে ঢাকার মতিঝিলের ইডেন হোটেলে ওয়ার্কিং কমিটির কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৩৫] এ অধিবেশনে ছয়দফার পক্ষে বিপক্ষে বিশদ আলোচনা হয় কিন্ত শেষ পর্যন্ত এক রকম বিনা বাঁধাতেই ৬ দফা দাবি কাউন্সিলররা অনুমোদন করে। তাছাড়া এ কাউন্সিল সভায় ওয়ার্কিং কমিটি নতুনভাবে গঠিত হয়। ছয়দফা নিয়ে আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতাদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও ছয়দফা জনগণের দাবিতে পরিণত হয়।[৩৬] এ অধিবেশনে কাউন্সিলররা শেখ মুজিবুর রহমানকে সভাপতি নির্বাচিত করেন। আমেনা বেগম (১৯২৫-১৯৮৯) মহিলা সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৩৭] ছয়দফা প্রচারণার এক পর্যায়ে ৮ মে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় যে সকল নেতাকর্মী জেলের বাইরে ছিলেন তারা শেখ মুজিবের পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক ছয়দফার পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।[৩৮] ছয়দফা ঘোষণা পরবর্তী সময়ে দলের এই চরম সংকটের সময় মহিলা সম্পাদক আমেনা বেগম অত্যন্ত সাহস, দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।[৩৯] সাংগঠনিক প্রয়োজনে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমেনা বেগম দেশের বিভিন্ন অঞ্চল (ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, খুলনা প্রভৃতি) সফর করেন। ছয়দফা আন্দোলন সঠিক অর্থে সকলের মাঝে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম সফর করেন। এসময় তার সাথে নূরজাহান মুরশিদও চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন।[৪০] আমেনা বেগম ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগে'র সাধারণ সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করেন।[৪১] ছয়দফা আন্দোলন চলাকালীন সময়ে তিনি এক বিবৃতির মাধ্যমে সকল জেলা, মহকুমা, নগর, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কমিটির প্রতি শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানান। তার এ আহবানে অনেক

নেতৃস্থানীয় মহিলা ছয়দফা আন্দোলনে শামিল হয়।[৪২] এভাবে আমেনা বেগমের সাথে থেকে নূরজাহান মুরশিদ ছয়দফার পক্ষে জোরালো ভূমিকা পালন করেন।[৪৩]

১৯৬৬ সালের ৭ জুনের হরতাল এবং বিক্ষোভই ছিল গণঅভ্যুত্থানের প্রকৃত উৎস। বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হয়ে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু করেন। ছয়দফা আন্দোলন প্রতিহত ও শেখ মুজিবসহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন থেকে সরানোর জন্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে।[৪৪] যদিও বর্তমান সময়ের অনেক গবেষক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সত্য ছিল বলে মতামত প্রদান করেন।[৪৫] তবে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই ছয়দফা আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। মূলত এ সময় ছাত্ররাই রাজপথের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাই এ আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের মহিলা সমাজ পূর্ণ সমর্থন প্রদান করে এবং তারাও আন্দোলন শুরু করে। ১৯৬৯ সালের ২ জানুয়ারি বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলো (ভাসানী ন্যাপ ছাড়া) ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠন করে। ১৯৬৯ সালের ১৪ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় অনুষ্ঠিত সাধারণ ছাত্র সভায় ১১ দফা কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। এ সময় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সরকার ঘোষিত ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে বিক্ষোভ মিছিল করে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি বেলা প্রায় ২ টার সময় ছাত্র জনতার একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালালে এ. এম. আসাদুজ্জামান (১৯৪২-১৯৬৯) শহীদ হন।[৪৬] এ ঘটনার পর আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ছাত্রী নেত্রীসহ মহিলা সমাজ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ছাত্র আন্দোলনের প্রয়োজনে নারী সমাজের সমর্থন সৃষ্টির জন্য ছাত্রীদের মধ্য থেকে বিভিন্ন মহিলা নেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে '৬৯ এর গণআন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালের ২২ জানুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার নানা স্তরের মানুষ নিজ নিজ দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। সারাদেশের জনগণ যখন সামরিক শাসন বিরোধী স্বাধিকারের দাবিতে জেগে উঠেছিল তখন রাজনৈতিক দলমত ও আদর্শের ঊর্দ্ধে সকল শ্রেণি ও স্তরের মহিলাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদ'। এই সংগ্রাম কমিটির সভানেত্রী ছিলেন সুফিয়া কামাল এবং আহবায়ক ছিলেন মালেকা বেগম (১৯৪৪-)। সদস্যরা ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য। আওয়ামী লীগ নেত্রী নূরজাহান মুরশিদ পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদের সক্রিয় সদস্য ছিলেন।[৪৭]

তিনি ১৯৬৯-৭১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার সম্পাদক হিসেবে রাজনীতিতে নারীদের সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। নূরজাহান মুরশিদ আওয়ামী মহিলা শাখার সাংগঠনিক ভিত্তি দৃঢ়করণ ও দেশে চলমান আন্দোলন সংগ্রামে আওয়ামী মহিলা লীগকে কার্যকরী ভূমিকা পালনে উপযুক্ত করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাংগঠনিক সফর করেন। ১৯৬৯ সালের ৩১ আগস্ট অনুষ্ঠিত সমাবেশে 'নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগে'র মহিলা সাংগঠনিক সাব-কমিটির আহবায়িকা হিসেবে তিনি এবং এ কমিটির সম্পাদিকা হিসেবে বেগম সাজেদা চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় 'মাগুরা জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ' গঠন করা হয়।

সভায় বক্তৃতাদানকালে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রয়োজনে মহিলাদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি উল্লেখ করতে গিয়ে দেশের অতীত রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেন। তাছাড়া পরিস্থিতি বিবেচনায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে সকল মহিলাদেরকে 'আওয়ামী মহিলা লীগে' যোগদানে উৎসাহিত করেন।[৪৮] এরপর ফরিদপুরের 'মহিলা আওয়ামী লীগে'র কর্মী বেগম ফরিদা সিদ্দিকার বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন। এ সভার মাধ্যমে ফরিদপুর আওয়ামী মহিলা শাখার সাংগঠনিক সাব-কমিটি গঠন করা হয়। নূরজাহান মুরশিদ ও সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী উভয়ে বক্তৃতায় মহিলাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান করেন।[৪৯] উনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় নূরজাহান মুরশিদ আইয়ুব খানের (১৯০৭-১৯৭৪) ছাত্র-শিক্ষক নিপীড়নের প্রতিবাদে বিশেষভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তিনি শিক্ষকদের মা, স্ত্রী আর মেয়েদের একত্রিত করে নারী আন্দোলন গড়ে তোলেন। আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের আন্দোলনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া গণঅভ্যুত্থানের প্রতিটি পর্যায়ে নূরজাহান মুরশিদ নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন ।[৫০]

পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থানের তীব্রতা উপলব্ধি করে ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ আইয়ুব খান সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সেনা বাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান (১৯১৭-১৯৮০) ক্ষমতা গ্রহণ করে ২৮ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। প্রদত্ত ভাষণে তিনি ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ও ১৯৭০ সালের ২২ অক্টোবরের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনী কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়া খানের এ ঘোষণার মাধ্যমে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলো নতুন করে তৎপর হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানে তৎকালীন সময়ে আওয়ামী লীগ ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় বৃহৎ গণসংগঠন। এ সময় শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় কর্মসূচি এবং কৌশল গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের ৭ মার্চ শেখ মুজিব ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) আয়োজিত বিশাল জনসভা থেকে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচার অভিযান উদ্বোধন করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার লক্ষ্যে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৫১] ১৯৭০ সালের ৬ জুন ঢাকার ইডেন হোটেলে 'নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগে'র কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ২০০ জন কাউন্সিলর যোগদান করে। পাকিস্তান পর্বে আওয়ামী লীগের এটিই ছিল সর্বশেষ কাউন্সিল কমিটি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৃতীয়বারের মত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এ কাউন্সিল অধিবেশনে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের নাম ঘোষণা করা হয়। বেগম নূরজাহান মুরশিদ কার্যনির্বাহী পরিষদের মহিলা সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৫২] ১৯৭০ সালের ৫ জুন পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ বিষয়ে সরকারের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে ১৬২ টি সাধারণ এবং ৭ টি মহিলা আসন নির্ধারিত হয়।[৫৩] জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৭ টি আসনে আওয়ামী লীগের ৭ জন নির্বাচিত হন। নূরজাহান মুরশিদ এই ৭ জন নির্বাচিত সদস্যের একজন ছিলেন।[৫৪]

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচনে জয়লাভ করে। কিন্তু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে সময় নষ্ট করতে থাকে। শেখ মুজিব-ইয়াহিয়া খানের আলোচনা ব্যর্থ হলে ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চ লাইটের নির্দেশনা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ তথা অসহযোগ আন্দোলন।[৫৫] ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাড়ে সাত কোটি নর-নারীর জীবন মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি পর্যায়ে নারীরা অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। বাঙালি নারীরা দেশে এবং দেশের বাহিরে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন।[৫৬] ১৯৭১ সালের ২২ মার্চ নূরজাহান মুরশিদ প্রস্তুতি পর্বে সুফিয়া কামাল, মালেকা বেগম সহ অন্যান্যের সাথে চট্টগ্রাম সফর করেন। ২৫ মার্চে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ভবনে ছিলেন। বিভীষিকাময় ২৫ মার্চ রাত পার করার পর তিনি ঢাকায় থাকা বিপজ্জনক মনে করেন এবং ছেড়া কাঁথা গায়ে জড়িয়ে ছদ্মবেশে পরিবার নিয়ে বের হন। কুমিল্লার কালিনগর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই-চার দিন করে অবস্থান করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থানকালীন সময়ে পাকিস্তান বিমান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হলে নূরজাহান মুরশিদ কোন রকমে দেশের অভ্যন্তর থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে প্রথমে আগরতলা এম পি হোস্টেলে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে তিনি এবং তার স্বামী খান সারওয়ার মুরশিদ কলকাতায় চলে যান। সেখানে বন্ধু সুকুমারী ভট্টাচার্যের বাসায় কিছু দিন অবস্থান করেন।[৫৭] এ সম্পর্কে নূরজাহান মুরশিদের লেখা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ থেকে প্রকাশিত *মুক্তিযুদ্ধ দিনের স্মৃতি গ্রন্থে* প্রকাশিত হয়। সেখানে উল্লেখ আছে,

> "আমি ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। তারপর ছেড়া কাঁথা গায়ে জড়িয়ে ছদ্মবেশে ঢাকা ছেড়ে কুমিল্লায় শ্বশুর বাড়ির গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করলাম। মাত্র দুই হাজার টাকা সম্বল করে পথে নেমেছিলাম এবং এখানে পৌঁছেই এক হাজার টাকা খরচ করে এক বস্তা চাল ও ডাল কিনে নিলাম। দেখাতে চাইলাম যে আমরা কারো উপর বোঝা হয়ে থাকবো না। কিন্তু সকাল হতেই চাচা শ্বশুর এসে জানালেন, 'আশপাশের লোকেরা জেনে গেছেন তোমরা ঢাকা থেকে এখানে এসেছো। এখন তোমাদের জন্য তো আমাদের জীবন বিপদগ্রস্থ হয়ে উঠলো।' এ জায়গা ছেড়ে আবার পথে নামলাম। খোলা নৌকা করে নদী খাল বিল পার হয়ে কোথায় যাচ্ছি জানি না। এমনি করেই যেদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ওপরে বোমা আক্রমণ হয় সেদিনই আমরা বাংলাদেশের মাটি ছেড়ে ভারতের মাটিতে পা রাখলাম। তারপর কলকাতা গিয়ে যুদ্ধকালীন সরকার অর্থাৎ মুজিবনগর সরকারের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সাথে নানারকম কাজে যুক্ত হয়ে পড়লাম।"[৫৮]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে নূরজাহান মুরশিদ আওয়ামী লীগ নেত্রী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন।[৫৯] ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে এ সরকারের ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরের কাজে নিয়োজিত হন।[৬০] এ সময় তিনি বেশির ভাগ সেক্টর পরিদর্শন করে তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রীর (তাজউদ্দিন আহমদ) কাছে রিপোর্ট প্রদান করতেন।[৬১] তাছাড়া তিনি যুদ্ধ ক্যাম্পগুলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র সরবরাহের কাজে

নিয়োজিত ছিলেন এবং শরনার্থী শিবিরে খাদ্য, বস্ত্র ও ওষুধের যোগান দিতেন। এ সব কিছু সংগ্রহের জন্য তিনি ভারত সরকার ও ভিন্ন ভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার (জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, বিবিসি, এফএও ইত্যাদি) কাছে নিয়মিত আবেদন ও যোগাযোগ রক্ষা করতেন।[৬২] তাকে ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত নিয়োগ (নূরজাহান মুরশিদ, ফণীভূষণ মজুমদার (১৯০১-১৯৮১) ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (১৯৩৯-) সহ একটি দল) করলে তিনি ভারতের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার করেন।[৬৩] দিল্লীতে পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। পত্রপত্রিকায় তার এ বক্তব্য গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়।[৬৪] সাংগঠনিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা ছাড়াও এসময় তিনি মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন।[৬৫] মুক্তিযুদ্ধের সময় নূরজাহান মুরশিদ পাকিস্তান সরকারের নানারকম নিপীড়ন সহ্য করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের অধীনে একটি পার্লামেন্টারি দল গঠিত হলে নূরজাহান মুরশিদ বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি পার্টির সদস্য হিসেবে ভারতের বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ সফর করে সে সব স্থানের পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন এবং বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনী যে নৃশংস গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে তা তাদেরকে অবহিত করেন। তাছাড়া এ সকল জায়গায় সফরকালে জনসভা করে বাংলাদেশের প্রকৃত পরিস্থিতি সকলের মাঝে তুলে ধরেন।[৬৬] পার্লামেন্টারি দলের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে স্বাধীন বাংলাদেশ ও মুজিবনগর সরকারের স্বীকৃতি দেবার বিষয়টি উত্থাপন করা।[৬৭] প্রতিটি স্থানে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। সভা সমিতিতে বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য বক্তব্য রাখেন এবং বাংলাদেশের সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা চালান। সে সময়ে ভারতের পার্লামেন্টে যুক্ত অধিবেশনে তিনি এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।[৬৮] তার এসব কর্মকাণ্ডের ফলে পাকিস্তান সরকার ভীষণ ক্ষুব্ধ হয় এবং তিনিই একমাত্র মহিলা যাকে পাকিস্তান সরকার (প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান) তার অনুপস্থিতিতে বিচার করে ১৪ বছরের কারাদণ্ড ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার দণ্ডাদেশ জারি করেন।[৬৯] তার স্বামী (মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের উপদেষ্টা ছিলেন) এবং সন্তানেরা (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নাট্যকর্মী হিসেবে নূরজাহান মুরশিদের মেয়ে তাজিন মুরশিদ কাজ করেন) মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেছিলেন।[৭০]

স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী (বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রতিমন্ত্রী) হিসেবে নূরজাহান মুরশিদ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।[৭১] স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৩ টি আসন লাভ করে।[৭২] সংরক্ষিত মহিলা আসনে নূরজাহান মুরশিদ নির্বাচিত হন।[৭৩] তিনি জাতীয় সংবিধান রচনার জন্য গঠিত গণপরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করেছিলেন। নূরজাহান মুরশিদ ছিলেন একজন প্রাণবন্ত ও সমাজকল্যাণে নিবেদিত প্রাণ নেত্রী। তিনি কখনও হতাশ হতেন না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বপরিবারে নিহত হলে দিশেহারা না হয়ে এগিয়ে আসেন নূরজাহান মুরশিদ। ১৫ আগস্ট পরবর্তী অনিশ্চিত ও ভীতিকর দিনগুলোতে যে কয়জন সাহসী সদস্য আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠনের কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন

নূরজাহান মুরশিদ তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বাংলাদেশের রাজনীতি বিপদগামী হতে দেখে দেশবাসীকে সমাজ ও সভ্যতা বাঁচাতে সুস্থ রাজনীতির পুনর্জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। এই লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন নেতাকর্মী একত্রিত হয়ে সীমিত শক্তি সামর্থ নিয়েও ধারাবাহিক কার্যক্রম শুরু করেন। নূরজাহান মুরশিদ স্বৈরাচার পতনেও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।[৭৪] মূলত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা এবং ৩ নভেম্বর বাংলাদেশের জাতীয় চার নেতা তাজউদ্দিন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫), সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯২৫-১৯৭৫), ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী (১৯১৯-১৯৭৫), এইচ.এম কামরুজ্জামান (১৯২৬-১৯৭৫) হত্যার পর রাজনীতিতে নিরুৎসাহিত হতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[৭৫]

বাংলাদেশের সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলেও সামাজিক দায়বদ্ধতা তার মধ্যে আমৃত্যু বিরাজ করেছে। নূরজাহান মুরশিদ ১৯৮৫ সালে *একাল* নামে একটি বাংলা সাময়িকী প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে *'এদেশ একাল'* নামে প্রকাশিত এই সাময়িকীতে বৌদ্ধিক পর্যায়ে নারী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।[৭৬] নারীর সমান অধিকার আদায় ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি সামনে রেখেই এ পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।[৭৭] এটিই দেশের প্রথম জেন্ডার বিষয়ক পত্রিকা ছিল। *'এদেশ একাল'* সাময়িকীতে নারীর প্রতি বৈষম্য, নারী নির্যাতন, নারীর ক্ষমতায়নসহ তৎকালীন বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় যেমন- সহিংসতা, দুর্নীতি, গণতন্ত্রের অভাব ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হত।[৭৮] তাছাড়া এ সাময়িকীতে নিরদচন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৭-১৯৯৯), এ কে ফজলুল হকের (কৃষক প্রজা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা), কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) এবং চিত্রশিল্পী কামরুল হাসানের (১৯২১-১৯৮৮) (যিনি এ সাময়িকীর প্রচ্ছদের চিত্রকার ছিলেন) সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়েছিল।[৭৯] মৌলবাদীদের বিভিন্ন তৎপরতার জবাবও এ সাময়িকীতে প্রকাশ করা হত। সাময়িকী প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তিনি সকলের সহযোগিতা ও সমর্থন নিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৯৯১ সালে আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে সাময়িকীটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

নূরজাহান মুরশিদ আমৃত্যু বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং জনকল্যাণে কাজ করে গেছেন। তিনি বাংলাদেশ মহিলা সমিতির প্রথম সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও তিনি আজিমপুর লেডিস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ইন ডায়াবেটিস, এনডোক্রিন অ্যান্ড মেটাবোলিক ডিজঅর্ডার (বার্ডেমের) (প্রতিষ্ঠিত ১৯৮০) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের গঠনকালে (প্রতিষ্ঠিত ১৯৮৬) এর একজন পৃষ্ঠপোষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্ত্রীদের জন্য ক্লাব "শ্রেয়শীর" প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।[৮০] নূরজাহান মুরশিদ ২০০৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন। রাজনীতি ও সমাজকর্মে তার উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি ২০১৩ সালে সমাজসেবায় 'একুশে পদক' (মরণোত্তর) লাভ করেন।[৮১]

প্রান্তটীকা

১. সুপা সাদিয়া, *’৭১ এর একাত্তর নারী*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৪৫
২. *দি ডেইলি স্টার*, ঢাকা, ৯ ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ৮। আ.শ.ম. বাবর আলী, *মুক্তিযুদ্ধে শত নারী*, জ্ঞান বিতরণী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৬৩
৩. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭
৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭
৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭
৬. **সুকুমারী ভট্টাচার্য (১৯২১-২০১৪)** ভারতের মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস গবেষক হলেও বাংলা ও ইংরেজি ভাষার সাহিত্যিক হিসেবেও পরিচিতি রয়েছে। ১৯৪৫ সালে লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরবর্তীতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনার সাথে যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে সুকুমারী ভট্টাচার্য বামপন্থি ছিলেন।
https://bn.wikipedia.org/wiki/সুকুমারী_ভট্টাচার্য
সরদার ফজলুল করিম, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সেলিনা হোসেন, আনিসুজ্জামান ও কামাল হোসেন (সম্পা.), *নূরজাহান মুরশিদ স্মারক গ্রন্থ*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৭
৭. সেলিনা হোসেন (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
লায়লা আর্জুমান্দ বানু (১৯২৯-১৯৯৫) ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর ‘অল ইন্ডিয়া রেডিও’ ঢাকা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একক সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তৎকালীন কঠোর সমাজ ব্যবস্থায় তিনি পারিবারিক অনুকূল পরিবেশ পাওয়ায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে পেরেছিলেন। পেশাগত জীবনে সাংস্কৃতিক বিভিন্ন পদে পদায়ন পেয়েছেন । ১৯৭৮-১৯৮৩ পর্যন্ত লায়লা আর্জুমান্দ বানু ঢাকা সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অবৈতনিক অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফরিদা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬-৯৮
লায়লা সামাদ (১৯২৮-১৯৮৯) নারী সাংবাদিকতায় অগ্রদূত হিসেবে বিবেচ্য। ১৯২৮ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। জলপাইগুড়িতে পড়াশোনা করা অবস্থায়ই তার রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি। লায়লা সামাদ তার গৃহশিক্ষকের কাছ থেকেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন। তার স্বামী মির্জা সামাদ কমিউনিস্ট রাজনীতিতে যুক্ত থাকায় স্বামীর সাথে একত্রে কাজ করতে থাকেন। ১৯৫২ সালে ঢাকায় আসেন এবং কমিউনিস্ট কর্মী যুঁইফুল রাইয়ের সাথে নারী প্রগতির কাজ শুরু করেন। এসময় ভাষা আন্দোলন চলমান থাকায় তিনি অন্যান্য নারী কর্মীদের সাথে ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। সহকর্মী নিবেদিতা নাগের সাথে রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবি সম্বলিত পোস্টার নিজ হাতে দেয়ালে দেয়ালে লাগিয়েছেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পক্ষে সভা-সমিতি ও বক্তৃতা প্রদান করেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তার সরব উপস্থিতি ছিল। পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় তুলসী লাহিড়ী রচিত ‘ছেঁড়া তার’ নাটকে অভিনয় করে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। তাছাড়া তিনি ‘চারনিক’ নামে একটি নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। লায়লা সামাদ সংস্কৃতির পাশাপাশি সাহিত্য চর্চাও করতেন। স্কুল জীবনেই তার প্রথম গল্প ‘মহিলা’ *সওগাত* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তার বিশেষ অবদান রয়েছে। *সাপ্তাহিক বেগম* পত্রিকার সহকারি সম্পাদিকাসহ *দৈনিক সংবাদ*, *পূর্বদেশ* ইত্যাদি পত্রিকায় কাজ করেছেন। প্রগতিশীলতায় বিশ্বাসী লায়লা সামাদ সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। ফরিদা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১-৯৩।
কামাল লোহানী (১৯৩৪-২০২০) সাংবাদিকতা দিয়ে পেশা জীবন শুরু করলেও সার্বক্ষণিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। স্কুল জীবনেই ভাষা আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগদানের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতারে সংবাদ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার সুপরিচিতি আছে। *দৈনিক যুগান্তর*, ঢাকা, ২০ জুন ২০২০।
আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-২০২০) পেশাগত জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য) যুক্ত থাকলেও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার বহুমূখী ভূমিকা রয়েছে। তিনি ছাত্রাবস্থায় ভাষা আন্দোলনে যোগদান করেন। তাছাড়া উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তার গবেষণা ক্ষেত্র সর্বজনবিদীত। তাছাড়া আনিসুজ্জামান তার কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ অসংখ্য সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ১৫ মে ২০২০
কামাল হোসেন ১৯৩৭ সালে ভারতের কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে ঢাকা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়ে এম এল এ নির্বাচিত হন। কামাল হোসেন বাংলাদেশের ৩৪ সদস্যের সংবিধান রচনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৯৩ সালে ‘গণফোরাম’ নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সরকার বিরোধী নির্বাচনী জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষনেতা হিসেবে

সক্রিয় রয়েছেন। ড. কামাল হোসেন, *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা ১৯৬৬-১৯৭১*, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. লেখক পরিচিতি অংশ

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৩৬ সালে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৮০ এর দশকে 'গাছ পাথর' ছদ্মনামে তিনি *দৈনিক সংবাদ* পত্রিকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সাপ্তাহিক প্রতিবেদন লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৯৬ সালে তাকে শিক্ষায় অবদানের জন্য একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। https://bn.wikipedia.org/wiki/সিরাজুল ইসলাম_চৌধুরী

শামসুল হুদা চৌধুরী (১৯২০-২০০০) টেলিভিশন ও বেতারের একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিও ও রেডিও পাকিস্তানের আঞ্চলিক পরিচালক ছিলেন। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ব্রডকাস্টিং ইকোয়্যারি কমিশনের সভাপতি এবং ১৯৭৭ সালে তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। তাছাড়া শামসুল হুদা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরিত বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। শাহনাজ হুদা, *বাংলাপিডিয়া*

৯. *দি ডেইলি স্টার*, ঢাকা, ৯ ডিসেম্বর ২০১২

১০. Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh*, UPL Dhaka, 1986, P.78

১১. কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগের পর সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসকে গণতন্ত্রায়ণ, আমূল সংস্কার এবং বিদ্যমান নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য কংগ্রেসের মধ্যেই আন্তঃসংগঠন হিসেবে ১৯৩৯ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করেন। চিত্তরঞ্জন মিশ্র, *বাংলাপিডিয়া*

ত্রিদিব চৌধুরী (১৯১১-১৯৯৭) ১৯৪০ সালের ১৯ মার্চ ভারতে রেভোলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি (আর.এস.পি) বা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল গঠন করেন। এ দলের সদস্যরা মার্কসবাদে বিশ্বাস করেন। https://bn.wikipedia.org/wiki/ত্রিদিব চৌধুরী

১২. Rangalal Sen, *Ibid*, P.78

১৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, *প্রথম খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৫০৬

১৪. Rangalal Sen, *Ibid*, p. 88

১৫. *দি ডেইলি স্টার*, ঢাকা, ৯ ডিসেম্বর ২০১২

১৬. **খান সারওয়ার মুরশিদ (১৯২৪-২০১২)** বাংলাদেশের একজন বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদ। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলনসহ বাংলাদেশের সকল গণআন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের নেপথ্য রূপকারদের তিনি একজন। আজীবন তার পেশা ছিল শিক্ষকতা এবং শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন এক কিংবদন্তিতুল্য প্রতিভা। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছু পর ইংরেজি ত্রৈমাসিক পত্রিকা *নিউ ভ্যালুজ* প্রকাশনা করে তিনি দেশের বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং পোল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া খান সারওয়ার মুরশিদ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যানেরও দায়িত্ব পালন করেছেন।
https://bn.wikipedia.org/wiki/খান সারওয়ার মুরশিদ। *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর ২০১২

১৭. *দি ডেইলি স্টার*, ঢাকা, ৯ ডিসেম্বর ২০১২

১৮. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭

১৯. মালেকা বেগম কর্তৃক গৃহীত রোকেয়া রহমান কবীরের সাক্ষাৎকার, ১৯৮৭ উদ্ধৃত মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৩০

২০. ১৯৫৪ সালে সুফিয়া কামালের সভানেত্রীত্বে 'ওয়ারি মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মহিলা সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎকালীন মহিলাদেরকে সংগঠিত ও সচেতন করে তোলা। ফরিদা আখতার (সম্পা.), *শত বছরে বাংলাদেশের নারী*, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৭

২১. **যুঁইফুল রায় (১৯১৬-১৯৯৭)** বাংলাদেশের বরিশাল জেলার কাউনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল জীবনেই ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী থাকাবস্থায় (১৯৩৮-১৯৩৯) কমিউনিস্ট পার্টির গোপন কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৪০ সালে এ পার্টির সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়েন। এরপর বরিশালে ফিরে এসে যুঁইফুল রায় মহিলাদের সংগঠিত করতে থাকে। ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি-সহ অন্যান্য মহিলা নেত্রী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৭ সালের পর ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। এ সময় তিনি আত্মগোপনে থেকে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ১৯৫৯ সালে যুঁইফুল রায় কলকাতায় চলে যান।
http://weeklyekota.net/printPaper.php?serial=7658

২২. **শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৭-১৯৭১)** ছাত্র জীবন থেকেই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। সাহিত্যকর্মেও তার গৌরবময় পদচারণা রয়েছে। ১৯৪৯ সালে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় যোগদানের মাধ্যমে সাংবাদিক জীবনে প্রবেশ করেন। দেশভাগের পর ১৯৫১ সালে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্য হন। ১৯৫২

সালের ভাষা আন্দোলনে যোগদান করায় গ্রেফতার হন এবং তিন বছর কারাগারে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আলবদর বাহিনীর সদস্যরা তাকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। সিমিন হোসেন রিমি, *তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী ১৯৪৭-১৯৪৮*, প্রতিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২২৫

রোকেয়া রহমান কবীর (১৯২৪-২০০০) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস ফরিদপুরের সন্নিকটে গের্দার জজপাড়া গ্রামে। তিনি একজন সংগঠক, সমাজসেবক ও গ্রন্থকার। ১৯৪২ সালে কলকাতা থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৬ সালে ডিস্টিংশনসহ বি.এ. পাস করেন। ১৯৪৮ সালে ইতিহাসে পঞ্চম স্থান অধিকার করে এম.এ. পাস করেন। ১৯৫৯ সালে লন্ডন ইউনিভার্সিটিতেও অধ্যয়ন করেন এবং মুসলমানদের (ভারতীয়) রাজনীতি সম্পর্কে গবেষণা করেন। ১৯৭৬ সালেই ফরিদপুরের কোমরপুর গ্রামে 'সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের ব্যাপ্তি ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া এলাকায়ও ছিল। রোকেয় রহমান কবীর ২০০০ সালের ২৮ জুলাই ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। সাঈদা জামান, *বাংলাদেশের নারী চরিতাভিধান*, দি রয়েল পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২২২

২৩. মালেকা বেগম কর্তৃক গৃহীত রোকেয়া রহমান কবীরের সাক্ষাৎকার, ১৯৮৭ উদ্ধৃত মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৩১

২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮-১৩১

২৫. সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনা পরিষদ, *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪৯-৫১

২৬. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১

২৭. মালেকা বেগম কর্তৃক গৃহীত সুফিয়া কামালের সাক্ষাৎকার, জুন ১৯৮৭ উদ্ধৃত মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১-১৩২। নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তিমঞ্চে নারী*, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৩

ড. হালিমা খাতুন (১৯৩২-২০০৮) বৃহত্তর খুলনার বাগেরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামে পিতার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় তার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ এবং শিক্ষা শাস্ত্রে এম এড ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬১ সালে ড. হালিমা খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট এ যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব নর্দান কলোরাডো থেকে ডক্টরেট ইন এডুকেশন লাভ করেন। হালিমা খাতুন স্কুল জীবন থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও পরে বামপন্থি আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভোরে পিকেটিং করে স্কুল থেকে মেয়েদের নিয়ে এসে ঐতিহাসিক আমতলার সভায় সমবেত হন এবং সেদিনের ১৪৪ ধারা অমান্য করে চার জনের মিছিল নিয়ে বের হয়েছিলেন। এরপর দীর্ঘকালধরে ভাষা আন্দোলনসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসীম নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সাথে কাজ করেছেন। ১৯৫৩ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে হালিমা খাতুন তাতে সমর্থন প্রদান করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী বেগম নূরজাহান মুরশিদের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সংঘবদ্ধ করেন। তাছাড়া মুসলিম সরকারের পতন ঘটাতে এ সময় তিনি নূরজাহান মুরশিদের পক্ষে জোরালোভাবে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। হালিমা খাতুন শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদদের সাথে কাজ করেন। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৭৯ সালে নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (শিশু সাহিত্য), ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের সাহিত্য পুরস্কারসহ অন্যান্য সাহিত্য সংশ্লিষ্ট পুরস্কারে ভূষিত হন। হালিমা খাতুন ২০০৮ সালে ইন্তেকাল করেন। সাঈদা জামান, *বাংলাদেশের নারী চরিতাভিধান*, পৃ. ৩০৭-৩০৮। ফরিদা ও সাঈদা জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫, ৩০৭

২৮. মালেকা বেগম কর্তৃক গৃহীত নূরজাহান মুরশিদের সাক্ষাৎকার, ১৯৮৬ উদ্ধৃত মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯

২৯. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *শত বছরে বাংলাদেশের নারী*, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১১৫

৩০. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১১৩। মালেকা বেগম কর্তৃক গৃহীত নূরজাহান মুরশিদের সাক্ষাৎকার, ১৯৮৬ উদ্ধৃত মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯। মফিদা বেগম, *আওয়ামী লীগ রাজনীতি নারী-নেতৃত্ব (১৯৪৯-২০০৯)*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৮৪

বেগম রাজিয়া বানু (১৯৩১-২০২২) এ কে ফজলুল হকের নাতনি যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের প্রথম সারির একজন নারী নেত্রী। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে প্রাদেশিক পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি শিক্ষা বিষয়ক সংসদীয় সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে সংবিধান রচনা কমিটি ৩৪ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হলে সেখানে রাজিয়া বানু একমাত্র নারী সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচনে (১৯৭৩) সংরক্ষিত মহিলা আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। *দৈনিক সমকাল*, ১৩ মে ২০১৯

দৌলতুন্নেসা খাতুন (১৯২২-১৯৯৭) বগুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্য সাধনা ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতায় তার জীবন বিকশিত হয়। তৎকালীন সময়ে কংগ্রেস রাজনীতি এবং ফজলুল হকের নেতৃত্বে 'কৃষক-প্রজা পার্টি'র আন্দোলন সারাদেশে

সরব অবস্থায় ছিল। পারিবারিক পরিমণ্ডল পেরিয়ে দৌলতুন্নেসা এ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩২ সালে লবন আইন অমান্য করার দায়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের নারী সমাজের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে রংপুর-দিনাজপুর-বগুড়া নির্বাচনী অঞ্চল থেকে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে দৌলতুন্নেসা খাতুনসহ তিনজন মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়। ১৯৫৬ সালে চীনের পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী কল্যাণ সংস্থার সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি উপন্যাসে 'নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী' স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি হলে তিনি রাজনীতি থেকে দূরে থাকা শুরু করেন। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনে তিনি নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে পারিবারিক বহুমূখী সমস্যার কারণে রাজনীতিতে সক্রিয় থাকেননি। ১৯৯৭ সালে দৌলতুন্নেসা মৃত্যুবরণ করেন। মেহেরুন্নেসা মেরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, ন্যাশনাল পাবলিকেশনস, ঢাকা, পৃ. ৭৫-৭৮। ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১-৬২

৩১. মালেকা বেগম কর্তৃক গৃহীত নূরজাহান মুরশিদের সাক্ষাৎকার, ১৯৮৬ উদ্ধৃত মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪

৩২. আ.শ.ম. বাবর আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

৩৩. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পা.), *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৪৪। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৬ আগস্ট ১৯৬২।

জোবেদা খানম (১৯২০-১৯৮৯) শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক কুষ্টিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। লেখিকা হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎকালীন নারী নেত্রীদের সাথে একযোগে কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ মহিলা সমিতির প্রথম সহ সভাপতি এবং পরবর্তীতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ শিশু একাডেমির (প্রতিষ্ঠা ১৯৭৬) প্রথম মহিলা সভাপতি (১৯৮৩-১৯৮৫)। সাঈদা জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১। ওয়াকিল আহমদ, *বাংলাপিডিয়া*

লুলু বিলকিস বানু নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন। তার পিতার নাম সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর, মাতা সারা তৈফুর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকাবস্থায় ভাষা আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি সভা-সমিতি, মিছিল-মিটিং-এ স্বতস্ফূর্তভাবে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ধর্মঘটে অন্যান্য ছাত্রীদের সাথে তিনি একাত্মতা ঘোষণা করেন। এসময় কর্তৃপক্ষ যেসকল ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার মধ্যে আইন বিভাগের ছাত্রী লুলু বিলকিস বানুও ছিলেন। পাকিস্তান আমলে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে নারীর আইনগত অধিকার ও পরিবারে নারীর অবস্থান উন্নত করার লক্ষ্যে পরিচালিত কর্মসূচিতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। লন্ডনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে তিনি প্রবাসী হয়ে কাজ করেন। তিনি বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ছিলেন। লন্ডনে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠনে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক সংগঠন 'ভয়েস অব গ্লোবাল বাংলাদেশিজ' এর পক্ষ থেকে ২০২২ সালের মার্চ মাসে তাকে সম্মাননা দেওয়া হয়। *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯। রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৪৫-৪৬

হাজেরা মাহমুদ পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মাহমুদ আলীর সাথে তার বিবাহ হয়। এ সময় তার স্বামী আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। হাজেরা মাহমুদ এ সময় থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় হন এবং কলকাতা কেন্দ্রিক রাজনীতির সাথে যোগাযোগ তৈরি হয়। সিলেটে বসবাস শুরু করার পর এ অঞ্চলে তার স্বামী মাহমুদ আলীর নেতৃত্বে ভাষা কমিটি গঠিত হলে তিনি এ কমিটির সক্রিয় কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুফিয়া কামাল-সহ অন্যান্য নারী নেতৃত্বের সাথে কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার স্বামী মাহমুদ আলী পাকিস্তানে চলে গেলে তিনিও তার সাথে পাকিস্তানে বসবাস শুরু করেন। হাজেরা মাহমুদ ১৯৯৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এম আর মাহবুব, *যারা অমর ভাষা সংগ্রামে*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩৯৪

৩৪. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৪০-১৪৩। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৩-২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

৩৫. **সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯২৫-১৯৭৫)** আওয়ামী লীগের সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে'র সদস্য হিসেবে সরাসরি ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি মনোনীত হন এবং ১৯৬৬ সালে ছয়দফা আন্দোলনের সংকটকালীন সময়ে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে যুগান্তকারী দায়িত্ব পালন করেন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ছিলেন এবং গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালে ময়মনসিংহ-১৭ নির্বাচনী অঞ্চল থেকে এম এল এ নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত হন এবং শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেন। এম আর মাহবুব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭-১৯৯

৩৬. *দি মর্নিং নিউজ*, ঢাকা, ১৯-২০ মার্চ ১৯৬৬

৩৭. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩-১৪৪

৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১-১৫২

৩৯. *দি ডেইলি স্টার*, ঢাকা, ৯ ডিসেম্বর ২০১২
৪০. রাশেদা আমিন, স্বশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা, সাক্ষাৎকার, নর্থ রোডের বাসভবন, ধানমন্ডি, ঢাকা, ২০ এপ্রিল ২০২২
৪১. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২-১৪৫
৪২. Shyamoli Ghosh, *The Awami League 1949-71*, Academic Publisher, Dhaka, p.130
৪৩. *দি ডেইলি স্টার*, ঢাকা, ৯ ডিসেম্বর ২০১২
৪৪. আবু আল সাঈদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
৪৫. কর্ণেল শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৯-১১
৪৬. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯-১৭১
৪৭. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০-১৬১। মোহীত উল আলম, আবু মো. দেলোয়ার হোসেনের সম্পাদনায়, *মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা ১৯৭১*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৮১
৪৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
৪৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
৫০. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫-১৫৮
৫১. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫-১৭৯
৫২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৭ ও ৯ জুন, ১৯৭০
৫৩. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬-১৭৭
৫৪. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮
৫৫. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *প্রথম খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৬০৫
৫৬. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০-১২৩
৫৭. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫-১৫৬
৫৮. আয়শা খানম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪-১৭৫
৫৯. মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী*, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়: মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৪১-৪২
৬০. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫-১৫৬
৬১. আয়শা খানম (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ দিনের স্মৃতি*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৭৫
৬২. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬
৬৩. রোকেয়া কবীর, মুজিব মেহদী, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১০২

ফণিভূষণ মজুমদার (১৯০১-১৯৮১) মাদারিপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪৮ সাল থেকেই ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং তার সক্রিয় ভূমিকার জন্য প্রথমে ১৯৪৮ সালে এবং পরবর্তীতে ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কারাগারে ছিলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এ দলের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের হয়ে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মাদারিপুর-গোপালগঞ্জ নির্বাচনী অঞ্চল থেকে এম এল এ নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পর তিনি গ্রেফতার হন এবং গণআন্দোলনের সময় জেল থেকে ছাড়া পান। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়ে ফরিদপুর-১৯ আসন থেকে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল-২ আঞ্চলিক কাউন্সিল (যশোর-ফরিদপুর) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুজিনগর সরকারের পক্ষ থেকে তিন সদস্যের ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনের লক্ষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সফর করে এবং সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাছাড়া ফণিভূষণ মজুমদার এ সময় ভারতের লোকসভায় স্বাধীনতার দাবি উল্লেখ করে ভাষণ প্রদান করেন। তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (১৯৩৯-) মুন্সীগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে নবম শ্রেণির ছাত্র থাকাবস্থায় ভাষা আন্দোলনে যোগদানের কারণে গ্রেফতার হন। ১৯৬৬ সালের ছয়দফা ও ১৯৬৯ সালের এগারো দফা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের এম এল এ নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও সংগঠক হিসেবে পালন করেছেন বহুমাত্রিক ভূমিকা। মুজিবনগর সরকার গঠিত ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতার স্বপক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে ভারতের ক্ষমতাসীন সরকার ও বিরোধী দলীয় নেতাদের সাথে যোগাযোগ তৈরি করেন। তাছাড়া তিনি ভারতীয় পার্লামেন্টে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে দুই ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট বক্তৃতা প্রদান করেন। https://www.banglanews24.com/politics/news/bd/546406.details

ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি দল দিল্লীতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরন সিং, স্পিকার ধীলন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম ও বিরোধী দলের নেতা ফখরুদ্দীন আলী আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের সময় এ সকল নেতৃবৃন্দ তাদের মতামত প্রকাশ করেন এভাবে, ইন্দিরা গান্ধী নূরজাহান মুরশিদকে প্রথমেই স্বাগত

জানান। নূরজাহান মুরশিদ বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থা এবং তাদের নিজেদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেন। তাছাড়া তিনি বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করলে ইন্দিরা গান্ধী শীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান। রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি তার মতামত উল্লেখ করতে গিয়ে ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথা বলেন এবং পাকিস্তানি বাহিনীর হিংস্রতার নিন্দা জানান। তিনি বাংলাদেশ সফর করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং তার মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে, পাকিস্তানের সমস্যা ভারতের সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে ইচ্ছাকৃতভাবে চালিত হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেন এবং এ সমস্যার সমাধানে বিশ্ব দরবারে আবেদন জানাবেন এ কথা বলেন। বাংলাদেশের স্বীকৃতির ব্যাপারে ভারতের কোন আপত্তি নেই বলে জানান। প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম আশ্বাস দেন যে, প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন তাই হবে। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তারা আলাদা দেশ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তাছাড়া ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সহযোগিতার কথা বলেন। স্পিকার ধীলন তার মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন যে বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থা তারা উপলব্ধি করতে পারছেন।

বিরোধী দলীয় নেতা ফখরুদ্দীন আলী আহমদ ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূতদের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, কেন বাংলাদেশ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দিকে গেল এবং সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করার ব্যাপারে তার মতামত ব্যক্ত করেন। রোকেয়া কবীর, মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২-১০৪

৬৪. আয়শা খানম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫
৬৫. রোকেয়া কবীর, মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২
৬৬. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭-১০৯। রোকেয়া কবীর, মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২
৬৭. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬
৬৮. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭-১০৯
৬৯. বেগম ফোরকান, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী*, সুমি প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড প্যাকেজিং, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৭৭-৭৮
৭০. মোহীত উল আলম, আবু মো. দেলোয়ার হোসেনের সম্পাদনায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭
৭১. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮
৭২. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউ.পি.এল, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩০১
৭৩. *দি ডেইলি স্টার*, ৯ ডিসেম্বর ২০১২
৭৪. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭
৭৫. আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (১৯২৬-১৯৭৫) ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হয়ে রাজশাহী অঞ্চল থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর দায়িত্বলাভ করেন। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর জেলে থাকাবস্থায় সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে নিহত হন। মুনতাসির মামুন, *বাংলাপিডিয়া*
৭৬. *দি ডেইলি স্টার*, ৯ ডিসেম্বর ২০১২
৭৭. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭
৭৮. *দি ডেইলি স্টার*, ৯ ডিসেম্বর ২০১২। আয়শা খানম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫
৭৯. আয়শা খানম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০-১৭৫
৮০. *দি ডেইলি স্টার*, ৯ ডিসেম্বর ২০১২। আয়শা খানম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫
৮১. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭

তৃতীয় অধ্যায় : বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল

৩.১ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)

৩.২ আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)

৩.৩ শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫)

৩.৪ হাতেম আলী খান (১৯০৪-১৯৭৭)

৩.১ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)

বিশ শতকে ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম তৃণমূল রাজনীতিবিদ ও গণআন্দোলনের নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। অল্পবয়সে মাতা-পিতা মারা যাওয়ায় সঠিক জন্ম তারিখ জানা যায় না। তবে মওলানা ভাসানীর সর্বশেষ পাসপোর্টে উল্লেখ অনুযায়ী তিনি ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।[১] তার পিতা হাজী শারাফাত আলী ও মাতা বেগম শারাফাত। অল্পবয়সে মাতা-পিতা হারিয়ে তিনি কিছুদিন চাচা ইব্রাহিমের আশ্রয়ে থাকেন এবং স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তেন। এরপর তিনি শাহ নাসিরউদ্দীন বাগদাদী নামে এক ইরাকি পীরের আশ্রয়স্থলে প্রতিপালিত হতে থাকেন। এখানে থেকেই তিনি ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। মওলানা ভাসানী বাঁধা ধরা জীবন পছন্দ করতেন না।[২] তিনি ১৯০৭ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত ভারতের উত্তর প্রদেশ অঙ্গরাজ্যের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দে ছিলেন। সেখানে তিনি মওলানা হোসেইন আহমদ মাদানীর নিকট কোরআন ও হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন।[৩] তৎকালে দেওবন্দের দারুল উলুম মাদ্রাসা ব্রিটিশ বিরোধী ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র থাকার ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার বিষয়টি তিনি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।[৪] দেওবন্দে মওলানা ভাসানী অনেক প্রগতিশীল ইসলামী পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন এবং প্রগতিশীল চিন্তা চেতনায় সিক্ত হন। এই দেওবন্দেই তিনি স্থির করেন তার জীবনের লক্ষ্য। সে লক্ষ্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং নিপীড়িত নির্যাতিত তথা মজলুম মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির লড়াইয়ে নিজেকে নিয়োজিত করা।[৫] দেওবন্দ থেকে ফিরে এসে আবদুল হামিদ কিছুদিন টাঙ্গাইলের কাগমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এ সময় কৃষকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষের জমিদারের নায়েব, গোমস্তার সাথে তার সংঘর্ষ শুরু হয়। জমিদার ভাসানীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। সকলের পরামর্শে তিনি আত্মগোপণ করে ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের পাদদেশে কলা গ্রামে আশ্রয় নেন। এখানে কিছুদিন আত্মগোপণ করার পর তিনি আসামের জলেশ্বরে পীর নাসিরউদ্দীনের আস্তানায় চলে যান। তার সান্নিধ্যে তিনি চার বছর অতিবাহিত করেন। তিনি পীরের মুরিদ হন। পরবর্তীতে তিনি লাখ লাখ মানুষের পীর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[৬]

১৯০৯ সালে যখন আসামে ফিরে আসেন তখন সারা বাংলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলছে। আবদুল হামিদ খানের বঙ্গভঙ্গের পক্ষে বা বিপক্ষে কি ভূমিকা ছিল তিনি কখনও প্রকাশ করেননি।[৭] এসময় তিনি আসামের জলেশ্বর থেকে কলকাতায় গমন করেন। এখানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনৈক মুখলেস নামক ব্যক্তি তাকে বিপ্লবী দলে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বিপ্লবী দলে যোগদান করে অস্ত্র ও লাঠি চালনা শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাছাড়া কবিগান ও যাত্রা পালা তাকে একজন প্রতিবাদী স্বদেশিতে পরিণত করেছিল। লাঠিখেলা ও কবিগানের আসরে কৃষক, মজুর, তাঁতী, জেলে, কামার-কুমার এইসব সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনের বঞ্চনার কথা শুনেই তিনি তাদের পক্ষে লড়াই করার মানসিকতা অর্জন করেছিলেন। ১৯০৫-১৯১১ সাল পর্যন্ত বাংলার স্বদেশি আন্দোলন দ্বারা আবদুল হামিদ খান প্রভাবিত হন এবং সশস্ত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে ভারতকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেন। স্বদেশি আন্দোলন চলাকালে তিনি

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত তিনি চরমপন্থিদের সাথে যুক্ত ছিলেন।[৮] তবে নিজে চরমপন্থায় যুক্ত হয়ে কোন ডাকাতি বা হত্যাকাণ্ডে অংশ নেননি। ১৯১৩ সালে তিনি স্বেচ্ছায় চরমপন্থি রাজনীতি পরিত্যাগ করেন।[৯] টাঙ্গাইলে দুই বছর থেকে তিনি বগুড়ার পাঁচবিবিতে গমন করেন। পাঁচবিবির জমিদার শামসুদ্দীন চৌধুরী মওলানা ভাসানীর সাহস, সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে তাকে জমিদারের সহকারি নিয়োগ করেন। মওলানা ভাসানী জমিদারির তত্ত্বাবধায়ক ও খাজনা পরিচালনা করতেন এ উপলক্ষে তাকে প্রায়ই কলকাতা যেতে হতো। কলকাতায় তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস রাজনীতির সাথে পরিচিত হন। তিনি জমিদারের অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। জমিদারের সহকারি হিসেবে কাজ করার সময় কৃষকদের অবস্থা তিনি স্বচক্ষে দেখেন। কৃষকদের দুরবস্থা, মানবেতর জীবন যাপন আর তাদের উপর জমিদারের শোষণ ও নির্যাতন প্রত্যক্ষ করে তিনি ক্ষুব্ধ হন।[১০] তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্মুখ সারিতে ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫), সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) প্রমুখ বাঙালি।[১১] এসব রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সভা সমিতিতে বক্তৃতা শুনে তিনি রাজনীতিতে অনুপ্রাণীত হন। অবশ্য এসময়ে ভারতীয় রাজনীতি পরিচালিত হত উচ্চবিত্তদের দ্বারা এখানে বিত্তহীনদের বিশেষ করে গরিব কৃষক বা গরিব মানুষের রাজনীতিতে কোন স্থান ছিল না। উচ্চবিত্ত রাজনৈতিক সংগঠন ছিল মুসলিম লীগ। তাছাড়া কংগ্রেসেও সাধারণ জনগণের প্রবেশাধিকার ছিল না।[১২] তাই মুসলিম লীগে মওলানা ভাসানীর কোন আস্থা ছিল না। আবার সর্বভারতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিও তাকে আকর্ষণ করেনি।[১৩]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯) পরবর্তী এক দশককাল মওলানা ভাসানীর জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে ধরা হয়। এই সময়কালে তিনি পাক ভারত উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় বেশ কয়েকজন ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদদের সাহচর্য লাভের সুযোগ পান।[১৪] তাদের মধ্যে মওলানা মোহাম্মদ আলী (১৮৭৮-১৯৩১), মওলানা শওকত আলী (১৮৭৩-১৯৩৯), আল্লামা আজাদ সোবহানী (১৮৯৬-১৯৬৩), মওলানা হযরত মোহানী (১৮৭৫-১৯৫১), মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি (১৮৭২-১৯৪৪) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের বিপ্লবী ও ইসলামী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় তিনি দারুণভাবে প্রভাবিত হন।[১৫] মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৯১৭ সালে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তার প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে চিত্তরঞ্জন দাসের রাজনীতি দ্বারা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হন। ১৯১৭ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের ৩৩তম অধিবেশনে দর্শক হিসেবে তিনি যোগ দেন। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে চিত্তরঞ্জন দাস ময়মনসিংহে কংগ্রেস সম্মেলনে যোগ দেন। এ সময় আবদুল হামিদ চিত্তরঞ্জন দাসের সাহচর্য লাভ করেন। তিনি যুবক আবদুল হামিদের মধ্যে অগ্নিশিখা আবিষ্কার করেন। মওলানা ভাসানী এমন একজন মুসলমান, একদিকে ধার্মিক অন্যদিকে কৃষকদের আপন এমন লোককেই খুঁজছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। ১৯১৯ সাল থেকে মওলানা ভাসানী সার্বক্ষণিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।[১৬] মওলানা মোহাম্মদ আলী ও চিত্তরঞ্জন দাসের উপদেশে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯১৯ সালের মে মাসে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন দাসের কাছে আসার সুযোগ হয় মওলানা ভাসানীর। এ সময় চিত্তরঞ্জন দাসের দেশপ্রেম ও জনসেবায় মুগ্ধ হন মওলানা ভাসানী এবং চিত্তরঞ্জন দাসের স্নেহভাজন কর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭]

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা তুরস্কের খেলাফত রক্ষার জন্য বাংলাসহ সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে যা 'খেলাফত আন্দোলন' নামে খ্যাত। মওলানা ভাসানী খেলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।[১৮] ১৯২১ সালে সারা বাংলায় চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। এ আন্দোলনে আবদুল হামিদ সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। এই সময় আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি গ্রেফতার হন ও এক সপ্তাহ জেলে কাটান।[১৯] চিত্তরঞ্জন দাস ১৯২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তার সমর্থকদের নিয়ে গঠন করেন 'স্বরাজ্য দল' (১৯২৩)। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষ চন্দ্র বসুর তেজস্বিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে মওলানা ভাসানী বাংলায়, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে গ্রাম গ্রামান্তরে কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের পক্ষে যুগপৎ কাজ করতে থাকেন।[২০] কারণ তার রাজনৈতিক পথিকৃৎ হিসেবে চিত্তরঞ্জন দাস এবং সুভাষ বসু দুজনকেই শ্রদ্ধার আসনে রেখেছিলেন।[২১] ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে আবদুল হামিদ খান যোগদান করেন।[২২] ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের পর কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে কিছুটা আন্দোলন মুখর হয়ে উঠলে ষড়যন্ত্রের মুখে উপায়ান্তর না পেয়ে মওলানা ভাসানী আসামের ধুবড়িতে চলে যান।[২৩] উত্তর বাংলা থেকে গরীব জনগোষ্ঠি আসামে জঙ্গল পরিস্কার করে বসতি শুরু করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পরে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হলে পূর্ববাংলা থেকে কয়েক লাখ লোক আসামে বসতি স্থাপন করে। প্রথম দিকে আসাম সরকার বহিরাগত কৃষকদের স্বাগত জানায় কিন্তু পরে অনেক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

আবদুল হামিদ খান তাদের সংগঠিত করে ১৯২৪ সালে আসামের ধুবড়ি জেলার ভাসানচরে এক বিরাট কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন। স্মরণকালে এতবড় কৃষক সম্মেলন এ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়নি। সম্মেলনের সাফল্য দেখে লোকে আবদুল হামিদকে ভাসানীর মওলানা ডাকতে শুরু করে এবং পরবর্তীতে এই নামেই তিনি দেশে বিদেশে পরিচিতি পান। এভাবেই ত্রিশের দশকে তিনি আসামের কিংবদন্তীতে পরিণত হন।[২৪] ১৯২৫ সালে বগুড়ার পাঁচবিবির জমিদার শামসুদ্দীন আহমেদ চৌধুরীর কন্যা আলেমা খাতুনকে বিবাহ করেন এবং তাকেও আসামে নিয়ে যান। ১৯২৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। এসময়ে তিনি উত্তর বঙ্গ ও আসামে ছিলেন এবং অসাম্প্রদায়িকতার প্রচারই ছিল তার গুরুত্বপুর্ণ কাজ। তিনি চিত্তরঞ্জন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কাছ থেকে অসাম্প্রদায়িকতার দীক্ষা লাভ করেন। মওলানা ভাসানী বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দু-মুসলিমের সংমিশ্রনেই দেশগঠন হয়েছে। হিন্দু কৃষকের যে অবস্থা, মুসলমান কৃষকের সেই একই অবস্থা। কমিউনিস্ট নেতা আবদুল মতিন (১৯২৬-২০১৪) মওলানা ভাসানীর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের মূল্যায়নে বলেছেন,

"মওলানা ভাসানী ছিলেন মানবতাবাদী, ধর্ম ও রাষ্ট্র নির্বিশেষে মওলানা ভাসানী প্রকাশ্যে বাঙালি জাতির ঐক্যের কথা বলতেন। জাতি সম্পর্কে এরকম চিন্তার অধিকারী ব্যক্তি কখনও সাম্প্রদায়িক হতে পারেন না। সুভাষ বসু, চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন তার আদর্শ স্থানীয়, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ... ভাসানী জামায়াতে ইসলামের নামে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে সেবা করার, গণতন্ত্র এবং বাঙালি জাতিসত্তা ও জনগণের বিরোধিতার রাজনীতির মূলে আঘাত করেছিলেন; তিনি তাদের সাথে কোনো প্রকার, কোনো ক্ষেত্রে আপস করেননি, তাদের কোনদিন কোন বিষয়ে প্রশ্রয় দেননি, তবু যারা আজও

মওলানা ভাসানী সাম্প্রদায়িক কিনা এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন তারাও দেশের গণতন্ত্র ও জাতিসত্তার ইতিহাস সম্পর্কে বিভ্রান্ত এবং উদাসীন"।[২৫]

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনৈতিক পরিসীমা ছিল নির্যাতিত-নিপীড়িত কৃষক সমাজ। তাই বিংশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে মওলানা ভাসানী বাংলা ও আসামে জমিদার ও মহাজনী প্রথার বিরুদ্ধে কৃষক-প্রজা আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি বেশ কয়েকটি কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করে অকল্পনীয় সাড়া জাগিয়ে এবং এ অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট কিংবদন্তীর কৃষক নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[২৬] তার পূর্বে যারা কৃষক আন্দোলন করেছেন তারা কৃষক প্রতিনিধি বা কৃষকদের কাছের মানুষ ছিলেন না। ১৯১৪ সালে এ কে ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) নির্দেশে শেখ মুহাম্মদ চৌধুরী জামালপুর জেলার কুমারচরে এক কৃষক প্রজা সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন।[২৭] এই সম্মেলনে কৃষক নেতা স্যার আবদুর রহিম (১৮৬৭-১৯৫২), খান বাহাদুর আবদুল মোমেন (১৮৭৮-১৯৬৮), এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) এ সকল নেতারা যদিও জমিদারদের বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু তারা নিজেরা কৃষক বা তাদের কাছের লোক ছিলেন না। মওলানা ভাসানী এ সম্মেলনে যোগদান করেন।[২৮] আর তিনিই ছিলেন প্রকৃত কৃষক নেতা ; তিনি নিজে কৃষক এবং তাদের অতি নিকট লোক ছিলেন। ১৯২৮ সালে মওলানা ভাসানী কলকাতায় অনুষ্ঠিত খেলাফত সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে মওলানা মোহাম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলী যোগদান করেন। একই সময়ে কংগ্রেসেরও অধিবেশন বসে। মওলানা ভাসানী এই সম্মেলনেও যোগদান করেন। এই অধিবেশনে নবীন-প্রবীণ সংঘাত সৃষ্টি হয়। একদল চায় ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস; তরুণরা চায় পূর্ণ স্বাধীনতা। মওলানা ভাসানী পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন প্রদান করেন। এ সময় উচ্চবিত্ত শ্রেণির রাজনীতির প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেন।[২৯] কৃষকদের পক্ষে কাজ করার সময় তিনি নানা রকম নিপীড়নের স্বীকার হন এবং হয়ে ওঠেন কৃষক নেতা।[৩০] ১৯২৯ সালে স্যার আবদুর রহিমকে সভাপতি; এ কে ফজলুল হক, আবদুল মোমেন ও আবদুল করিমকে সহ সভাপতি এবং মওলানা আকরম খাঁকে সম্পাদক করে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' (১৯২৯) গঠন করা হয়। মওলানা ভাসানী 'বঙ্গীয় প্রজা সমিতি'র প্রথম সারির নেতা ছিলেন।[৩১] সরকারের পক্ষ থেকে কৃষক সম্মেলন আহবান করা মওলানা ভাসানীর জন্য নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তিনি ১৯৩০ সালে টাঙ্গাইলে ঈদের দিনে এক কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং ঈদের জামাতকে কৃষক সম্মেলনে রূপদান করেন। টাঙ্গাইলের কৃষক সম্মেলন বানচাল করতে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি কারণ এ ছিল ঈদের জামাত। এভাবে মওলানা ভাসানী বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে কৃষক আন্দোলন গতিশীল রাখেন।[৩২]

১৯৩১ সালে বন্যায় উত্তর বাংলা ভেসে যায়। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের ত্রাণ কাজে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) দিনরাত কাজ করেন। এ সময় মওলানা ভাসানী প্রথম বারের মতো হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে পরিচিত হন। ১৯৩২ সালে সিরাজগঞ্জ সম্মেলনের কিছুদিন পূর্বে টাঙ্গাইলের চারাবাড়ি ঘাটে মওলানা ভাসানী কৃষক–খাতক সম্মেলন করেছিলেন যেখানে সভাপতিত্ব করেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। দুইদিন ব্যাপী সম্মেলনে অনেক হিন্দু-মুসলমান নেতা যোগ দিয়েছিলেন।[৩৩] ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে সিরাজগঞ্জ মহকুমার কাওয়াখোলা

নামক গ্রামে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এক ঐতিহাসিক আসাম-বাংলা কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনের পরে তার নাম সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সম্মেলন 'বঙ্গীয় প্রজা সমিতি' থেকে আলাদা ছিল। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং খান বাহাদুর আবদুল মোমেন সভাপতি ছিলেন। অবশ্য এ সম্মেলন 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়নি। মওলানা ভাসানী নিজ দায়িত্বেই এ সম্মেলন আহবান করেন। এটা জেলা প্রজা সম্মেলন হিসেবে চিহ্নিত হত কিন্তু বিশেষ ঘটনায় এই সম্মেলন সারাদেশে গুরুত্ব পায়। কারণ সিরাজগঞ্জের এস ডি ও মওলানা ভাসানী ও সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের উপর ১৪৪ ধারা জারি করেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আবদুল মোমেন এ বিষয় নিয়ে গভর্নরের সাথে আলোচনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত গভর্নর এস ডি ও এর আদেশ বাতিল করান। এই ঘটনা খবরের কাগজে প্রকাশিত হওয়ায় বাংলায় প্রায় সকল জেলা হতে প্রজা কর্মীরা বিনা নিমন্ত্রণে এই সম্মেলনে যোগদান করে।[৩৪] এই সম্মেলন সম্পর্কে মওলানা ভাসানী লিখেছেন,

> "... ১৯৩৭ সালে সিরাজগঞ্জের কাওয়াখোলা ময়দানে তিনদিনব্যাপী বঙ্গ-আসাম প্রজা-সম্মেলনে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। ...উক্ত সম্মেলনে কৃষকদের ঋণের তালিকার যে কাগজ সংগ্রহ করা হয় তাহার ওজন ২০ সের হইয়াছিল। তিনদিনের সম্মেলনে ১৮ হাজার মন চাউল, ৮৩২টি গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি খরচ হইয়াছিল। ইহা আরব্য উপন্যাসের গল্প নহে অতি বাস্তব ঘটনা।"[৩৫]

এ সম্মেলনের পর ইংরেজ সরকার মওলানা আবদুল হামিদ খান সম্পর্কে সতর্ক হয়। সম্মেলনে মূল প্রস্তাব ছিল কৃষকদের ঋণের আসল ও সুদের সমুদয় টাকা মওকুফ, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, খাজনা হ্রাস ও সালামী বন্ধ প্রভৃতি। এরপর ১৯৩৮ সালে ভাসানীর আহবানে রংপুর জেলার গাইবান্ধায় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে বিভিন্ন স্থানে সম্মেলন করে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের উত্তেজিত করার অভিযোগে তাকে পুনর্বার বাংলা থেকে বহিস্কার করা হয়। তিনি স্থায়ীভাবে আসামে বসবাস শুরু করেন এবং আসামে কৃষক আন্দোলন শক্তিশালী করেন।[৩৬]

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আসামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। আসামে কৃষক আন্দোলনে তার নেতৃত্বের চরম বিকাশ ঘটে। কেননা হাজার হাজার উদ্বাস্তু নিয়ে তিনি জঙ্গল পরিষ্কার করে জনবসতি গড়ে তোলেন। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, রংপুর, পাবনা, নোয়াখালী, কুমিল্লা জেলা হতে কয়েক লাখ গরিব কৃষক আসাম আগমন করে এবং তারা জঙ্গল পরিস্কার করে জনপদ গড়ে তোলে।[৩৭] আসাম সরকার প্রথমে তাদের কৃষি জমি বরাদ্দ করে উৎসাহিত করেছেন কিন্তু পরবর্তীতে 'লাইন প্রথা' চালু করেন।[৩৮] ১৯৩৩ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে 'লাইন প্রথা'র বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে। আসামের বাঙালি কৃষকগণ 'লাইন প্রথা' ভঙ্গ করে বসতি বৃদ্ধি করে। 'লাইন প্রথা'র বিরুদ্ধে ভাসানী অসংখ্য সম্মেলন করে বাঙালি কৃষকদের সংঘবদ্ধ করেন। তিনি আসাম সরকারের 'লাইন প্রথা'র বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন পরিচালনা করেন।[৩৯] ১৯৩৬ সালে মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে ভাসানচরে এক বিরাট কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের ফলে সারা আসামে আলোড়ন তৈরি হয়। ফলে মওলানা ভাসানী আসাম প্রদেশে শক্তিশালী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং ১৯৩৭ সালে তাকে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। একই বছর তিনি আসাম প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যও নির্বাচিত হন।[৪০] ফলে আসামে

ভাসানীর প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং লাখ লাখ বাস্তুহারা বাঙালি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু সরকারি দলের সদস্য হয়ে আসামের মুখ্যমন্ত্রী মুহাম্মদ আবদুল্লাহর সাথে বাস্তুহারাদের নিয়ে প্রায়ই মতবিরোধ হতো। ১৯৩৭ সালে মওলানা ভাসানী কর্তৃক আহুত কামরূপ জেলার বড় পেটায় অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগের একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন। কেন্দ্রীয় নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান (১৮৮৯-১৯৭৩) সভায় সভাপতিত্ব করেন। কৃষক মজুরদের সংগঠিত করে মওলানা ভাসানী মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ১৯৩৭ সালে ভারতের সকল প্রদেশের মতো আসামেও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জয় লাভের লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী আসামের সর্বত্র জনসভা করেন। তিনি অসহায় বাঙালি কৃষক মজুরদের রক্ষার জন্য মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন আবার একই কারণেই নির্বাচনে প্রার্থীতা করেন। মওলানা ভাসানী দক্ষিণ ধুবড়ি থেকে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী রূপে জয় লাভ করেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। আসাম আইন সভায় প্রথম তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। পরবর্তীকালে আসাম বিধান সভায় বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পায়। আসাম ব্যবস্থাপক সভায় তিনি একজন সমাজ সচেতন ও জ্ঞানময়ী বক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[৪১]

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা থেকে প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক, আসাম থেকে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও আইন সভার সদস্য মওলানা ভাসানী লাহোর অধিবেশনে যোগদান করেন। ফজলুল হক এই লাহোর অধিবেশনে 'ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব' (১৯৪০) উপস্থাপন করেন।[৪২] মুসলিম লীগের অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে মওলানা ভাসানী লাহোর প্রস্তাব সমর্থন করেন। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসের ৩০-৩১ তারিখ আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের দ্বিতীয় অধিবেশনে মওলানা ভাসানী আসামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান।[৪৩]

১৯৪৪ সালের ৭-৮ এপ্রিল মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে বড় পেটায় আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই ভাসানী সম্মেলন আহবান করেন। তার অক্লান্ত শ্রমে শহরে, গ্রামে মুসলিম লীগের শাখা গঠন করা হয় এবং আসামের সকল মুসলমান মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়।[৪৪] ১৯৪৫-৪৬ সালে আসামে 'বাঙাল খেদা' অর্থাৎ বাঙালি বিতাড়ন আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।[৪৫] আসামের হিন্দু সংগঠন 'অহম' জাতীয় মহাসভার উদ্যোগে 'বাঙাল খেদা' আন্দোলন চলে। শুধুমাত্র অসমীয়াদের স্বার্থের জন্য সংকীর্ণ উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী কঠোর অবস্থান নেন এবং সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করেন যাতে আসাম পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়।[৪৬] ১৯৪৬ সালের ২৬ জুন মওলানা ভাসানী আসামের মঙ্গলদইয়ের করোনেশন ময়দানে 'প্রজা মজুর সমিতি'র এক বিশাল সম্মেলন আয়োজন করেন। হাজার হাজার বহিরাগত কৃষক লাঠি-সোটা নিয়ে সম্মেলনে যোগ দেয় এবং পাকিস্তানের পক্ষে শ্লোগান দেয়।[৪৭] সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন *দৈনিক আজাদ*-এর সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮)।[৪৮] তিনি ভাসানীর আহবানে সম্মেলনে যোগ দেন। সভায় তিনি 'লাইন প্রথা' উচ্ছেদের জন্য মুসলিম লীগকে আপসহীন ভূমিকা পালনের আহবান জানান।[৪৯] 'লাইন প্রথা' বিরোধী আন্দোলন যতই জোরদার হয় ততই আসাম সরকার কঠোর হচ্ছিল বাঙালি কৃষকদের উচ্ছেদ অভিযানে। ১৯৪৬ সালের ৭ নভেম্বর

ভাসানীর সভাপতিত্বে আসাম মুসলিম লীগের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের পরে মওলানা ভাসানীর নির্দেশে আসাম মুসলিম লীগ বহিরাগত চাষীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে।[৫০] এসময় বঙ্গীয় মুসলিম লীগ আইন অমান্য আন্দোলনে সর্বাত্মক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে আসাম ও বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহী কমিটিদ্বয়ের যৌথ এক জরুরি সভা মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ময়মনসিংহের বাহাদুরাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণে তিনি ব্রিটিশের দু'শ বছরের নির্যাতন নিপীড়নের ইতিহাস বর্ণনা করেন। আসাম সরকার কর্তৃক জনসাধারণের ওপর নির্যাতন বন্ধের জন্য তিনি বিপ্লবের ডাক দেন। একদা অনুন্নত আসামের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বাঙালি কৃষকদের অবদানের বিস্তারিত বিবরণ দেন। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভা সিলেটের মৌলভীবাজার শহরে মঈনুদ্দীন চৌধুরীর বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাসানীর নেতৃত্বে একটি এ্যাকশন কমিটি গঠন করা হয় এবং সভায় আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাবার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়।[৫১] ভারত বিভাগের পূর্বে ১৯৪৭ সালের ৬-৭ জুলাই অনুষ্ঠিত সিলেটের গণভোটে মওলানা ভাসানী নেতৃত্ব দেন। অনেকটা তারই নির্দেশে সিলেট পাকিস্তানের পক্ষে বিজয় অর্জন করে। মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের পক্ষে ভোট প্রদানে একটি অসাম্প্রদায়িক বিবৃতি দেন। তিনি বিবৃতিতে বলেন,

> "... গণভোটের সময় সিলেটকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয়ের নিকট আমি আবেদন জানাইতেছি। অনেকেই পাকিস্তান সম্পর্কে সংখ্যালঘুদের মনে ভুল ধারণা জন্মাইবার অপচেষ্টা করিতেছে। আমি প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, তাহারা পাকিস্তানে সর্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।"[৫২]

১৯৪৭ সালে ভাসানী আসামে ৩ এবং ৪ মার্চ পরপর 'বেঙ্গল-আসাম মুজাহিদ সম্মেলন' 'ন্যাশনাল গার্ডস সম্মেলন', 'নওজোয়ান সম্মেলন' ও 'লিটারারি সম্মেলন' আয়োজন করেন এবং পুনরায় কারাগারে আটক হন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট যখন পাকিস্তান সৃষ্টি হয় তখনও তিনি আসামের জেলে অন্তরীন। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আসামের বরদুলাই সরকার তাকে সিলেট সীমান্তে এসে মুক্তি দেয় এই শর্তে যে, তিনি আর আসামে প্রবেশ করবেন না। তাই ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে মুক্তি লাভ করে তিনি ধুবড়ি থেকে স্বপরিবারে টাঙ্গাইলের সন্তোষে চলে আসেন। ১৯২৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ১৯/২০ বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে মওলানা ভাসানী আসামে ছিলেন না। মাঝে মাঝেই তিনি পূর্ববাংলায় এসেছেন এবং এখানকার কৃষক প্রজাদের জমিদার বিরোধী আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।[৫৩] এ অঞ্চলের মানুষ তাদের অধিকার আদায়ে সবসময় ভাসানীকে পাশে চেয়েছে। তাছাড়া মুসলিম লীগ বিরোধী অংশের নেতৃবৃন্দ তার নেতৃত্বে তৎকালীন রাজনৈতিক করণীয় কর্মকাণ্ড ও নীতি নির্ধারণে মতামত গ্রহণ করতেন। এমনকি তৎকালীন তরুণ নেতৃত্ব শেখ মুজিব তাকে ব্যক্তিগত পত্রের মাধ্যমে (১৭ জুলাই ১৯৪৮) তার সরব উপস্থিতি কামনা করেন।[৫৪] তাছাড়া ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে নানা ব্যাপারে সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের আহবানে মাঝে মাঝে তিনি

কলকাতায় যেতেন। তবে আসামের নেতৃত্বাধীন বহিরাগতদের একা ফেলে তিনি অন্যত্র যাবার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। এভাবেই প্রয়োজনের তাগিদে আসামে স্থায়ী হন।[৫৫]

প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের নির্ধারিত সময়কালে (১৯৪৭-৭১) পূর্ব পাকিস্তানের ধারাবাহিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর নিরীক্ষে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে একজন গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক নেতা হিসেবে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ভূমিকা মূল্যায়ন করা গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। মুসলমানদের সামগ্রিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে মুসলিম লীগের রাজনীতি করেছেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।[৫৬] ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ টাঙ্গাইলের একটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৫ মার্চ পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে ভাষার প্রশ্ন আলোচনার সময় মওলানা ভাসানী জোরালো প্রতিবাদ জানান।[৫৭] পরবর্তীতে তৎকালীন গভর্নর এক আদেশে মওলানা ভাসানীর নির্বাচন বাতিল করে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। মওলানা ভাসানীর শূন্য নির্বাচনী আসনে ১৯৪৯ সালের ২৬ এপ্রিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ওয়ার্কার্স ক্যাম্প এর তরুণ নেতা শামসুল হক মুসলিম লীগ প্রার্থী খুররম খান পন্নীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। ওয়ার্কার্স ক্যাম্প কোন রাজনৈতিক দল বা জাতীয় সংগঠন ছিল না। দেশভাগের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সোহ্‌রাওয়ার্দী-আবুল হাশিম প্রমুখের অনুসারি অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল ও বেশিরভাগ তরুণ নেতৃত্বের সম্মিলিত গ্রুপ ছিল ওয়ার্কার্স ক্যাম্প গোষ্ঠী। মুসলিম লীগের প্রার্থী পরাজিত হওয়ার পর ক্ষমতাসীন সরকার বেআইনীভাবে শামসুল হকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় বলা হয় নির্বাচনে শামসুল হক জয়লাভ করার জন্য তার নির্বাচনী ইস্তেহারে ভাসানীর স্বাক্ষর নকল করে অসৎ পন্থা অবলম্বন করেছেন। যদিও হযরত আলী নামক শামসুল হকের এক সমর্থক ভাসানীর সাথে আসামে দেখা করে স্বাক্ষর নিয়ে এসেছিলেন। মুসলিম লীগ সরকারের সরকারি-বেসরকারি নানারকম হয়রানিমূলক কার্যক্রম দেখে মওলানা ভাসানী মুসলিম লীগের উপর থেকে সম্পূর্ণরূপে আস্থা হারিয়ে ফেলেন। আসামের ধুবড়ি থেকে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের সকল অঞ্চল ঘুরে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন এবং তার সমর্থক ও অনুসারীদের একটি কর্মী সম্মেলন আয়োজনের তাগিদ প্রদান করেন।[৫৮] এসময়ই তিনি মোগলটুলী কর্মী শিবিরের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং একটি কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন।[৫৯] মূলত এসময় মুসলিম লীগের বৈষম্যমূলক ও অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের একদল অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল তরুণ রাজনৈতিক কর্মী স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে একমত হয়। জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রথম থেকেই পরিষদ ও পরিষদের বাইরে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেন এবং নতুন দল গঠনকে সমর্থন দেন। মওলানা ভাসানী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ জুন ঢাকার স্বামীবাগে কাজী মোহাম্মদ বশীর হুমায়ুনের 'রোজ গার্ডেন' বাসভবনে এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন আহবান করেন। এখানে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি এবং ইয়ার মোহাম্মদকে (১৯২০-১৯৮১) সম্পাদক করে প্রস্তুতি

কমিটি গঠিত হয়।[৬০] মওলানা ভাসানী ১৫ জুন ১৯৪৯ এ কর্মী সম্মেলন সফল করার জন্য এক বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন,

> "মুসলিম লীগ পূর্বের ন্যায় আর গণপ্রতিষ্ঠান নেই বলে পূর্ব পাক সরকারের দ্বারা কোন জনকল্যাণমূলক কাজও করাতে পারেনি। পূর্ব পাক লীগ নেতাদের অযোগ্যতার দরুণই আজ দেশে নানা রকম দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা দানা বেঁধেছে ও পাকিস্তান দিন দিন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।...রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনায় এবং স্বার্থবাজদের কবল থেকে কওমী প্রতিষ্ঠান উদ্ধারের উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাক মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন আহবান করা হয়েছে।[৬১]

'রোজ গার্ডেনে'র কর্মী সম্মেলনে সারাদেশ থেকে ৩০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি এবং শামসুল হককে (১৯১৮-১৯৬৫) সম্পাদক করে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। এ দল গঠনের সরাসরি ফল ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি উচ্চবিত্তদের কাছ থেকে মধ্যবিত্তদের কাছে চলে আসে। নবগঠিত 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' ক্রমান্বয়ে অসাম্প্রদায়িক দলে পরিণত হয়।[৬২] পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিকে মধ্যবিত্তের মাঝে তথা সর্বসাধারণের কাছে সর্বপ্রথম নিয়ে আসার কৃতিত্ব মওলানা ভাসানীর। আবার পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত করার প্রচেষ্টা তার হাত দিয়েই শুরু। রাজনীতির এই পর্যায়টি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।[৬৩]

১৯৪৯ সাল হতে ১৯৫৭ সালের ২০ মার্চ পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন।[৬৪] ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন সদ্যগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয় মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকার আরমানিটোলা (১১ অক্টোবর ১৯৪৯) মাঠে। শেখ মুজিবুর রহমান ভাসানীর নির্দেশে (২৫ আগস্ট ১৯৪৯ সালে পাঠানো পত্রের মাধ্যমে) ১৯৪৯ সালে পূর্ববাংলায় খাদ্যাভাব দেখা দিলে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এ সম্মেলনের আয়োজন করেন।[৬৫] সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। তিনি তার স্বভাবসুলভ জ্বালাময়ী ভাষণে ২২ মাসের অপকীর্তির খতিয়ান তুলে ধরেন এবং স্বৈরাচারের অবসান কল্পে জনগণের মুসলিম লীগের অর্থাৎ আওয়ামী মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহবান জানান। ১৯৪৯ সালের ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় এলে ভাসানীর নেতৃত্বে ভূখা মিছিল বের হয়। মিছিল থেকে মওলানা ভাসানী ও শামসুল হককে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে ঢাকা জেলে আটক করা হয়।[৬৬] জেল থেকে ছাড়া পেয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সারাদেশ সফর করে মওলানা ভাসানী, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ এ দলকে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের জেলা ও মহকুমা কমিটি গঠন করেন।[৬৭] মওলানা ভাসানী ময়মনসিংহ গিয়েছিলেন তার তথ্য পাওয়া যায় আবুল মনসুর আহমদের লেখায়।

"...মওলানা ভাসানী ও শহীদ সাহেব কয়েক দিনের মধ্যেই ময়মনসিংহ আসিয়া আওয়ামী লীগ মহকুমা কমিটি করিলেন আমাকে তার সভাপতির দায়িত্ব গছাইলেন। বগা ফাঁদে পড়িল।"[৬৮]

মওলানা ভাসানী জনগণের নেতা হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগকে সর্বজনীন প্রতিনিধিত্বের দলে পরিণত করার চেষ্টা করেন। তাই জনগণের মতামত প্রকাশের জন্য পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে উঠেন। কারণ ঢাকা থেকে প্রকাশিত সকল পত্রিকা সরকারের পক্ষে তথ্য প্রকাশ করত। এসময় দলের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত হয় *ইত্তেফাক* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা হবে। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বার লাইব্রেরি হল-এ এক ঘরোয়া সভায় মওলানা ভাসানী পত্রিকা প্রকাশের কথা ঘোষণা করেন এবং উপস্থিত লোকদের কাছে পত্রিকার জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানালে তৎক্ষণাৎ শ'চারেক টাকা পাওয়া যায়। পরে দেশের অন্যান্য জায়গা থেকে তিনি ও আওয়ামী নেতা কর্মীগণ চাঁদা তোলেন। ১৯৪৯ সালের ১৫ আগস্ট সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে *ইত্তেফাক* প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন মওলানা ভাসানী। পরবর্তী পর্যায়ে সম্পাদক নিযুক্ত করা হয় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে। মওলানা ভাসানী জানতেন পত্রিকা ছাড়া জনমত গঠন করা সম্ভব নয় তাই পরবর্তীতে আরও পত্রিকা তার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়।[৬৯] ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার সংবিধানের মূলনীতি রিপোর্ট পেশ করে। পাকিস্তানের সংবিধান রচনার এই মূলনীতিতে ছিল-একমাত্র উর্দু ভাষাই হবে রাষ্ট্রভাষা, জাতীয় পরিষদ হবে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট ইত্যাদি। এটা ছিল অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যমূলক। তাই মওলানা ভাসানী মূলনীতি রিপোর্টের বিরোধিতা করেন এবং প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[৭০]

মুসলিম লীগ সরকার 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নেতাদের উপর দমন নিপীড়ন দিন দিন বাড়াতে থাকে। সরকারি দমন নীতির প্রতিবাদে ভাসানী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। তাছাড়া জেলে থাকা অবস্থায় মওলানা ভাসানী কমিউনিস্ট রাজবন্দীদের সংস্পর্শে আসেন এবং কমিউনিস্ট আদর্শ সম্পর্কে অবহিত হন। হাজী দানেশ (১৯০০-১৯৮৬), মোহাম্মদ তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭) প্রমুখের সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনার পর তিনি কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। কমিউনিস্টরাও এই সময়ে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে কাজ করার ও তাকে নেতৃত্বে সামনে রাখার কথা ভাবেন। এই সময় 'ইস্ট পাকিস্তান রেলওয়েজ এমপ্লয়িজ' এর সভাপতি হন মওলানা ভাসানী। তাছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব আয়োজিত সমাবেশ হয় ১৯৫৪ সালের ১ মে ঢাকার পল্টন ময়দানে। মওলানা ভাসানী আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির এই জনসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। একই দিনে নারায়ণগঞ্জের বিশাল শ্রমিক জনতার সমাবেশেও বক্তৃতা করেন মওলানা ভাসানী। এভাবেই মওলানা ভাসানী কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।[৭১] কারামুক্তির পর কালবিলম্ব না করে মওলানা ভাসানী গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৫০ সালের ২৪ ডিসেম্বর ঢাকার আরমানিটোলা মাঠে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' আয়োজিত এক ঐতিহাসিক জনসভায় ভাষণ দেন ভাসানী। একই দিনে পল্টন ময়দানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বক্তৃতা দেন। মওলানা ভাসানী এই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করেন। তিনি তার বক্তৃতায় লিয়াকত আলী খানের মার্কিন তোষণ নীতির বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, লিয়াকত আলী খান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাবেদারী করে চলেছেন। তিনি লিয়াকত

আলীর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেন, শ্রোতারা সেটি সমর্থন করেন। এভাবে তিনি সারাদেশে বক্তৃতা করে জনমত তৈরির চেষ্টা চালান।[৭২] ১৯৫১ সালের মার্চে পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববাংলায়ও নির্বাচনের দাবি ওঠে। নির্বাচনের দাবি উপস্থাপন করেন 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র সভাপতি মওলানা ভাসানী। এই সময়ে দেশের উভয় অংশের মধ্যে বৈষম্যের বিষয়টিও তিনি লক্ষ্য করেন। মার্চ মাসে প্রদেশে ও কেন্দ্রে বার্ষিক বাজেট পেশ করা হলে ভাসানী বৈষম্যের দিকটি আরো প্রকটভাবে তুলে ধরেন। তিনি পূর্ববাংলায় সামরিক বিদ্যালয় এবং নৌঘাঁটি স্থাপনের দাবি করেন। তিনি বলেন,"পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানের মোট আদিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫৬ জনের বাসস্থান হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গ ইহার ন্যায্য অংশ লাভ করিতেছে না।"[৭৩]

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর ভাষা নিয়ে অর্থাৎ পাকিস্তানের দুই অংশে রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। বাংলা ভাষা অবহেলিত হতে থাকে। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে মওলানা ভাসানী মাতৃভাষা বাংলার পক্ষেই ছিলেন। সর্বস্তরের বাঙালিদের দাবি ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরি হল-এ 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে'র এক সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সভাপতিত্ব করেন মওলানা ভাসানী। সভায় 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ', 'তমদ্দুন মজলিস', 'ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ', 'যুবসংঘ', 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ২৮ মতান্বতরে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট্য 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এ পরিষদে দল, মত, নির্বিশেষে নবীন-প্রবীণ সকল স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয় ঘটেছিল যার প্রধান কৃতিত্ব ছিল মওলানা ভাসানীর। ভাষা আন্দোলনের প্রধান নেতা অলি আহাদ (১৯২৮-২০১২) তার গ্রন্থে লিখেছেন যে, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ পূর্ববঙ্গ কর্মীশিবির অফিস ১৫০ নং মোগলটুলীতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে আলোচনা হয় যে, সরকার যদি ১৪৪ ধারা বা অন্য কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করে, তাহলে আইন ভঙ্গ করা হবে কি হবে না। বেশিরভাগ উপস্থিত সদস্য আইন ভঙ্গের বিরুদ্ধে মত জ্ঞাপন করেন। কিন্তু অলি আহাদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে দৃঢ় মত প্রকাশ করে। বৃদ্ধ মওলানা ভাসানী সভাপতির আসন হতে অলি আহাদের বক্তব্যের সমর্থনে জোরালো ভাষায় ঘোষণা করে বলেন,

> "যে সরকার আমাদের নিয়মতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনকে ইচ্ছাকৃতভাবে বানচাল করিবার জন্য অন্যায়ভাবে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নিষেধাজ্ঞাকে মাথানত করিয়া গ্রহণ করিবার অর্থ স্বৈরাচারের নিকট আত্মসমর্পণ"।[৭৪]

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট বিভিন্ন সংগঠন ও সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে যা পরবর্তী সকল আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ সকলেই সক্রিয় ছিলেন কিন্তু মূল নেতৃত্বে ছিলেন মওলানা ভাসানী। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের হলে সেই মিছিলে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে মওলানা ভাসানী একটি বিবৃতি প্রদান করেন। এসময় ভাষা আন্দোলন জোরদারকরণে তার কর্মকাণ্ডের জন্য তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হলে ১০ এপ্রিল ১৯৫২ মওলানা ভাসানী ঢাকার জেলা প্রশাসকের অফিসে আত্মসমর্পন করেন।[৭৫]

তারপর তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। এসময় মওলানা ভাসানীর সাথে জেল জীবন সম্পর্কে অলি আহাদ তার গ্রন্থে লিখেছেন যে, মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, শামসুল হক ও অলি আহাদ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ৫নং ওয়ার্ডে একত্রে থাকতেন। সকল অবস্থায় মওলানা ভাসানী তাদের পিতৃতুল্য স্নেহ, ভালোবাসা, সাহস, উৎসাহ ও দৃঢ়তার প্রেরণা দিয়েছিলেন। থাকা-খাওয়াসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সে ক্ষেত্রে তিনি সুকৌশলে কারা কর্তৃপক্ষকে জয় করেছিলেন। মওলানা ভাসানীর নির্ভীক মনোবল দ্বারা এ সময় তারা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হন।[৭৬] তাছাড়া ১২ এপ্রিল ১৯৫২ মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে ব্যক্তিগত পত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের চার কোটি জনগণের দায়দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করেন। সত্য পথ ও ত্যাগের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ারও আহবান জানান। মওলানা ভাসানী গণতন্ত্রের মন্দ দিক পরিহার করে ইতিবাচকতা গ্রহণ করে জনগণের কল্যাণে কাজ করার আহবান করেন।[৭৭] মওলানা ভাসানী এভাবে দলীয় নেতাকর্মীদের সবসময় তার প্রেরণা প্রদান করতেন।[৭৮]

১৯৫৩ সালের ২১ এপ্রিল মওলানা ভাসানী জেল থেকে মুক্তি পান। মওলানা ভাসানী পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন দাবি করেন অনেক আগেই, তবে জেল থেকে বের হয়ে তিনি সে দাবির পুনরুল্লেখ করেন এবং কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকাকালীন সরকারের বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপের সমালোচনা করেন। এসময় তিনি কঠোর আন্দোলনেরও হুমকি দেন। অবশেষে সরকার ১৯৫৪ সালের মার্চে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ভাসানী প্রচেষ্টা নেন এবং এসময় তিনি যুক্তফ্রন্ট গঠনের কথা ভাবেন। তার প্রচেষ্টার ফলেই ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর নির্বাচনে মুসলিম লীগকে প্রতিহত করার জন্য 'আওয়ামী মুসলীম লীগ', 'কৃষক শ্রমিক পার্টি', 'নেজামে ইসলাম পার্টি', 'গণতন্ত্রী দল', এবং 'খেলাফতে রব্বানী পার্টি'র সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি বিরোধী দলীয় ঐক্যজোট যা 'যুক্তফ্রন্ট' নামে পরিচিত। যুক্তফ্রেন্টের প্রধান নেতা নির্বাচিত হন মওলানা ভাসানী, ফজলুল হক এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী। আওয়ামী মুসলিম লীগে'র সভাপতি এবং যুক্তফ্রন্টের প্রধান নেতা হিসেবে মওলানা ভাসানী সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সভাসমাবেশ করে জনমত গঠন করেন। এ সময় মুসলিম লীগ সরকার ফজলুল হক, ভাসানীসহ যুক্তফ্রন্টের হাজার হাজার নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের গ্রেফতার করে। তা সত্ত্বেও ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ অনুষ্ঠিত পূর্ববাংলার সাধারণ নির্বাচনে 'যুক্তফ্রন্ট' বিপুল বিজয় অর্জন করে।[৭৯] ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে নবনির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সদস্যদের একটা সভা আয়োজন করা হয় যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, ফজলুল হক যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় দলের নেতা হবেন।[৮০] মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৪ এপ্রিল ঢাকার লায়ন সিনেমা হল-এ যুক্তফ্রন্টের বিজয়োত্তর কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে তিনি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করে হুশিয়ারি প্রদান করেন। ১৯৫৪ সালের ২৫ মে মওলানা ভাসানী জার্মানির বার্লিনে শান্তি সম্মেলনে যোগদান করার জন্য জুলিও কুরীর আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণে লন্ডনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু করেন। ৩০ মে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কমিউনিস্ট বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যর্থ এই অভিযোগ তুলে হক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন।[৮১] পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন জারি ও সদ্যগঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলের সংবাদে মওলানা ভাসানী উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং লন্ডনে অবস্থান করেই এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান।[৮২] এ সময় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরয়ানা জারি করা হয়। তাছাড়া ঢাকার

রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্বাভাবিক থাকাই তিনি দেশে ফিরে আসতে না পেরে ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইউরোপে অবস্থান করেন।[৮৩] পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ধারায় যুক্ত রাজনীতি তথা যুক্তফ্রন্ট গঠন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কারণ এ নির্বাচনী জোটে তৎকালীন বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন মতাবালম্বী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নিজেদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্বল্পসময়ের জন্য হলেও ঐক্যমত্যে পৌঁছাতে পেরেছিলেন যা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়। তাছাড়া যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমেই সারাদেশের সকল স্তরের মানুষকে একই দাবির অংশীদার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৮৪]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয় লাভের পর মওলানা ভাসানী সুইডেনের স্টকহোমে শান্তি সম্মেলনে (১৯৫৪ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত) যোগদান শেষে দেশে ফিরে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'কে একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যার ফলে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষ এ দলে যোগদান করতে পারে। অতঃপর ১৯৫৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত পার্টির কাউন্সিল মিটিং-এ পার্টিকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দলে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুসারে ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে (ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে) 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয় এবং পার্টির নামকরণ করা হয় আওয়ামী লীগ। তখন থেকে এই দল আপামর জনসাধারণের একটি গণসংগঠনে পরিণত হয়। দলকে অসাম্প্রদায়িক করার ব্যাপারে মওলানা ভাসানী বিদ্যমান একটি গ্রুপের নেতৃবৃন্দের সমর্থন পাননি। এক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) বিবাদমান দু গ্রুপের সেতু বন্ধনরূপে কাজ করেছিলেন। তবে এ যুগান্তকারী পদক্ষেপ সফল করার মূল প্রচেষ্টা মওলানা ভাসানীর। তিনি 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করে রাজনীতিকে মধ্যবিত্তের কাছে এনে দেন এবং তিনি এই দলকে সর্বজনীন রূপদান করেন। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগকে ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে পুন:প্রতিষ্ঠা করে পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক চরিত্র তথা ধর্মান্ধ ও উচ্চবিত্তের রাজনীতি ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন এই বৈশিষ্ট্য আনয়নে মওলানা ভাসানীর কৃতিত্ব স্মরণীয়।[৮৫]

১৯৫৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (১৯০০-১৯৬৩) পদত্যাগ করলে ১২ সেপ্টেম্বর সোহ্‌রাওয়ার্দী রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি পূরণ হয়নি, তবে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সোহ্‌রাওয়ার্দীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো বিধায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৯৫৭ সালের ১৪ জুন পল্টন ময়দানে এক জনসভায় তিনি ভাষণ দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন আদায় হয়েছে। মওলানা ভাসানী সোহ্‌রাওয়ার্দীর এই ঘোষণার প্রতিবাদ করেন এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে জনমত গঠনে জোর আন্দোলন ও দেশব্যাপী জনসভা করে বেড়ান। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের মার্কিন প্রীতি ও দেশের শাসনকার্য পরিচালনা নিয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে তার চরম বিরোধ হয়।[৮৬] অবশ্য এর আগেও মওলানা ভাসানী সভাসমাবেশ করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রমের সমালোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে অলি আহাদ তার গ্রন্থে লিখেছেন,

"...ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় সভাপতির ভাষণ দানকালে মওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া ঘোষণা করেন যে, শোষণ-শাসনের মনেবৃত্তি ত্যাগ না করিলে পূর্ব পাকিস্তান 'আসসালামু আলায়কুম' বলিতে বাধ্য হইবে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হইয়া যাইবে"।[৮৭]

উপরিউক্ত মন্তব্য তৎকালীন সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মওলানা ভাসানী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সভা সমাবেশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রমের তীব্র সমালোচনা করেন। এরপর মওলানা ভাসানীর সাথে প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দীর বিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং সকল ধরণের সামরিক চুক্তি বাতিল করে জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ এ দুটি বিষয় নিয়েই দুই নেতার মতপার্থক্য চরম আকার ধারণ করে। আওয়ামী লীগের দুই প্রধান নেতার মধ্যে যখন মতবিরোধ তখন ভাসানী দলীয় প্রধান হিসেবে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করেন। ১৯৫৭ সালের ৭-৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের পর মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।[৮৮] তার পদত্যাগ সম্পর্কে অলি আহাদ তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

"...১৮ ই মার্চ আমি কাগমারীতে (সন্তোষ) সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সহিত সাক্ষাৎ করি। মওলানা ভাসানী সংগঠনের সভাপতি পদ হইতে ইস্তফা দানের সিদ্ধান্ত আমাকে জানান। তিনি আমার কোন যুক্তিই শ্রবণ করিতে রাজি হন নাই। বরং তাহার পদত্যাগ পত্রটি দৈনিক সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশ দেন"।[৮৯]

১৯৫৭ সালের ২৪ জুলাই মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটান এবং দেশে আর একটি গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৯০] ২৫-২৬ জুলাই ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকার 'রূপমহল' সিনেমা হল-এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'সীমান্ত গান্ধী' গাফফার খান (১৮৯০-১৯৮৮), আবদুল মজিদ সিন্ধি (১৮৮৯-১৯৭৮), মিয়া ইফতেখারকে (১৯০৭-১৯৬২) নিয়ে 'পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (ন্যাপ) গঠন করেন। তার নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সর্বপ্রকার শোষণ বিরোধী একটি সমাজবাদী দলে পরিণত হয়।[৯১] মওলানা ভাসানীর 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' গঠনের পর এই দলের রাজনীতি পাকিস্তানে মার্কিনী প্রভাবের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছিল। আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেই মওলানা ভাসানীকে পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বলে গ্রেফতার করে। মওলানা ভাসানী একজন কমিউনিস্ট এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নাস্তিকদের দল হিসেবে প্রচার ও নিপীড়ণ শুরু করে। মওলানা ভাসানীর বিপরীতে জনগণের মধ্যে ভাবমূর্তি সৃষ্টির জন্য ১৯৬১ সালের ৩১ জানুয়ারি সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় ফলে ঢাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৯ আগস্ট মুক্তি পেয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' (এন ডি এফ) গঠন করেন। মওলানা ভাসানী ২৬ অক্টোবর জেলে অনশন শুরু করেন। এরপর পরিস্থিতির চাপে আইয়ুব খান মওলানা ভাসানীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু চীন ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত বিরোধের কারণে ১৯৬২

সালের ২০ অক্টোবর যুদ্ধ বেঁধে গেলে উপমহাদেশের রাজনীতি পাল্টে যায়। এক রাজনৈতিক মেরুকরণের প্রক্রিয়ায় ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অন্যদিকে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সাথে মৈত্রী স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। এসময় আইয়ুব খান মওলানা ভাসানীকে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ১৯৬৩ সালের ২২ আগস্ট ভাসানী-আইয়ুব সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়।[৯২] এরপর গণচীনের জাতীয় দিবসে যোগদানের জন্য চীন গমন করেন এবং সেখানে চেয়ারম্যান মাও সে তুং (১৮৯৩-১৯৭৬) এবং প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই'র (১৮৯৮-১৯৭৬) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[৯৩]

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান 'মৌলিক গণতন্ত্র' (১৯৫৯) প্রবর্তন করলে মওলানা ভাসানী তার তীব্র বিরোধিতা করে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জোর দাবি জানান। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী শিবির' গঠন করেন। ১৯ জানুয়ারি সর্বজনীন ভোটাধিকার দিবস পালনের আহবান জানান। এই বছর জাপানের রাজধানী টোকিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্মীয় সম্মেলনে যোগদান করে পুনরায় চীনে গমন করেন। মওলানা ভাসানীর আহবানে সর্বদলীয় প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ১৮ মার্চ প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ১৯৬৫ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মওলানা ভাসানী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করতে উদ্যোগী ছিলেন এবং তার পক্ষে সারা দেশে প্রচার আন্দোলন চালান।[৯৪] ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ বেঁধে যায়। এই যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা প্রশ্ন সকলের কাছে গোচরিভূত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলনে বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবির ঘোষণা দেন। ছয় দফার সমালোচনা করে মওলানা ভাসানী বলেন, ছয় দফায় সামন্তবাদ, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়নি এবং কৃষক শ্রমিকদের মুক্তির কথা নেই। এ সময় তিনি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন জাতীয় মুক্তি কর্মসূচি ১৪ দফা দাবি পেশ করেন।[৯৫]

১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনের পর বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি পিকিং গ্রুপ ও মস্কো গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মস্কো-পিকিং মতদ্বৈততার এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও দ্বিখণ্ডিত হয়। মস্কোপন্থি ন্যাপ নেতৃবৃন্দ কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করার দাবিতে সংগঠনের সভাপতি মওলানা ভাসানীকে রিকুইজিশন পত্র দেয়। কিন্তু মওলানা ভাসানী পত্রের কোন উত্তর না দিয়ে রংপুরে কাউন্সিল অধিবেশন সম্পন্ন করেন এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে মস্কো সমর্থক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন (১৯২৩-১৯৯২) সহ অন্যান্য নেতাকে সংগঠন হতে বহিস্কার করেন। এ সময় মস্কোপন্থি নেতৃবৃন্দ ১৯৬৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় মোজাফ্ফর আহমদকে (১৯২২-২০১৯) সভাপতি নির্বাচিত করেন। মূলত রংপুরের কাউন্সিল অধিবেশনে ন্যাপ বিভক্ত হয়ে যায় এবং ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে রিকুইজিশন ন্যাপের কাউন্সিল সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যাপের ভাঙ্গন সম্পন্ন হয়।[৯৬] এভাবেই 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' চীনপন্থি ও সোভিয়েতপন্থি হিসেবে ভাগ হয়ে যায়। মওলানা ভাসানী চীনপন্থি গ্রুপের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[৯৭]

আইয়ুব খান পাকিস্তানের স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলন দমন করার জন্য এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতি থেকে বিদায় করার জন্য ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করেন।[৯৮] তবে বর্তমানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে বিভিন্ন গবেষক ভিন্নমুখী মতামত প্রদান করছেন। অনেক গবেষক বলছেন এ মামলা সত্য ছিল।[৯৯] আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত এ মামলাকে কেন্দ্র করে সারাদেশে এক ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু হয়। এ সময় মওলানা ভাসানী আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে মওলানা ভাসানী আর একবার জাতীয় রাজনীতির কাণ্ডারীরূপে আবির্ভূত হয়। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সময় শুধু দেশবাসীর কাছে নয় বিশ্ববাসীর কাছে ভাসানী পরিণত হন এক দুর্বিনীত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে।[১০০] ১৯৬৮ সালের ৬ ডিসেম্বর আইয়ুব খান (১৯০৭-১৯৭৪) ঢাকায় এলে পল্টনের এক বিশাল জনসভায় মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন না দেওয়া হলে অধিকার আদায়ে প্রয়োজনে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হবে। পল্টনের জনসভায় মওলানা ভাসানীর আহবানে দেশব্যাপী জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত করা হয়। এ সময় সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে বর্তমান শাসক শোষকদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের ডাক দেন ভাসানী। ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বই ছিলো শীর্ষে। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে তিনি যে গণমূখী আন্দোলনের সূচনা করেন তা ১৯৬৯ এর ২০ জানুয়ারি শহীদ আসাদের জীবনদানের মধ্য দিয়ে ২৪ জানুয়ারি তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এ গণঅভ্যুত্থানে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামগঞ্জে স্বাধীনতার চেতনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ছাত্রসমাজ গণআন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে। মওলানা ভাসানী সামরিক শাসন বিরোধী এ আন্দোলনকে সর্বাত্মকরণে দেশের প্রায় সকল অঞ্চলে সভা সমাবেশ করে। ফলে এ আন্দোলন সর্বজনীন আন্দোলনে রূপ নেয়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে এ গণমুখী আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যার মূল নেতৃত্বে ছিলেন মওলানা ভাসানী।[১০১] ১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভায় ভাষণদানকালে শেখ মুজিবকে মুক্তি না দিলে 'ফরাসী বিপ্লব' করার হুমকি দেন। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এই সর্বাত্মক আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খানের প্রশাসন শেখ মুজিবুর রহমানকে ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।[১০২]

১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন। তিনি ১৯৭০ সালে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টিতে জয়লাভ করলে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিনন্দন জানান।[১০৩] ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর দেশের দক্ষিণাঞ্চলে এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। এই ঘূর্ণিঝড়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত ও বিপন্ন হয়। মওলানা ভাসানী উপদ্রুত এলাকায় বিপন্ন মানুষের প্রতি সরকারের চরম উদাসীনতা দেখতে পান। তিনি ঢাকা ফিরে এসে ২৩ নভেম্বর পল্টনের এক জনসভায় পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়ে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ঘোষণা করেন।[১০৪] এই ঘোষণার পর পরই ভাসানী 'পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'র বিলুপ্তি ঘোষণা করেন তবে 'পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'কে সক্রিয় রাখেন। এ

সময় টাঙ্গাইলের সন্তোষে স্বাধীনতার স্বপক্ষের নেতা কর্মীদের এক প্রতিনিধি সম্মেলন ডাকেন। তার বিবৃতিতে ভাসানী লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ মর্যাদা আদায়ের জন্য নির্ভীক ও নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে সন্তোষে জাতীয় সম্মেলনে যোগদানের আহবান জানান।[১০৫] তাছাড়া ১৯৭০ সালের ১৯ জানুয়ারি মওলানা ভাসানী সন্তোষে কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর আরেক 'লালটুপি' সম্মেলন আহ্বান করেন।[১০৬] ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের টোবাটেকসিং এ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আহূত এক কৃষক সম্মেলনে পাকিস্তানি শাসকদের কৃষক দমন পীড়ণের চিত্র তুলে ধরে জঙ্গী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সভা-সমাবেশ আন্দোলন পরিচালনা করেন তবে ১৯৭১ সালের পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনগণের উপর নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করলে ১৬ এপ্রিল তিনি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে গমন করেন।[১০৭] মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে সকল প্রকার দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র ও উপদলীয় কোন্দলের হাত থেকে রক্ষা করে অভিষ্ঠ লক্ষে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ৩০-৩১ মে কলকাতার বেলেঘাটায় প্রগতিশীল রাজনৈতিকদের এক সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয় এবং ১ জুন এ সম্মেলনের বৈপ্লবিক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মওলানা ভাসানীর ভারতে অবস্থানকাল বিতর্কিত ও জটিলতাপূর্ণ ছিল।[১০৮] ভারতে অবস্থাকালীন সময়ে তিনি জাতিসংঘ, চীন, রাশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে তারবার্তা প্রেরণসহ বিভিন্নভাবে তার বিপুল আন্তর্জাতিক প্রভাব স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপক্ষে প্রয়োগ করেন।[১০৯] ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি আসামের ফরিদগঞ্জে অনুষ্ঠিত জনসভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সামগ্রিক ইতিহাস উল্লেখ করেন এবং পাকিস্তানি সরকারের নৃশংসতা ও শোষণের চিত্র তুলে ধরেন। শেখ মুজিবের কাছে (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) ভুট্টোর পাকিস্তানের মৈত্রী প্রস্তাব সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ভুট্টো শেখ মুজিবকে অনুরোধ জানিয়েছিল। ভাসানী এ সম্পর্কে ভুট্টোকে বলেছিলেন যে, তখনকার পরিস্থিতিতে সেটা অসম্ভব এবং পরবর্তী শত বছরেও তা সম্ভব হবে না। বর্বর পাকিস্তানিদের নৃশংস অত্যাচারের কথা বাংলাদেশের মানুষ কোনদিনই ভুলবে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও তার দলসহ বিদ্যমান অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দের প্রতি ভাসানী এ জনসভার মাধ্যমে শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।[১১০] ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি দেশে ফিরে আসেন এবং দেশে ফিরেই মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি প্রণয়নের জন্য সকল রাজনৈতিক দল, শ্রমিক, কৃষক ও জনগণের অন্যান্য অংশের প্রতিনিধি সমবায়ে জাতীয় সম্মেলন আহবানের প্রস্তাব করেন।[১১১] ১৯৭২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি '*হক কথা*' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।[১১২] ১৯৭৩ সালের ১২ ডিসেম্বর সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্মেলন আহবান করেন। ১৯৭৪ সালে সকল প্রকার দুর্নীতি ও অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য 'হুকুমতে রব্বানিয়া' সমিতি গঠন করেন।[১১৩] ফারাক্কায় ভারত কর্তৃক একতরফা পারি প্রত্যাহারের প্রতিবাদে 'ফারাক্কা লং মার্চে'র পর থেকে তার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে এবং ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১১৪]

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তার দীর্ঘ কর্মজীবনে পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। তবে তার জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় আসামে কেটেছে বাঙালি কৃষক সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। মওলানা ভাসানী পূর্ববাংলার একজন আঞ্চলিক নেতা হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করে জাতীয় রাজনীতির মহান ধারক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। গবেষণা অভিসন্দর্ভের সময় কালানুযায়ী (১৯৪৭-১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে একজন আঞ্চলিক নেতা হিসেবে মওলানা ভাসানীকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় রাজনীতির সকল বিষয় খুবই সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে। মওলানা ভাসানী বিশ্বাস করতেন রাজনৈতিক ক্ষমতা মূলত কৃষক প্রজার হাতেই নিহিত। তাই তিনি রাজনীতিকে উঁচু পর্যায় থেকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। জমিদারের নিষ্ঠুর নির্যাতনে জর্জরিত এ দেশের ভুখানাঙ্গা, গরিব কৃষক ও মেহনতি মানুষই ছিল মওলানা ভাসানীর আন্দোলনের প্রাণশক্তি। তাই তিনি কৃষক সম্মেলন ডেকে এই বঞ্চিত কৃষকদের সংগঠিত ও সচেতন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতা ছিলেন। একটি গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে গড়ে তোলায় তার অসামান্য অবদান ছিলো। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের পক্ষে ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে চেতনা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রধান কৃতিত্ব মওলানা ভাসানীর। বলা যায় বাংলাদেশের লোকায়ত সমাজতন্ত্রের নেতা ছিলেন মওলানা ভাসানী। তারই প্রতীক হিসেবে মজলুম জননেতা হিসেবে পরিগণিত হয়ে উঠেছিলেন মওলানা ভাসানী। মওলানা ভাসানী তার বিশাল কর্মজীবনে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন এবং তিনি কখনো রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হননি। তারপরও বৈশ্বিক ইস্যুতে তিনি যতটুকু ভূমিকা রেখেছিলেন তা একজন সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা, কোন রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকা নয়। মওলানা ভাসানী তার সংগ্রামী ভূমিকা অক্ষুন্ন রেখেছেন আমৃত্যু। জীবনের শেষপ্রান্তে তার রাজনৈতিক পদচারণা কোন সংগঠিত শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে ছিলো না কারণ তার ত্যাগ, সংগ্রাম ও মেহনতি মানুষের প্রতি দরদ তাকে এ দেশের জনগণের কাছে এতো প্রিয় ও প্রভাবশালী করেছিলো যে, মওলানা একাই সকল অবস্থায় দেশের রাজনীতিতে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারতেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষণে ভাসানী সমাজতন্ত্রী ছিলেন না, আবার মওলানা বলে সাম্প্রদায়িকও ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ মুসলমান এবং একজন নির্ভেজাল বাঙালি। তিনি কাগমারীতে মহাসম্মেলনে সুভাষ বোস আর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে তোরণ তৈরিতে এতটুকু দ্বিধা করেননি। চিন্তা চেতনা আর কর্মে ইসলামের শাশ্বত বাণী মানুষকে ভালোবাসার মহান আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সে কারণে তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এক অসাধারণ নেতা; যিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভৌগোলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে নির্যাতিত মানুষের নেতা হতে পেরেছিলেন।[১১৫]

প্রান্তটীকা

১. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১১
২. আমজাদ হোসেন, *মওলানা ভাসানীর জীবন ও রাজনীতি*, পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১১
৩. মওলানা ভাসানীর ৩৯তম মৃত্যুবার্ষিকী সাময়িকী প্রকাশনা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা, টাঙ্গাইল, ২০১৫, পৃ. ১
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
দারুল উলুম দেওবন্দ ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহরানপুরে অবস্থিত প্রাচীন একটি মাদ্রাসা। এখান থেকেই দেওবন্দি আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৮৬৬ সালে মুহাম্মদ কাসেম নানুতবি (১৮৩২-১৮৮০), রশীদ আহমেদ গাঙ্গুহী (১৮২৯-১৯০৫) ও সৈয়দ আবিদ হুসাইন (১৮৩৪-১৯১২) মিলে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে ইসলাম রক্ষার প্রয়াস, মুসলিম সমাজের অসংগতি, কুসংস্কার ও শরিয়তের নৈতিকতা রক্ষার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। মূলত দেওবন্দ মাদ্রাসা ব্রিটিশ বিরোধী ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করত। https://bn.wikipedia.org/wiki/দারুল_উলুম_দেওবন্দ
৫. *সোসাইটি ফর মওলানা ভাসানী স্টাডিজ ভাসানী সাংস্কৃতিক ফোরাম*, গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী অক্টোপাসমুক্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও বিশ্বশান্তির পথে, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৭
৬. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২১-২২। পীর শব্দটি ফার্সি। আরবিতে বলা হয় মুরশীদ। মুরশীদ শব্দের অর্থ হল পথ প্রদর্শক। যিনি আল্লাহর আদেশ নিষেধ আল্লাহ তাআলা যেভাবে চান যেভাবে পালন করার প্রশিক্ষণ দেন তার নাম মুরশীদ বা পথ প্রদর্শক যাকে ফার্সিতে বলে পীর। (*www. islamicambit. com/archives /2015)*
৭. শাহরিয়ার কবির (সম্পা.), *মওলানা ভাসানী রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ১৭
৮. *সাক্ষাৎকার*, ইরফানুল বারী, মওলানা ভাসানী গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান সমন্বয়ক, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সন্তোষ, টাঙ্গাইল, ১৫ মে ২০১৫
৯. *মওলানা ভাসানীর অভিভাষণ*, ৩০ জানুয়ারি ১৯৬৭, রংপুর উদ্ধৃত সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩-২৪
১০. আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২-১৩
১১. **দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫)** একজন বাঙালি আইনজীবী এবং রাজনীতিবিদ। তিনি স্বরাজ্য পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। উদার মতবাদ ও দেশপ্রেমের কারণে তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেন এবং তার এই উদার মতবাদের জন্য জনগণ তাকে দেশবন্ধু খেতাবে ভূষিত করেন। সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু (সম্পা.), *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, *প্রথম খণ্ড*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৩, পৃ. ২২৩-২২৪
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (১৮৪৮-১৯২৫) ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের একজন বিশিষ্ট নেতা। ১৮৭৬ সালে সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ভারতীয় সংঘ' বা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৮ সাল হতে তিনি *বেঙ্গলী* শিরোনামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন যেখানে তিনি জাতীয় সংস্কৃতি, একতা, স্বাধীনতা ও মুক্তির বিষয়ে নিয়মিত লিখতেন। তাছাড়া ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্ব প্রদান করেন। ইয়াসমিন আহমেদ, *উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১০৭-১১৮
১২. আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
১৩. শাহরিয়ার কবির (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
১৪. সাক্ষাৎকার, *প্রাগুক্ত*
১৫. সাক্ষাৎকার, *প্রাগুক্ত*।
মওলানা মোহাম্মদ আলী (১৮৭৮-১৯৩১) ১৯১৯ সালে ইউরোপ খেলাফত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবং রাজদ্রোহিতার অভিযোগ ১৯২০ সালে কারারুদ্ধ হন। ভারতীয় উপমহাদেশের খেলাফত আন্দোলনে মূল নেতৃত্বে ছিলেন। ১৯২১-২৩ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। মওলানা মোহাম্মদ আলী ১৯২৮ সালে নেহেরু রিপোর্টের বিরোধিতা করেন এবং ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে মুসলমানদেরকে যোগদান না করার আহবান জানান। ১৯৩০-১৯৩১ সালে তিনি গোল টেবিল বৈঠকেও যোগদান করেন। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা (১৯০৫-১৯৪৭)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৪৩
মওলানা শওকত আলী (১৮৭১–১৯৩২) খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম একজন নেতা ছিলেন। তুর্কি খেলাফত রক্ষা এবং গ্রেট ব্রিটেন ও ইউরোপীয় শক্তি থেকে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়। মূলত আলী ভ্রাতার মাধ্যমেই এই আন্দোলন সূচীত হয়। ১৯২০ সালে বোম্বাইয়ে খেলাফত কমিটি গঠিত হলে মওলানা শওকত আলী এর সম্পাদকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এক বছর খেলাফত ইশতেহার প্রকাশনায়ও তার ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৪
আল্লামা আজাদ সোবহানী (১৮৯৭-১৯৬৪) প্রথম জীবনে কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। এরপর তিনি খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি তৎকালীন বোম্বাই নামক স্থানে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় খেলাফত কনফারেন্সের উলামা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেসের হিন্দুঘেঁষা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে তিনি ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস পরিত্যাগ করে

পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করেন। সিলেটের গণভোটে তিনি পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর আল্লামা আজাদ সোবহানী ভারতে চলে যান। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫-২৭

মওলানা হযরত মোহানী (১৮৭৫-১৯৫১) ভারতের মোহন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম সৈয়দ ফজল-উল-হাসান। তিনি উর্দু ভাষার বিশিষ্ট কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত। তিনি ১৯০৪ সালে ভারতীয় কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। হযরত মোহানী ১৯১৯ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠায় সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন তবে হযরত মোহানী ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের বিরোধী ছিলেন। https://bn.wikipedia.org/wiki/মওলানা হযরত মোহানী

মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি (১৮৭২-১৯৪৪) পূর্ব পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে পড়াশোনার সময় প্যান ইসলামী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। তবে পরবর্তীতে প্যান ইসলামী ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে দেওবন্দী উলামাদের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন।
https://bn.wikipedia.org/wiki/ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি

১৬. আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

১৭. সাক্ষাৎকার, *প্রাগুক্ত*

১৮. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলায় খেলাফত অসহযোগ আন্দোলন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ৬-৯

১৯. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

২০. আমজাদ হোসেন, *মওলানা ভাসানীর জীবন ও রাজনীতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫) ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক কিংবদন্তি নেতা। তিনি নেতাজি নামে সমধিক পরিচিত। সুভাষচন্দ্র পরপর দুইবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আদর্শগত সংঘাত এবং কংগ্রেসের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ নীতির প্রকাশ্য সমালোচনা করার জন্য তাকে পদত্যাগ করতে হয়। সুভাষচন্দ্র মনে করতেন গান্ধীজীর অহিংসার নীতি ভারতের স্বাধীনতা আনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। এই কারণে তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক ভারত (১৯২০-১৯৪৭)*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৫১-৫৬)

২১. আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

২২. আবুল মনসুর আহমেদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩৭

২৩. মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পা.) স্মারক গ্রন্থ, *মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী*, পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৪

২৪. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-২৭

২৫. মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮-৭৯

২৬. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

২৭. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২-১৩

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২-১৩

স্যার আবদুর রহিম (১৮৬৭–১৯৫২) মেদিনীপুর জেলার জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। ১৯২৯ সালে গঠিত ‘নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি’ গঠিত হলে তিনি এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি এ দলের কল্যাণে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সালে স্যার আবদুর রহিম ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সভাপতি হন এবং রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*

খান বাহাদুর আবদুল মোমেন (১৮৭৬-১৯৪৬) বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৭ সালে সিভিল সার্ভিসে সাব ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু। ১৯২৯ সালে স্যার আবদুর রহিমের সভাপতিত্বে ‘নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি’ গঠিত হয়। সভাপতির সাহায্যকারী পাঁচজন সহ সভাপতির একজন ছিলেন তিনি। ১৯৩৪ সালে স্যার আবদুর রহিম ভারতীয় আইন সভার স্পিকার হন। ফলে পরবর্তী সভাপতির প্রশ্নে দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি হলে বিদায়ী সভাপতি খান বাহাদুর আবদুল মোমেনকে সভাপতি নির্বাচিত করেন। মূলত ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার ও কৃষক রাজনীতির জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাপিডিয়া*

২৯. নাজমুল হক নান্নু , *ইতিহাসের ধারায় মওলানা ভাসানী*, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা , ২০১১, পৃ. ৩৯-৪১

৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪২

৩১. সাইফুল ইসলাম, *স্বাধীনতা–ভাসানী-ভারত*, বর্তমান সময়, ঢাকা, ১৯৮৭ , পৃ. ৩৩

৩২. শাহরিয়ার কবির (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

৩৩. সাক্ষাৎকার, *প্রাগুক্ত*

৩৪. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১-৬৩

৩৫. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

৩৬. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৩৮

৩৭. সাইফুল ইসলাম, *আসাম ও মাওলানা ভাসানী এবং লাইন প্রথা-বাঙালখেদা*, বর্তমান সময়, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৭-১৯

৩৮. 'লাইন প্রথা' ছিল মূলত আসাম রাষ্ট্রের স্বদেশীয় সম্প্রদায়কে অভিবাসী মুসলমান বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে রাখার বিশেষ এক ব্যবস্থা। আদিবাসী ও বাঙালি অভিবাসীদের মধ্যে নানা কারণে যেন কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয় এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই লাইন প্রথা প্রবর্তিত হয়। অবিভক্ত ভারতবর্ষের আসাম প্রদেশের একটি কুখ্যাত আইন 'লাইন প্রথা' নামে পরিচিত। মূলত আসামে বাঙালি নির্যাতন ও বাঙালিদের বিতাড়নের জন্য এ আইন করা হয়েছিল। এ আইনের ফলে আসামে বসবাসকারী বাঙালিরা একটা নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যেতে পারত না, কাজকর্ম করতে পারত না। এ আইনের ফলে বাঙালিরা রাতারাতি ভূমিহীন, অসহায় ও দরিদ্র মানুষে পরিণত হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ১৯৪৫ সালে 'লাইন প্রথা' বাতিল ঘোষণা করা হয়। Bimal J. Dev and Dilip K. Lahiri, "The Line System of Assam", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Vol-XXIII,* Dhaka, 1978, P. 11 সাইফুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-১৯

৩৯. সাইফুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭-১৯

৪০. আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

৪১. সাইফুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৪০-৪৩

৪২. অমলেন্দু দে, *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক*, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ভারত, ১৯৮৫, পৃ. ২২৩-২২৪

৪৩. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

৪৪. Bimal J. Dev and Dilip K. Lahiri, *ibid*, p. 11

৪৫. **'বাঙাল খেদা' আন্দোলনের (১৯৪৫-৪৭)** অন্যতম নেতা মওলানা ভাসানী। ১৯৪৭ সালে আসাম সরকার 'বাঙাল খেদা' অভিযান শুরু করলে তিনি এর বিরুদ্ধে গড়ে উঠা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং জারিকৃত ১৪৪ ধারা অমান্য করে আসামের শীলচরে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। মওলানা ভাসানী 'বাঙাল খেদা' আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম, অসমীয়া বাঙালি নির্বিশেষে সকল কৃষক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করেন। মহসিন শস্ত্রপাণি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

৪৬. Bimal J. Dev and Dilip K. Lahiri, *ibid*, p. 11

৪৭. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০-৫২

৪৮. **আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮)** ময়মনসিংহ জেলার ধানিখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০–২২) যোগদান করে কংগ্রেসের আহবানে বি.এ পরীক্ষা বর্জন করেন। কলকাতার *দৈনিক মোহাম্মদী*, সাপ্তাহিক *দি মুসলমান*, এবং মওলানা আকরম খাঁর *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের মনোনয়নে ময়মনসিংহ জেলা থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের সময় পাকিস্তান সরকারের দমন নীতির প্রতিবাদে 'সিতারা এ খেদমত' ও 'সিতারা এ ইমতিয়াজ' খেতাব বর্জন করেন। শহিদুল ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*

দৈনিক আজাদ একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকা, ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর পত্রিকাটি কলকাতা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় বাংলা ও আসামের মুসলমানদের মুখপত্র হিসেবে *দৈনিক আজাদ* প্রকাশিত হয়। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ সালের ১৯ অক্টোবর পত্রিকাটি কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। *আজাদ* পত্রিকাই তখন ছিল পূর্ববাংলার প্রধান দৈনিক পত্রিকা। ঢাকায় স্থানান্তরের পর *আজাদ* পত্রিকার সম্পাদক হন আবুল কালাম শামসুদ্দিন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। মনু ইসলাম,*বাংলাপিডিয়া*

৪৯. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।

৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০-৫২

৫১. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২-৫৩

৫২. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৬০

৫৩. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯-২৪০

৫৪. Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister, Government of People's Republic of Bangladesh) *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 1948-1950, vol-1,* Hakkani Publishers, Dhaka, 2020, p. 42-43

৫৫. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০-২৪২

৫৬. মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০-৮৫

৫৭. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

৫৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬-৬৯

৫৯. মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৪১। হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৩

৬০. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ২২-৩১

৬১. *সাপ্তাহিক সৈনিক*, ঢাকা, ১৭ জুন ১৯৪৯

৬২. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-৩১
৬৩. সিরাজ উদ্‌দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮
৬৪. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮-৮০
৬৫. Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister of GOB), *ibid*, p. 279
৬৬. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭-৭৮
৬৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২
৬৮. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
৬৯. সৈয়দ আবুল মকসুদ , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬
৭০. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫-১০৬
৭১. আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-২৭, আরেফিন বাদল (সম্পা.), *চাষী-মজুরের মওলানা ভাসানী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ৬১
৭২. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭
৭৩. আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯-৩০
৭৪. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, খোশরোজ কিতাব মহল লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৪৫
৭৫. বশির আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭-৩০৯। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলে গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি মওলানা ভাসানী ধারালো বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেছিলেন, কলঙ্কজনক এ ঘটনার প্রতিবাদ জানানোর ভাষা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। নূরুল আমীন সরকার জাতীর ভবিষ্যৎ ছাত্র সমাজকে আন্দোলন থেকে দূরে রাখার জন্য চরমপন্থা অবলম্বন করছে। এ ঘটনা ঘটিয়ে পাকিস্তান সরকার বাঙালির ইতিহাসকে অস্বীকার করছেন। তিনি বিবৃতিতে দাবি করেন যে, অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলি বর্ষণের তদন্ত করার লক্ষে তদন্ত কমিশন গঠন করা হোক। তাছাড়া গ্রেফতারি পরোয়ানা বাতিল করে শহীদ পরিবারের ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করার দাবি করেন। এ সময় তিনি সকল স্তরের জনগণকে পাকিস্তানিদের অনৈক্য সৃষ্টির কৌশল হতে দূরে থেকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ উদ্ধৃত সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯১
৭৬. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪-১৮৫
৭৭. Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister of GOB), *vol-4, 1954-1957, ibid*, p. 228
৭৮. Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister of GOB), *vol-2, 1951-1952, ibid*, p. 159-160
৭৯. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০-২৫৩
৮০. তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৫১-৫৭
৮১. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩
৮২. খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *ভাসানী যখন ইউরোপে*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১২৮
৮৩. সৈয়দ আবুল মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৭
৮৪. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫-৯৭
৮৫. মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭-৮১
৮৬. সম্পাদনা ও প্রকাশনা, মওলানা ভাসানী রিসার্চ সেন্টার, *জ্যোতিষ্ক*, মজলুম জননেতার ৩৬তম মৃত্যুবার্ষীকিতে মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধার্ঘ, টাঙ্গাইল, ২০১২, পৃ. ২৬-২৭। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সময়ের ওপর গুরুত্ব তথা সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর মুসলিম লীগের পররাষ্ট্রনীতি সমর্থন করে দেশ পরিচালনা করছিলেন। এসময় শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক 'শূন্য তত্ত্ব' প্রয়োগে উৎসাহী ছিলেন। তার যুক্তি ছিল জোট নিরপেক্ষতার নামে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশের সাথে মৈত্রী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এ সকল দেশের ভূমিকা শূন্য। পাকিস্তানের মত দেশ শূন্য হয়ে অন্য একটি শূন্য দেশের সাথে যুক্ত হলে ফলাফল স্বাভাবিকভাবেই শূন্য হবে। এক্ষেত্রে সোহ্‌রাওয়ার্দী উন্নত দেশ ব্রিটেন অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলতেন উন্নত দেশের শক্তির বহর যদি পাঁচ হয় তাহলে শূন্যের সঙ্গে মৈত্রী হলে পাকিস্তান পাঁচ হবে। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর এই তত্ত্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে আশঙ্কাজনক হয়ে দেখা দেয়। *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭। *দৈনিক আজকের কাগজ*, ঢাকা, ১৩ জুন ১৯৯৩। মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২০৭
৮৭. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৮
৮৮. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮-৮০
৮৯. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮
৯০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪-২১৫
৯১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮-২১৫

গাফফার খান (১৮৯০-১৯৮৮) ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী অহিংস আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। পশতুন বংশোদ্ভূত ভারতীয় রাজনৈতিক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। তাছাড়া তিনি সীমান্তগান্ধী হিসেবে অধিক পরিচিত। ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ' প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

আবদুল মজিদ সিন্ধি ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল 'ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ' গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মওলানা ভাসানীর ন্যাপ প্রতিষ্ঠাকালীন অন্যতম একজন নেতা হিসেবে তার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

৯২. *সোসাইটি ফর মওলানা ভাসানী স্টাডিজ ভাসানী সাংস্কৃতিক ফোরাম*, গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী অক্টোপাসমুক্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও বিশ্বশান্তির পথে, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, ২০০৮, পৃ. ৭

৯৩. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩। মওলানা ভাসানী, *মাও সে তুঙ এর দেশে*, মওলানা ভাসানী, পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ১৭-১৮

মাও সে তুং (১৮৯৩-১৯৭৬) চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা। ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত একই পদে ছিলেন। মাও সে তুং প্রতিষ্ঠিত তাত্ত্বিক মতবাদ 'মাওবাদ' নামে পরিচিত। তাকে গণতান্ত্রিক চীনের জাতির জনক বলা হয়ে থাকে। মনির জামান, *মাও সে তুং*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১১-১২

চৌ এন লাই (১৮৯৮-১৯৭৬) গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৪৯ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। মাও সে তুং এর অধীনে কাজ করেন এবং চীনে কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া চীনের বৈদেশিক এবং অর্থনৈতিক নীতির পুনর্গঠনে বিশেষ অবদান রাখেন। শেখ মুজিবুর রহমান, *আমার দেখা নয়াচীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭

৯৪. আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

৯৫. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩-৪৬। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী জাতীয় মুক্তি কর্মসূচি ১৪ দফা দাবি ঘোষণা করেন। সংক্ষেপে ১৪ দফা দাবি নিম্নরূপ ঃ

১. বর্তমান আইন পরিষদ ভেঙ্গে প্রত্যক্ষ ও প্রাপ্ত বয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নতুন আইন পরিষদ নির্বাচন করতে হবে। ফেডারেল শাসন ব্যবস্থায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা এই তিনটি বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হবে।

২.পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা পুন:প্রতিষ্ঠা করে অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে।

৩. রাজনৈতিক কারণে সাজাপ্রাপ্ত ও বিনা বিচারে আটক সকল বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে। তাছাড়া রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে বিচারাধীন মামলা ও গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

৪. পাকিস্তানকে 'সিয়াটো' ও 'সেন্টো' থেকে সকল প্রকার সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

৫.পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা কাঠামো বিন্যাস পুনর্গঠন করতে হবে।

৬. পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি পাচার করা বন্ধ করতে হবে।

৭. দেশ রক্ষা, শিল্প, সরকারী খাতে সীমাবদ্ধ করতে হবে এবং দেশের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশে স্থাপন করতে হবে।

৮.আমলাতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি, ব্যাংক, বীমা কোম্পানি ও পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করতে হবে।

৯.পূর্ব পাকিস্তানে ব্যক্তিগত মালিকানা জমির পরিমাণ তেত্তিশ একর ও পশ্চিম পাকিস্তানে একশ একরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে হবে।

১০.শ্রমিক সংগঠনের উপর সকল প্রকার বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করতে হবে।

১১. সকল স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা উন্মুক্ত রাখতে হবে।

১২.বেলুচিস্তানে নির্যাতনের অবসান করতে হবে।

১৩.পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪. জনসাধারণের উপর থেকে খাজনা ও ট্যাক্সের ভার কমানোর জন্য কর ধার্য করার পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করতে হবে। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ২৬৪-২৬৬

৯৬. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৭-৩০৮

মস্কোপন্থি ন্যাপ সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন (১৯২৩-১৯৯২) যাকে মওলানা ভাসানী ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে ন্যাপ থেকে বহিস্কার করেন।

৯৭. আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০

৯৮.সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৩-১৫

৯৯. কর্ণেল শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৫-১৬

১০০.সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮

১০১.সম্পাদনা ও প্রকাশনা, মওলানা ভাসানী রিসার্চ সেন্টার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৪

১০২.সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮-২৭

ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯-১৭৯৯) ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসানের মাধ্যমে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। তাছাড়া রোমান ক্যাথলিক চার্চ সকল প্রকার গোড়ামী পরিহার করে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। ফরাসি বিপ্লবের মূলনীতি ছিল 'স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী'। এমরান জাহান, *আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস ফরাসি বিপ্লব থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৭৮৯-১৯৪৫*, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩০-৩২

১০৩.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৯-৫০

১০৪.মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭-১২৮

১০৫.শাহরিয়ার কবির (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২-৬৩। আবদুল হাই শিকদার, *জানা অজানা মওলানা ভাসানী*, ফারহানা বুকস, ঢাকা , ২০০২, পৃ. ১৬

১০৬.১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করা হলে মওলানা ভাসানী কৃষক সমিতির কাজে বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মসূচির আয়োজন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় পাবনার শাহপুরে কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লাল টুপি পরে লক্ষ্যাধিক কৃষক এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। শাহপুরের পর একই কর্মসূচিতে বগুড়ার পাঁচবিবি, টাঙ্গাইলের সন্তোষে এবং ঢাকায় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন গুলোকে লাল টুপি সম্মেলন বলে আখ্যায়িত করা হয়। লাল টুপি সম্মেলনের একটি জনপ্রিয় স্লোগান ছিল 'ভোটের আগে ভাত চায়'। সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩০-৩৩৭

১০৭.শাহরিয়ার কবির (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২-৬৩। আবদুল হাই শিকদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

১০৮.জগলুল আলম, *বাংলাদেশে বামপন্থি রাজনীতির গতিধারা ১৯৪৮-১৯৮৯*, বাঙ্গালা গবেষণা, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১০১

১০৯.সোসাইটি ফর মওলানা ভাসানী স্টাডিজ ভাসানী সাংস্কৃতিক ফোরাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

১১০.সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৯

১১১.*দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৮ নভেম্বর ১৯৭৬। *দৈনিক বার্তা*, ঢাকা, ১৮ নভেম্বর ১৯৭৬

১১২.১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মওলানা ভাসানী *সাপ্তাহিক হক কথা* নামে টাঙ্গাইল থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ ইরফানুল বারী। সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড এ পত্রিকায় প্রচার করা হত। সাক্ষাৎকার, ইরফানুল বারী, মওলানা ভাসানী গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান সমন্বয়ক, টাঙ্গাইল, ১৫.০৫.২০১৫

১১৩.**হুকুমতে রাব্বানিয়া সমিতি ঃ** ১৯৭৩ সালের পর থেকে মওলানা ভাসানী রাজনীতিতে নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও তৎকালীন রাজনীতিতে তার দল গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ন্যাপকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত না করলেও দলীয় কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন না। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৭৪ সালের ৮ এপ্রিল টাঙ্গাইলের সন্তোষে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে 'হুকুমতে রাব্বানিয়া সমিতি' নামে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। আপাত দৃষ্টিতে এই প্রতিষ্ঠান ইসলামী বা সাম্প্রদায়িক হলেও তিনি এটাকে ধর্মনিরপেক্ষভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানব জাতির মঙ্গল বিধান করা। সৈয়দ ইরফানুল বারী (সম্পা.), *রবুবিয়াত মওলানা ভাসানীর শেষ কথা*, মুক্তি মাণবী প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ২০১৩। সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৩-৪৮৪।

১১৪.*দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৮ নভেম্বর ১৯৭৬। *দৈনিক বার্তা*, ঢাকা, ১৮ নভেম্বর ১৯৭৬

১১৫.মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭-৫৪০

৩.২ আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)

সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও আইনবিদ আবুল মনসুর আহমদ ১৮৯৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার ধানীখোলা গ্রামের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবদুর রহিম ফরাজি, মাতা মীর জাহান খাতুন।[১] ১৯০৬ সালে তিনি ধানিখোলা জমিদার-কাচারিতে স্থাপিত পাঠশালায় ভর্তি হন এবং বাংলা, অংক, ইংরেজি প্রভৃতি শিখতে থাকেন। মক্তব ও পাঠশালার শিক্ষার পর তিনি ১৯০৯ সালে দরিরামপুর মাইনর স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে আবুল মনসুর আহমদ ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে ভর্তি হন এবং এখান থেকে ১৯১৭ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯১৯ সালে জগন্নাথ কলেজ (প্রতিষ্ঠা ১৮৮৪) থেকে আই.এ এবং ১৯২১ সালে ঢাকা কলেজ (প্রতিষ্ঠা ১৮৪১) থেকে বি.এ পাস করেন। ১৯২৯ সালে কলকাতার রিপন কলেজ (১৮৮৪) থেকে প্রথম শ্রেণিতে ২য় স্থান অধিকার করে আইন পাস করেন যা তৎকালীন মুসলমানদের জন্য ছিল বিরল ঘটনা। আর এখানেই তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে।[২] আইনশাস্ত্র পড়ার জন্য কলকাতায় এসে ১৯২৩ সালেই আবুল মনসুর আহমদ সাংবাদিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন এবং ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন।[৩] আবুল মনসুর আহমদ সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও আইনবিদ হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। তবে এই অভিসন্দর্ভের বিষয় শিরোনামে তাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে একজন আঞ্চলিক নেতা হিসেবে ভূমিকা লিপিবদ্ধ করা হবে।

আবুল মনসুর আহমদ এক বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী। কৃষক পরিবারে জন্ম নিয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগুতে হয়েছে। তার জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দুটো ধারা প্রবাহমান ছিলো; তা হলো সাহিত্য এবং রাজনীতি। জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন।[৪] আবুল মনসুর আহমদ যখন রাজনীতি কী এ কথাটা বোঝেননি অর্থাৎ কিশোর বয়স থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। মাত্র সাত বছর বয়সে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯১১ সালে ইংল্যান্ডের সম্রাট পঞ্চম জর্জের বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদের শিশু মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। বড়লাট লর্ড কার্জন যখন বঙ্গভঙ্গের প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গ সফরের অংশ হিসেবে ময়মনসিংহ সফরে গিয়েছিলেন তখন আবুল মনসুর আহমদ মুরুব্বিদের সঙ্গে কার্জনের জনসভায় গিয়েছিলেন বড়লাটকে দেখতে।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন আবুল মনসুর আহমদের শিশু মনে যে প্রভাব ফেলেছিল এবং এ সম্পর্কিত মুরুব্বিদের যে চিন্তা-চেতনা থেকে তৃণমূল পর্যায়ের মুসলমানদের মানসিকতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন-

> "১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লি দরবার উপলক্ষে স্কুলের সবচেয়ে ভালছাত্র হিসেবে আমাকে অনেকগুলি ইংরেজি ও খান কতক বাংলা বই প্রাইজ দেওয়া হয়। সেকালের তুলনায় এক স্তুপ বই। বইগুলি দুই বগলে লইয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিলাম তখন আতিকুল্ল্যা নামে আমার এক বয়োজেষ্ঠ মাদ্রাসার

ছাত্র বন্ধু আমার প্রতি চোখ রাগাইয়া বলিয়াছিলেন, আজ মুসলমানদের মাতমের দিন। ফিরিঙ্গিরা আমাদের গলা কাটিয়াছে। তুমি কিনা সেই ফিরিঙ্গির দেওয়া প্রাইজ লইয়া হাসি-মুখে বাড়ী ফিরিতেছো?”[৫]

বলা যায় আবুল মনসুর আহমদের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ পড়েনা কিন্তু বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্রিক যে রাজনীতি বাংলার হিন্দু-মুসলমান সমাজের ভাগ্যকে পরিচালিত করেছিল তার প্রভাব আবুল মনসুর আহমদের চিন্তা চেতনাকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছিল। তার রাজনৈতিক চিন্তা চেতনায় বঙ্গভঙ্গের প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেন,

> “১৯০৫ সনে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টি ও ১৯১১ সালে তা বাতিল আমার দেখা রাজনীতিতে পড়ে না। কিন্তু আমার দেখা রাজনীতির উপর তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইমপ্যাক্ট হইয়াছিল, তৎকালীন মুসলিম সমাজের মনোভাব হইতে তা স্পষ্ট বুঝা যাইত। তাদের চিন্তার প্রভাব আমার নিজের পরবর্তীকালের রাজনৈতিক চিন্তায়ও কম পড়ে নাই। সেটা অবশ্য বুঝিয়াছিলাম অনেক পরে।”[৬]

প্রজা আন্দোলনের একেবারে শুরুর দিকে তাকে দেখা যায় এক সংগঠক হিসেবে। ময়মনসিংহের ধাণিখোলায় প্রজা সাধারণের জনসভায় ভূমিকা পালন করেন এবং নয় বছর বয়সে প্রথম জনসভায় বক্তৃতা করেন। এই সভায় যোগদানের মাধ্যমে আবুল মনসুর আহমদ জমিদারদের অত্যাচার, জুলুমের অনেক কাহিনী সম্পর্কে জানতে পারেন এবং প্রজার দাবির পক্ষে কাজ শুরু করেন। ১৯১৪ সালে জামালপুর মহকুমার কামারিয়ার চরে প্রজা সম্মিলনী হয় যখন আবুল মনসুর আহমদের বয়স ১৬ বছর। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া মনসুর আহমদ *মোহাম্মদী* ও *মোসলেম হিতৈষী* পত্রিকার মাধ্যমে সম্মেলন সম্পর্কে জানতে পেরে উৎসাহিত হয়েছিলেন।[৭] এই প্রজা সম্মেলনে উপস্থিত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যেমন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান চৌধুরী (১৮৬৫-১৯৩৫), মওলানা খন্দকার আহমদ আলী আকালুবী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) প্রমুখ ব্যক্তি।[৮] সাধারণ গরিবের পক্ষে থেকে কৃষক নেতারা আন্দোলন করেন এ বিষয়টা তাকে রাজনীতিতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে। নিয়মতান্ত্রিক প্রজা আন্দোলনের ইতিহাসে কামারিয়ার চর প্রজা সম্মিলনী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রজা সম্মিলনী ছিলো।

মূলত এই প্রজা সম্মিলনীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনীতিতে আবুল মনসুর আহমদের হাতে খড়ি।[৯] এরপর থেকে ইংরেজদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মতবাদী হয়ে যেতেন। যেমন স্বদেশি আন্দোলন নিয়ে ইংরেজদের সমর্থক হয়ে উঠেন। আবার ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন। স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত থাকার দায়ে আবুল মনসুর আহমদের সুপরিচিত কয়েকজন ছাত্র গ্রেফতার হওয়ায় বিরাজমান রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার ইংরেজ বিদ্বেষ বেড়ে গিয়েছিল।[১০]

১৯১৬ সালের ‘লক্ষ্ণৌচুক্তির’ মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হওয়ায় স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধে। এর সঙ্গে ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক তুরস্ককে খণ্ড-বিখণ্ড করা, ১৯১৯ সালে বিনা বিচারে আটক রাখা সংক্রান্ত কুখ্যাত ‘রাওলাট আইন’ জারী করা ও জালিয়ানওয়ালাবাগের

হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি ঘটনা যুক্ত হওয়ায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন অগ্নিরূপ ধারণ করে।[১১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) পর ভারতের মুসলমানরা তুরস্কের অখণ্ডতা, খেলাফত রক্ষা ও ধর্মীয় পবিত্র স্থানগুলো খলিফার হাতে ন্যস্ত করার দাবিতে এক তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে যা ইতিহাসে খেলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত।[১২] এসময় মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী বয়কট কর্মসূচি তথা অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। গান্ধীর সত্যাগ্রহ নীতিতে হিন্দু-মুসলমান একত্র হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী তীব্র আন্দোলন শুরু করে।[১৩]

খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আবুল মনসুর আহমদ রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তখন (১৯২০ সন) ঢাকা কলেজে দর্শন বিষয়ে অর্নাসের ছাত্র। এসময় ল’ কলেজের ছাত্র মৌলবী ইব্রাহিমের নেতৃত্বে তিনি বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগ দেন। বিশেষ করে ১৯২০ সালে ঢাকার আহসান মঞ্জিলে খেলাফত কনফারেন্সের জনসভায় তিনি ভলান্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১৪] খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের প্রভাবে আবুল মনসুর আহমদ এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে বি এ পরীক্ষা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। কংগ্রেস খেলাফত কমিটির ‘ব্যাক টু ভিলেজ’ নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে তিনি গ্রামে ফিরে যান এবং সেখানে গিয়ে পল্লী সংগঠনে নেতৃত্ব দেন। গ্রামে তিনি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তার প্রধান শিক্ষক হন। এছাড়া তিনি গ্রামে হাই স্কুল, তাঁতের স্কুল, চরকা স্কুল, বেসরকারি সালিশী পঞ্চায়েত, পল্লী সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলনের সাথে মনে প্রাণে জড়িয়ে পড়েন। তুরস্কের যুদ্ধে কামাল পাশাকে সাহায্যের জন্য ‘আংকারা তহবিলে’ ফেতরার মতো শিশুবৃদ্ধ নর-নারী নির্বিশেষে মাথাপিছু দুই পয়সা করে চাঁদা তুলে দুই গ্রামের মোট ত্রিশ হাজার অধিবাসীর কাছ থেকে প্রায় এক হাজার টাকা চাঁদা তোলেন এবং এ টাকা জেলা খেলাফত কমিটিতে জমা দেন। মোটামুটি খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের (১৯১৯-১৯২২) কেন্দ্রীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের একটি সর্বভারতীয় ক্ষুদ্র সংস্করণ ছিল আবুল মনসুর আহমদ পরিচালিত পল্লী সমিতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড। শুধু আন্দোলনের মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বিলাতি কাপড় বয়কট করে দেশী কাপড় পরতেন এবং এ বিষয়ে সকলকে সচেতন করেন। এসময় ১৯২২ সালের মাঝামাঝিতে তিনি ময়মনসিংহ জেলার খেলাফত কমিটির সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু আন্দোলনের সমাপ্তিতে আবুল মনসুর আহমদ নতুন ধারার রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেন।[১৫]

খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন স্থিমিত হলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে আবার ফাটল ধরে। বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়।[১৬] ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় ১৯২৩ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। ১৯২২ সালে গয়ায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫) কাউন্সিলে প্রবেশ করে অসহযোগিতার মাধ্যমে সরকারকে অচল করার পক্ষপাতি ছিলেন, অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) চেয়েছিলেন নির্বাচন বয়কট করতে। অবশেষে গয়া কংগ্রেসে গান্ধীর প্রস্তাব গৃহীত হলে চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫) ও মতিলাল নেহেরুর (১৮৬১-১৯৩১) নেতৃত্বে ১৯২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তাদের সমর্থকদের কংগ্রেস থেকে বের করে নতুন দল ‘স্বরাজ্য পার্টি’ গঠন করেন এবং ১৯২৩ সালের নির্বাচনে

অংশগ্রহণ করে কাউন্সিলে একটি শক্তিশালী দল হিসেবে আবির্ভূত হন।[১৭] আবুল মনসুর আহমদ এই নির্বাচনে 'স্বরাজ্য পার্টি'র সমর্থনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ময়মনসিংহ থেকে স্বরাজ্য পার্টির প্রার্থী হিসেবে মৌলবী তৈয়বুদ্দীন আহমদের সমর্থনে তিনি নির্বাচনী প্রচারণা চালান। তৈয়বুদ্দীন আহমদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ধনবাড়ির বিখ্যাত জমিদার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৯১০-১৯৮০)। নওয়াব আলীর বিরুদ্ধে আবুল মনসুর আহমদ 'নবাব বাহাদুরের বাহাদুরি' শিরোনামে জীবনের প্রথম নির্বাচনী ইশতেহার লিখে ব্যাপক প্রচারণা চালান এবং মূলত এ কারণেই নবাব বাহাদুর নির্বাচনে হেরে যান। নির্বাচনের পর আবুল মনসুর আহমদ কলকাতায় গিয়ে *ছোলতান* পত্রিকায় চাকুরি নেন এবং স্বরাজ্য দলের একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পার্লামেন্টারি নীতির পক্ষে লিখতে থাকেন। দেশবন্ধুর প্রচেষ্টায় এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সহ হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের সমর্থনে এ সময় ঐতিহাসিক 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩) সাধিত হয়।[১৮]

দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বেঙ্গল প্যাক্ট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে তীব্র বিরোধিতার মুখে তা গৃহীত হয় কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস এবং বাংলার অধিকাংশ হিন্দু নেতৃবৃন্দ মন থেকে এই প্যাক্টকে গ্রহণ করেনি। ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মিলনীতে দেশবন্ধু কংগ্রেসীদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও বেঙ্গল প্যাক্টকে পাশ করাতে সমর্থ হন।[১৯] আবুল মনসুর আহমদ এ সময় মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর *ছোলতান* পত্রিকায় সাব-এডিটরের চাকরি করতেন।[২০] ইসলামাবাদীর অনুরোধে সম্মিলনী সফল করার বিশেষ মিশন নিয়ে আবুল মনসুর আহমদ সম্মিলনীর আগে সিরাজগঞ্জে আসেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর নেতৃত্বে এ সময় আঞ্জুমানের মুসলিম নেতারা ও সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা সিরাজগঞ্জের সম্মিলনী ভণ্ডুল করার চেষ্টা করলে তিনি যুক্তি দিয়ে তাদের বোঝানোর পর সম্মেলন সফলভাবে সমাপ্ত হয়। এভাবে তিনি বেঙ্গল প্যাক্টের পক্ষে সাংগঠনিক পর্যায়ে উলেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন।[২১]

খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন স্থিমিত হওয়া, দেশবন্ধুর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি, লীগ ও কংগ্রেস উভয়ের সাইমন কমিশন বর্জন, মুসলিম লীগের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, কংগ্রেসের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে 'নেহেরু রিপোর্ট' প্রণয়ন ও মুসলমানদের প্রত্যাখান, নেহেরু রিপোর্টের বিপরীতে 'জিন্নাহর চৌদ্দ দফা' পেশ, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রদান, মুসলিম লীগের মধ্যে বিভিন্ন উপদলের সৃষ্টি ও 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ছিল ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ভারত তথা বাংলার রাজনীতিতে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনা।[২২] বাংলার রাজনীতির এমনই এক প্রেক্ষাপটে ১৯২৯ সালে স্যার আবদুর রহিমকে সভাপতি, মওলানা আকরম খাঁকে সেক্রেটারি ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে সহ সভাপতি করে বাংলার উলেখযোগ্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মিলে গঠন করেন 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'।[২৩] আবুল মনসুর আহমদ এ সময় ওকালতি পাশ করে *দি মুসলমান* পত্রিকার কাজ ছেড়ে কলকাতা থেকে ময়মনসিংহে চলে আসেন এবং ওকালতির পাশাপাশি প্রজা সমিতির ময়মনসিংহ শাখা গঠন করে তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন।[২৪] একই সঙ্গে তিনি ময়মনসিংহ জেলা শাখার আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার সহ সভাপতি, কংগ্রেসের সহ সভাপতি, মুসলিম লীগের সভাপতি ও প্রজা সমিতির সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন।[২৫] বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকলেও মূলত তিনি ছিলেন একজন

প্রজাকর্মী। তার কঠোর পরিশ্রম ও অসাধারণ দক্ষতায় অল্প সময়ের মধ্যে তৎকালীন বাংলার সর্ববৃহৎ জেলা ময়মনসিংহ প্রজা সমিতির একটা শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়। এখান থেকে প্রজা আন্দোলন সংঘবদ্ধ আন্দোলনের আকারে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এ সময়ই তিনি *'চাষী'* নামে প্রজা আন্দোলনের সাপ্তাহিক মুখপত্র বের করেন।[২৬]

প্রজা সমিতি একটি অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হলেও মূলত মুসলমান প্রজারাই এই সমিতির সদস্য ছিলেন। আবুল মনসুর আহমদ একটা কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করলে আঞ্জুমানের মুসলিম নেতারা তার বিরোধিতা করেন ও মুসলিম কর্মী সম্মেলন ডাকার পরামর্শ দেন। কিন্তু আবুল মনসুর আহমদ প্রজা সমিতির অসাম্প্রদায়িক চরিত্র নষ্ট না করে আঞ্জুমানের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে সহ সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন। অন্যদিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বেশির ভাগ নেতাই ছিলেন জমিদার ও অভিজাত শ্রেণির এবং প্রজা সমিতির মূল উদ্দেশ্য জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ হওয়ায় তারা সবাই ছিলেন প্রজা সমিতির বিরোধী শক্তি। সাধারণভাবে বাংলার জমিদার ও মহাজনেরা হিন্দু এবং প্রজা ও খাতকরা মুসলমান হওয়ায় কার্যত প্রজা আন্দোলন ছিল হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের আন্দোলন। হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের সময়ও তিনি কংগ্রেসে ছিলেন।[২৭] ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার কর্তৃক কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হলে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা গ্রেফতার হন। আবুল মনসুর আহমদকেও এ সময় জেলার পুলিশ সুপার মি. টেইলর গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে তার অফিসে নিয়ে আসেন কিন্তু তার বাগ্মিতায় এস পি টেইলর ভারতবাসীর স্বাধীনতার দাবি ও প্রজা আন্দোলনের অধিকারের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে প্রজা সমিতির কার্যক্রমে সহায়তার আশ্বাস দিয়ে তাকে ছেড়ে দেন। ফলে আবুল মনসুর আহমদের একক নেতৃত্বে ময়মনসিংহের প্রতিটি স্তরে প্রজা সমিতি একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়।[২৮]

আবুল মনসুর আহমদ বাংলার রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশিষ্ট ছিলেন। বিশেষ করে ত্রিশের দশকে তিনি প্রজা সমিতির আঞ্চলিক নেতৃত্বে ছিলেন।[২৯] ১৯৩৪ সালে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে ঢাকা-ময়মনসিংহ নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী ছিলেন স্যার আব্দুল হালিম গজনবী (১৮৭৬-১৯৫৩)।[৩০] ফজলুল হক এ সময় আবুল মনসুর আহমদের কাছে আব্দুল হালিম গজনবীর বিরুদ্ধে একজন শক্তিশালী প্রার্থী দাঁড় করানোর জন্য একটি চিঠি লেখেন। আবুল মনসুর আহমদ নিজেও স্যার গজনবীর রাজনীতি পছন্দ করতেন না। তাই তিনি ধনবাড়ির জমিদার নবাবজাদা হাসান আলীকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করালেন। যদিও তার বয়স পঁচিশ বছর না হওয়ায় প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে হয়। এই নির্বাচনে প্রজা সমিতির সভাপতি স্যার আবদুর রহিম কলকাতা থেকে নির্বাচিত হন এবং ১৯৩৫ সালে আইন পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হন। তাই তিনি প্রজা সমিতির সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলে নতুন সভাপতি নিয়ে দলের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয় এবং এতে আবুল মনসুর আহমদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[৩১] প্রজা সমিতির সেক্রেটারি মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে প্রবীণ প্রজা নেতারা চেয়েছিলেন খান বাহাদুর আব্দুল মোমেনকে (১৮৭৬-১৯৪৬) প্রেসিডেন্ট করতে, অন্যদিকে আবুল মনসুর আহমদের মতো তরুণ নেতারা চেয়েছিলেন ফজলুল হককে।[৩২] বিদায়ী সভাপতি স্যার আবদুর রহিম সমর্থন করেন আব্দুল মোমেনকে। ফলে ফজলুল হকের সমর্থনকারীরা তা মেনে নিলেন না। এভাবে ময়মনসিংহ প্রজা সমিতির বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি নিয়ে মতদ্বৈততার সৃষ্টি হয়। ১৯৩৫ সালে

ময়মনসিংহ প্রজা সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সম্মেলনের আয়োজন সমাপ্ত হলে মওলানা আকরম খাঁ সম্মিলনী অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলে আবুল মনসুর আহমদ এই ঘোষণাকে অগ্রাহ্য করে সকল নেতাকর্মীকে সম্মেলনে আসার জন্য আহবান জানান এবং তার একক প্রচেষ্টায় ফজলুল হককে সভাপতি নির্বাচিত করেন।[৩৩] ময়মনসিংহ অঞ্চলের একজন আঞ্চলিক নেতা হয়েও আবুল মনসুর আহমদ এভাবে বাংলার রাজনীতিতে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রজা সমিতিকে তিনি ময়মনসিংহের তৃণমূল পর্যায়ের একটি জনপ্রিয় সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলেন। তার প্রচেষ্টাতে এ সময়ে গোটা জেলার লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে মোট ৭২ টি আসনের মধ্যে প্রজা সমিতি ৬৪ টি আসন লাভ করে। ১৯৩৬ সালের এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রজা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে তিনি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে মেনিফেস্টো পেশ করেন।[৩৪]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলায় প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই আইন অনুযায়ী পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় বাংলার আসন সংখ্যা ছিল মোট ২৫০টি। নির্বাচনের পূর্বে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দীর্ঘদিন বিলেতে অবস্থান শেষে ভারতে এসে মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং বাংলায় এসে কৃষক প্রজা সমিতির সঙ্গে আপোসের চেষ্টা চালান।[৩৫] কৃষক প্রজা সমিতির প্রতিনিধি দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে আবুল মনসুর আহমদ কলকাতায় জিন্নাহর সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আলোচনায় বসেন কিন্তু বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদের শর্তে জিন্নাহ রাজি না হওয়ায় আপোসের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি পৃথকভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।[৩৬] নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৪০টি, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৮টি ও স্বতন্ত্র মুসলিম প্রার্থী ৪১টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে স্বতন্ত্র বর্ণ হিন্দু ও তফসিলি হিন্দু বাদে কংগ্রেস ৫০টি আসন লাভ করে। স্বতন্ত্র মুসলিম আসনের অনেকেই মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দেওয়ায় মুসলিম লীগের আসন দাড়ায় ৬০টিতে এবং কৃষক প্রজা পার্টির আসন দাড়ায় ৫৮টিতে। কৃষক প্রজা পার্টি তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলেও মূল দল কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কারও পক্ষে এদের সমর্থন ছাড়া সরকার গঠন করা সম্ভব ছিলনা। কংগ্রেস কোন মন্ত্রীত্ব ছাড়া কৃষক প্রজা পার্টিকে সরকার গঠনের জন্য সমর্থনের ইচ্ছা প্রকাশ করে তাই কোন সমঝোতা করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে মুসলিম লীগ কৃষক প্রজা পার্টির সমস্ত কার্যক্রম মেনে নিলে ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রীত্বে মুসলিম লীগের সঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়।[৩৭] ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী হলেও দলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দলীয় নেতৃবৃন্দকে আয়ত্তে আনতে বা বোঝাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে আবুল মনসুর আহমদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এ সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ তার বিখ্যাত রাজনৈতিক গ্রন্থ *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*-এ বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তিনি নিজে প্রার্থী না হলেও একমাত্র তারই প্রচেষ্টায় ও নির্বাচনী প্রচারণায় ময়মনসিংহ জেলার মোট ১৬ টি মুসলিম আসনের মধ্যে কৃষক প্রজা পার্টি ১১ টি আসনে জয়ী হয়েছিলেন।[৩৮]

আবুল মনসুর আহমদ ১৯৩৭ সালের মন্ত্রিপরিষদের উপদেষ্টা বোর্ডের একমাত্র সদস্য যিনি মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন না। তবে সরকারের কর্মসূচি নির্ধারণ করতে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে তিনি মুসলিম লীগের সঙ্গে বির্তকে জড়িয়ে পড়েন। কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ ও মন্ত্রীদের বেতন মাসিক এক হাজার টাকা নির্ধারণ নিয়ে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে তিনি তর্ক-বিতর্কের সম্মুখীন হন।[৩৯] এভাবে আবুল মনসুর আহমদ কৃষক প্রজা আন্দোলনের মাঠ পর্যায়ের একজন আঞ্চলিক নেতা হয়েও সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ কর্মসূচির মাধ্যমে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করতে পেরেছিলেন।[৪০]

বঙ্গভঙ্গের ফলে ১৯০৬ সালে আগা খানের নেতৃত্বে সিমলা ডেপুটেশনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি, ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ডের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় রাজনৈতিকভাবে দুটি পৃথক সত্ত্বায় পরিণত হয়।[৪১] পরবর্তীতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় যথাক্রমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন। আদর্শগত কারণে কংগ্রেস কখনও ভারতবর্ষ বিভক্ত হোক চায়নি কিন্তু মুসলিম লীগ তা চেয়েছে। ১৯৩০ সালে এলাহাবাদ মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে কবি ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮) ভারতের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে অভিহিত করেন।[৪২] এই ঘোষণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৩১ সালে ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সময় ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী (১৮৯৭-১৯৫১) পুস্তিকা প্রকাশ করে, যেখানে মুসলমানদের জন্য 'পাকিস্তান' নামে স্বতন্ত্র মুসলিম আবাস ভূমি সৃষ্টির দাবি করেন। পরবর্তীতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারত বিভাগের ক্ষেত্রে কবি ইকবালের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।[৪৩] এ সমস্ত আলোচনা ও চিন্তা চেতনার সফল পরিণতি আসে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে বিখ্যাত 'লাহোর প্রস্তাব' উপস্থাপনের মাধ্যমে। লাহোর প্রস্তাব অনুসারে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চল (বাংলা ও আসাম) নিয়ে একাধিক স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলা হলেও পরে মুসলিম লীগ এই অবস্থান থেকে সরে এসে একটি মাত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়, যা সুস্পষ্টভাবে লাহোর প্রস্তাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতের হিন্দু ও মুসলমানকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করে দুটি পৃথক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের যুক্তি তুলে ধরেন যা 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' বা 'Two-nation theory' নামে পরিচিত। তিনি ভারতের সমস্ত মুসলমানকে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেন, যাতে ভৌগোলিক সীমারেখাকে অগ্রাহ্য করা হয়।[৪৪]

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে আবুল মনসুর আহমদের মতাদর্শগত পার্থক্য ছিল। জিন্নাহ যেখানে 'Two nation theory'তে বিশ্বাসী ছিলেন সেখানে আবুল মনসুর আহমদ দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিপরীতে 'Two culture theory' বা 'দ্বি-সংস্কৃতি তত্ত্বে'র ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। যেখানে ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল। আবুল মনসুর আহমদের এই 'দ্বি-সংস্কৃতি তত্ত্ব' ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তিতে অগ্রাহ্য হলেও ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের মাধ্যমে তা বাস্তব রূপ নেয়।[৪৫] বিভাগ পূর্ববাংলার রাজনীতিতে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩ সাল) বিশেষ স্থান দখল করে আছে। 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে আখ্যায়িত এই দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। তিনি এই দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে তার বিখ্যাত ব্যঙ্গগ্রন্থ ফুড কনফারেন্স (১৯৪৮) এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনকে উপলক্ষ করে আকাল আনিল কারা? নামক দুটি পুস্তিকা লিখেছিলেন।[৪৬] ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ইংল্যান্ডের নির্বাচনে (২৬ জুলাই ১৯৪৫) শ্রমিক দল ক্ষমতায় আসে এবং তারা তাদের পূর্ব প্রস্তুতি অনুযায়ী ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানের ঘোষণা দেয়। ১৯৪৬ সালের ১৫ মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এটলি (১৮৮৩-১৯৬৭) ভারতবর্ষকে যতদ্রুত সম্ভব স্বাধীনতা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন এবং বিভিন্ন দলের সাথে আলোচনা করার জন্য মন্ত্রি মিশন প্রেরণ করেন। কিন্তু এই 'মন্ত্রিমিশন' পরিকল্পনার দ্বারা তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলো সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারায় মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ২৯ জুলাই (১৯৪৬) মুসলিম লীগ গণপরিষদ বর্জন করে দিয়ে ১৬ আগস্ট পাকিস্তানের দাবিতে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' (Direct Action Day) পালনের ঘোষণা দেয়। ফলে ভারতব্যাপী ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগের এই কর্মসূচি ছিল মূলত ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দিন কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটের এক সভায় 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'কে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বলে ঘোষণা করেন। ফলে হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে হিন্দুরা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'কে প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফলে হিন্দু-মুসলিম ব্যাপক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। কয়েকদিন পর এটা সাময়িকভাবে স্থিমিত হলেও দেশ বিভাগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে এ দাঙ্গা চলতে থাকে।[৪৭] আবুল মনসুর আহমদ এই দাঙ্গার হৃদয় বিদারক বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-

> "...আমার মহলায় হয়ত একজন মুচি ফুটপাতে বসিয়া মুসলমানদেরই জুতা মেরামত করিতেছে। হয়ত একজন হিন্দু নাপিত ফুটপাতে বসিয়া মুসলমানদের ক্ষৌরকাজ করিতেছে। হঠাৎ কয়েকজন মুসলমান আততায়ী ধারাল রড বা বল্লম তার মাথায় গলায় বা পেটে এপার-ওপার ঢুকাইয়া দিল। মুহূর্তের মধ্যে ধড়পড় করিয়া লোকটি সেখানেই মরিয়া পড়িয়া রহিল। বীরেরা জয়ধ্বনি করিতে করিতে চলিলেন অন্য শিকারের তালাশে।"[৪৮]

মূলত এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই কংগ্রেস তথা ভারতের হিন্দুদের অখণ্ড ভারতের দাবি থেকে সরে এসে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির প্রতি নমনীয় হতে সহায়তা করেছিল। অন্যদিকে বিরোধিতার উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলিম লীগ মন্ত্রিপরিষদে যোগদান করলে গণপরিষদ কার্যত অচল হয়ে পড়ে। ফলে বাধ্য হয়ে কংগ্রেস মুসলমানদের পাকিস্তান দাবি মেনে নেয়।[৪৯] ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট এটলি ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। ঘোষণায় ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের (১৮৮৩-১৯৫০) পরিবর্তে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে (১৯০০-১৯৭৯) ভারতের শেষ ভাইসরয় হিসেবে নিয়োগ দেন। ইতিমধ্যে ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মুসলিম লীগের বিরোধী ভূমিকা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অখণ্ড ভারতের অনড় অবস্থানকে দুর্বল করে তোলে। অন্যদিকে মাউন্টব্যাটেন কূটনৈতিক উপায়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দকে দেশ ভাগের ব্যাপারে নমনীয় করে তোলেন এবং ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত ভারত বিভাগের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

অবশেষে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হয়। পরিকল্পনানুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' তথা ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।[৫০]

মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন পূর্ববাংলা তথা বাংলার সকল নেতাকে প্রভাবিত করেছিল। আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন মূলত কৃষক প্রজা আন্দোলনের নেতা। ফজলুল হক কৃষক প্রজা আন্দোলনের সূচনাকারী হলেও এ আন্দোলন অবসানে তার ভূমিকাই মূখ্য।[৫১] ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ (১৯৩৭) দিলেও আবুল মনসুর আহমদ কৃষক প্রজা পার্টিতে থেকে *দৈনিক কৃষক* (১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর প্রকাশিত) পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন।[৫২] তবে লাহোর প্রস্তাব তাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে এবং এর পক্ষে তার মানসিক পরিবর্তন ঘটে। আবুল মনসুর আহমদ এর ভাষায়-

> "... কংগ্রেস লীগ আপোসের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান যতই পিছাইয়া যাইতে লাগিল আমি ততই মুসলিম লীগের দিকে হেলিয়া পড়িতে লাগিলাম। আমার কংগ্রেসী নেতারা যতই হিন্দু হইতে লাগিলেন, আমি ততই মুসলিম হইতে লাগিলাম। আমার এই মুসলিমত্বে অবশ্য ধর্মীয় গোড়ামি ছিলনা; পরধর্ম বিদ্বেষও ছিলনা। ছিল শুধু তীব্র স্বকীয়তা আত্মমর্যাদা বোধ ও স্বতন্ত্র চেতনা। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যটা এই সময় আমার কাছে বুনিয়াদি মানস পার্থক্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল।"[৫৩]

আবুল মনসুর আহমদের এই মানসিক পরিবর্তনে ডা. আম্বেদকারের ইংরেজী গ্রন্থ 'পাকিস্তান' এবং মৌলবী মুজিবর রহমানের বাংলা গ্রন্থ 'পাকিস্তান' যথেষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল। দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপটে ধীরে ধীরে তিনি পাকিস্তানবাদী হয়ে পড়েন এবং অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগে যোগ দেন। আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্তান আন্দোলনের একটা বুদ্ধিবৃত্তিক রূপ দিতে চেয়েছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি দুটি বিষয় তুলে ধরেছিলেন।

> "এক, পাকিস্তান দাবিকে দেশ-বিদেশের সকল চিন্তুকের কাছে গ্রহণযোগ্য করিতে হইলে উহাকে একটা ইনটেলেকচুয়াল রূপ দিতে হইবে। ইতিহাস, ভূগোল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিচারে উহাকে যুক্তিসহ ও প্রাকটিক্যাল করিতে হইবে। দুই, শুধু ধর্মের ডাকে পাকিস্তান আসিলে মোল্লাদের প্রাধান্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মোল্লাদের প্রভাবে মুসলমানরা কেবল পিছন ফিরিয়ে রাস্তা চলে তাই জীবন পথে মুসলমানরা এত বেশি হোঁচট খাইতেছে। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের নামে রাষ্ট্র গঠিত হইলে তাতে কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ বিপন্ন হইতে পারে। এই দুইটা সম্ভাবনাকে ঠেকাইতে হইবে।"[৫৪]

পাকিস্তান আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক রূপ দেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'তে যোগ দেন। তাছাড়া হিন্দু সাহিত্যিকদের সমান্তরালে মুসলমান সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে সাহিত্যে পাকিস্তান বিরোধী ভাবধারাকে যারা প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ অন্যতম। ১৯৪৪ সালের ৫ মে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজের মিলনায়তনে 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'র এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আবুল

মনসুর আহমদ ছিলেন সেই সম্মেলনের সভাপতি। সভাপতির অভিভাষণে তিনি সেদিন যা বলেছিলেন তার মধ্যে পাকিস্তান আন্দোলনের তাত্ত্বিক রূপটা ধরা পড়ে। পরবর্তীতে তিনি উল্লেখ করেন,

> "প্রথমত, আমি বলিয়াছিলাম, পাকিস্তান দাবিটা প্রধানতঃ কালচারেল অটনমির দাবি বলিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেয়ে কালচারেল অটনমি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই দিক হইতে পাকিস্তান দাবি শুধু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাবি নয় এটা গোটা ভারতের কালচারাল মাইনরিটির জাতীয় দাবি। দ্বিতীয় কথা আমি বলিয়াছিলাম যে ভারতীয় মুসলমানরা হিন্দু হইতে আলাদা জাত ত বটেই বাংলার মুসলমানরাও পশ্চিমা মুসলমানদের হইতে পৃথক জাত। বলিয়াছিলাম, শুধু মাত্র ধর্ম জাতীয়তার বুনিয়াদ হইতে পারেনা।"[৫৫]

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সময়ের দাবি হিসেবে আবুল মনসুর আহমদ কৃষক প্রজা আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হয়েও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান সমর্থকে পরিণত হন এবং মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পান। তবে কখনও তার মন থেকে কৃষক-প্রজাদের স্বার্থের বিষয়টি মুছে যায়নি বরং মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদকের পদ কে ব্যবহার করে তিনি কৃষক প্রজাদের স্বপক্ষে কাজ করেছেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তাই তিনি "লাঙ্গল যার মাটি তার", "বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ", "কায়েমী স্বার্থের ধ্বংস চাই", "শ্রমিক যে মালিক সে", 'জনগণের পাকিস্তান", "কৃষক শ্রমিকের পাকিস্তান", প্রভৃতি শ্লোগান তৈরি করে পোস্টার প্লাকার্ড ছাপিয়ে রাস্তায় রাস্তায়, গ্রামাঞ্চলে পাঠাতেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ তাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিলেও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড তা বাতিল করে আবুল কালাম শামসুদ্দিন কে মনোনয়ন দেয়। তবে তিনি ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলিম লীগের সদস্য নির্বাচিত হন কিন্তু কেন্দ্রীয়ভাবে মুসলিম লীগ গণপরিষদের বৈঠক বর্জন করায় তাতে আর যোগ দেওয়া হয়নি।[৫৬]

আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক হলেও পাকিস্তানের ত্রুটিপূর্ণ বিভক্তিতে তিনি তৎকালীন নেতৃত্বকে দায়ী করেন। ভারত বিভাগের সময় পাকিস্তানের উপর অবিচার করা হয়েছে কারণ সিলেটের করিমগঞ্জ ও গুরুদাসপুর জেলা পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পক্ষে মতামত দিলেও তা ভারতের ভাগে ফেলা হয়। এক্ষেত্রে বলা হয় যে, মাউন্টব্যাটেনকে গভর্নর না করে জিন্নাহ নিজেই গভর্নর হওয়ায় মাউন্টব্যাটেন বিরাগভাজন হয়ে সীমানা কমিশনের সদস্য র‍্যাডক্লিফকে দিয়ে পাকিস্তানকে ঠকিয়েছে। তবে পাকিস্তানের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার অসঙ্গতির জন্য শুধুমাত্র র‍্যাডক্লিফ দায়ী নয় বরং পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের দায় সবচেয়ে বেশি। পার্টিশন কাউন্সিলে যদি সোহ্‌রাওয়ার্দী থাকতেন তাহলে কলকাতা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হত। পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ লাহোর পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করতে পেরেই খুশি হয়ে যান এবং ব্যারাকপুর, বারাসাত, ভাঙ্গর বশিরহাট ও দার্জিলিং বিনা আপত্তিতে ভারতের কাছে ছেড়ে দেয়। এ সময় পূর্ববাংলার ভৌগোলিক ব্যাপার বা স্বার্থ দেখার মত কোন দায়িত্বশীল নেতা ছিল না। তৎকালীন পূর্ববাংলা অঞ্চলের শীর্ষনেতারা ক্ষমতা আকাঙ্খা করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বিরোধিতা করেননি। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা ফজলুল হক ও সোহ্‌রাওয়ার্দীকে হেনস্তা হতে দেখে অনেক নেতাই তাদের বিরোধিতা করার সাহস পায়নি।[৫৭]

আবুল মনসুর আহমদ ১৯৪৬ সালে তেমনভাবে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না। ১৯৪৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকা প্রকাশ করলে তিনি এর সম্পাদক নিযুক্ত হন।[৫৮] তাই এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি তখন পূর্ববাংলার স্বার্থ সংশিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেন। এর মধ্যে একটি বিষয় ছিল কলকাতাকে পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়ে তার পক্ষে প্রচারণা চালান। এসময় খাজা নাজিমুদ্দিন গ্রুপের অনেক নেতা *দৈনিক ইত্তেহাদ* অফিসে এসে আবুল মনসুর আহমদকে কলকাতা রক্ষার আন্দোলন বন্ধ করার অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি তা মানেন নি। দেশ ভাগের পর আবুল মনসুর আহমদ কলকাতায় থেকে গিয়ে পত্রিকা চালাতে থাকেন কিন্তু নাজিমুদ্দিন সরকার বাংলাদেশের *দৈনিক ইত্তেহাদ* এর প্রকাশ অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সরকারের অসহযোগিতার কারণে ঢাকায় বাড়ি ভাড়া করার পরও পত্রিকা প্রকাশ করা হয়নি। ফলে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। আর এর মধ্য দিয়ে তার সাংবাদিকতা জীবনের ইতি ঘটে।[৫৯]

দেশভাগের পর থেকেই মুসলিম লীগ সরকার তাবেদারী দলে পরিণত হয়। কেননা মুসলিম লীগ সরকার দেশ পরিচালনায় সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য ও দমন নীতি অনুসরণ করে। এরই প্রতিবাদস্বরূপ মুসলিম লীগের একদল স্বশিক্ষিত ও অসাম্প্রদায়িক তরুণ রাজনৈতিক কর্মী আলাদা একটি দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এই রাজনৈতিক তাড়না থেকে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পূর্ববাংলার নতুন রাজনৈতিক দল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' আত্মপ্রকাশ করে।[৬০] প্রথমদিকে এ দলের তেমন উলেখযোগ্য কোন সাংগঠনিক তৎপরতা ছিলনা। দলের সভাপতি মওলানা ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক মাঝে মধ্যে পার্টি তৎপরতা সক্রিয় রাখার জন্য বক্তৃতা বিবৃতি দিতেন। তাছাড়া শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীও যুক্ত বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়ে কোন রকমে টিকিয়ে রেখেছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের পরিচিতি।[৬১] ১৯৪৭ সালের শেষ দিক থেকে ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কালে আবুল মনসুর আহমদের রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ ছিল না। তবে *ইত্তেহাদ পত্রিকার* সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক তৎপরতা ও মতামত প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করতেন।[৬২]

১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে আবুল মনসুর আহমদ কলকাতা থেকে নিজ জেলা ময়মনসিংহ এসে তিনি ওকালতিতে মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাছাড়া এসময় তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে মনস্থির করেন। আবুল মনসুর আহমদ তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওকালতি শুরু করার কয়েকদিন পর মওলানা ভাসানী ও সোহ্‌রাওয়ার্দী আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক বিস্তারের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ এসে ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগ কমিটি গঠন করেন। আবুল মনসুর আহমদকে নতুন গঠিত এ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব অর্পন করেন। এ সময় দলীয় রাজনীতিতে অনিচ্ছা থাকা স্বত্ত্বেও তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের ময়মনসিংহ শাখার সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করেন। আবুল মনসুর আহমদ ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে স্থানীয় পর্যায়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক বিকাশের সাথে সাথে মতাদর্শ ভিত্তিক দলীয় রাজনীতির গোড়াপত্তন করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদানের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের এ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে অর্থাৎ আওয়ামী মুসলিম লীগের

রাজনীতিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চলে আওয়ামী মুসলিম লীগের অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাসহ রাজনীতিকে সাধারণ জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেন। যার ফলে তার অঞ্চলের সকল স্তরের মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এ দল গঠনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি ক্রমান্বয়ে মধ্যবিত্তদের কাছে চলে আসে। নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ ধর্ম, গোত্র, বর্ণ তথা সকল শ্রেণির মানুষের দলে পরিণত হয় এবং এ দল মুসলিম লীগের অনাচার ও ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।[৬৩]

পাকিস্তান প্রাতষ্ঠার পরই স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে সোচ্চার হয়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত জনসাধারণ। ভাষা আন্দোলন ইস্যুকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন আরো বেগবান হতে থাকে।[৬৪] ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। মূলত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে এর সূচনা হলেও ক্রমে এটি একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। দুই পর্বে বিভক্ত এ আন্দোলন ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং শুধু বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হলেও ১৯৫২ সালে আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে।[৬৫] মূলত *দৈনিক ইত্তেহাদ* (প্রতিষ্ঠা ১৯৪৭) পত্রিকার মাধ্যমেই তিনি ভাষা আন্দোলনের পক্ষে ব্যাপক সমর্থন জানান। ভাষা আন্দোলনের যৌক্তিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন তার লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে। তাছাড়া ময়মনসিংহে গিয়ে অহিংসভাবে সকল নেতা কর্মীকে নিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করেন। এ ক্ষেত্রে একজন আঞ্চলিক নেতা হিসেবে ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাজনীতি তথা ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বেই ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিস' 'পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দু' এ নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। তিনটি প্রবন্ধের এ সংকলনে কাজী মোতাহের হোসেন এবং আবুল কাসেমের সঙ্গে 'বাংলা ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্র ভাষা' শিরোনামীয় অন্য প্রবন্ধের লেখক ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। এভাবে পূর্ববাংলার রাজনীতির অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ভাষা আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন।[৬৬]

পাকিস্তান জন্মের কয়েক বছরের মধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ করে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক উপদল তাদের মধ্যকার ভাষা ও আঞ্চলিক রাজনীতি, স্বাধিকারের প্রশ্নে অব্যাহত মতানৈক্য এবং দ্বন্দ্ব দেশটিকে নতুন নতুন রাজনৈতিক দল ও জোট গঠন আবশ্যক করে তোলে।[৬৭] পরবর্তীতে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য নীতি ও নিপীড়ন পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করে। তাছাড়া মুসলিম লীগ সরকার নির্ধারিত নির্বাচন অনুষ্ঠান বিলম্বিত করলে এবং পরবর্তীতে নির্বাচনের ঘোষণা করলে একটি নির্বাচনী জোট গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[৬৮] ফলে বিদ্যমান প্রধান রাজনৈতিক দল একত্রে কাজ করার জন্য যুক্তফ্রন্ট গঠন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। তাছাড়া নির্বাচনের দিন যতই নিকটে আসে তখন ছাত্র তরুণ প্রগতিবাদী চিন্তাশীলদের মধ্যে এবং শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার দাবি সর্বজনীন হয়ে ওঠে। যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য ১৯৫৩ সালের মে মাসে ময়মনসিংহ শহরে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশন আহবান করা হয়। এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে আবুল

মনসুর আহমদ যুক্তফ্রন্ট গঠনের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের সাথে সাথে একটি আবেদনও পেশ করেন। এই কাউন্সিল কৃষক শ্রমিক পার্টির সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠনে মত প্রকাশ করে। প্রথমে এ কে ফজলুল হক ও মওলানা ভাসানী যুক্তবিবৃতিতে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।[৬৯] যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আবুল মনসুর আহমদ একুশ দফা নির্বাচনী ইশতেহার রচনার ভার নেন। তিনি ঐতিহাসিক ২১ দফার রূপকার হিসেবে বাঙালির ইতিহাসে স্মরণীয় স্থান দখল করে আছেন। একুশ দফা বাঙালির রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক। ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার অন্যতম পন্থা হিসেবে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ২১টি দফার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। তাছাড়া ২১ দফা আবুল মনসুর আহমদের স্বদেশপ্রেম এবং সর্বজনীন মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার অনন্য স্মারক। এটি ছিল একটি সুপরিকল্পিত, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দলিল যা আবুল মনসুর আহমদ প্রস্তুত করেছিলেন।[৭০] ২১ দফা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

> "আমি ইতিপূর্বেই আওয়ামী মুসলিম লীগের ৪২ দফা একটি নির্বাচনী ইশতেহার রচনা করিয়াছিলাম। ... রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য। শহীদ মিনার নির্মাণ, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থান বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার সেবা-কেন্দ্র করার তিনটি দফা আওয়ামী লীগের ৪২ দফায়ও ছিল। ... কাজেই ২১ ফিগারটিকে চিরস্থায়ী করিবার অতিরিক্ত উপায় হিসেবে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচিকে ২১ দফার কর্মসূচি করিলে কেমন হয়? অত:পর আমার কাজ সহজ হইয়া গেল। ইতিহাস বিখ্যাত ২১ দফা রচনা হইয়া গেল।"[৭১]

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি বোর্ডের প্রথম বৈঠকে ফজলুল হককে সর্বসম্মতিক্রমে পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচন করা হয়।[৭২] কিন্তু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা নিয়ে জোটের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল শুরু হয়। ১৯৫৪ সালের ১৫ মে নতুন সদস্য ভিত্তিক সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আবুল মনসুর আহমদ ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হন এবং প্রাদেশিক যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার শুরু থেকেই মন্ত্রিত্ব নিয়ে শরিক দলগুলোর মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় যা ছিল যুক্তফ্রন্ট সরকারের চরম দূর্বলতা। এরই মধ্যে মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২ (ক) ধারা বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত এবং পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন ঘোষণা করেন।[৭৩] মুখ্যমন্ত্রী সভা ভেঙ্গে দেওয়াতে বাংলার আঞ্চলিক অন্যান্য নেতাদের মত তিনিও প্রতিবাদ শুরু করেন। ১৯৫৫ সালে আবুল মনসুর আহমদ আওয়ামী লীগের মনোনয়নের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ সদস্যদের ভোটে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।[৭৪] তাছাড়া ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের রায়কে উপেক্ষা করে অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালুর বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার সকল স্তরে আন্দোলন চলাকালীন সময় অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয়।[৭৫] সংবিধান রচনার পেছনে এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আবুল মনসুর আহমদের ভূমিকাও ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[৭৬]

১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হলে আবুল মনসুর আহমদ শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু ছয়দিন পর সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে পাকিস্তান সরকার গঠিত হলে তাকে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালীন আবুল মনসুর আহমদ গৃহীত অনেক সংস্কার ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর দীর্ঘ ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর অনুপস্থিতিতে আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্তানের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন। আবুল মনসুর আহমদের রাজনৈতিক জীবনে এটাই ছিল শীর্ষ অবস্থান।[৭৭]

জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় স্বৈরতান্ত্রিক এবং আমলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া ১৯৫৮ সালে সেনাশাসন জারির বেশ আগে থেকে দেশের শাসন প্রক্রিয়ার ভেতর সেনাবাহিনীর পরোক্ষ ভূমিকা ও প্রভাব যুক্ত হয়। শুরু থেকেই পাকিস্তানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব এবং ষড়যন্ত্রের রাজনীতি চলছিল। এমনি এক পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল খুব অবাক হবার মত কোন ঘটনা নয়। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের সংবিধান বাতিল করে জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা প্রথমে সামরিক শাসন জারি করেন। এরপর বিশ দিনের মাথায় তাকে উৎখাত করে আরেক সামরিক শাসক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন। পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থানের পর ১০ অক্টোবর আবুল মনসুর আহমদকে সামরিক আইনে গ্রেফতার করা হয় তবে ১৯৫৯ সালের ২৯ জুন হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চের রায়ে তিনি মুক্তি লাভ করেন।[৭৮] ১৯৬২ সালের ৩১ জানুয়ারি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হলে ৬ ফেব্রুয়ারি রাতে আবুল মনসুর আহমদকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। এ সময় জেলখানায় একই ওয়ার্ডে তফাজ্জল হোসেন, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন সহ প্রায় বিশ-বাইশ জন রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর (অধিকাংশ আওয়ামী লীগের) সাথে বন্দি ছিলেন। আবুল মনসুর জেলে থাকাকালীন আইয়ুব খান নতুন সংবিধান পাস করেন। তাছাড়া এ সময়ই (২৭ এপ্রিল ১৯৬২) ফজলুল হক মৃত্যুবরণ করায় তিনি খুবই ব্যথিত হন।[৭৯] ১৯৬২ সালে কারা মুক্তির পর আবুল মনসুর আহমদ আর রাজনীতিতে সক্রিয় থাকেননি, লেখালেখি করেই বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। আবুল মনসুর আহমদ ৬৪ বছর বয়সে রাজনৈতিক জীবন থেকে সরে আসেন। তার জীবনের বাকী সময়ে তিনি বাংলার রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি নিয়ে লেখালেখি করেছেন।

আবুল মনসুর আহমদ জীবনের শুরু থেকে রাজনীতির বিভিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং আঞ্চলিক নেতা হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনীতির নিয়ন্ত্রকরূপেও আবির্ভূত হয়েছিলেন।[৮০] তৎকালীন রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনুযায়ী একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারতো। তাই আবুল মনসুর আহমদ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা সমিতি ও আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাংলার রাজনীতিতে মূলত জমিদার, নাইট, নবাব ও উচ্চবিত্ত অভিজাত শ্রেণির একাধিপত্য ছিল। এক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদ তৃণমূল পর্যায় থেকে উঠে এসে শুধু তার একান্ত নিজস্ব প্রতিভার গুণে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। বলা যায়, তার অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিভায় তাকে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে একজন

বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।[৮১] আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা অর্জন আন্দোলনে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। একদিকে তিনি ধর্মের খোলসধারী, কাঠমোল্লা, ভণ্ডপীর, ফতোয়াবাজ ও ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাহিত্যিক আন্দোলন চালিয়ে সমাজকে শোধনের চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিনির্মাণের আন্দোলনে আপসহীন নেতৃত্ব প্রদান করেন। তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সমর্থক হলেও ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল রক্ষণশীল এবং কখনও কখনও প্রতিক্রিয়াশীলও। এ কথা সত্য যে এক জীবনে তিনি ব্রিটিশ, পাকিস্তানি, বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক বহু আন্দোলন, বিক্ষোভ, মেরুকরণ, সংগঠন বা সংহতি সৃজনের সাথে যুক্ত ও প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। শোষক, জমিদার, মহাজন, ধনিক, বণিকের অন্যায় আচরণ ও অবিচারমূলক প্রথা বা বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার সক্রিয় ও প্রতিরোধ রচনাকারীও ছিলেন। তার সমকালীন রাজনৈতিক স্রোত-প্রতিস্রোতের মধ্যে বিপ্লববাদ ও কমিউনিস্ট মতবাদ বেগবান হয়েছিল। নেতাজী সুভাষ বসুর সান্নিধ্যে সাহচর্য লাভ করলেও এবং ভক্তি প্রণতচিত্তে নেতাজীর বহু উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ডের অনুমোদনকারী হলেও আবুল মনসুর আহমদ কোথাও কখনো বিপ্লববাদের কিংবা বিপ্লবী কোন দল বা উপদলের সঙ্গে যুক্ত হননি। কমিউনিস্ট মতবাদ ও কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তার মোহ বা অনুরাগ ছিলনা। মওলানা ভাসানী ও ন্যাপের মার্কিন বিরোধী বক্তব্য ও প্রচারণাতে তিনি সমালোচনা করেছেন এবং সর্বদা সজাগ মানসিকতায় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক চরিত্র রক্ষার্থে তিনি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী নির্দেশিত রাজনৈতিক পথ অনুসরণ করেছেন। তৎকালীন সময়ে একই ব্যক্তির একই সঙ্গে কংগ্রেস, লীগ, প্রজাপার্টির সদস্য ও নেতৃত্ব গ্রহণ ও ধারণ করা তার রাজনৈতিক কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ক্ষমতার বৃত্তে না পৌঁছাতে পারলে আত্মসেবা কিংবা জনসেবা কিছুই করা যায় না। এই বোধ-বিশ্বাস এ কে ফজলুল হকের মতো আবুল মনসুর আহমদেরও ছিল। কংগ্রেসী হিসেবে আবুল মনসুর আহমদের আদর্শ ছিল গণতন্ত্র ও কর্মসূচি ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। বাংলার ইতিহাসে প্রজা পার্টি এবং এ কে ফজলুল হকসহ প্রজা পার্টির নেতৃত্বে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। লীগ ও কংগ্রেসী বিরোধিতার মুখে প্রজা পার্টি ও ফজলুল হক অকুতোভয় সংগ্রামী ভূমিকা নিতে পেরেছিলেন আবুল মনসুর আহমদের মত নিবেদিত প্রাণকর্মী ও নেতার অক্লান্ত ভূমিকার জন্য। এরই ধারাবাহিকতায় আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। আবার আওয়ামী লীগের নেতা সোহ্‌রাওয়ার্দীর অনুসারী হিসেবে মন্ত্রিত্ব করেছেন। স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার আন্দোলনে ও সশস্ত্র সংগ্রামে তিনি তার মেধা ও মনন প্রয়োগ করলেও নানারূপ শঙ্কা ও দ্বিধাগ্রস্থতা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আবুল মনসুর আহমদের মুসলিম বাংলা ভাষিক কৃষ্টির স্বকীয়তা ও লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়নে স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব ইত্যাদি ধারণা মুসলিম লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী অন্যান্য মহলের প্রাণে আশা, মুখে কথা ও কাজে প্রেরণা দিয়েছে। আবুল মনসুর আহমদের বিশিষ্ট দোদুল্যমানতা সত্ত্বেও সে বাংলাদেশি প্রচেষ্টায় তার সক্রিয় সমর্থন ঐতিহাসিক সত্য। তিনি জাতীয়তাবাদে বাঙালি মুসলমান, ধর্মনিরপেক্ষ ও পরম গণতান্ত্রিক ছিলেন। ষাটের দশক শুরু হতে না হতেই যখন বয়োবৃদ্ধ জাতীয় নেতৃবৃন্দ যেমন এ কে ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দিন, সোহ্‌রাওয়ার্দী পরলোকগমন করেন আবুল

মনসুর আহমদ তখন স্বেচ্ছায় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই মহান রাজনীতিবিদ **১৯৬৯** সালের মার্চ মাসে ইন্তেকাল করেন।[৮২]

প্রান্তটীকা

১. নুরুল আমীন, আবুল মনসুর আহমদ, *জীবনী গ্রন্থমালা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১২
২. রফিকুল ইসলাম (সম্পা.), *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৭৭১-৭৭৩
৩. মো. চেঙ্গীশ খান, *আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্য, সমাজ, জীবন ও রাজনীতি*, পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩, পৃ. ৬৪
৪. নুরুল আমীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩
৫. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০১০ (১ম প্রকাশ, ১৯৬৯), পৃ. ১৬-১৮
৬. রফিকুল ইসলাম (সম্পা.), *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী*, *তৃতীয় খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৯৩
৭. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১৩
মোহাম্মদী মাসিক পত্রিকা হিসেবে ১৯০৩ সালে খুব অল্প সময়ের জন্য প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ সালে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং ১৯২২ সালে সাপ্তাহিক *মোহাম্মদীকে* দৈনিকে পরিণত করা হয়। *মোহাম্মদী* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মওলানা আকরম খাঁ। মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত ১৯০১-১৯৩০*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ৪৩৩
শেখ আবদুর রহিমের সম্পাদনায় ১৯১১ সালে কলকাতা থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে *মোসলেম হিতৈষী* প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকার মূল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ফুরফুরার পীর মওলানা আবু বকর। *মোসলেম হিতৈষী* মূলত তৎকালীন সরকার সমর্থক হিসেবে প্রচারিত হত। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৪
৮. **খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান চৌধুরী** ফরিদপুর জেলার বেলগাছির জমিদার। ১৮৯৯ সাল থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৮৯৯ সালে লক্ষ্ণৌ এবং ১৯০০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলা থেকে তিনিই ছিলেন একমাত্র মুসলমান প্রতিনিধি। ১৯০১ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের একজন প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯২৪-১৯২৬) নির্বাচিত হয়ে ভারত সরকার কর্তৃক প্রথমে খান বাহাদুর ও পরে সি আই ই উপাধিতে ভূষিত হন। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫
মওলানা আহমদ আলী (১৮৮১-১৯৭১) খুলনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবিভাগ বিরোধী ও স্বদেশি আন্দোলনে (১৯০৫-১১) যোগদানের মধ্য দিয়ে তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মওলানা আহমদ আলী ফজলুল হক পরিচালিত প্রজা আন্দোলনে যোগ দেন। খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের কারণে এক বছর কারাবরণ করেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের কারণে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া মওলানা আহমদ আলী *দৈনিক ছোলতান*, *কৃষক*, *নবযুগ*, পত্রিকার সাথেও জড়িত ছিলেন। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮-১৬৯
৯. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১৩
১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
১১. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২-৯
রাওলাট আইন ঃ ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তৎকালীন ভারতের বিপ্লবী পরিস্থিতি তদন্তের জন্য ইংরেজ আইনজীবী রাওলাটের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে। ঐ কমিটির সুপারিশক্রমে 'রাওলাট বিল' নামে একটি খসড়া আইন ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে উপস্থাপন করা হয়। এ আইনে এমন একটি বিশেষ আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয় যার রায় আপীলের ঊর্দ্ধে। তাছাড়া গোপন বিচার, থানা তল্লাশী ও গ্রেফতারের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার ব্যবস্থাও এ আইনে রাখা হয়। কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৮১
১২. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪-৯
১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫-২৭
রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমতকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী ১৯১৯ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে **সত্যাগ্রহ সভা** প্রতিষ্ঠা করেন। এ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীকে বিশ্বস্ততার সাথে সত্যের অনুসরণ এবং জীবন ও সম্পদের ক্ষতিসাধন হতে বিরত থাকার শপথ গ্রহণ করতে হত। একজন সত্যাগ্রহীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গান্ধীর অভিমত ছিল এরূপ 'একজন সত্যাগ্রহীকে রাগ থেকে মুক্ত- রাজনৈতিক প্রতিবাদী হতে হবে। তিনি প্রতিপক্ষের ক্রোধ সহ্য করে যাবেন কিন্তু প্রতিহিংসার বশবর্তী হবেন না। সরকার যখন তাকে গ্রেফতার করতে আসবে তিনি স্বেচ্ছায় গ্রেফতারী বরণ করবেন। সত্যাগ্রহী কখনও ইংরেজ জাতির প্রত্যাশাকে সালাম করবে না, তবে পতাকাকে লাঞ্ছিতও করবে না। সৈয়দ মকদুস আলী, *রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৯৫-৯৬
মৌলবী আবুল কাসেম (১৮৭২-১৯৩৬) বাঙালি মুসলমানের মধ্যে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী নেতা এবং খেলাফত আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃত্বে ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সহকর্মীরূপে বঙ্গভঙ্গ রদ ও স্বদেশি আন্দোলন

পরিচালনা করেন। তিনি *'The Mussalmans'* (১৯০৩) পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। মুসলিম লীগের সাথেও মৌলবী আবুল কাসেমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি বাংলার ব্যবস্থাপক সভা ও পরে ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তার অন্য পরিচয় হল তিনি আবুল হাশিমের পিতা ছিলেন। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত* , ১৯৯৬, পৃ. ১৮০

১৪. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২৩

১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-২৫, ২৬-৩৩

১৬. আবু আল সাঈদ, *মুসলিম শাসনকাল ধর্মনিরপেক্ষতা ও বঙ্গবন্ধু* ১২০৬-১৯৭৫, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৮০

১৭. কামরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

১৮. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩৫। আবুল মনসুর আহমদ 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সম্পর্কে বলেন-১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে সম্পাদিত ঐতিহাসিক বেঙ্গল প্যাক্ট নামক হিন্দু মুসলিম চুক্তিনামায় অন্তর্ভুক্ত বিষয় ছিল যে, সরকারি চাকুরীতে মুসলমানরা জনসংখ্যানুপাতে চাকুরী পাবে এবং যতদিন ঐ সংখ্যানুপাতে (তৎকালে শতকরা ৫৪) না পৌঁছবে ততদিন নতুন নিয়োগের শতকরা ৮০টি মুসলমানদের দেওয়া হবে। সরকারি চাকুরী ছাড়াও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান যথা কলকাতা কর্পোরেশন সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ড সমূহে মুসলমানরা ঐ হারে চাকুরী পাবে।

১৯. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩৬, ৩৭-৩৯, ইমরান মাহফুজ (সম্পা.), *কালের ধ্বনি দুর্লভ কথক আবুল মনসুর আহমদ*, কালের ধ্বনি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৮৪-৮৫

২০. *ছোলতান* সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে ১৯০৩ সালে কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। কিছুদিন প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৩ সালে পুনরায় সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে এবং ১৯৩০ সালের আগস্ট মাস থেকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দৈনিক পত্রিকা হিসেবেও প্রকাশিত হয়। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১১৬

২১. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩৬, ৩৭-৩৯, ইমরান মাহফুজ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪-৮৫

২২. মো: চেঙ্গীশ খান, *প্রাগুক্ত*, ২০১৩, পৃ. ৮০

সাইমন কমিশনের প্রতি বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা কংগ্রেসের উদ্যোগে ১৯২৮ সালের ১৯ মে এক সর্বদলীয় সম্মেলনে মিলিত হয় ও মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করেন। আগস্টের শেষে এই কমিটি ভারতীয় সংবিধানের খসড়া বিষয়ক রিপোর্ট লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে পেশ করে যা 'নেহেরু রিপোর্ট' নামে পরিচিত। রিপোর্টে সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা না থাকায় মুসলমানসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুরা এই রিপোর্ট প্রত্যাহার করেন। এনায়েতুর রহিম, *বাংলাপিডিয়া*

নেহেরু রিপোর্টের বিরোধিতা করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে মুসলমানদের অধিকার বিষয়ক ১৪ দফা পেশ করেন। ভারতে ফেডারেল পদ্ধতির সরকার, সমমানের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, সংখ্যালঘুদের আসন সংরক্ষণ,কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আইন সংরক্ষণ, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, ধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা, চাকরিতে ন্যায্য অধিকার প্রভৃতি দাবি এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কংগ্রেস তথা হিন্দু নেতৃবৃন্দ এই দাবির প্রতি একমত হননি। মুয়ায্যম হুসায়ন খান, *বাংলাপিডিয়া*

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ৩৪০ ধারায় প্রতি দশ বছরে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমীক্ষার জন্য একটি কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এ সময়ের পূর্বেই ব্রিটিশ সরকার খ্যাতনামা ব্রিটিশ আইনজীবী স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ৭ জন সদস্য নিয়ে একটি কমিশন গঠন করে (৮ নভেম্বর, ১৯২৭) যা **'সাইমন কমিশন'** নামে খ্যাত। ১৯৩০ সালে দুই খণ্ডে রির্পোট প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টে দ্বৈত সরকার বিলোপ, প্রদেশের হাতে ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন, ফেডারেল পদ্ধতির কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠন, মুসলিম আসন সংরক্ষণ, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, আইনসভা গঠন, আইন সভার সম্প্রসারণ প্রভৃতির সুপারিশ করা হয়। কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগসহ প্রায় সকল দলই এই কমিশন বয়কট করে। এনায়েতুর রহিম, *বাংলাপিডিয়া*

২৩. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৫

১৯২৭ সালে সৈয়দ আজমাতুল্লাহ ভারতের উর্দুভাষী মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার প্রয়োজন তথা ভাবনা থেকে *দি মুসলমান* পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভারতের তামিলনাড়ুর উপকূলীয় শহর চেন্নাই থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রকাশিত *দি মুসলমান* পত্রিকা বিশ্বের সবচেয়ে পুরানো এবং একমাত্র হাতে লেখা দৈনিক সংবাদপত্র।

https://bn.wikipedia.org/wiki/দ্যা মুসলমান (সংবাদপত্র)

২৫. 'আঞ্জুমানে ইসলামীয়া' নামে সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠন বাংলার ও ভারতের অনেক সদর ও মফস্বলে স্থাপিত হয়। তার মধ্যে ময়মনসিংহের 'আঞ্জুমানে ইসলামিয়া' (১৮৭৫) প্রাচীনতম। ১৮৮৮ সালে ঢাকার 'আঞ্জুমানে ইসলামিয়া' স্থাপিত হয়। সৈয়দ আবদুল বারি আঞ্জুমানের সভাপতি এবং শেখ হেদায়েত সম্পাদক ছিলেন। ঢাকার আঞ্জুমান কংগ্রেসের সমর্থক ছিল। ঢাকার আঞ্জুমানের ভূমিকা সে সময়ের পটভূমিতে মুক্ত ও উদার হিসেবে বিবেচিত হয়। এর মাধ্যমে সমাজের একটি অংশ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে যার কারণে ভারত তথা বাংলার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার মুসলিম সভা-সমিতির ইতিহাস (১৮৫৫-১৯৪৭)*, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৮৮

২৬. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬
২৭. মিজানুর রহমান, *আবুল মনসুর আহমদের চিন্তাধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০০৮, পৃ. ৩১-৩২
২৮. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৮
২৯. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ৬৬
৩০. **আব্দুল হালিম গজনবী (১৮৭৬-১৯৫৩)** টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ারের প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক এবং স্বদেশি শিল্পের উদ্যোক্তা। তিনি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমানদের সংগঠিত করেন। কংগ্রেসের সমর্থক হলেও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের বিভক্তিকরণ হলে জীবনের বাকী সময় নির্দলীয় উদারপন্থি হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। মুহাম্মদ আবদুস সালাম, *বাংলাপিডিয়া*
৩১. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬
৩২. **খান বাহাদুর আবদুল মোমেন (১৮৭৬-১৯৪৬)** বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৭ সালে সিভিল সার্ভিসে সাব ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু। ১৯২৯ সালে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠিত হলে সভাপতির সাহায্যকারী পাঁচজন সহ সভাপতির একজন এবং পরবর্তীতে সভাপতি নির্বাচিত হন। মূলত ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার ও কৃষক রাজনীতির জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাপিডিয়া*
৩৩. সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬
৩৪. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০, ৮৫-৮৬
৩৫. মুহম্মদ আবদুর রহিম, আবদুল মমিন চৌধুরী, এ.বি.এম মাহমুদ, সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৪৩০
৩৬. ইমরান মাহফুজ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫
৩৭. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh, Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987 p.79-81
৩৮. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯
৩৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪-১১৬
৪০. সিরাজ উদ্‌দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০-১৩৬
৪১. **সিমলা ডেপুটেশন** : আগা খাঁর নেতৃত্বে এই ডেপুটেশনে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনে স্থানীয় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সকল কাউন্সিলে মুসলমান প্রতিনিধিগণ মুসলমানদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার দাবি উপস্থাপন করেন যা 'সিমলা ডেপুটেশন' নামে পরিচিত। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *আবুল কালাম শামসুদ্দীন রচনাবলী, প্রথম খন্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৬০৫-৬০৯

ভারত সচিব জন মর্লি ও বড় লাট লর্ড মিন্টোর নামানুসারে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে একজন ভারতীয় সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিধান রাখা হয় এবং এ পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। আরিফা সুলতানা, *বাংলাপিডিয়া*

১৯১৯ সালে ভারত সচিব মন্টেগু ও ভাইসরয় চেমসফোর্ডের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত শাসন আইন' পাশ হয় যা 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনতান্ত্রিক সংস্কার' নামে পরিচিত। এই সংস্কার কেন্দ্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ও প্রদেশে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ ও বাণিজ্য, যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্রের অধীন এবং আইন শৃঙ্খলা, শিক্ষা, ভূমি, রাজস্ব, কৃষি, সেচ, পূর্ত, বন, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়কে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যাস্ত করা হয়। এই আইনে কেন্দ্র এবং প্রদেশে দ্বৈত শাসনের ব্যবস্থা করা হয়। মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয় এবং আসনসংখ্যা বাড়ানো হয়। বঙ্গীয় আইন সভায় ১৩৯ জন সদস্য নিয়ে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা রাখা হয়। মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৬৫-১৬৭

'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ-১৯৩২' ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন এবং প্রদেশ গুলোতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণের প্রতিনিধিত্বের বিষয় নিয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩২ সালের ১৭ আগস্ট যে সাময়িক সিদ্ধান্ত সমূহ ঘোষণা করেন তাই "সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ" নামে খ্যাত। এ আইনের দ্বারা মুসলমান, শিখ, ভারতীয়, খ্রিস্টান, এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আইন সভায় পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। অতুল চন্দ্র রায়, প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভারতের ইতিহাস*, মৌলিক লাইব্রেরি, কলিকাতা, ২০০০, পৃ. ৪৯৬
৪২. K.B. Sayeed, *The Political System of Pakistan,* Oxford University Press, London, 1967, p. 33

১৯৩০ সালে এলাহাবাদ মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বিশিষ্ট উর্দু কবি ও পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা **স্যার আল্লামা ইকবাল** বলেন যে, ভারতের হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব স্থায়ীভাবে সমাধানের সর্বপ্রথম উপায় হল মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা। তিনি আরও বলেন যে, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানকে একত্রিত করে একটি রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বা এর বাইরে উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা এ অঞ্চলের মুসলমানদের চূড়ান্ত ভাগ্য বলে মনে করেন। K.B. Sayeed, *ibid,* p. 33
৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ভারতের মুসলমানদের জন্য আল্লামা ইকবাল ও চৌধুরী রহমত আলীর প্রস্তাবিত রাষ্ট্র সৃষ্টির পরিকল্পনায় বাংলার কথা নেই, যদিও বাংলা প্রদেশে তৎকালীন সময়ে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তাদের এ পরিকল্পনা থেকে অবাঙালি মুসলিম চিন্তাবিদদের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। K.B. Sayeed, *ibid*, p. 33. Muzaffer Ahmed Chaudhuri, *Government and Politics in Pakistan*, Puthighar Ltd. Kolkata, p. 57-91

৪৪. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৪৭)*, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৪৯-১৫০

৪৫. মিজানুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২

৪৬. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২

‘ভারত ছাড় আন্দোলন’ (Quit India Movement) ছিল আইন অমান্য আন্দোলন। ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা চালিত হয়েছিল। এ আন্দোলনে তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। ‘ভারত ছাড় আন্দোলন’ই পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। যার সফল পরিণতি ঘটে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের মধ্যে দিয়ে। হোসেন উদ্‌দীন হোসেন, *বাংলার বিদ্রোহ (৬০০-১৯৪৭)*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৩১-৪৩৩

৪৭. মুহম্মদ আবদুর রহিম, আবদুল মমিন চৌধুরী, এ.বি.এম মাহমুদ, সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৬-৪৪২

৪৮. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬

৪৯. মো. চেঙ্গীশ খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

৫০. বিমলানন্দ শাসমল, *ভারত কী করে ভাগ হলো*, ইউনিভার্সাল বুক সাপ্লাই, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৫৬-১৬০

৫১. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮-১৪৯

৫২. আবুল মনসুর আহমদ এর সম্পাদনায় ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় *দৈনিক কৃষক*। এই পত্রিকার মাধ্যমে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার বিভিন্ন কার্যক্রমের সমালোচনা করা হত। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮-১৪৯

৫৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮-১৪৯

৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪-১৮৫

৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬-১৮৭

৫৬. মো. চেঙ্গীশ খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১

৫৭. রফিকুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪, ১৭৬

৫৮. *দৈনিক ইত্তেহাদ* ১৯৪৭ সালের ১৭ জানুয়ারি প্রথম প্রকাশিত হয় যার সম্পাদক ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। এটি মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারণা চালাতো। তাছাড়া মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার সাথে সাথে মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করার জন্যও প্রচার করতো। বিশেষ করে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর (১৮৯২-১৯৬৩) রাজনৈতিক কার্যক্রম নিয়ে খবর প্রচারিত হত। *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকা ১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭২, ৩৮৬

৫৯. মিজানুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২

৬০. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১

৬১. আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৭৭-৭৮

৬২. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯

৬৩. আবুল মনসুর আহমদ আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান এবং কার্যক্রম সম্পর্কে তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এভাবে, “... সক্রিয় রাজনীতি হইতে কিছুদিন দুরে থাকিয়া অখণ্ড মনোযোগে ওকালতি করিব। শুরুও করিয়াছিলাম সেইভাবে। কিন্তু কপাল দোষে তা হইয়া উঠিল না। ঢেকি স্বর্গে গেলেও ভাড়া বানে। আমারও হইল তাই। মওলানা ভাসানী ও শহীদ সাহেব কয়েক দিনের মধ্যেই ময়মনসিংহ আসিয়া আওয়ামী লীগ মহকুমা কমিটি করিলেন আমাকে তার সভাপতির দায়িত্ব গছাইলেন। বগা ফাঁদে পড়িল।” *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১

৬৪. মিজানুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২-৩১৩

৬৫. আবুল কাশেম ফজলুল হক, *মুক্তিসংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৯

৬৬. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫-৪০

‘তমদ্দুন মজলিস’ ১৯৪৭ সালে গঠিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। শুরু থেকেই এই প্রতিষ্ঠান তদানীন্তন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে তাদের মতামত দেওয়া শুরু করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর এই সংগঠন প্রচার করে ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা-না উর্দু’ নামক একটি পুস্তিকা। পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে অসামান্য ভূমিকা পালন করে ‘তমদ্দুন মজলিস’। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৮ এপ্রিল ২০১৬

৬৭. আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

৬৮. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮-২৫২

৬৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১

৭০. ইমরান মাহফুজ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৬

৭১. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২

৭২. *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ৩ এপ্রিল ১৯৫৪

৭৩. ইমরান মাহফুজ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১
৭৪. মিজানুর রহমান, *আবুল মনসুর আহমদের চিন্তাধারা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১০-৩১৩
৭৫. ইমরান মাহফুজ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১
৭৬. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১
৭৭. মিজানুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৩
৭৮. রফিকুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২৯-৭৮০
৭৯. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫০-৪৫১
৮০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮২
৮১. ইমরান মাহফুজ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৪
৮২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৪-২৬৫

৩.৩ শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫)

আওয়ামী লীগের পথিকৃৎ রাজনীতিবিদ শামসুল হক ১৯১৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বর্তমান টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার এলাসিন ইউনিয়নের শাকইজোড়া গ্রামের মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।[১] নিজ গ্রাম মাইঠান টেউরিয়া। তার পিতার নাম দবির উদ্দিন সরকার, মাতা শরিফুন্নেছা।[২] মুসলিম শিশুদের জন্য তৎকালীন সময়ে প্রচলিত শিক্ষার অংশ হিসেবে নিজ গ্রামের মসজিদ মাদ্রাসায় বাল্যশিক্ষা গ্রহণ করেন শামসুল হক। এরপর তার নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করে এলাসিন স্বর্ণময়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।[৩] এই বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে কিশোর বয়সেই সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। পরবর্তীতে সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখান থেকেই শামসুল হকের জীবনে রাজনৈতিক সচেতনতা ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম শুরু হয়। সাংগঠনিক দক্ষতা আর বক্তৃতার জন্য শামসুল হক স্কুল জীবনেই ব্যাপক জনপ্রিয় ও পরিচিত হয়ে উঠেন।[৪]

শামসুল হক স্কুল জীবনেই মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) নেতৃত্বে গড়ে ওঠা স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তিনি চরকায় সুতা কেটে কাপড় বানিয়ে পরতেন।[৫] জাহ্নবী স্কুলে অধ্যয়নকালীন তার মধ্যে নেতৃত্বগুণের বিকাশ ঘটে। শামসুল হক ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগের সদস্য হন।[৬] ১৯৩৮ সালে জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগ লাভ করে প্রবেশিকা (ম্যাট্রিকুলেশন) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'বঙ্গের আলীগড়' খ্যাত করটিয়ায় অবস্থিত সা'দত কলেজে (প্রতিষ্ঠিত ১৯২৬) ভর্তি হন। ছাত্রদের প্রয়োজনে কলেজের ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং ১৯৩৯ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সা'দত কলেজ ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি নির্বাচিত হন।[৭] ১৯৪০ সালে সা'দত কলেজ হতে তিনি প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।[৮] এরপর তিনি রাজনীতির বৃহত্তর অঙ্গনে পা রাখতে জীবনের কঠিন ব্রত নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং ১৯৪৩ সালে বি.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক কর্তৃক 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপনের সময় (২২ মার্চ ১৯৪০) শামসুল হকের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রকৃত অভিষেক ঘটে। তিনি এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী কনিষ্ঠতম কর্মী ছিলেন বলে জানা যায়। ছাত্র নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণের এ সুযোগে তার পরিচয় ঘটে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) ও আবুল হাশিমের (১৯০৫-১৯৭৪) সঙ্গে।[৯] অত:পর মুসলিম লীগের প্রথম সারির প্রাদেশিক নেতা হিসেবে শামসুল হক একনিষ্ঠ সমর্থকে পরিণত হন। পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক নেতা হিসেবে তিনি লাহোর প্রস্তাবানুযায়ী ভারত বিভক্তিকে গণতান্ত্রিক উপায়ে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের বিকল্পহীন পথ বলে মনে করতেন।[১০] মূলত আবুল হাশিমের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই শামসুল হক সরাসরি রাজনীতিতে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি আবুল হাশিমের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন।[১১] আবুল হাশিমের অসাধারণ সাংগঠনিক কর্মকুশলতায় ও ফলপ্রসু পদক্ষেপে বাংলায় মুসলিম লীগের মধ্যে একদল সুশিক্ষিত ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী বাহিনী গড়ে উঠে। ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর আবুল হাশিম এর আমূল সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। আগে নিজ উদ্যোগে প্রথমে তিনি

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় দপ্তর ও স্থায়ী তহবিল পুনর্গঠন করেন, এরপর মাঠ পর্যায়ের সংগঠন পুনর্বিন্যাসে মনোনিবেশ করেন। মাঠ পর্যায়ের সংগঠন গোছাতে উঁচু স্তরের কর্মীর পরিবর্তে সার্বক্ষণিক কর্মী সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেন।[১২]

ঢাকায় অবস্থানকালে আবুল হাশিম পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করে মুসলিম লীগ সংগঠনকে আরও সুদৃঢ় করা এবং ঢাকা জেলা মুসলিম লীগকে খাজা পরিবারের প্রভাবমুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি সুবিধাজনক স্থানে মুসলিম লীগ অফিস ও পার্টি হাউজের জন্য বাড়ি ভাড়া করার নির্দেশ দেন। তার এ নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৪৪ সালের ১ এপ্রিল প্রাদেশিক লীগের শাখা অফিস হিসেবে চক মোগলটুলীর ১৫০ নম্বর ত্রিতল বাড়ির দোতলা ও তিন তলা ভাড়া নেওয়া হয়। দোতলায় অফিস, তিন তলায় কনফারেন্স রুম ও কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা হয়। দলীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে শামসুল হক, শামসুদ্দীন আহমদ (১৯২০-১৯৭১), মোহাম্মদ শওকত আলী (১৯১৮-১৯৭৫) এবং আমীর আলী (১৯২০-১৯৭১) নিয়োজিত হন।[১৩] ঐ সময়ের নেতৃত্ব সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের মূল্যায়ন নিম্নরূপঃ

> "শুধু কর্মী শিবির বা মুসলিম লীগ নয় শহীদ নাজির আহমদ নিহত হওয়ার পর ঢাকায় ছাত্রদের নেতৃত্ব দিতেন জনাব শামসুল হক সাহেব, শামসুদ্দীন আহমেদ প্রমুখ। এরা সকলেই সোহ্‌রাওয়ার্দীর ভক্ত ছিলেন। পরে হাশিম সাহেবেরও ভক্ত হন। মুসলিম লীগকে কোটারি স্বার্থের কবল থেকে মুক্ত করেন। আবুল হাশিমের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ১৫০ মোগলটুলী অফিসের সার্বক্ষণিক কর্মী ছিলেন শামসুল হক। তার ওপরই পুরো ভার বর্তায়। পাকিস্তান আনতে ব্যর্থ হলে লেখাপড়া করে কোনো লাভ হবে না এই প্রত্যয় কর্মীদের মাঝে তৈরি হয়।"[১৪]

আবুল হাশিম তার গঠিত কর্মীবাহিনী দ্বারা পূর্ববাংলায় স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ধারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই অনেকের মাঝ থেকে বিশেষভাবে শামসুল হককে চিহ্নিত করেন। তার নিজের ভাষায়, "শামসুল হক ও শামসুদ্দীন তখন ছাত্র ছিলেন এবং তাদের মধ্যে আমি নেতৃত্বের গুণাবলি লক্ষ্য করে ভালোভাবে তাদের চিহ্নিত করি।"[১৫] আবুল হাশিমের এ উদ্যোগের মাধ্যমে মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে নতুন যুগের সূচনা হয়। এ যুগে শামসুল হক পথনির্দেশকের ভূমিকায় ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ববাংলার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পটভূমি তৈরিতে আবুল হাশিমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কারণ তৎকালীন তরুণ সমাজ তার রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী হয়ে ওঠে। আবুল হাশিমের প্রতিষ্ঠিত কর্মী শিবিরের মূল নেতৃত্বে ছিলেন শামসুল হক। তার নেতৃত্বে এবং শামসুল হকের মত নিঃস্বার্থ ও আত্মত্যাগী কর্মীদের নিয়ে এই কর্মী শিবির ১৯৪৫-৪৬ সালে পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগকে জনসাধারণের গণসংগঠনে পরিণত করে। তাছাড়া মুসলিম লীগ ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে পূর্ববাংলার মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীরা প্রায় সকলেই জয় লাভ করে। একইভাবে ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীরা শতকরা ৯৭ ভাগ আসনে জয়লাভ করেন। উল্লেখ্য তখন একমাত্র বাংলা ছাড়া ভারতের আর কোথাও কোনো প্রদেশে মুসলিম লীগের একক সরকার ছিল না। বাংলায় মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা না থাকলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে

প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন না এবং কংগ্রেসও ভারত বিভাগ মেনে নিতে পারত না। এদিক থেকে বিবেচনা করলে পাকিস্তান সৃষ্টিতে শামসুল হকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল বলা যায়। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রকৃত পটপরিবর্তন শুরু আবুল হাশিম প্রতিষ্ঠিত সার্বক্ষণিক কর্মীবৃন্দের হাতে, কারণ এই প্রগতিশীল কর্মীরাই মুসলিম লীগের মূল আদর্শের বিপক্ষে অবস্থান করে মুসলিম লীগকে জনসংগঠনে পরিণত করেন। এক্ষেত্রে শামসুল হকের ভূমিকা ছিল অগ্রগামী।[১৬] তাছাড়া পাকিস্তান আন্দোলনে শামসুল হকের অবদানের কথা শেখ মুজিবুর রহমান তার *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* উল্লেখ করেন যে,

> "পাকিস্তান আন্দোলনে তার অবদান যারা এখন ক্ষমতায় আছেন, তাদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। বাংলাদেশে যে কয়েকজন কর্মী সর্বস্ব দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলন করেছে তাদের মধ্যে শামসুল হক সাহেবকে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মী বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না। ১৯৪৩ সাল থেকে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানকে জমিদার, নবাবদের দালানের কোঠা থেকে বের করে জনগণের পর্ণকুটিরে যারা নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে শামসুল হক সাহেব ছিলেন অন্যতম। একেই বলে 'কপাল' কারণ সেই পাকিস্তানের জেলেই শামসুল হক সাহেবকে পাগল হতে হলো।"[১৭]

এ বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় শামসুল হক পূর্ব পাকিস্তনের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে অর্থাৎ রাজনীতিকে সর্বজনীন করতে পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে আবুল হাশিমের সকল কার্যক্রমে সক্রিয় ছিলেন। সারা দেশ জুড়ে সভা সমাবেশ করে পাকিস্তান আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার জন্য সদস্যদের কর্মী শিবিরের মূল নেতৃত্বে ছিলেন শামসুল হক।[১৮] পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালীন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করে। শামসুল হক অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি ১৯৪৬ সালের কলকাতা ও নোয়াখালী দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে দাঙ্গা প্রতিরোধে তার নিজ জেলা টাঙ্গাইলে কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে 'শান্তি কমিটি' গঠন করে তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন।[১৯] পূর্ব নজির থাকা সত্ত্বেও ঢাকায় কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি মূলত কর্মী শিবিরের কর্মাধ্যক্ষ শামসুল হক ও ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক শামসুদ্দীন আহমদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও ভূমিকার কারণে। বলা হয় তাদের অসাম্প্রদায়িক নেতৃত্বে চরম উত্তেজনাপূর্ণ এই দাঙ্গার প্রভাব ঢাকায় পড়তে পারেনি।[২০] ১৯৪৮ সালে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন বেশ কয়েকটি সভার বন্দোবস্ত করা হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সকলের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রথম সভা টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত হয়। শামসুল হক টাঙ্গাইলে সভা অনুষ্ঠানের সকল বন্দোবস্ত করেছিলেন।[২১]

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন ভারত বিভক্তির পরিকল্পনা করছিল তখন অখণ্ড স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩), শরৎচন্দ্র বসু (১৮৮৯-১৯৫০), আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আনুষ্ঠানিকভাবে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ঘোষণার পর উদ্যোগ গ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ বাংলায় এর স্বপক্ষে জনমত ও আন্দোলন সংগঠনের জন্য আবুল হাশিম ও তার কর্মী বাহিনীর সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। এ সময় আবুল হাশিম ও তার অনুগামী যুব নেতাদের কলকতায় আসার নির্দেশ দেন। অখণ্ড বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর কলকাতার ৪০ নং থিয়েটার রোডের বাসভবনে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মিলিত

হন।[২২] অখণ্ড স্বাধীন বাংলা আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর শুরু হয় পাকিস্তানের সীমান্ত নির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান প্রশ্ন। সিলেট অঞ্চল পাকিস্তানের না আসামের অন্তর্ভূক্ত হবে সে প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।[২৩] স্বাভাবিকভাবেই কর্মী শিবিরের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। আর এতে শামসুল হক রাখেন প্রধান ভূমিকা।[২৪] শেখ মুজিবুর রহমান সিলেট গণভোটের স্মৃতিচারণ করে বলেন,

> "বিশাল কর্মী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন শামসুল হক স্বয়ং। নির্বাচনে অধিক পরিশ্রমের কারণেই হয়ত উপনির্বাচনে বিজয় লাভ করা স্বত্ত্বেও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে করিমগঞ্জকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করায় শামসুল হক শিশুর মতো কেঁদেছিলেন।"[২৫]

পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি গঠিত হওয়ার পর মুসলিম লীগ সরকার অর্থনৈতিক বৈষম্যসহ বিভিন্ন ধরনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রয়োগ করে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশভাগের কারণে বাস্তুত্যাগী জনসাধারণের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের মাঝেও চলছিল অবস্থান পরিবর্তন এবং নতুন পরিস্থিতিতে সংগঠনে সম্পৃক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।[২৬] দেশ বিভাগ পরবর্তী শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম ভারতে অবস্থান করায় তাদের সমর্থকবৃন্দ হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৯) বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলে উক্ত শূন্য আসন নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তদানিন্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম এবং আকরম-নাজিমুদ্দিন গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট এ কে ফজলুল হক সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকালে বঙ্গীয় প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রত্যক্ষভাবে আবুল হাশিমকে সমর্থন না করায় এবং ১৯৪৭ সালের ৫ আগস্ট পূর্ববাংলা মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি নেতা নির্বাচনে খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে সোহ্‌রাওয়ার্দীকে আবুল হাশিম সক্রিয় সমর্থন না দেওয়াতে কার্যত সোহ্‌রাওয়ার্দী-হাশিম জোট সমর্থকবৃন্দ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েন।[২৭] এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পর কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলে কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্র পূর্ব পাকিস্তানে তাদের পরবর্তী কর্তব্য এবং কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য সমবেত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আতাউর রহমান (১৯০৭-১৯৯১), কাজী মুহাম্মদ ইদ্রিস (১৯০৬-১৯৭৫), শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৭-১৯৭১), আখলাকুর রহমান (১৯২১-১৯৯২) সহ আরও কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী।[২৮] এরপর এসকল রাজনৈতিক কর্মীদের কয়েকজন ঢাকা এসে কামরুদ্দীন আহমেদ (১৯১২-১৯৮২), শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫), শামসুদ্দীন আহমদ (১৯২০-১৯৭১), তাসাদ্দুক আহমদ (১৯২৩-২০০১), মোহাম্মদ তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭), অলি আহাদ (১৯২৮-২০১২) সহ তৎকালীন নেতাকর্মীদের সাথে প্রাথমিক যোগাযোগ স্থাপন করেন।[২৯] রাজনীতিবিদদের মধ্যে মতবিরোধ, সঠিক দিক নির্দেশনার অভাব ও বিরাজমান দ্বিধাবিভক্তি এবং ঐক্য প্রচেষ্টায় কর্মীদের স্থিমিত সাহস ও উদ্যম পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে তরুণ নেতা শামসুল হক ১৫০ মোগলটুলীতে (ঢাকা) কর্মীসভা আহবান করে ১৯৪৭ এর পর বিভাগোত্তর রাজনীতিতে ভূমিকা নির্ধারণকল্পে যুব সম্মেলন প্রস্তাব করেন। কফিলউদ্দীন চৌধুরীকে (১৮৯৮-১৯৭২) সভাপতি ও শামসুল হককে সম্পাদক নিয়োগ করে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। দেশবিভাগ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির এই দ্বিধা বিভক্ত পর্যায়ে শামসুল হক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভারত বিভাগ পরবর্তী

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে তরুণ নেতা শামসুল হক স্বীয় রাজনৈতিক দক্ষতায় নেতা কর্মীদের মুসলিম লীগ ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী করে তোলেন। খান সাহেব আবুল হাসনাতের (ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান) ঢাকার বেচারাম দেউড়ীস্থ বাসভবনের খাস কামরায় ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর মহা উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শামসুল হক ৭ সেপ্টেম্বর সকাল ৯-৩০ মিনিটে শুরু হওয়া সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে আধ ঘণ্টা বক্তৃতা করেন।[৩০] কর্মী সম্মেলনের গণ-দাবির সনদের ভূমিকায় শামসুল হক বলেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন, তিনি তার কাজ করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যুবকদেরই সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলতে হবে। শামসুল হক এ কর্মী সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন যে, “এমন একটি কর্মপন্থা স্থির করা, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের সকল হিন্দু-মুসলমান যুবক বর্তমান অবস্থায় তাদের কর্তব্য বুঝে আজাদ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সুখী, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধশালী আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে অগ্রসর হতে পারেন।”[৩১] তাছাড়া তিনি সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক যুব প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি তৈরি এবং দেশব্যাপী এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করা। আর এ উদ্দেশ্যেই যুব সংগঠনের ইশতেহার রচনা করা হয়েছে। ইশতেহারে বলা হয়েছে যে, নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সাহায্য করার জন্য দেশে বহু যুব প্রতিষ্ঠান স্বভাবতই গড়ে উঠবে কিন্তু সকল যুব শক্তির মিলন না ঘটলে কোন বৃহৎ কাজই করা সম্ভব হবে না।[৩২]

১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত এ কর্মী সম্মেলনে একটি স্বতন্ত্র যুব প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সেই অনুসারে শামসুল হককে সভাপতি এবং মোহাম্মদ তোয়াহা-কে সম্পাদক করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট ‘পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ এর পূর্ব পাকিস্তান সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।[৩৩] প্রতিষ্ঠার পরপরই ঢাকা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন জেলায় এর শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৩৪] মূলত পূর্ব পাকিস্তানের যুবসমাজকে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ ও পরিচিতি প্রদানে শামসুল হক পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠন করেন। এ কর্মী সম্মেলনের পর ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ ১৯৪৮ এর মধ্যে কলকাতায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[৩৫] গণতান্ত্রিক যুবলীগের পক্ষে শামসুল হক, আবদুর রহমান চৌধুরী (১৯২৬-২০০৪), শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৭-১৯৭১), লিলি খান (১৯২৭-২০০৪), লায়লা আরজুমান্দ বানু (১৯২৯-১৯৯৫) উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন।[৩৬] উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গঠিত হলেও গণতান্ত্রিক যুবলীগ বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম সংগঠন ছিল ‘গণতান্ত্রিক যুবলীগ’। শত নির্যাতন ও প্রতিকূলতার মধ্যে শামসুল হকের নেতৃত্বে গড়ে উঠা গণতান্ত্রিক যুবলীগই একমাত্র সংগঠন যার পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ শুরু হয়। তাই তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হিসেবে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এ সংগঠনটি স্থায়ী রূপ লাভ করতে পারেনি।[৩৭]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যে রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি হয় তাকে কোনভাবেই সুষ্ঠু বা সুস্থ বলা যায় না। প্রাদেশিক রাজনীতির দুই প্রধান নেতা সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম ভারতে অবস্থান করায় এবং শামসুল হকসহ প্রধান মুসলিম লীগ সংগঠকদের বহিস্কার করায় রাজনীতির ভারসাম্য একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে

বঞ্চিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শামসুল হকের নেতৃত্বে পুরানো ঢাকার ১৫০ মোগলটুলী অফিসকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হতে থাকে।[৩৮] শামসুল হকের নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল অংশ সর্বদাই দলীয় সংহতি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট থাকলেও কায়েমী স্বার্থপর নেতৃবৃন্দ নেতৃত্ব হারানোর শঙ্কা থেকে তাদেরকে ভালভাবে গ্রহণ করেনি।[৩৯] ফলে ত্যাগী কর্মীদের হারিয়ে দলটি (মুসলিম লীগ) জনবিরোধী সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। তার প্রাথমিক ফল ছিল টাঙ্গাইলে উপনির্বাচনে তাদের পরাজয় যা তাদের জন্য গণজবাব হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।[৪০] ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় পরিষদের সর্বশেষ নির্বাচনে বিজয়ী খুররম খান পন্নীর (১৯২১-১৯৯৭) আসন শূন্য ঘোষিত হলে আসাম প্রদেশ মুসলিম লীগের প্রাক্তন সভাপতি মওলানা ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল দক্ষিণ (মুসলিম) কেন্দ্র থেকে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নী এবং আরও দুইজন প্রার্থীকে পরাজিত করেন।[৪১] নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী জমিদার খুররম খান পন্নী ভোট কারচুপির অভিযোগ এনে ভাসানীর নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করার জন্য আবেদন জানান। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক গভর্নর উপরোক্ত নির্বাচন বাতিল করে দেয়। নির্বাচনে ব্যয়ের হিসাব দাখিল না করার অপরাধে মওলানা ভাসানী, খুররম খান পন্নীসহ চারজনের ওপর ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সকল নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।[৪২] (অবশ্য নিষেধাজ্ঞার মেয়াদের প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর এবং আবুল মকসুদ ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বলবৎ করার কথা উল্লেখ করেছেন।)[৪৩] ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইল দক্ষিণ (মুসলিম) কেন্দ্রে প্রাদেশিক সরকার নতুন করে আবার নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। এই খবর শোনার পর ১৫০ মোগলটুলীতে খোন্দকার মোশতাক আহমদ (১৯১৮-১৯৯৬), নবাবজাদা হাসান আলী (১৯১০-১৯৮১), কামরুদ্দীন আহমদ (১৯১২-১৯৮২), এবং শওকত আলীসহ (১৯১৮-১৯৭৫) ওয়ার্কার্স ক্যাম্প কর্মীরা মিলে শামসুল হককে মুসলিম লীগ বিরোধী প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৪৪] এরপর অন্য সকলেই মোটামুটিভাবে এ ব্যাপারে একমত হন তবু নির্বাচনের ব্যাপারে সাবধান হওয়ার জন্য নারায়নগঞ্জের খান সাহেব ওসমান আলীর (১৯০০-১৯৭১) বাসায় এক বৈঠকে শওকত আলী, সামসুজ্জোহা (১৯৩৪-১৯৬৯) সহ ১৫০ মোগলটুলীর সার্বক্ষণিক নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মী স্থির করেন যে, মুসলিম লীগ যদি শামসুল হককে মনোনয়ন দেয় তাহলে তাকে সমর্থন না করে অন্য একজনকে তার পরিবর্তে দাঁড় করিয়ে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধাচরণ করবেন।[৪৫] এ ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য ছিল যে, তিনিসহ অন্যান্য নেতৃত্ব শামসুল হককে অনুরোধ করবেন মুসলিম লীগের প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। শামসুল হক শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন কিন্তু তখন আর্থিক সমস্যা ছিল মূল বিবেচনার বিষয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শামসুল হক টাঙ্গাইল চলে যান এবং শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মিলে টাকা জোগাড় করার চেষ্টা শুরু করেন। শেখ মুজিব এ সময় শামসুল হক সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছিলেন যে, শামসুল হকের অর্থকষ্ট আছে কিন্তু তিনি ছিলেন একজন নি:স্বার্থ ও ত্যাগী কর্মী। তার আদর্শ ও কর্ম দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তাছাড়া শামসুল হক বক্তৃতাদানে পটু ছিলেন।[৪৬]

শেষ পর্যন্ত শামসুল হকই মুসলিম লীগ বিরোধী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়ন দেন খুররম খান পন্নীকে।[৪৭] ১৯৪৯ সালের ২৬ এপ্রিল টাঙ্গাইল-এ পূর্ববাংলার প্রথম

উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখনো আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়নি। একজন ছাত্রনেতা এবং গণতান্ত্রিক যুবলীগের নেতার পরিচিতি নিয়ে শামসুল হক নির্বাচনে প্রার্থীতা করেন। নির্বাচনে জমিদারির বিশাল প্রভাব, আর্থিক ক্ষমতা এবং মুসলিম লীগের ব্যাপক সমন্বিত শক্তির বিরুদ্ধে আর্থিকভাবে সংগতিহীন কিন্তু প্রতিবাদী কর্মী শামসুল হক।[৪৮] এ নির্বাচনে ঢাকা থেকেও ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের খোন্দকার মোশতাক আহমদ, কামরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ আউয়াল, শওকত আলী, আজিজ আহমদ, সামসুজ্জোহা প্রমুখ নেতা টাঙ্গাইল গিয়েছিলেন।[৪৯] মুসলিম লীগের মন্ত্রী ও এম এল এ মণ্ডলী টাকা-পয়সা, গাড়ী ও সব লোকবল নিয়ে টাঙ্গাইলে উপস্থিত হয়েছিলেন। মুসলিম লীগ প্রার্থী করটিয়ার বিখ্যাত জমিদার খুররম খান পন্নী, অধিকাংশ ভোটার তার প্রজা। সরকারি ক্ষমতা আর অর্থবল ছিল তার মূল শক্তি। শামসুল হক নি:স্বার্থ ত্যাগী কর্মী, যিনি আদর্শবাদী ও ব্যাপক পরিচিতির অধিকারী। টাঙ্গাইলের তিনটি থানা (নাগরপুর, মির্জাপুর ও বাসাইল) নিয়ে নির্বাচনী এলাকা নির্ধারিত হয়।[৫০] জমিদারি প্রভাব এবং সরকারি প্রভাবের সামনে একজন কৃষক সন্তানের পক্ষে বিজয় অর্জন করা অকল্পনীয় ছিল। এই নির্বাচনের সময় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৯), সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী (১৯০৫-১৯৭১) এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন (১৮৯৩-১৯৭৪), জমিদার খুররম খান পন্নীর পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালান। তারা শুধু আবেদন-নিবেদন করেই ক্ষান্ত হননি, মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনসহ ছয়জন মন্ত্রী টাঙ্গাইলে অবস্থান করেন। নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য দশ হাজার মণ চাল বিতরণসহ ব্যাপক অর্থ বিনিয়োগ করেন।[৫১] 'টাঙ্গাইল উপনির্বাচন' নামে একটি সম্পাদকীয়তে *দৈনিক আজাদ* নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, এই উপনির্বাচনে দুইজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। খুররম খান পন্নী মুসলিম লীগের মনোনয়ন লাভ করেছিলেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী শামসুল হক দুই বৎসর আগে তদানিন্তন প্রাদেশিক লীগ সেক্রেটারি আবুল হাশিমের অনুসারী হিসেবে লীগের প্রচারকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে আশা করেছিল যে, লীগকর্মী হিসেবে শামসুল হক লীগ মনোনীত প্রার্থী খুররম খান পন্নীর অনুকূলে নির্বাচন দ্বন্দ্ব হতে সরে দাড়াবেন। কিন্তু শামসুল হক মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং লীগ মনোনয়ন অগ্রাহ্য করে লীগের প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীদের কাছে অভাবনীয় ছিল যে, মুসলিম লীগের কর্মী হিসেবে শামসুল হক দলীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে নিজে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।[৫২]

মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং *দৈনিক আজাদ* পত্রিকা শামসুল হক সম্পর্কে বিভিন্ন রকম অসাধু মন্তব্য করতে থাকে।[৫৩] টাঙ্গাইলের সকল স্তরের জনগণ তার পক্ষে কাজ করেছিলেন। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ খুররম খানের বিরুদ্ধে শামসুল হক স্বতন্ত্র প্রার্থী রূপে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ঘোষণা করার পর মুসলিম লীগ সরকারের বিরোধী মহলে সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই শামসুল হককে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। এ ব্যাপারে ১৫০ মোগলটুলির পার্টি হাউজকে কেন্দ্র করে যে কর্মীদল তখনো পর্যন্ত মোটামুটি একত্রিত ছিলেন তারাই সব থেকে সংগঠিত এবং ব্যাপকভাবে শামসুল হকের পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। মোশতাক আহমদ ছিলেন এই নির্বাচনের মূল সংগঠক।[৫৪] সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের পক্ষ থেকে শামসুল হকের নির্বাচনের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। নির্বাচনের সাত আট দিন বাকী থাকতেই পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে এক টাকা, দুই টাকা, পাঁচ টাকা,

দশ টাকা করে সাহায্য আসতে থাকে। এমনকি অনেক নারী নিজের কানের গহনা, হাতের চুড়ি, প্রভৃতি পাঠাতে শুরু করে। সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণীয় ঘটনা ঘটে এ নির্বাচনে কারণ খুররম খান পন্নীর স্ত্রী শামসুল হকের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন। তিনি স্ব-উদ্যোগে জমিদারের বিপক্ষে এবং শামসুল হকের পক্ষে এক প্রচারপত্র বিতরণ করেছিলেন।[৫৫] শামসুল হকের নির্বাচনে যে বিশাল কর্মী বাহিনী গড়ে উঠেছিল তারা দিনরাত পরিশ্রম করে প্রচারণা চালাত যা খুররম খান পন্নীর একার পক্ষে অসম্ভব ছিল।[৫৬]

প্রজাপ্রিয় জমিদার পরিবারের সন্তান খুররম খান পন্নী ছিলেন ভদ্রলোক, প্রজা নিপীড়নের কোন অভিযোগ তার নামে কেউ দিতে পারেননি। শামসুল হক তার বিরুদ্ধে বিবেচনার যোগ্য প্রার্থী হিসেবে প্রথম দিকে কেউ গণ্য করেননি। খুররম খান পন্নী তার নির্বাচনের জন্য মাইক নিয়ে এসেছিলেন। টাঙ্গাইল অঞ্চলে এটাই মাইকের প্রথম ব্যবহার। টাঙ্গাইল জেলার করোটিয়াতে অবস্থিত সা'দত কলেজের সেই জনসভায় সহস্র মানুষের সমাগম হয়েছিল। জমিদার সাহেবের কথা শেষ হওয়ার পর শামসুল হক মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান। খুররম খান পন্নীকে তার পরিচয় দিয়ে ভোট প্রার্থনার সুযোগ চান। জমিদার ভদ্রলোক না করতে পারলেন না। তারপর শামসুল হক সেখানে বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তব্যে খুররম খান পন্নী ও তার পরিবারের প্রশংসা করেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। শামসুল হক প্রণতচিত্তে বলেন, তার নির্বাচন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয় বরং দলীয় অনাচারের প্রতিবাদে। এসময় শামসুল হক উল্লেখ করেন তিনিও পাকিস্তান সৃষ্টিতে মুসলিম লীগকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার বক্তব্যে মুসলিম লীগ সরকারের সকল প্রকার দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধ করে বাঙালির ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য তাকে ভোট দেওয়ার অনুরোধ করেন।[৫৭] শামসুল হকের বক্তব্য শোনার পর সভার লোকজন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার শপথ নেয়। তারা মুসলিম লীগ প্রার্থী খুররম খান পন্নীকে ভোট না দিয়ে তাকে ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।[৫৮]

শামসুল হক নির্বাচনী প্রচারণার জন্য যেখানেই যেতেন সেখানেই প্রচুর লোকের সমাবেশ হতো। এমনও অনেক সময় দেখা গেছে শামসুল হক নির্বাচনী প্রচার কাজ শেষ করে ফিরছেন, দেখা গেল শত-শত লোক হারিকেন ও কুপি হাতে রাস্তার ধারে বসে আছে শামসুল হককে দেখার জন্য। শামসুল হকের প্রতি এলাকার জনগণের ছিল অত্যন্ত দরদ কারণ তিনি দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান হওয়ায় তার অবস্থান সর্বসাধারণের মত ছিল। তৎকালীন রাজনীতি তথা মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সাধারণ জনগণের অবস্থান না থাকায় শামসুল হককে সবাই পছন্দ করে। তার প্রতি জনসাধারণের অগাধ ভালবাসা ছিল বলেই সরকারি দলের সকল প্রকার অপপ্রচার ও ভয়ভীতি উপেক্ষা করে টাঙ্গাইলবাসী ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে শামসুল হককে বিজয়ী করে।[৫৯] নির্বাচনে পরাজিত শক্তি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মোহন মিয়া (১৯০৫-১৯৭১), শাহ আজিজুর রহমান (১৯২৫-১৯৮৭) ও তার সঙ্গীদের ওপর হামলার কল্পিত অভিযোগ উপস্থাপন করে হুকুমের আসামী করে শাসমুল হক, বদিউজ্জামানসহ কয়েক জনকে ১৯৪৯ সালের মে মাসে গ্রেফতার করা হয়। এই মামলা কয়েক বছর ধরে চলে এবং শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের আপসের মাধ্যমে মামলাটি নিস্পত্তি হয়।[৬০]

১৯৪৯ সালের ২৬ এপ্রিলের নির্বাচনে খুররম খান পন্নীর পরাজয় শুধু তার নিজের পরাজয় ছিল না বরং পরাজয় ছিল মুসলিম লীগ মন্ত্রিপরিষদের। তবে নির্বাচনে শামসুল হকের বিজয় ছিল মুসলীম লীগ বিরোধী প্রগতিশীল শক্তির।

টাঙ্গাইলের উপনির্বাচন এদেশের নিপীড়িত, শোষিত বঞ্চিত মানুষ যেমন একদিকে নিজেদের আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছিল, অন্যদিকে মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষে তাদের দুর্বলতাও ধরা পড়েছিল। এ বিজয় সম্পর্কে মুসলিম লীগ সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা *দৈনিক আজাদের* সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে লীগ মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন। এটা মুসলিম লীগ নির্বাচনের ইতিহাসে এক অভিনব এবং অকল্পনীয় বিষয়। কোন সাধারণ নির্বাচনের সময় জয়-পরাজয় যতটা গুরুত্ব বহন করে তার চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এই উপনির্বাচন। ভারত বিভাগপূর্ব ও পরবর্তী নির্বাচনের ইতিহাসে এই প্রথম মুসলিম লীগ প্রার্থী পরাজিত হয়। তৎকালীন জাতীর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং জাতির একমাত্র বহু কৃতিত্বপূর্ণ মুসলিম লীগের জন্য পরাজিত হওয়ার কলঙ্ক অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান মর্মান্তিক ঘটনা হিসেবে চরম বেদনা এবং ক্ষোভের বিষয় হয়ে থাকলো।

টাঙ্গাইলের উপনির্বাচন নিয়ে তৎকালীন প্রচলিত পত্রিকা *দৈনিক আজাদ*, *দৈনিক সৈনিক*সহ অন্যান্য পত্রিকা বিভিন্ন মতামত সম্বলিত প্রবন্ধ ও সাময়িকী প্রকাশ করে।[৬১] শামসুল হকের বিজয়কে কেন্দ্র করে শুধু টাঙ্গাইলে নয়, ঢাকায়ও বিজয় উৎসব করা হয়। ঢাকায় বিরাট শোভাযাত্রা করে তাকে নিয়ে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করা হয়। ১৯৪৯ সালের ৮ মে পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ কর্মী শিবির নবনির্বাচিত পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ সদস্য জননেতা শামসুল হককে ঢাকা নগরবাসীর পক্ষ হতে ভিক্টোরিয়া পার্কে প্রাণঢালা গণসংবর্ধনা জ্ঞাপন করে।[৬২] ঢাকা ছাড়াও তার নিজ গ্রাম টেউরিয়ায় তাকে ব্যাপক সংবর্ধনা দেওয়া হয়।[৬৩] সংবর্ধনা সভায় শামসুল হক দীর্ঘ সময় বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তব্যে মুসলিম লীগ সরকারের সকল প্রকার বৈষম্যমূলক শাসনের বিষয় তুলে ধরেন। সংবর্ধনা সভায় শপথ নিয়ে তিনি বলেন, শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের দাবি আইন পরিষদে তুলে ধরাই তার প্রধান দায়িত্ব। তিনি আরো বলেন যে, "আমি বিশ্বাস করি এ ব্যাপারে আমার কণ্ঠে শক্তির অভাব হবে না।" শামসুল হক বক্তৃতার উপসংহারে বলেন যে, "দেশে আজ যে সমস্যার পাহাড় জমে ওঠেছে তার কোনটা থেকে কোনটা বিচ্ছিন্ন নয়। এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে।"[৬৪] শামসুল হক তার বক্তব্যে এখানে পাকিস্তানি মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হলে নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। আর সেই রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই বাংলার মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে।[৬৫] ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে শামসুল হকের বিজয় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। তাছাড়া টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক রাজনীতি নতুন পথে চালিত হয় এবং শামসুল হক অত্র অঞ্চলে আঞ্চলিক রাজনীতির চালিকা হিসেবে আবির্ভূত হন। তার নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় রাজনীতি কেবলমাত্র উচ্চবংশ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য নয়। তিনিই রাজনীতিকে সর্ব সধারণের মাঝে পৌঁছে দেন যা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য পটপরিবর্তন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী শামসুল হকের বিজয়ে বলেছিলেন যে, টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে শামসুল হকের বিজয়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়েছে এবং এখান থেকেই তারা নতুন

করে রাজনৈতিক পথ চলা শুরু করার আশা করেন।[৬৬] *লন্ডন ডেইলি* পত্রিকায় বলা হয় যে, এটা শুধুমাত্র শামসুল হকের বিজয়ই ছিল না বরং এটা বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে বড় রকমের হুমকি ছিল।[৬৭]

টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও শামসুল হককে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভায় আসন গ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি।[৬৮] একটি নির্বাচনী ইশতেহারকে ভিত্তি করে শামসুল হকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগে বলা হয় আসাম জেলে অন্তরীণ মওলানা ভাসানীর স্বাক্ষর জাল করে নির্বাচনী ইস্তেহার বিলি করা হয়েছে। এই মামলাটি ১৯৫০ সাল পর্যন্ত চলে এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ট্রাইব্যুনালে শামসুল হকের পক্ষে এ মামলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ঢাকা আসেন। মামলার রায়ে শামসুল হকের নির্বাচনকে ট্রাইব্যুনাল বাতিল ঘোষণা করেন।[৬৯] মামলা নিস্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও শামসুল হককে আইন সভায় বসতে দেওয়া হয়নি।[৭০] এ নির্বাচনের ফল থেকেই মুসলিম লীগ বিরোধী শক্তি শামসুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়।[৭১] প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর পূর্ববাংলার ৩৪ টি আসনে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগ পর্যন্ত নূরুল আমীন সরকার পরাজিত হওয়ার ভয়ে কোন উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেনি।[৭২]

নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্বকে অবহেলা করতে শুরু করে। এ পরিস্থিতি সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিগ লীগের সাংগঠনিক কার্যে অংশগ্রহণে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের উদ্দেশ্যে শামসুল হক, কামরুদ্দীন আহমেদ, শেখ মুজিবুর রহমান, মোশতাক আহমেদ প্রমুখ নেতা যৌথভাবে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা শহরের পুরাতন মুসলিম লীগ কর্মীদের একটি সম্মেলন আহবান করেন।[৭৩] ‘ওয়ার্কার্স ক্যাম্প’ নামে অভিহিত এই সম্মেলন মুসলিম লীগের সাবেক অফিস ১৫০ মোগলটুলীতে অনুষ্ঠিত হয়।[৭৪] ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের সকল কর্মীই অবিভক্ত বাংলার শহীদ-হাশিম বামপন্থি উপদলের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন এবং তাদের ভয়ে আকরম খাঁ, খাজা নাজিমুদ্দিন, নূরুল আমীন প্রমুখ দক্ষিণপন্থি উপদলীয় নেতারা শঙ্কিত থাকতেন।[৭৫] আতাউর রহমান খান (১৯০৭-১৯৯১), শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও খোন্দকার মোশতাক আহমেদ সমবায়ে গঠিত এক প্রতিনিধি দল মওলানা আকরম খাঁর সাথে দেখা করে মুসলিম লীগ সদস্য হওয়ার রশিদ বই চেয়ে ব্যর্থ হন।[৭৬] পরবর্তীতে আতাউর রহমান খান ও আনোয়ারা খাতুন (১৯১৯-১৯৮৮) করাচি গিয়ে মুসলিম লীগ সংগঠক চৌধুরী খালিকুজ্জামানের (১৮৮৯-১৯৭৩) সাথে দেখা করেন। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য পূরণ না হলে কর্মীরা নতুন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন।[৭৭] তবে তারা প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম লীগকে নতুনভাবে সংগঠিত করে এর মাধ্যমে নিজেদের শক্তিকে সংহত করতে চেয়েছিলেন। এজন্যই শামসুল হক এবং শেখ মুজিবুর রহমান ‘ওয়ার্কার্স ক্যাম্প’ নামে অভিহিত মুসলিম কর্মী সম্মেলন আহবান করে রসিদ বই দেওয়ার জন্য আকরম খাঁকে চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন।[৭৮] ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত মোগলটুলীর অফিসকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের যুব কর্মীরা মোটামুটি একত্রিত হতে থাকে।[৭৯] রাষ্ট্র পরিচালনায় নানা ব্যর্থতা ও অযোগ্যতা তুলে ধরতে শামসুল হক একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। একটি রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যাপারে শামসুল হকের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচোনায় ঠিক হয় শামসুল

হক মওলানা ভাসানীর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলবেন।[৮০] পরবর্তীতে মওলানা ভাসানীর আনুষ্ঠানিক মুসলিম লীগ ত্যাগের পর নতুন সংগঠন গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়।[৮১]

নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যাপারে কর্মীদের মধ্যে মতানৈক্য তৈরি হলে আলী আমজাদ খানের বাড়ীতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ঢাকায় ১৫০ মোগলটুলীতে একটি বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে মওলানা ভাসানী আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহ সভাপতি আলী আমজাদ খানকে সভাপতি এবং ইয়ার মুহাম্মদ খানকে (১৯২০-১৯৮১) সম্পাদক করে একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করেন।[৮২] পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৪৯ সালের ২৩ হতে ২৪ জুন ঢাকার কে এম লেনস্থ কাজী বশীর হুমায়ুনের বাসভবন 'রোজ গার্ডেনে' মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের বিরোধী রাজনৈতিক দল 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করেন। এ সময় ৪০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয় যেখানে শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পান।[৮৩] 'রোজ গার্ডেনে'র এই কর্মী সভায় শামসুল হক বক্তৃতা প্রদান করা ছাড়াও 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ' সম্মেলনে বিবেচনার জন্য 'মূলদাবি' নামে পুস্তিকা আকারে কর্মসূচি বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। তার এই প্রস্তাব সমূহই সম্মেলনের পর সামান্য পরিবর্তিত অবস্থায় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে'র প্রথম খসড়া ম্যানিফেস্টো রূপে প্রকাশিত এবং প্রচারিত হয়।[৮৪] উল্লেখ্য, সম্মেলনের সময় শেখ মুজিবুর রহমান কারাবন্দি থাকায় সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে তাকে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এ দল গঠন সম্পর্কিত খবর পত্রিকায় বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়। খবরের কাগজে শেখ মুজিবের নামের পাশে যুগ্ম-সম্পাদক (নিরাপত্তা বন্দি) লেখা হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান বন্দিদশা থেকে মুক্তি পান। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের কয়েক দিনের মধ্যেই তাকে জেল গেটে আনতে যাওয়া দলীয় নেতা কর্মীদের দেখে তিনি অভিভূত হয়ে যান। তিনি আত্মজীবনীতে লেখেন,

> "...আব্বাকে সালাম করে ভাসানী সাহেবের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকেও সালাম করলাম।" সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ, ছাত্রলীগ জিন্দাবাদ ধ্বনি উঠল। জেল গেটে এই প্রথম আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ হলো। শামসুল হক সাহেবকে কাছে পেয়ে তাকে অভিনন্দন জানালাম এবং বললাম "হক সাহেব, আপনার জয়, আজ জনগণের জয়।" হক সাহেব আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, "চল, এবার শুরু করা যাক।"[৮৫]

আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর সংগঠনের প্রসার ও প্রচারের কাজে সভাপতি মওলানা ভাসানী যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করতে থাকেন। এ সময় শামসুল হক শেখ মুজিবের সাথে থেকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন।[৮৬] *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মওলানা ভাসানীসহ শামসুল হক ও শেখ মুজিব ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমায় প্রথম সভা করতে যান। জামালপুরের উকিল হায়দার আলী মল্লিক ইতিমধ্যে সেখানে আওয়ামী লীগের শাখা গঠন করেছিলেন। জামালপুরে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক সভাতে শামসুল হক সভাপতিত্ব করেন এবং মওলানা ভাসানী প্রধান বক্তা ছিলেন।[৮৭]

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাংগঠনিক সফর করার সাথে সাথে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা ভাসানীর সাথে সকল কর্মকাণ্ডে শামসুল হক অংশগ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে মওলানা ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকের সুযোগ্য নেতৃত্বে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকারের দোষত্রুটি জনসম্মুখে তুলে ধরার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[৮৮] ১৯৪৯ সালের ২৩ অক্টোবর ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় দেশব্যাপী খাদ্য সংকট এবং উত্তরবঙ্গের দুরবস্থার কথা তুলে ধরা হয়। এ জনসভায় সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের সমালোচনা করে শামসুল হক বক্তব্য প্রদান করেন।[৮৯] পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান (১৮৯৬-১৯৫১) ১৯৪৯ সালের ১১ অক্টোবর ঢাকা আসেন। তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মূলত এই সমাবেশের আয়োজন করা হয় এবং মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১১ অক্টোবর সভা হতে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল গভর্নমেন্ট হাউজ অভিমুখে রওনা হয়। মিছিলটি ঢাকা ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকট নাজিরা বাজার রেলওয়ে ক্রসিং এর নিকটবর্তী হলে পুলিশ বাঁধা দেয় এবং কাঁদানে গ্যাস ও লাটি ব্যবহার করে। ঘটনাস্থলেই মওলানা ভাসানী, শামসুল হকসহ এগারজনকে গ্রেফতার করা হয়।[৯০] শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানী ও শামসুল হক কারাগারে একই কক্ষে থাকতেন। এসময় শামসুল হকের স্বাস্থ্য ভীষণ খারাপ হয়ে যাওয়ায় শেখ মুজিব ও মওলানা ভাসানী খুবই সমস্যায় পড়েছিলেন। ১৯৫০ সালের শেষ দিকে মামলার শুনানী শেষ হলে মওলানা ভাসানী ও শামসুল হক জেল থেকে ছাড়া পান।[৯১] জেল থেকে মুক্ত হওয়ার সময় শামসুল হক স্বাস্থ্যগতভাবে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েন। যদিও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শামসুল হক তখন দলের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন। সংগঠক হিসেবে তার যথেষ্ট দক্ষতা থাকলেও একটি নতুন সংগঠনকে শক্ত ভীতের ওপর দাঁড় করানোর জন্য যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল। নানামুখী প্রতিকূলতায় সময়োপযোগী সহযোগিতা বা সমর্থন পাননি যার ফলে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক বিকাশ তেমনভাবে ঘটেনি। তবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম রাজনৈতিক দল গঠন এবং রাজনীতিতে নতুন ধারা প্রতিষ্ঠায় শামসুল হক পথিকৃৎ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।[৯২]

ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয়তাবাদ বিকাশের শ্রেষ্ঠ পর্যায়। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়। আর এ রাজনীতির একজন ধারক ছিলেন শামসুল হক। ভাষা আন্দোলনের সকল পর্ব ও পর্যায়ে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক তৎকালীন *সাপ্তাহিক সৈনিক* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক এনামুল হক এক সাক্ষাৎকারে শামসুল হকের ব্যাপারে মূল্যায়ন করে বলেন, "আমরা যে কাজ করতাম, আন্দোলন করতাম, ছাত্র সমাজের সে আন্দোলনে ব্রেইন বলতে যা বুঝতাম, তা ছিলেন শামসুল হক।"[৯৩] ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর থেকেই ভাষা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা, বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পরিকল্পনা করলে পূর্ববাংলা অঞ্চলের তরুণ ছাত্র সমাজ তীব্র বিরোধিতা তথা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।[৯৪] পাকিস্তানের গণপরিষদে ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করলে তা সঙ্গে সঙ্গে নাকচ হয়ে যায়। এ সংবাদ ঢাকায় প্রকাশিত হওয়া মাত্র প্রগতিবাদী ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ তমদ্দুন মজলিস ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের এক যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

যে, অবিলম্বে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষারূপে ঘোষণা করার দাবিতে ১১ মার্চ ১৯৪৮ সমগ্র পাকিস্তানে ধর্মঘট পালন করা হবে।[৯৫] এ উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা ২ মার্চ ১৯৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে এক সভায় মিলিত হন যেখানে শামসুল হক উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।[৯৬] ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত করার আহবান জানিয়ে অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের ন্যায় শামসুল হক (সংগঠক, মুসলিম লীগ পূর্ববঙ্গ) ৩ মার্চ বিবৃতি প্রদান করেন।[৯৭]

১১ মার্চ ১৯৪৮ খুব ভোর থেকেই ছাত্ররা পিকেটিংয়ের জন্য বিভিন্ন হল থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেন। শেখ মুজিবুর রহমান এদিনের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন, ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভোরবেলা শত শত ছাত্রকর্মী ইডেন বিল্ডিং, জেনারেল পোস্ট অফিস ও অন্যান্য জায়গায় পিকেটিং শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে কোনো পিকেটিংয়ের দরকার ছিলনা। সমস্ত ঢাকা শহর পোস্টারে ভরে ফেলা হয়েছিল। অনেক দোকানপাট বন্ধ ছিল, কিছু খোলাও ছিল। সকাল ৮টায় জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে ছাত্রদের ওপর ভীষণভাবে লাঠিচার্জ করা হয়েছিল। একদল মার খেয়ে স্থান ত্যাগ করার পর আরেক দল হাজির হয়। ফজলুল হক হলে ভাষা আন্দোলন কর্মীরা অবস্থান করছিল। এইভাবে গোলমাল, মারপিট অনেকক্ষণ ধরে চলেছিল। ৯ টায় ইডেন বিল্ডিংয়ের সামনের দরজায় লাঠিচার্জ হয়। আব্দুল গণি রোডের দরজায় তখন ছাত্ররা অত্যাচার ও লাঠির আঘাত সহ্য করতে পারছিল না। অনেক কর্মী আহত হয়ে গেছে এবং সরে পড়েছে। এসময় শেখ মুজিব জেনারেল পোস্ট অফিসের দিক থেকে নতুন কর্মী নিয়ে ইডেন বিল্ডিংয়ের দিকে যান, এর মধ্যে শামসুল হককে ইডেন বিল্ডিংয়ের সামনে পুলিশ ঘিরে ফেলে। এ সময় শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার জন্য সিটি এস পি জিপ নিয়ে বারবার তাড়া করে কিন্তু ধরতে পারেনি। কোন উপায় না পেয়ে তিনি চার পাঁচজন ছাত্র নিয়ে আবার ইডেন বিল্ডিংয়ের দরজায় বসে পড়লেন। এসময় তাদের দেখাদেখি কিছু ছাত্র তাদের পাশে বসে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে শেখ মুজিব ও অন্যান্যদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের গ্রেফতারের আগেই শামসুল হককে গ্রেফতার করা হয়।[৯৮] অলি আহাদ ঘটনার বর্ণনায় বলেন, পুলিশ বাহিনী অধৈর্য্য হয়ে বেপরোয়া লাঠি চালাতে শুরু করে। আব্দুল ওয়াদুদ এবং অলি আহাদ পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হয়। পুলিশ তাদের আহত অবস্থায়ই জিপে বস্তাবন্দি করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে সেখানকার হাসপাতালে ভর্তি করে।[৯৯]

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চে যে সব শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি গ্রেফতার হন তাদের মধ্যে শামসুল হক অন্যতম। এই দিনের সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ছাত্রদের সাথে চুক্তি করেন। চুক্তি পত্রটি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগেই সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা কেন্দ্রীয় কারাগারে শামসুল হক সহ সকল ছাত্র নেতাদের চুক্তি পত্রটি দেখিয়ে তাদের সম্মতি নিয়ে আসেন।[১০০] অলি আহাদ তার গ্রন্থে এ চুক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, ১১ মার্চে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন চলাকালে ভীত সন্ত্রস্ত খাজা নাজিমুদ্দিন সরকার রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সদস্যদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। উভয়পক্ষ একটা খসড়া চুক্তি প্রণয়ন করেন। চুক্তি পত্রটি ১১ মার্চ গ্রেফতারকারী নেতৃবৃন্দ দ্বারা অনুমোদনের জন্য অধ্যাপক আবুল কাসেম ও জনাব কামরুদ্দীন আহমদ কারান্তরালে অলি আহাদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে

মিলিত হন। শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও অলি আহাদ প্রমুখ বন্দীগণের পক্ষ হতে খসড়া চুক্তির শর্তাবলী পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অনুমোদন করে। খসড়া চুক্তি নামাটি সরকারের পক্ষ হতে খাজা নাজিমুদ্দিন ও রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের পক্ষ হতে জনাব কামরুদ্দীন আহমদ স্বাক্ষর করেন।[১০১]

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ আন্দোলনে গ্রেফতারকৃতদের ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ সর্বদলীয় ভাষা আন্দোলন পরিষদ ও নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক মুক্তি দেওয়া হয়। জেলে আটক নেতৃবৃন্দ জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ১৬ মার্চ ১৯৪৮ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[১০২] সরকার এই বিক্ষোভ মিছিলে লাঠি চার্জ করলে প্রতিবাদস্বরূপ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ধর্মঘটের ফলে ভাষা আন্দোলন গণআন্দোলন হিসেবে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।[১০৩] ১৯ মার্চ ১৯৪৮ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা সফরে এসে ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেন, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' এ বক্তব্যের সাথে সাথে শামসুল হক সহ অনেকে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেন। পরে নাগরিক সংবর্ধনা শেষে ওখানে দাঁড়িয়েই শামসুল হক উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাষা বিষয়ক ঘোষণার নিন্দা জ্ঞাপন করে প্রতিবাদী বক্তব্য প্রদান করেন।[১০৪] ২৪ মার্চ ১৯৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ভাষণ শেষে জিন্নাহ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে কর্ম পরিষদের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। ২৪ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে যারা দেখা করতে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কারা কারা ছিল সে প্রসঙ্গে নানা সময় নানা বিতর্ক হয়েছে। বিতর্ক ও ভূমিকা প্রসঙ্গে সৈয়দ নজরুল ইসলামের সাক্ষ্য,

> "২৪ তারিখ সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে কায়েদে আজম দেখা করেন। তার মধ্যে আমি ছিলাম। অন্যদের মধ্যে তোয়াহা, কামরুদ্দীন, অলি আহাদ, শামসুল হক, কাসেম, নুরুল হুদা (ইঞ্জিনিয়ার)। সেই সময় মুশতাক সাহেব থাকার কথা আমার মনে পড়ে না। তিনি ছিলেন না। শামসুল হকের নামাজ পড়া নিয়ে একটা গণ্ডগোল হয়।"[১০৫]

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে শামসুল হকের সঙ্গে বিশেষত রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে বেশ তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ঐ সভায় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ হতে জিন্নাহ কে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।[১০৬] স্মারকলিপি পড়ার পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, 'এক ধর্ম, এক ধর্মগ্রন্থ, এক রাষ্ট্র সুতরাং দেশ ও জাতির সংহতির জন্য ভাষাও এক হওয়া দরকার।' শামসুল হক এই কথার প্রতিবাদ করলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে তার বির্তকের সূচনা হয় এবং জিন্নাহ রাগান্বিত স্বরে শামসুল হককে উদ্দেশ্য করে বলেন,

> "You are the man who always create trouble at Lahore convention also along with Moulana Hasrat Mohani and Abul Hashim."[১০৭]

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে ভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন করে বাঁধার সম্মুখীন হলেও থেমে যাননি। বিদায় নেওয়ার সময় তিনি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে লক্ষ্য করে দীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন,

'প্রিয় কায়েদে আজম, আমাদের একটি দাবি, তা হলো পাকিস্তানের বৃহত্তর জনগণের মায়ের ভাষাকে রাষ্ট্রীয় জীবনে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নাই, সে যতবড় হোক না কেন, আমাদের এই ন্যায়সঙ্গত এবং প্রাণের দাবিকে অগ্রাহ্য করে তা দাবিয়ে রাখে।'[১০৮]

প্রসঙ্গত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সম্মুখে তার মতের বিরোধিতা করার মতো মানসিক সাহস যে কটি হাতে গোনা তরুণের ছিল শামসুল হক তাদের অগ্রগণ্য। শেখ মুজিবুর রহমান এ ঘটনার বর্ণনায় বলেন,

"আমাদের পক্ষ থেকে মিস্টার তোয়াহা আর শামসুল হক সাহেব ছিলেন, তবে আমি ছিলাম না। জিন্নাহ আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামটা পছন্দ করেছিলেন। নিখিল পূর্ব পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের নাম যখন আমাদের প্রতিনিধি পেশ করেন, তখন তারা দেখিয়ে দিলেন যে, এদের অধিকাংশ এখন চাকরি করে, অথবা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। তখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাদের ওপর রাগই করেছিলেন। শামসুল হক সাহেবের সঙ্গে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর একটু তর্কই হয়েছিল, যখন তিনি দেখা করতে যান বাংলা রাষ্ট্রভাষা করার বিষয় নিয়ে- শামসুল হক সাহেব আমাকে এসে বলেছিলেন। শামসুল হক সাহেবের সৎ সাহস ছিল, সত্য কথা বলতে কাউকেই ভয় পেতেন না।"[১০৯]

১৯৪৮ সালের ১১ অক্টোবর লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এলে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে মিটিং ও মিছিলের মাধ্যমে বাংলা ভাষার আন্দোলন জোরদার করা হয়। এসময় শামসুল হক, মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এক বছর পর শামসুল হক জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সর্বদলীয় ঐক্যের ভিত্তিতে বাংলা ভাষার দাবিতে সংগ্রাম শুরু করেন।

প্রধানমন্ত্রী ও মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি করাচি হতে ঢাকা আসেন। ২৮ জানুয়ারি ১৯৫২ পল্টন ময়দানের সভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র কথা উদ্ধৃত করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর ঘোষণা করেন।[১১০] এ ঘোষণার প্রতিবাদে আবার ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে আন্দোলন শুরু করে। ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ' গঠন করা হয়। কর্ম পরিষদের ৪০-৪২ জন প্রতিনিধির একজন সদস্য ছিলেন শামসুল হক।[১১১] ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ পূর্ববাংলা কর্মীশিবির অফিস ১৫০ মোগলটুলীতে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সংগঠনের অর্থ সংগ্রহ এবং সরকার যদি ১৪৪ ধারা জারি করে সেক্ষেত্রে কি সিদ্ধান্ত হবে সে ব্যাপারে আলোচনা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ অপরাহ্নে নূরুল আমীন সরকার ঢাকা শহরে একমাস মেয়াদী ১৪৪ ধারা জারি করে সভা ও শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭ টায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ৯৪ নং নবাবপুর রোডস্থ অফিসে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আবুল হাশিম। এ জরুরী সভায় যোগদানকারী সকলের পক্ষ হতে শামসুল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরোধিতা করেন এবং যুক্তির অবতারণা করেন। প্রথমত, আওয়ামী মুসলিম লীগ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে

বিশ্বাস করে। দ্বিতীয়ত, গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করে সরকার প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচন অনিশ্চয়তার গর্ভে নিক্ষেপ করবে। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রবিরোধী ও ধ্বংসাত্মক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। সভায় অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে জোরালো বক্তব্য প্রদান করলে শামসুল হক রাত প্রায় ১ টা ৩০ মিনিটে সংগ্রাম পরিষদের এই সভায় বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করেন,

> "Resolved that in view of the promulgation of the section 144 CRPC the programmes of the 21st February are withdrawn & if any member of the All Party Committee of Action for State Language defies the decision, the committee will ipso facto stand dissolved."[১১২]

শামসুল হক ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করেও ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে নেতাকর্মীদের বোঝাতে যান। কিন্তু শামসুল হকের সিদ্ধান্ত না মেনে গাজীউল হকের (১৯২৯-২০০৯) সভাপতিত্বে শুরু হয় আমতলা সভা। সভা চলাকালীনও শামসুল হক ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার কথা বলেন। এই সময় ছাত্র সমাজের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। যাহোক, অধিকাংশ ছাত্র ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে থাকায় অবশেষে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে ছাত্ররা মিছিল শুরু করে। এরূপ পরিস্থিতিতে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে আবুল বরকত, জব্বার, রফিক, সালাম ও সালাউদ্দিন শহীদ হন। পুলিশের গুলি বর্ষণের পরও শামসুল হক পিছপা হননি। ঐদিন বিকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে আহত ছাত্রদের সেবা শুশ্রুষায় এগিয়ে আসেন।[১১৩] ২১ ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক ঘটনায় পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ একটি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্তের এই বৈঠকে শামসুল হক উপস্থিত ছিলেন। এসময় সরকার কঠোর নীতি প্রয়োগ করে এবং শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করতে থাকে। ঘটনার দ্রুত পরিবর্তনে সকলেই অনেকটা বিহবল হয়ে পড়েন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল কি না সে সম্পর্কে অনেকের মধ্যে দ্বিধা তৈরি হয়।[১১৪] ঘটনার দিন ছাত্র মিছিলে গুলিবর্ষণের কিছুক্ষণ পর আনুমানিক অপরাহ্ন চারটার দিকে আওয়ামী মুসলিম লীগ সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক খবর পাঠালে অলি আহাদ সেই শোকাভিভূত মুহূর্তে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল থেকে হাসপাতাল ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের গেটের সম্মুখের চত্বরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় অলি আহাদ বলেন যে, এই সদ্য ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সকলেই মর্মাহত। হৃদয়বিদারক এই পরিস্থিতির পর অত্যন্ত ধীর ও শান্তভাবে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে হবে। তাই শামসুল হক ও অলি আহাদ সব ধরনের মতবিরোধ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব মুছে ফেলে এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা সঠিক হয়েছে কিনা, সেই প্রসঙ্গও উত্থাপন না করে পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে জালেম সরকারের সমুচিত জবাব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নেন।[১১৫]

মূলত: সরকারি তৎপরতা ও দমন নীতির দরুণ আন্দোলনকারীদের মধ্যে মতদ্বৈততার সৃষ্টি হয়। এমনি অবস্থায় ১৯ মার্চ ১৯৫২ শামসুল হক গ্রেফতার হন। ২৫ মার্চ ১৯৫২ *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় শামসুল হকের গ্রেফতার সম্পর্কে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে,

> "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ১৯ মার্চ বুধবার বেলা ১২ ঘটিকার সময় ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির হন। তাহাকে গ্রেফতার করিয়া ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে। গ্রেফতারের প্রাক্কালে জনাব হক বলেন, "রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছাত্র, যুবক ও জন সাধারণের মিলিত আন্দোলন। ইহা তাহাদের বাঁচিবার আন্দোলন। ...সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বহু জুলুম ও হয়রানি সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু সত্যের জয় অবধারিত।"[১১৬]

ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপের পর থেকে কারামুক্তি পর্যন্ত সময়কাল শামসুল হকের জীবন ছিল বিভীষিকাময়। কারাগারে তিনি পূর্বেও ছিলেন তবে এবারের কারাজীবন শেষে তার বিভীষিকা আর শেষ হয়নি। ভাষা আন্দোলনের কারণে কারাগারে অন্তরীণ থাকাবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে তার স্ত্রী আফিয়া হকের মাধ্যমে শামসুল হককে লোভনীয় প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[১১৭] পরে কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী তার পারিবারিক জীবনে আঘাত করে তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ করতে উদ্যত হয় এবং তার স্ত্রীকে লোভনীয় বৃত্তি দিয়ে দুই কন্যাসহ বিদেশে পাঠিয়ে দেন। বলা যায় ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে শামসুল হকের রাজনৈতিকভাবে মৃত্যু ঘটে এ অর্থে যে কারাগারে থাকাবস্থায় তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল।[১১৮] শামসুল হকের কারামুক্তি এবং শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্র কর্মীরা মুক্তি পেতে শুরু করে। এসময় শামসুল হকও মুক্তি পান কিন্তু তখন তিনি অসুস্থ। তার কারাগারে থাকাবস্থায় কিছুটা মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছিল। করাগারে বন্দি থেকে তা বুঝতে কারও বাকি রইল না। তিনি অবশ্য কোন গোলমাল করতেন না, তবে কিছু সময় কথা বললেই বোঝা যেত যে, এক কথা বলতে যেয়ে অন্য কথা বলতে শুরু করেছেন। এ সময় শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শামসুল হককে নিয়ে খুবই চিন্তা করতেন। শামসুল হকের মত নি:স্বার্থ ও ত্যাগী দেশকর্মী দেশের জন্য কাজ করতে গিয়ে পাগল হয়ে গেলেন। এসময় শেখ মুজিব নেতাকর্মীদের সাথে আলোচনা করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন কিন্তু তিনি রাজি হননি।

শেখ মুজিবুর রহমান শামসুল হককে আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারির দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। কার্যকরী কমিটির সভা ডেকেও তাকে অনুরোধ করেছিলেন, কারণ এতদিন শেখ মুজিব ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজ করছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন কাজের মধ্যে থাকলে শামসুল হক ভাল হয়ে যেতে পারেন। পূর্ব নির্ধারিত সভায় শামসুল হক উপস্থিত হলেন এবং বললেন, "আমি প্রতিষ্ঠানের জেনারেল সেক্রেটারির ভার নিতে পারব না, মুজিব কাজ চালিয়ে যাক।" শামসুল হকের কথাবার্তার মাধ্যমে সকলেই বুঝতে পারলেন যে, তার মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে। এসময় শেখ মুজিব কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। পরবর্তীতে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় শামসুল হককে সভাপতিত্ব করার জন্য জোর করেই শেখ মুজিব উপস্থিত করালেন। কিন্তু তিনি এমন এক বক্তৃতা করলেন যাতে সকলেই দুঃখ পেলেন। কারণ শামসুল হক নিজেকে সমস্ত দুনিয়ার খলিফা বলে ঘোষণা করলেন। এসময় উপস্থিত নেতৃত্ব হতাশ

হয়ে পড়লেন এবং তাকে চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন। শামসুল হকের স্ত্রী বিদেশে থাকায় চিকিৎসা করানো অসম্ভব হয়ে পড়ে।"[১১৯]

দীর্ঘ কারাজীবন এবং পারিবারিক সংযোগহীনতা এ দুটি বিষয়ই শামসুল হকের কর্মময় জীবনের ইতি ঘটায়। তিনি ১৯৬৪ সালে নিখোঁজ হন। সিলেটসহ একাধিক স্থান থেকে তার মৃত্যুর খবর আসে। আত্মীয়স্বজন তার খোঁজ পেতে বহু চেষ্টা করেছে কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। টাঙ্গাইলের কালিহাতির তৎকালীন বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা মহির উদ্দিন আনসারির বাড়িতে থাকাবস্থায় শামসুল হক সাত দিনের জ্বরে ভুগে ১৯৬৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। শামসুল হক গবেষণা পরিষদ অনেক অনুসন্ধান করে ২০০৭ সালে টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলার জোকারচরের কদিম হামজানিতে শামসুল হকের কবর আবিষ্কার করে। শামসুল হক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতাবলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের মূল্যায়ন নিম্নরূপ,

> "অত্যাচারের প্রতিবাদ করার মত ক্ষমতা তখন আমাদের ছিল না আর আমরা প্রস্তুতও ছিলাম না। ছাত্ররা সামান্য প্রতিবাদ করেছিল। নেতৃত্ব দেওয়ার মত কেউ আমাদের ছিল না। আমরা যদি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম, নিশ্চয়ই সাড়া পেতাম। জনসাধারণ শহীদ সাহেবকে ভালবাসতেন। আমরা কয়েকজন প্রস্তাব করলে ঢাকার পুরানা নেতারা নিষেধ করলেন। আমরা ঢাকায় নতুন এসেছি, পরিচিত হতে পারি নাই ভালভাবে। ... ঐদিন যদি শামসুল হক সাহেব ঢাকায় থাকতেন তবে আন্দোলন আমরা করতে পারতাম বলে আমার বিশ্বাস ছিল।"[১২০]

শামসুল হক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে সরাসরি রাজনীতিতে পদার্পণ করেন। তবে মোগলটুলীর ওয়ার্কার্স কর্মী হিসেবেই তার রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণতা লাভ করেন। মূলত ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে আঞ্চলিক রাজনীতিতে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে পেরেছিলেন। সে কারণে এ নির্বাচনকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সূতিকাগার বলা যায়। টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আদর্শ তৈরি হয় তার মাধ্যমেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শামসুল হক আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক বিকাশে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের চালিকা শক্তি আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা তথা স্বতন্ত্র দলীয় রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় একজন আঞ্চলিক নেতা হিসেবে যুগসন্ধিকারী ভূমিকা পালন করেছেন। দলীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে তার নিজ এলাকায় এ রাজনীতির প্রসার ঘটান। যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন কারও প্রতি কোন অভিযোগ করেনি বরং অপেক্ষাকৃত নিভৃতচারী এই মানুষটি তার জীবনে যে কাজটি করে এসেছেন সেই পার্টি গঠনের আশা নিয়ে বেঁচেছিলেন। জীবনের হতাশা ও মানসিক চাপে একপর্যায়ে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন হযরত মোহানীর 'রব্বানী' দর্শনের চর্চায় ও স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায়। দু:খজনক বিষয়, এই সাহসী রাজনৈতিক নেতা দীর্ঘ

কারাজীবন এবং পারিবারিক জীবনে অস্থিতিশীলতার কারণে অনেকটাই মানসিকভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে শামসুল হকের মৃত্যু হয়।

প্রান্তটীকা

১. নুরুল ইসলাম খান (সম্পা.), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার টাংগাইল*, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯০, পৃ. ২৮৩। মো. লুৎফর রহমান (সম্পা.) *টাঙ্গাইল জেলার গুণীজন*, ছায়ানীড় প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ১৩৮
২. মো. সাইফুল ইসলাম স্বপন, *একজন অসমাপ্ত রাজনীতিকের কথা*, *সাপ্তাহিক ইনতিজার* (টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা), ২৪ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৪। মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *স্বাধিকার আন্দোলন ও শামসুল হক*, শামসুল হক ফাউন্ডেশন, টাঙ্গাইল, ১৯৯২, পৃ. ৯
৩. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯
৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
৫. কামাক্ষা নাথ সেন, 'ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রবন্ধ', মুহাম্মদ বাকের (সম্পা.), *টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, জেলা পরিষদ, টাঙ্গাইল, ১৯৯৭, পৃ.৩৭২। মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫
৬. মোঃ সাইফুল ইসলাম স্বপন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪
৭. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪। মো. লুৎফর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮
৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩। মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
৯. কামাক্ষা নাথ সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭২
১০. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১
১১. Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal 1937-47,* New Delhi, India, 1976, p. 185
১২. আরিফা সুলতানা, *আবুল হাশিম ঃ কর্ম ও রাজনৈতিক জীবন*, এম.ফিল থিসিস (অপ্রকাশিত), ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ. ৪৩
১৩. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, খোশরোজ কিতাব মহল লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৬৯-৭০। ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর মুসলিম লীগের আমূল সংস্কার সাধন করেন। মুসলিম লীগ সংগঠনকে শক্তিশালী এবং খাজা পরিবার তথা উচ্চবিত্তের নিয়ন্ত্রন মুক্ত করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মুসলিম লীগ অফিস ও পার্টি অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। আবুল হাশিমের নির্দেশে ১৯৪৪ সালের ১ এপ্রিল ঢাকার চক মোগলটুলীর ১৫০ নম্বর ত্রিতল বাড়ি ভাড়া করা হয়। এ বাড়ির দোতলায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের শাখা অফিস এবং তৃতীয় তলায় সম্মেলন কক্ষ ও কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। কারণ তৎকালীন পরিস্থিতিতে সবার সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা কষ্টসাধ্য ছিল। তাছাড়া অনেক কর্মী ছিল যাদের ঢাকাতে অবস্থান করার মত সামর্থও ছিলনা। তিন তলার পার্টি অফিস সার্বক্ষণিক কর্মীবৃন্দ তথা মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশ সবসময় অবস্থান করে সাংগঠনিক তৎপরতা পরিচালনা করতেন। ১৫০ নং মোগলটুলীর পার্টি অফিস গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কর্মীদের মধ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮-৭২
১৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউপিএল, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩২
১৫. আবুল হাশিম (অনুবাদ শাহাবুদ্দীন মহম্মদ আলী), *আমার জীবন ও বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৬৪
১৬. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯-৭০
১৭. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬-৩৭
১৮. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২০৬-২০৭
১৯. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, ২৯-৩০
২০. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭
২১. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮
২২. অখণ্ড বাংলার দাবিতে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণের জন্য তফসিলি সম্প্রদায়ের মন্ত্রী যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল (১৯০৪-১৯৬৮), *ইত্তেহাদের* সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (১৯১১-১৯৬৯), নুরুদ্দীন আহম্মদ (অল স্টুডেন্টস লীগের প্রাক্তন সম্পাদক), শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) (তৎকালীন ছাত্র নেতা), পূর্ববাংলার মুসলিম লীগ কর্মী শিবিরের নেতা শামসুল হক, ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক শামসুদ্দীন আহমদসহ (১৯২০-১৯৭১) অখণ্ড বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর কলকাতার ৪০ নং থিয়েটার রোডের বাসভবনে মিলিত হন। অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।
২৩. রব্বানী চৌধুরী, *সিলেটের ইতিহাস সমগ্র*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬৬
২৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৬
২৫. আশরাফ সিদ্দিকী, *উপেক্ষিত নায়ক*, সাহিত্য সাময়িকী, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩
২৬. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪
২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-২৮
২৮. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২১

২৯. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৯৩

৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪

৩১. শামসুল হক, *আমরা গড়িব স্বাধীন সুখি গণতান্ত্রিক পাকিস্তান*, পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনের পক্ষে শামসুল হক কর্তৃক ১৫০ মোগলটুলী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা উদ্ধৃত বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৮

৩২. শামসুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৯

৩৩. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫, বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত* পৃ. ২৭

৩৪. হাসান হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩

৩৫. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

৩৬. **ভাষা সৈনিক লিলি খান (১৯২৭-২০০৪)** ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত একজন নৃত্যশিল্পী। ১৯৪৭-৪৮ সালে গৌরবময় ভাষা আন্দোলন পর্বে সরাসরি জড়িত ছিলেন। ভাষা আন্দোলন সংগঠনকারী প্রতিষ্ঠান তমদ্দুন মজলিসের সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত সভায় লিলি খান উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় গঠিত দ্বিতীয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে'র সদস্য ছিলেন। লিলি খান ১১ মার্চের হরতাল কর্মসূচিতে মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২১ ও ২৪ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রদত্ত বক্তৃতার পর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি দল ২৪ মার্চ সন্ধ্যায় জিন্নাহর সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। এ প্রতিনিধি দলে নারী সদস্য হিসেবে লিলি খান উপস্থিত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৬ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক যুব সম্মেলনে সরকারি দলের সদস্য হিসেবে তিনি যোগদান করেন। সুপা সাদিয়া, *বায়ান্নর ৫২ নারী*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৮৬-৮৭

আবদুর রহমান চৌধুরী (১৯২৬-২০০৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে ভাষা সম্পর্কিত যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতৃত্ব দেন। সম্প্রসারিত 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত (১৯৪৮) হলে সেখানে তিনি সদস্য ছিলেন। তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীকে দেওয়া স্মারকলিপি প্রণয়নের মূল দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ ভারতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান যুব সম্মেলনে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলে আবদুর রহমান নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেন এবং ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত একই পদে ছিলেন। খান মাহবুব, *টাঙ্গাইল জেলা পরিচিতি*, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৬৩। তাহমিনা খান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতির সাংগঠনিক বিকাশ ১৯৪৭-১৯৫৭*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৭৮

৩৭. তাহমিনা খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮

৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮

৩৯. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, নওরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০০৬ (১ম প্রকাশ ১৯৬৯), পৃ. ২৩৯

৪০. Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh : Politics and Functioning of the East Bengal Legislature, 1947-58,* University of Dhaka, 1980, p 82.

৪১. *ibid,* p 80-82.

খুররম খান পন্নী (১৯২১-১৯৯৭) টাঙ্গাইলের করটিয়ার জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে শামসুল হকের বিরুদ্ধে প্রার্থিতা করে পরাজিত হন। তাছাড়া ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট পরাজিত হন। ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৩ সালে কোরিয়ায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিয়োজিত হন। পরবর্তীতে তিনি ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়ায় কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। শফিক ইমতিয়াজ, *টাঙ্গাইলের স্মরণীয় বারো মণীষী*, সাধারণ গ্রন্থাগার, টাঙ্গাইল, ২০০৩, পৃ. ১৫-১৮

৪২. Najma Chowdhury, *ibid,* p. 85

৪৩. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৬৮-৬৯

৪৪. **নবাবজাদা হাসান আলী (১৯১০-১৯৮১)** টাঙ্গাইলের নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা পার্টির মনোনয়নে টাঙ্গাইলের মধুপুর, গোপালপুর নির্বাচনী এলাকা হতে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৬২ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে টাঙ্গাইল (মধুপুর-গোপালপুর) আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী কৃষক প্রজাদের স্বার্থে রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৬২ সালে তৎকালীন পাকিস্তানে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৬২-৬৩ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৮ সালে বিএনপির মনোনয়নে টাঙ্গাইল-১ মধুপুর নির্বাচনী এলাকা হতে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদ সদস্য থাকাবস্থায় তিনি ১৯৮১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। খান মাহবুব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

৪৫. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩

৪৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫

৪৭. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৯৭

৪৮. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *স্বাধিকার আন্দোলনে শামছুল হক*, শামসুল হক ফাউন্ডেশন, টাঙ্গাইল, ১৯৯২ পৃ.৪১

৪৯. **মোহাম্মদ আউয়াল (১৯২৬-১৯৫২)** আবুল হাশিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্কার্স ক্যাম্প কর্মী ছিলেন। ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে শামসুল হকের পক্ষে ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল গিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অঞ্জলি বসু সম্পাদিত, *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৪৩
আজিজ আহমদ (১৯০৬-১৯৯২) পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের উর্দ্ধতন অবাঙালি সদস্য ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারির দায়িত্ব পালনকালে পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন। শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫
৫০. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১
৫১. তাহমিনা খান, *পাকিস্তানের প্রথম দশক ১৯৪৭-১৯৫৭: পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক বিবর্তন*, প্রকাশিত এম ফিল অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০, পৃ. ১৩৫
৫২. *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ২৩ এপ্রিল ১৯৪৯
৫৩. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭
৫৪. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯
৫৫. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫
৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪-১৫
৫৭. মাহমুদুর রহমান মান্না, 'খোলা কলম', *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ঢাকা, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
৫৮. সাক্ষাৎকার : ডা. সাইফুল ইসলাম স্বপন (শামসুল হকের ভাতিজা, শামসুল হক ফাউন্ডেশনের সভাপতি), ২০ জানুয়ারি ২০১৯, শামসুল হক হাসপাতাল, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
৫৯. তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৪-১৫
৬০. তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
শাহ আজিজুর রহমান (১৯২৫-১৯৮৭) অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক (১৯৪৫-৪৭) ছিলেন। ১৯৪৭ এর দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক এবং পরবর্তীতে সম্পাদক হিসেবে (১৯৫২-৫৮) দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। ১৯৬২ সালে সোহ্‌রাওয়ার্দীর ন্যাশনাল ফ্রন্টে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ১৯৭০ সালে বহিষ্কৃত হন। ১৯৭০ সালে আতাউর রহমানের দল 'জাতীয় লীগে' যোগদান করেন। ১৯৭১ এর স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশের দালাল আইনে গ্রেফতার হন। মুয়ায্যম হুসায়ন খান, *বাংলাপিডিয়া*
৬১. এস.এ মালেক ও অন্যান্য (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু*, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৫০
৬২. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯
৬৩. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
৬৪. তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭
৬৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪-১৭
৬৬. মো. হযরত আলী সিকদার, *টাঙ্গাইলের অগ্নিপুরুষ শামসুল হক*, ফাল্গুনী, টাঙ্গাইল সমিতি, ১৯৭৮, পৃ. ৭০
৬৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০-৭১। টাঙ্গাইল উপনির্বাচন সম্পর্কে *লন্ডন ডেইলির* ভাষ্য ছিল, "It is not only a victory of Mr Samsul Haque, but it is threatening to the reactionary government of the world over…"
৬৮. বদরুদ্দীন উমর , *প্রাগুক্ত*, ২২১
৬৯. তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, ১৮
৭০. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯
৭১. *সাপ্তাহিক নওবেলাল*, ঢাকা, ২ জুন ১৯৪৯
৭২. *Assembly Proceedings, Official Report, East Bengal Legislative Assembly, First session 1948. Vol I p III, VI No.1 Fourth Session 1949-50, Vol-IV, No 1 p.I- VII, Eleventh Session 1953 Vol XI No.1 p I-V* . মো. হাবিবউল্লাহ্ বাহার, *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৪৯০
৭৩. এস.এ মালেক ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪
৭৪. মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ উত্থান পর্ব ১৯৪৮-৭০*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৪০-৪৩
৭৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩
৭৬. *সাপ্তাহিক সৈনিক*, ঢাকা, ১৭ জুন ১৯৪৯
৭৭. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১
৭৮. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৯৮
৭৯. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২
৮০. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪
৮১. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮
৮২. বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ২৩২-৩৩
৮৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫
৮৪. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস ১৯৪৯-৭১*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৫-১৬

৮৫. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১
৮৬. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
৮৭. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮-২৯
৮৮. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
৮৯. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫.
৯০. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২
৯১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪।
৯২. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, *৩য় খণ্ড*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৪৭
৯৩. তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১
৯৪. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
৯৫. বশির আল হেলাল, *ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৬১
৯৬. এস.এ মালেক ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০
৯৭. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে শামসুল হক নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন, "For some time past considerable agitation is going on to make Bengali as the (i) official language of East Pakistan, (ii) as one of the State Languages of the Central Pakistan (iii) as one of the Languages of Pakistan assembly." বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬
৯৮. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২-৯৩
৯৯. বশির আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩
১০০.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
১০১. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩
১০২.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
১০৩.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-২১
১০৪.*দৈনিক মিল্লাত*, ঢাকা, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১
১০৫.বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, ভাষাসৈনিক সৈয়দ নজরুল ইসলামের সাক্ষাৎকার (২০.০৯.১৯৬৯) আবুল কাসেম ফজলুল হক ও এম আর মাহবুব (সম্পা.) ও সংকলিত, *ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২৭১, বশির আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৭
১০৬.তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১
১০৭.শফিক ইমতিয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
১০৮.তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১
১০৯.হাসান হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১
১১০.শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য (সম্পা.), *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৭
১১১. তপন কুমার দে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
১১২.অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪-১০৫
১১৩.বশির আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৬
১১৪. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ৩য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০২
১১৫.অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫-১৬
১১৬.বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৭
১১৭. *দৈনিক আমার দেশ*, ঢাকা, ২৩ জুন ২০০৭
১১৮.সাক্ষাৎকার, সাইফুল ইসলাম স্বপন, (শামসুল হকের ভাতিজা), *প্রাগুক্ত*
১১৯.শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬-৩৭
১২০.*দৈনিক আমার দেশ*, ঢাকা, ২৩ জুন ২০০৭

৩.৪ হাতেম আলী খান (১৯০৪-১৯৭৭)

কৃষক নেতা হাতেম আলী খান জন্মেছিলেন ১৯০৩ সালে মতান্তরে (১৯০৪ সালের ২৪ নভেম্বর) টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার হেমনগর ইউনিয়নের বেলুয়া গ্রামের এক ধনাঢ্য মুসলিম পরিবারে। বাবা নায়েব আলী খান জমিদার পরিবারের ছেলে হওয়ায় ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে কেটেছে তার শৈশবকাল। কৈশোর থেকেই তিনি শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। স্কুল জীবনে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হন এবং আমৃত্যু তিনি আন্দোলন সংগ্রাম করেই জীবন কাটিয়েছেন।[১] ১৯২০ সালে হেমনগর হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯২১ সালে কলকাতার রিপন কলেজে (বর্তমান নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, প্রতিষ্ঠা ১৮৮৪) ভর্তি হন।[২] এসময় তিনি সংগ্রামী নেতা সূর্যসেন (১৮৯৪-১৯৩৪), সত্যেনসেন (১৯০৭-১৯৮১), কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), জিতেন ঘোষ (১৯০১-১৯৭৬) প্রমুখের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান।[৩] সক্রিয় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকেও তিনি ১৯২৬ সালে বি.এ এবং ১৯২৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠিত ১৮৫৭) থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।[৪] হাতেম আলী খানের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা এবং একটি শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।[৫] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) সময় সমগ্র বাংলায় বিপ্লবী সংগঠনগুলোর তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এসময় হাতেম আলী খান স্বশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'র সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন।[৬] তিনি যখন স্বশস্ত্র বিপ্লবীদের নির্দেশিত পথে ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে মনস্থির করেন তখন মহাত্মা গান্ধী (১৮৭৯-১৯৪৮) অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। আন্দোলনে দেশের সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় এক অভূতপূর্ব গণজাগরণের সৃষ্টি হয়।[৭] হাতেম আলী খানও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করতে রাজপথে নামেন।[৮]

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি বিশ শতকের শুরুতেই বাংলায় প্রজা আন্দোলনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ১৯১৪-১৯৩০ সালের মধ্যে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির তৎপরতায় বাংলায় প্রজা আন্দোলন বিস্তার লাভ করে।[৯] পূর্ববাংলার বিভিন্ন জায়গায় প্রজা আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠার পর হাতেম আলী খান নিজ এলাকায় ফিরে এসে কৃষকদের সংগঠিত করে প্রজা আন্দোলন শুরু করেন।[১০] প্রজা আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র (প্রতিষ্ঠা ১৯২৯) উদ্যোগে টাঙ্গাইলের গোপালপুর থানার ভেঙ্গউলায় ১৯৩৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এক প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[১১] মওলানা আবদুল্লাহ হেল বাকীর (১৮৮৬-১৯৫২) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মন্ত্রী সৈয়দ নওশের আলী (১৮৯১-১৯৭২), মওলানা শামসুদ্দীন আহমেদ (১৮৮৯-১৯৬৯) সহ অন্যান্য নেতা।[১২] হাতেম আলী খান সম্মেলনে যোগদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ প্রজা সম্মেলনের প্রভাব কাজে লাগিয়ে তিনি কৃষকদের প্রজা আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করেন।[১৩] একজন কৃষক নেতা হিসেবে পরবর্তীতে জেলায় জেলায় সংঘটিত সকল সম্মেলনে হাতেম আলী খান অংশগ্রহণ করতেন। এ সময় টাঙ্গাইলের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে গোপালপুর ও মধুপুর অঞ্চলে তিনি একটি শক্তিশালী কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হন।[১৪]

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে অবিভক্ত বাংলায় প্রায় ৬০ লাখ ভাগচাষী তেভাগার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে।[১৫] ১৯৪৭ সালের মার্চ পর্যন্ত নাটোর, দিনাজপুর, পাবনা, কুড়িগ্রাম, বগুড়া, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল, যশোর এরূপ ১৯টি জেলায় এই আন্দোলন চলে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টি ছিল এ আন্দোলনের প্রধান চালিকা শক্তি। কৃষকদের দাবি আদায়ে হাতেম আলী খান তার এলাকায় তেভাগা আন্দোলন শুরু করেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রমে টাঙ্গাইলে তেভাগা আন্দোলন বেগবান হয়ে উঠে। টাঙ্গাইলে এ আন্দোলন সফল হওয়ার পর তিনি রংপুর, দিনাজপুর, রায়পুর ও মুন্সিগঞ্জ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন সংগঠনে কাজ করেন।[১৬]

টাঙ্গাইল মহকুমা থেকে তেভাগা আন্দোলনের প্রভাব নি:শেষ হওয়ার আগেই পাকিস্তান আন্দোলনের ব্যাপকতা গোটা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে পূরণচাঁদ যোশী (১৯০৭-১৯৮৯) ও বঙ্কিম মুখার্জী (১৮৯৭-১৯৬১) সহ কমিউনিস্ট পার্টির বেশ কয়েকজন নেতা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিকে 'ন্যাশনাল মাইনরিটির আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার' বলে স্বীকৃতি দেন।[১৭] এ স্বীকৃতির ফলশ্রুতিতে হাতেম আলী খান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি এলাকার কৃষকদের পাকিস্তান আন্দোলনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু হেমনগরের জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী (১৮৩৩-১৯২৫) এসময় মুসলমান প্রজাদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেন।[১৮] জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন কংগ্রেসের সমর্থক এবং পাকিস্তান আন্দোলন বিরোধী। তাই পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক মুসলমান প্রজাদের ওপর তিনি অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। এ সময় হাতেম আলী খান অত্যাচারিত প্রজাদের সাথে থেকে এই জমিদারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করেন। জমিদার বিরোধী স্বশস্ত্র হামলার মুখে জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরী এলাকা ছেড়ে কলকাতায় চলে যেতে বাধ্য হয়।[১৯] ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির ওপর মুসলিম লীগ সরকার প্রচণ্ড দমননীতি চালায়। ফলে এ দলের অনেক সদস্য আত্মগোপনে চলে যান।[২০] কিন্তু হাতেম আলী খান প্রকাশ্যে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর (১৮৮০-১৯৭৬) সঙ্গে সুদৃঢ় যোগাযোগ গড়ে তোলেন।[২১] ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় ২০ হাজার উদ্বাস্তু হেমনগর এসে অবস্থান নিলে তাদের একমাস থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন হাতেম আলী খান।[২২]

দেশ বিভাগের পর মুসলিম নেতৃত্ব ও সরকারের গণবিরোধী কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় নেতা মওলানা ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬), শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫), শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এ দল প্রতিষ্ঠার পর শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এই দলে যোগদান করেন। দেশে গণতান্ত্রিক ধারা বিকাশের ইতিহাসে 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র জন্ম একটি তাৎপর্যময় ঘটনা।[২৩] আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের এক বছর পর ১৯৫০ সালে মওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আওয়ামী মুসলিম লীগের জেলা শাখা গঠন করার জন্য ময়মনসিংহ আসেন।[২৪] এ সময় হাতেম আলী খান ময়মনসিংহে গিয়ে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ময়মনসিংহে ভাসানী ও সোহ্‌রাওয়ার্দী জেলা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর টাঙ্গাইলে মহকুমা আওয়ামী লীগ গঠনের দায়িত্ব হাতেম আলী খানের ওপর অর্পণ করেন। তার অক্লান্ত সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় খুব অল্প সময়ে টাঙ্গাইলে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' একটি শক্তিশালী

সংগঠনে পরিণত হয়।[২৫] পূর্ববাংলা সরকার ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা রহিত করার পর কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কৃষক সমিতি পুনর্গঠনের জন্য মওলানা ভাসানীকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু মওলানা ভাসানী জাতীয় রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে (১৯০০-১৯৮৬) দায়িত্ব দেওয়া হয়।[২৬] মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ সংগঠনের সভাপতি ও মহিউদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[২৭] এ সময় হাতেম আলী খান কৃষক সমিতির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের সাথে সম্পৃক্ততা সত্ত্বেও দুটি কারণে তিনি কৃষক সমিতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমত, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এ দায়িত্ব গ্রহণে তাকে উৎসাহিত করেন কারণ তিনি ছিলেন ভাসানীর প্রিয়পাত্র ও আস্থাভাজন ব্যক্তি। দ্বিতীয়ত, তার রাজনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষক সম্প্রদায়। কৃষক আন্দোলনের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে তিনি জেলা আওয়ামী লীগের দায়িত্ব সূচারুরূপে সম্পাদন করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি তার এলাকায় আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সারির নেতায় পরিণত হন। একদিকে সাংগঠনিক তৎপরতা ও কর্মদক্ষতা, অন্যদিকে মওলানা ভাসানীর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে হাতেম আলী খান ১৯৫৪ সালে ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়েই হাতেম আলী খান 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র রাজনীতি শুরু করেন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের একজন আঞ্চলিক নেতা হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে অসামান্য অবদান রাখেন। অর্থাৎ ধর্মান্ধ রাজনীতিতে বিশ্বাসী মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে দীক্ষিত করেন।[২৮] এসময় হাতেম আলী খান বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র কাউন্সিলে অংশগ্রহণ করেন এবং একজন উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক নেতা হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতে নিজের অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হন।[২৯] ১৯৫৫ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'কে অসাম্প্রদায়িকীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর ঢাকার সদরঘাটে অবস্থিত 'রূপমহল' সিনেমা হল-এ 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে'র তিনদিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[৩০] ১৯৫৫ সালের ২৩ অক্টোবর কাউন্সিল অধিবেশনে প্রায় ৮০ টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এগুলোর মধ্যে পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন, অর্থনৈতিক মুক্তি ও বৈদেশিক নীতির রূপরেখা সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া গুরুত্ব পায়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শেখ মুজিবুর রহমান উত্থাপিত কার্যনির্বাহী পরিষদ চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। হাতেম আলী খান এ কার্যনির্বাহী পরিষদে টাঙ্গাইল অঞ্চলের সদস্য নির্বাচিত হন।[৩১]

হাতেম আলী খান ভাষা আন্দোলনের সূচনা থেকে ১৯৫২ সালের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। টাঙ্গাইলে আওয়ামী মুসলিম লীগের সদস্য, শুভানুধ্যায়ী, ছাত্র-যুব কর্মীদের আন্দোলনের জন্য সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। তার তৎপরতার ফলে টাঙ্গাইলে ভাষা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, ছাত্রকর্মী ও সাধারণ মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। টাঙ্গাইলে যে ক'জন নেতার সাহসী ভূমিকা ও সাংগঠনিক দক্ষতায় টাঙ্গাইলে ভাষা আন্দোলন জোরালো হয়েছিল হাতেম আলী খান তাদের মধ্যে অন্যতম। দল, মত নির্বিশেষে ভাষাভিত্তিক জাতীয় রাজনীতির বিকাশে আঞ্চলিক নেতা হিসেবে তার ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩২]

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ছিল পূর্ববাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অবিস্মরণীয় রাজনৈতিক ঘটনা। স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকারের উপর সাধারণ মানুষ এতটাই অসন্তুষ্ট ছিল যে, নির্বাচনী অভিযান শুরু হওয়া মাত্র যুক্তফ্রন্টের অনুকূলে এক ব্যাপক গণজাগরণের সৃষ্টি হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরে 'যুক্তফ্রন্ট' নামক রাজনৈতিক জোট জয়লাভ করে।[৩৩] মুসলিম লীগ সরকারের সকল প্রকার মিথ্যা অপপ্রচারকে উপেক্ষা করে টাঙ্গাইলের জনগণ যুক্তফ্রন্টের নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে মুসলিম লীগ প্রার্থীদের ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে।[৩৪] এ নির্বাচনে হাতেম আলী খান যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে গোপালপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) ও খন্দকার আবদুস সামাদ। নির্বাচনের ফলাফলে হাতেম আলী খান বিপুল ভোটে বিজয়ী হন।[৩৫] ১৯৫৪ সালের সুষ্ঠ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে পূর্ব পাকিস্তানে একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ আসে। কিন্তু মুসলিম লীগ দল ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের কারণে তা বাস্তবায়ন হয়নি। ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পরপরই খুলনা ম্যাচ ফ্যাক্টরি, চন্দ্রঘোনা পেপার মিল, আদমজী পাটকলসহ অন্যান্য কারখানায় বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা বাঁধিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা প্রচার করে যে, প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে যুক্তফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছে। ফজলুল হকের কলকাতায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতা বিকৃতভাবে প্রকাশ করে তাকে দেশদ্রোহী বলে অভিহিত করে। এভাবেই কেন্দ্রীয় সরকার নানা রকম ষড়যন্ত্র করে ১৯৫৪ সালের ২৯ মে যুক্তফ্রন্ট (ফজলুল হক) মন্ত্রিসভা বাতিল করে দিয়ে পূর্ববাংলা প্রদেশের উপর গভর্নরের শাসন জারি করে।[৩৬] পূর্ব পাকিস্তানে ৯২ (ক) ধারা জারি করে প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেফতার করে। গভর্নরের শাসনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই যুক্তফ্রন্টের ৬৫৯ জন সক্রিয় কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। তাছাড়া যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১৩ জন নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যকেও গ্রেফতার করা হয়।[৩৭] এ সময় সংগ্রামী নেতা হাতেম আলী খানকে গ্রেফতার করা হয়। পাকিস্তান সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তারা পূর্ব পাকিস্তানিদের পুরোপুরি ক্ষমতাহীন করার জন্য নানামূখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানিদের স্বার্থবিরোধী ভিন্ন ভিন্ন বৈদেশিক চুক্তিও সম্পাদন করা হয়। হাতেম আলী খান আওয়ামী মুসলিম লীগের একজন নেতা হিসেবে প্রতিক্রিয়াশীল বৈদেশিক নীতি ও কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সবসময় সংগ্রাম করেছেন, সোচ্চার থেকেছেন। এ ব্যাপারে পুরোপুরি তিনি ভাসানীর অনুসারী ছিলেন।[৩৮]

১৯৫৬ সালের ৩০ আগস্ট আবু হোসেন সরকারের (১৮৯৪-১৯৬৯) মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। কোয়ালিশন সরকারের মূখ্যমন্ত্রী হন আতাউর রহমান খান। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠনের পাঁচদিন পর কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিক পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর এই নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। কেন্দ্র ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই সরকার গৃহীত বিভিন্ন নীতির প্রশ্নে পার্টির অভ্যন্তরে কোন্দল দেখা দেয়। আওয়ামী লীগের দুই নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা

ভাসানীর মধ্যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়।[৩৯] সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করলে মওলানা ভাসানী সোহ্‌রাওয়ার্দীকে তার মতামত সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন।[৪০] কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দী মার্কিনঘেঁষা নীতিতে অবিচল থাকলে মওলানা ভাসানী স্বাভাবিকভাবেই বেশ ক্ষুব্ধ হন। এসময় আওয়ামী লীগের মধ্যে 'গা ঢাকা' দিয়ে থাকা কমিউনিস্টরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারীতে অনুষ্ঠিত পার্টির কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। এভাবেই পররাষ্ট্রনীতিকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের মধ্যে দুটি ভিন্ন মতাবলম্বী গ্রুপের সৃষ্টি হয়।[৪১] হাতেম আলী খান পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে মওলানা ভাসানীকে সমর্থন করেন।[৪২]

প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচি বিরোধী কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির ইতিহাসে কাগমারীর সম্মেলন একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কেননা পূর্ব পাকিস্তানের একক বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের ভাঙ্গন এখান থেকেই শুরু হয় যাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি স্পষ্টত পটপরিবর্তন বলা যেতে পারে। তৎকালীন মহকুমা শহর টাঙ্গাইলের কাগমারীতে ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সকালে সন্তোষ নাটমন্দিরে ৮৯৬ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলন শুরু হয়।[৪৩] কাগমারী সম্মেলন সফল করার জন্য হাতেম আলী খান অন্যান্য নেতা কর্মীর সাথে কঠোর পরিশ্রম করেন যেহেতু তিনি ছিলেন মওলানা ভাসানীর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তার ওপর দায়িত্ব ছিল কৃষি ও শিল্প প্রদশর্নীর ব্যবস্থাপনা এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। এক পর্যায়ে এ সম্মেলনে ভাসানীপন্থি ও ভাসানী বিরোধী উভয় গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। উত্তেজনা প্রশমন ও উভয়পক্ষকে শান্ত রাখার ক্ষেত্রে হাতেম আলী খান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৭ সালের ২৪ জুলাই মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদে ইস্তফা দিলে দেশের প্রগতিশীল অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে হাতেম আলী খানও তাকে স্বাগত জানান।[৪৪]

মওলানা ভাসানীর পদত্যাগ পত্র তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদ (১৯২৮-২০১২), *দৈনিক সংবাদ* সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর (১৯২২-১৯৮০) নিকট পৌঁছে দেন। ভাসানীর পদত্যাগপত্র নিয়ে এসময় আওয়ামী লীগের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে অলি আহাদকে আওয়ামী লীগ থেকে বরখাস্ত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদে মূখ্যমন্ত্রীর কক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব আবুল মনসুর আহমদের সভাপতিত্বে ওয়ার্কিং কমিটির মূলতবী সভায় এই বরখাস্তের আদেশ দেওয়া হয়। অলি আহাদ তার গ্রন্থে এ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-

> "...সভাপতির আসন হইতে স্বয়ং আবুল মনসুর আহমদ প্রস্তাব করিলেন যে, "মিঃ অলি আহাদকে সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হউক। সর্বমোট ৩৭ জন সদস্যের মধ্যে আমিসহ ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলাম। ৩০ জনের মধ্যে ১৪ জন সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন এবং ৯ জন সদস্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট ও প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন।"[৪৫]

হাতেম আলী খান (এম পি এ) তৎকালীন বাস্তবতায় মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক ধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি অলি আহাদের এই বরখাস্তের আদেশের ভোটাভুটিতে প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দান করেন। তিনি শুধু বিপক্ষে ভোট প্রদানই করেননি বরং প্রস্তাবের প্রতিবাদস্বরূপ তার সদস্যপদ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে পদত্যাগ করেন।[৪৬] আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেই মওলানা ভাসানী সারা পাকিস্তানভিত্তিক একটি প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। দল গঠনের প্রস্তুতি পর্বে মওলানা ভাসানী দেশব্যাপী জনসভা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং জনমত গড়ে তোলেন। এ সময় হাতেম আলী খান সবসময় মওলানা ভাসানীর সাথে ছিলেন। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে দেশের প্রথম প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দল 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (ন্যাপ) গঠন করা হয়। 'ন্যাপ' এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদক হন মাহমুদুল হক ওসমানি। এসময় হাতেম অলী খান ন্যাপের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, ময়মনসিংহ জেলা ন্যাপের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য এবং টাঙ্গাইল মহকুমা ন্যাপের সভাপতি হন। ন্যাপ গঠনের পর বিপুল রাজনৈতিক সম্ভাবনার মুখে মওলানা ভাসানী কৃষক সমিতি পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেন।[৪৭] এ লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে সন্তোষে 'কৃষক মজদুর কর্মী সম্মেলন' আহবান করেন। এরপর ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে রংপুর জেলার ফুলছড়ি ঘাটে মওলানা ভাসানী এক বিশাল কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সম্মেলনে কৃষক সমিতি পুনর্গঠন করা হয়। সম্মেলনে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও হাতেম আলী খানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসন বিদ্যমান থাকায় অনেকটা গোপনে সাংগঠনিক তৎপরতা চালাতে হয়। কৃষক সমিতির প্রচার কাজের মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়াকে সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া হিসেবেই তুলে ধরতে সক্ষম হন। মওলানা ভাসানী ও হাতেম আলী খানের অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা, কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের কর্মীদের যুগোপযোগী কর্মসূচির ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব জেলাতেই কৃষক সমিতির শাখা গড়ে উঠে।[৪৮]

কৃষক সমিতির পুনর্গঠনের সময় ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা (১৮৯৯-১৯৬৯) দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট হলে নানা রকম প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করে এবং গণগ্রেফতার শুরু করলে এ সময় হাতেম আলী খান আত্মগোপন করেন।[৪৯] সামরিক শাসনের অবসানের পর রাজনৈতিক পার্টি ও শ্রেণি প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ তৈরি হয়। হাতেম আলী খান চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসে কৃষক সমিতির সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি ১৯৬৩ সালের জানুয়ারিতে প্রধান শিক্ষক পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে প্রাদেশিক কৃষক সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করার জন্য কাগমারীতে মওলানা ভাসানীর কাছে চলে আসেন। ঐ সময় একমাস কাগমারীতে থেকে তিনি কৃষক সমিতির লক্ষ্য ও দাবি সম্বলিত ৫ হাজার বিজ্ঞাপন ও রশিদ ছাপিয়ে প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে তিনি এবং সদ্য কারামুক্ত কৃষক নেতা জিতেন ঘোষ (১৯০১-১৯৭৬) ওসমান গণি রোডে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে কৃষক সমিতি অফিস খোলেন। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে মওলানা ভাসানীর একটি 'লিথো সাইক্লোস্টাইল প্রেস' নিয়ে হাতেম আলী খান টাঙ্গাইলে যাওয়ার সময় বাসস্ট্যান্ডের কাছে গ্রেফতার হন। এরপর

লালবাগ থানায় সাতদিন আটক রেখে তার উপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়।[৫০] ১৯৬৪ সালের শুরু থেকেই হাতেম আলী খান মওলানা ভাসানীর সাথে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সফর করেন। তিনি এসময় কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং কৃষকদের সামগ্রিক সমস্যা বিশ্লেষণ করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৫১] ১৯৬৫ সালের ১-৩ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের অব্যবহিত আগে রংপুরের পীরগাছায় কৃষক সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে হাতেম আলী খান দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তৃতা প্রদান করেন। পীরগাছার সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও হাতেম আলী খানকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পুনর্নির্বাচিত করা হয়। তাছাড়া এ সময় তিনি সমস্যাগ্রস্থ কৃষক সমাজের সার্বিক উন্নতিতে করণীয় সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার শুরু করেন।[৫২] এভাবেই তিনি আমৃত্যু কৃষক সমাজের ভাগোন্নয়নে কাজ করে গেছেন।[৫৩]

১৯৬৮ সালের ২৭-২৮ এপ্রিল পাবনার লাহিড়ী মোহনপুরে কৃষক সমিতির সম্মেলনে মওলানা ভাসানী সভাপতি ও হাতেম আলী খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনে কৃষকদের পক্ষ থেকে খাজনা, ঋণ, দ্রব্যের দাম, কৃষক, জেলে তাঁতীদের কাজের উপকরণ ইত্যাদি সরবরাহ সংক্রান্ত দাবি উপস্থাপন করা হয়।[৫৪] ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনসমূহ তৎকালীন বিদ্যমান বিরোধী দলগুলোকে আইয়ুব বিরোধী কার্যক্রমে সমবেত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে একমত হয় এবং সম্মিলিত বিরোধীদল নামে একটি জোট গঠন করে। এই জোট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সকল বিরোধীদলের পক্ষে মিস ফাতিমা জিন্নাহকে প্রার্থী মনোনয়ন করে।[৫৫] ১৯৬৪ সালের ১৫ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তানে কপের (Combined Opposition Parties বা সম্মিলিত বিরোধী দল) নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু হয়। ফাতেমা জিন্নাহ (১৮৯৩-১৯৬৭) ২১ অক্টোবর ময়মনসিংহে জনসভা করেন। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালায়। এ নির্বাচনী প্রচার অভিযানে হাতেম আলী খান সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এভাবে তিনি একজন আঞ্চলিক নেতা হিসেবে স্বৈরাচারবিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন।[৫৬]

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি আইয়ুব খান দ্বিতীয়বারের মতো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন কৌশলে দমনের জন্য কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে আইয়ুব খান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।[৫৭] যুদ্ধের সময় হাতেম আলী খান সাংগঠনিক সফরে ময়মনসিংহে যান। জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে পুলিশ হাতেম আলী খানকে গ্রেফতার করলে কয়েক মাস পর হাইকোর্টের রিট আবেদনের মাধ্যমে তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হন। পাক-ভারত যুদ্ধে বৈদেশিক সমর্থনের ওপর মূল্যায়ন করে ন্যাপের এক অংশ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে চীনপন্থি আদর্শ সমর্থন করেন এবং পাকিস্তানের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। অপর অংশ অধ্যাপক মুজফ্ফর আহমদের (১৮৮৯-১৯৭৩) নেতৃত্বে যুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির যেসব নেতাকর্মী ন্যাপের সঙ্গে মিলেমিশে মূল সংগঠন ও বিভিন্ন অংঙ্গ সংগঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন সঙ্গত কারণেই তারা মওলানা ভাসানী ও মুজফ্ফর আহ্মদের

নেতৃত্বে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যান। এ সময় হাতেম আলী খান মুজফ্ফর আহ্মদের প্রতি তার সমর্থন ব্যক্ত করেন। তিনি তখন ন্যাপ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও টাঙ্গাইল জেলা ন্যাপের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন।

ন্যাপের দ্বিধাবিভক্তি প্রায় চূড়ান্ত হওয়ার পর পরই ১৯৬৬ সালে কুলাউড়ায় কৃষক সমিতির সম্মেলন আহবান করা হয়। এ সম্মেলনে কৃষক সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এক প্যানেলে মওলানা ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) সভাপতি ও আবদুল হক (১৯২০-১৯৯৫) সাধারণ সম্পাদক হন। অন্য প্যানেলে আমজাদ হোসেন (১৯২৪-১৯৭১) সভাপতি ও হাতেম আলী খান সাধারণ সম্পাদক হন। এই দ্বিধাবিভক্তি ছিল হাতেম আলী খানের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কারণ এতে ভাসানীর মতো জনপ্রিয় একজন কৃষক নেতার সঙ্গে তার কাজের ক্ষেত্র পৃথক হয়ে যায়। এতে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন, কিন্তু ভেঙ্গে পড়েননি বা মনোবল হারাননি। পূর্ব পাকিস্তানের এই দ্বিধাবিভক্ত রাজনীতির প্রেক্ষাপটে হাতেম আলী খান নিজ মতাবলম্বী ধারায় অবস্থান করে একজন সফল আঞ্চলিক নেতায় পরিণত হয়েছিলেন।[৫৮] ১৯৬৭ সালে কৃষক সমিতির ঢাকা জেলার রায়পুরা অঞ্চলে এক বিশাল কৃষক সমাবেশ আয়োজন করে। এই সমাবেশে প্রায় দশ হাজার কৃষক একত্রিত হয়। সমাবেশ শেষে তারা বিভিন্ন দাবি দাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তৎকালীন গভর্নরের কাছে প্রদানের জন্য মিছিল করে কৃষকরা ঢাকার দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ গ্রেফতার শুরু করে। বর্বর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদ সমাবেশ সভাস্থল থেকে অন্যান্য নেতাদের সাথে হাতেম আলী খানকেও গ্রেফতার করা হয়। এর কিছুদিন পর হাতেম আলী খানের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় অভিযোগ করা হয় যে, নেত্রকোনা মহকুমার বোয়ার হাটে আয়োজিত এক কৃষক সমাবেশে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক বক্তৃতা দিয়েছেন। এ অভিযোগে তাকে আড়াই বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[৫৯] ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের পতনের পর জেল থেকে বের হয়ে কৃষক সমিতির সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সহ সভাপতি হিসেবে হাতেম আলী খান ঢাকা জেলার কৃষক সমিতির বিশেষ সম্মেলনে কৃষক বান্ধব বিভিন্ন দাবি দাওয়া পেশ করে পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন বেগবান করেন।[৬০]

গণআন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে ইয়াহিয়া খান (১৯১৭-১৯৮০) আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করেন।[৬১] এই আদেশের অধীনে তিনশ তেরো সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় সংসদ গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন। জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য জাতীয় পরিষদে একশত বাষট্টি আসন বরাদ্দ করা হয়।[৬২] এ নির্বাচনে হাতেম আলী খান ন্যাপের (মুজাফ্ফর) প্রার্থী হিসেবে টাঙ্গাইলের গোপালপুর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু নিজ এলাকায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বীর কালো টাকার দৌরাত্বের কাছে তিনি পরাজিত হন।[৬৩] পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। বাকী ২টি আসনের ১টি পান পি ডি পি নেতা নূরুল আমীন (১৮৯৩-১৯৭৪), অপরটি রাজা ত্রিদিব রায় (১৯৩৩-২০১২) স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। ১০ দিন পর অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। অপরপক্ষে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে।[৬৪] এ নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত

হয়। এরপর ইয়াহিয়া খান (১৯১৭-১৯৮০) সামরিক বাহিনী ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর (১৯২৮-১৯৭৯) সমর্থন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া থামিয়ে দেন। যে মূহুর্তে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য পাকিস্তান প্রস্তুত ছিল, সে মূহুর্তেই সামরিক বাহিনী তাদের প্রভাব হারানোর আশঙ্কায় পুরো প্রক্রিয়াকেই নস্যাৎ করে দেয়। এ ক্ষেত্রে ভুট্টোর সহযোগিতা সামরিক বাহিনীর হাতকে আরও শক্তিশালী করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম দলটির পূর্ণ সমর্থন পেয়ে সামরিক বাহিনীর পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাস ও নিপীড়ন চালানো সহজতর হয়।[৬৫] ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাতে পাকিস্তান সেনা বাহিনীর বর্বর সৈন্যরা নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে আক্রমণ করার ফলে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। ইতিহাসের নজিরবিহীন হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা কবলিত সাড়ে সাত কোটি বাঙালি দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।[৬৬] ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ঘটনা খুব দ্রুত সারা দেশে পৌঁছে যায়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় টাঙ্গাইল শহরের ছাত্র জনতা ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করার শপথ গ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিরোধের প্রয়াস হিসেবে টাঙ্গাইলের মধুপুর, কালিহাতি, মির্জাপুর, গোপালপুর এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী যুব প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠে।[৬৭] এসময় হাতেম আলী খান নিজ গ্রামে অবস্থান করছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে এখানে তিনি নিজ এলাকার তরুণদেরকে সংগঠিত করা শুরু করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং সবার সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তৎপরতা শুরু করেন। মওলানা ভাসানী এ সময় তাকে ভারতে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি দেশের অভ্যন্তরে থেকেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের কাজ করেন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস হাতেম আলী খান কখনো টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার শ্বশুয়ার চর এবং কখনো হেমনগর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের দিক নির্দেশনা ও নানাভাবে সহায়তা করেছেন।[৬৮] দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে নরসিংদীর বেলাবোতে কৃষক সমিতির সভা হয় যেখানে হাতেম আলী খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে হাতেম আলী খান ন্যাপ (মুজফ্‌ফর) এর মনোনয়ন নিয়ে গোপালপুর-ভুঞাপুর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সামান্য ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে বগুড়া কৃষক সম্মেলনে তিনি সিনিয়র সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৭৬ সালে ঢাকার রায়পুরা কৃষক সমিতির সম্মেলনে কৃষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। সংগঠনের সভাপতি হওয়ার অল্প কিছুদিন পর তিনি গলার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৭ সালে ২৪ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন।[৬৯]

হাতেম আলী খান জমিদার পরিবারে সন্তান হয়েও জমিদার বিদ্বেষী ছিলেন এবং কৃষকদের সঙ্গে একাত্ব হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি প্রচারবিমুখ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তার রাজনৈতিক চেতনার উৎস ছিল বঞ্চিত জনগণ, খেটে খাওয়া ও সর্বহারার দল। পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের (১৯৪৭-৭১) অধিকাংশ পর্যায়ে হাতেম আলী খানের কর্মদক্ষতা, ত্যাগ ও একনিষ্ঠ অবদান বিবেচনায় তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক নেতা হিসেবে মূল্যায়নযোগ্য।

প্রান্তটীকা

১. সাক্ষাৎকার, জাহিদ খান (হাতেম আলী খানের নাতি), টাঙ্গাইল, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
২. খান মাহবুব, *টাঙ্গাইল জেলা পরিচিতি*, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৪-৪৫
৩. **সূর্যসেন** বিপ্লবী যুগান্তর দলের চট্টগ্রাম শাখার প্রধান এবং ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রধান সংগঠক। ১৮৯৪ সালে চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলেজে পড়া অবস্থায় বিপ্লবী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। মোহাম্মদ শাহ, *বাংলাপিডিয়া*

সত্যেন সেন (১৯০৭- ১৯৮১) প্রগতি ও শিল্পী সংঘ উদীচী সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কিংবদন্তী বিপ্লবী, সাহিত্যিক ও শ্রমিক সংগঠক। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি যুক্ত হন বিপ্লবী দল যুগান্তরের সাথে। আজীবন এ রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। তপন বাগচী, *বাংলাপিডিয়া*

প্রখ্যাত কৃষক নেতা **জিতেন ঘোষ** জন্মেছিলেন ১৯০১ সালে মুন্সিগঞ্জ জেলার কুমার ভোগ গ্রামে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিক্রমপুরের স্থান ছিল অনন্য। ১৯২১ সালে জিতেন ঘোষ অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে কলেজ ত্যাগ করে আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হন। এই আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে ব্রিটিশ সরকার তাকে গ্রেফতার করে দেড় বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। কংগ্রেস গণআন্দোলনের প্রথম যুগে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কংগ্রেসকর্মী। কিন্তু তারপরও রাজনৈতিক দিক নির্ণয়ের পরিপূর্ণতা পাননি। সর্বশেষ জনগণের একমাত্র শোষণ মুক্তির পথ মার্কসবাদ, লেনিনবাদের তত্ত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক পরিপূর্ণতা আসে। শামসুজ্জামান খান, সেলিনা হোসেন (সম্পা.), *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১০৮-১০৯

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ভারতীয় উপমহাদেশের শুধুমাত্র একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। তার লেখায় ('বিদ্রোহী', 'অগ্নিবীণা', 'রাজবন্দীর জবানবন্দী', 'ভাঙার গান' ইত্যাদি রচনা, *জাতীয়তাবাদী মুসলিম পত্রিকা*, *দৈনিক নবযুগ*, *ধূমকেতু সাময়িকী*) সংগ্রামী মানসিকতা এবং সংগ্রামী অনুপ্রেরণার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের আকাঙ্খা থেকেই তিনি ১৯১৭ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় সেনা বাহিনীতে সৈনিক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। তার সাহিত্যকর্ম ছিল সব ধরণের শোষণের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। কাজী নজরুল ইসলাম স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে নিজে এবং তার সাহিত্য কর্ম দিয়ে সকল বাঙালির প্রেরণার উৎস্য ছিলেন।
https://www.unfoldbangla.com>article)

৪. খান মাহবুব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫
৫. সাক্ষাৎকার, জাহিদ খান (হাতেম আলী খানের নাতি), *প্রাগুক্ত*
৬. যে নিয়মতান্ত্রিক পথে বাংলায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বদেশি আন্দোলন চলছিল সেই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সেদিন অনেক যুবককেই বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এই বিক্ষুব্ধ যুবদল শুধু বিলাতী দ্রব্য বর্জন নীতিতে সমর্থন করেননি, তারা মূলত সেদিন মনে প্রাণে চেয়েছিলেন ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন। এই ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনের উদ্দেশ্যে তারা রুশ বিপ্লবের মত সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য তাগিদ অনুভব করেছিলেন এবং গড়ে তুলেছিলেন 'অনুশীলন সমিতি'। হোসেন উদ্দীন হোসেন, *বাঙলার বিদ্রোহ প্রথম খন্ড (৬০০-১৯৪৭)*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২৭৯, সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭*, পশ্চিম বাংলা পুস্তক পরিষৎ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১০৪-১০৬
৭. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পা.) স্মারক গ্রন্থ, *কৃষক নেতা হাতেম আলী খান*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা ২০১৩, পৃ. ৫৫-৫৬
৮. জুলফিকার হায়দার, *সংগ্রামী ঐতিহ্যের জাগ্রত চেতনা কৃষক নেতা হাতেম আলী খান*, প্রাঙ্গন প্রকাশন, ময়মনসিংহ, ২০০৩, পৃ. ২০
৯. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০১০ (প্রথম সংস্কার, ১৯৬৯), পৃ. ১৪-১৬
১০. সাক্ষাৎকার, তাহমিনা খান (হাতেম আলী খানের নাতনী), ১৭ এপ্রিল ২০১৫, টাঙ্গাইল
১১. বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। আবুল মনসুর আহমদসহ অন্যান্য কংগ্রেস দলীয় নেতা-কর্মী কংগ্রেস বর্জন করে মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে ১৯২৯ সালে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন করেন। স্যার আবদুর রহিম এই সমিতির সভাপতি ও মওলানা আকরম খাঁ এটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। এখানেই অধিকাংশ মুসলিম নেতা প্রজার পক্ষে প্রজা সমিতিতে সংঘবদ্ধ হন। আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫
১২. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫

মওলানা আবদুল্লাহ হেল বাকী (১৮৮৬-১৯৫২) বর্ধমান জেলায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তিনি কংগ্রেসপন্থি রাজনীতি করতেন। তিনি খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে (১৯১৯-১৯২২) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি ফজলুল হক গঠিত 'কৃষক প্রজা' আন্দোলনে যোগদান করেন এবং এ পার্টির সদস্য হয়ে ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে আবদুল্লাহ হেল বাকী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থী হয়ে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ সভাপতি এবং পরবর্তীতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ. ১৮১-১৮৪

সৈয়দ নওশের আলী (১৮৯০–১৯৭২) ১৯৩০ এবং ১৯৪০ এর দশকের একজন জাতীয়তাবাদী নেতা। তিনি তার রাজনৈতিক জীবনের বেশির ভাগ সময়ই দরিদ্র মুসলিম কৃষকদের পক্ষে অবস্থান নেন। ১৯২৮ সালে তিনি যশোর জেলা বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে সৈয়দ নওশের আলী 'কৃষক-প্রজা পার্টি'র প্রার্থী হিসেবে যশোর অঞ্চলে বিজয়ী হন। তিনি আজীবন কৃষক

প্রজার পক্ষে বামপন্থি নেতা হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাছাড়া ১৯৪৬ সালে শরৎ বসুর অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন। তিনি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। Rana Razzaque, *Some Aspects of Bengali Muslim Social and Political Thought (1918-1947,* Ph.D thesis, Dhaka University, 1997, p. 205-219

১৩. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫

১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬

১৫. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*

১৬. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬-১২৭। খান মাহবুব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫

১৭. **বঙ্কিম মুখার্জী (১৮৯৭-১৯৬১)** ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৩৬ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম নির্বাচিত সদস্য। ভারত স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ করা হলে বঙ্কিম মুখার্জী আত্মগোপন (১৯৪৮-১৯৪৯) করেন। পরবর্তীতে ১৯৫২ এবং ১৯৫৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচিত হন। কমিউনিস্ট সদস্য হিসেবে আজীবন শ্রমিক শ্রেণির কল্যাণে কাজ করেছেন। *https://bn.m.wkipedia.org>wiki*

পূরণ চাঁদ যোশী (১৯০৭-১৯৮৯) ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান আন্দোলনকারী। তিনি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়াপত্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। *https://bn.m.wkipedia.org>wiki*

১৮. **হেমচন্দ্র চৌধুরী (১৮৩৩-১৯১৫)** টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলায় হেমনগরের রাজবাড়ীর রাজা ছিলেন। তার নামেই এলাকাটির নামকরণ হয়। হেমনগর বিখ্যাত আম্বাবীয়ার জমিদার বংশের কালীচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র হেমচন্দ্র চৌধুরী। তিনি পুখুরিয়া পরগণার একআনি অংশের জমিদার ছিলেন। তিনি প্রজাদের কল্যাণে নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তবে প্রজা নিপীড়নের ক্ষেত্রেও তার কুখ্যাতি ছিল । খান মাহবুব, *বাংলাপিডিয়া*

১৯. সাক্ষাৎকার, জুলফিকার খান (হাতেম আলী খানের ভাতিজা), ৫ এপ্রিল ২০১৫, টাঙ্গাইল

২০. Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh*, UPL, Dhaka, 1980, p. 88 দেশভাগের আগে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। এরা অধিকাংশ ছিল হিন্দু-সম্প্রদায়ের। দেশভাগের পর অধিকাংশ হিন্দু নেতাকর্মী ভারত গমনের পর ১৯৫০ সালে কমিউনিস্ট সদস্য সংখ্যা কয়েকশ'তে নেমে আসে। Talukdar Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*, Bangladesh Books International Ltd., Dacca, 1975, p. 5

২১. সাক্ষাৎকার, তাহমিনা খান (হাতেম আলী খানের নাতনি), *প্রাগুক্ত*

২২. সাক্ষাৎকার, জাহিদ খান (হাতেম আলী খানের নাতি), *প্রাগুক্ত*

ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের মানুষ মনে করেছিল ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবসান হবে। একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই ধর্মের নামে পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয়েছিল। ভারত বিভাগ হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৫০ সালে কলকাতায় ভারতীয় ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলের (১৮৭৫-১৯৫০) মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে আপত্তিকর ও উস্কানিমূলক বক্তৃতার পর কলকাতাসহ পশ্চিম বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ব্যাপকহারে মুসলিম নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে হিন্দু বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড বিস্তারলাভ করে। এসময় পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তি দখল চলতে থাকে। রাজনৈতিক পরিচয়ে অনেকেই এসময় হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করে নেয়। ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল ও নেতাকর্মীরা দাঙ্গার জন্য সংঘটিত নির্মম হত্যাকাণ্ড ও প্রতারণার জন্য সরাসরি দায়ী ছিলেন। যতীন সরকার, *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১১৮। অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫

২৩. আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৭১

২৪. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত* পৃ. ২৪১

২৫. মাহমুদ কামাল, *টাঙ্গাইলের স্মরণীয় বারো মনীষী*, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৮৯-৯০

২৬. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কৃষক জমিতে তার মালিকানা হারায় এবং জমিদাররা জমির মালিকে পরিণত হয়। পরবর্তীতে পূর্ববাংলার কৃষক সমাজ জমিদারদের অত্যাচার নির্যাতনে দিশেহারা হয়ে ওঠে। কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ ও আইন (খাজনা আইন- ১৯৫৯, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন-১৮৮৫, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইন-১৯২৮, ১৯৩৮) প্রণীত হলেও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ছাড়া কৃষকদের জমিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৭-৪৮ সালে বাংলাব্যাপী 'তেভাগা আন্দোলনে'র প্রেক্ষিতে 'বঙ্গীয় বর্গাদার নিয়ন্ত্রন বিল' পাশের সুপারিশ করা হয় কিন্তু এ আন্দোলন স্থিমিত হলে বিলটি পার্লামেন্টে পাশ করা হয়নি। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পূর্ববাংলা মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের প্রতিজ্ঞা করা হয়। তাই দেশ ভাগের পর ভূমি সংস্কারে ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে পূর্ববাংলার সরকার আইন সভায় 'পূর্ববাংলা জমিদারি দখল এবং প্রজাস্বত্ব বিল' উপস্থাপন করে। প্রায় দুই বছর দীর্ঘ বিতর্কের পর ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে সামান্য অংশ সংশোধন করে প্রাদেশিক পরিষদে পাশ করে তা আইনে পরিণত হয়। এ আইনের বড় সুফল ছিল যে, কৃষক সমাজ জমিতে তাদের মালিকানা ফিরে পায়। সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭২-৫৮৫

২৭. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪-৪৫

মহিউদ্দিন আহমেদ (১৯২৫-১৯৯৭) পিরোজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তিনি মুসলিম লীগের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। তিনি ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মঠবাড়িয়া থেকে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে এম এল এ নির্বাচিত হন। স্থানীয়দের কাছে পান্না মিয়া নামে অধিক পরিচিত এই নেতা রাজনৈতিক জীবনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর অন্যতম সহচর ছিলেন। ১৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগের দুঃসময়কালে মহিউদ্দিন আহমেদ কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। *বাংলা ট্রিবিউন*, ঢাকা, ২২ এপ্রিল ২০১৭

২৮. সাক্ষাৎকার, জাহিদ খান (হাতেম আলী খানের নাতী), *প্রাগুক্ত*

২৯. বিভুরঞ্জন (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭-৮৮

৩০. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৭৮

৩১. আবু আল সাইদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৬

৩২. সাক্ষাৎকার, *প্রাগুক্ত*

৩৩. Rangalal Sen, *ibid*, p. 119-123

৩৪. তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪

৩৫. খান মাহবুব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮। তাহমিনা খান, *পূর্ব বাংলায় রাজনীতির সাংগঠনিক বিকাশ (১৯৪৭-১৯৫৭)*, সুবর্ণ প্রকাশনী ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৮৬-৮৮

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪–১৯৭৮) টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানার অন্তর্গত বিরামদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক। ১৯৪৮ সালের ৯ মার্চ গঠিত উচ্চ পর্যায়ের ১৪ সদস্য বিশিষ্ট ভাষা কমিটির একজন সদস্য। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং একই সালে বাংলার প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান এবং ১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য (ময়মনসিংহ-২) নির্বাচিত হন। খান মাহবুব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪১

৩৬. Rangalal Sen, *ibid*, p. 128-30

৩৭. *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ১-৩০ জুন ১৯৫৪

৩৮. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পা.) স্মারক গ্রন্থ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪-৩৫

৩৯. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের শাসনকাল ১৯৫৬-৫৮ এবং ১৯৭১-৭৫*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ. ১৭-১৮

৪০. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮। *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ২৬ জুলাই ১৯৫৭। আওয়ামী লীগের প্রধান ম্যানিফেস্টো ছিল স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে সাবেক প্রদেশসমূহ পুনর্গঠন এবং ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের (১৯৪০) ভিত্তিতে দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রাব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার জন্য আহবান জানান। *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ২৬ জুলাই ১৯৫৭

৪১. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭-২০

৪২. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

৪৩. মহসিন শস্ত্রপানি (সম্পা.) স্মারক সংকলন, *মজলুম জননেতা ভাসানী*, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পরিষদ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৭-৩৫

৪৪. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, প. ৯২-৯৫

৪৫. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮-২১০

৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫-২১০

৪৭. মহসিন শাস্ত্রপানি (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩-৬৮

৪৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯, পৃ. ৮। সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৩৪-২৩৫

৪৯. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯-১০০

৫০. সত্যেন সেন, *সংগ্রামী কৃষক নেতা হাতেম আলী খান*, (পুস্তিকা) ঢাকা, (প্রকাশের তারিখ নেই), পৃ. ১৩-১৪

৫১. *সাপ্তাহিক জনতা*, ঢাকা, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪

৫২. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬২

৫৩. সত্যেন সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩-১৪

৫৪. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯-১০০

৫৫. *The Pakistan Observer*, 12-15 July 1962.

৫৬. জুলফিকার হায়দার, *টাঙ্গাইলের রাজনীতি ও মুক্তিযুদ্ধ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৭-৫৮

৫৭. Kamruddin Ahmad, *A Socio Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh,* Inside Library, 1975, p. 158-159. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭-১৮।

১৯৬৫ সালের শুরু থেকেই ক্রমশ ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি হয়। এসময় পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় এক দেশ অন্যদেশকে দায়ী করতে থাকে। তবে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে মূল সমস্যা ছিল কাশ্মীর ও অন্যান্য কয়েকটি বিতর্কিত এলাকায় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম থেকে। ১৯৬৫ সালের ৫ আগস্ট পাকিস্তানি সৈন্য স্থানীয় কাশ্মীরের ছদ্মবেশে

‘লাইন অব কন্ট্রোল’ অতিক্রম করে এবং একই সময়ে কাশ্মীরের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে। পাকিস্তানিদের এই কার্যক্রম সম্পর্কে কাশ্মীরের স্থানীয় জনগণ ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে ১৫ আগস্ট ভারতীয় সৈন্যরা যুদ্ধবিরোধী রেখা অতিক্রম করে। এভাবে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও অবিশ্বাসের ফলেই এ যুদ্ধের সূচনা হয়। ১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের যুদ্ধবিরতি সীমারেখার ভিম্বার-চাম্ব এলাকা আক্রমণ করে। এই সংঘর্ষ আস্তে আস্তে তীব্র হয়ে ওঠে এবং ৬ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের পাঞ্জাব অঞ্চলের আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রম করে কাশ্মীরের যুদ্ধচাপ কমানোর জন্য লাহোর অভিমুখে তীব্র আক্রমণ শুরু করে। ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ১৭ দিন স্থায়ী হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের এ যুদ্ধের ফলেই আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের পতনের সূচনা হয়। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচেষ্টায় ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি ‘তাসখন্দ চুক্তি’ ঘোষণার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়। নূরুল হুদা আবুল মনসুর, *বাংলাপিডিয়া*। *দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ৬-১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

৫৮. সাক্ষাৎকার, তাহমিনা খান (হাতেম আলী খানের নাতনী) *প্রাগুক্ত*। সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃ. ৫২

৫৯. সাক্ষাৎকার, জাহিদ খান (হাতেম আলী খানের নাতী), *প্রাগুক্ত*

৬০. বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০

৬১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৪৮৩

৬২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৩-৪৮৭ ও ৫০৯-৫১১

৬৩. সাক্ষাৎকার, তাহমিনা খান (হাতেম আলী খানের নাতনী), *প্রাগুক্ত*

৬৪. *দ্যা ডন*, ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭০। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯২

৬৫. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩ পৃ. ৪১৮

৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮০

৬৭. মো. হাবিবউল্লাহ্ বাহার, *টাঙ্গাইল জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৮৪-৮৫

৬৮. সাক্ষাৎকার, জাহিদ খান (হাতেম আলী খানের নাতী), *প্রাগুক্ত*

৬৯. জুলফিকার হায়দার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১-৬২

চতুর্থ অধ্যায় : বৃহত্তর যশোর অঞ্চল

৪.১ মশিউর রহমান (১৯১৭-১৯৭১)

৪.২ রওশন আলী (১৯২১-১৯৯৪)

৪.১ শহীদ মশিউর রহমান (১৯১৭-১৯৭১)

প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, আইনজীবী শহীদ মশিউর রহমান ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যশোর জেলার চৌগাছা থানার সিংহঝুলি গ্রামে এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন বিশ্বাস এবং মাতা ছৈয়দুন্নেছা। তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে মশিউর রহমান ছিলেন দ্বিতীয়।[১] তার বাল্যকালে লেখাপড়া শুরু হয় গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে। ১৯২৬ সালে তিনি তৎকালীন চৌগাছা মিডিল ইংলিশ স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ১৯৩১ সালে যশোর জিলা স্কুলে (প্রতিষ্ঠিত ১৮৩৮) ভর্তি হন এবং ১৯৩৬ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর ১৯৩৮ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মৌলানা আজম কলেজ, ১৯২৬) হতে আই.এ এবং ১৯৪০ সালে বি.এ পাস করেন। ১৯৪৪ সালে মশিউর রহমান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন রিপন কলেজ (১৮৮৪, বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে আইন শাস্ত্রে 'ল' ডিগ্রি অর্জন করেন।[২] কলকাতায় আইনশাস্ত্রে পড়ার সময়ে তিনি একটি মার্চেন্ট অফিসের ইংরেজ কর্মকর্তার সহকারি হিসেবে কাজ করায় ইংরেজিতে দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনে সক্ষম হন।[৩]

কলকাতাতে ছাত্রাবস্থাতেই মশিউর রহমান মুসলিম লীগের ছাত্র শাখার রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন।[৪] ১৯৪৫ সালে তিনি সরাসরি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এসময় কলকাতাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) সাথে তার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। তাছাড়া কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর (১৮৯২-১৯৬৩) সংস্পর্শে আসেন এবং তার একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কাজ করেন। তাছাড়া ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন মশিউর রহমান। ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে যশোর জেলা মুসলিম লীগের নির্বাচনী অভিযান পরিচালনায় তিনিই নেতৃত্ব দেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই তিনি অগ্রসরমান সম্ভাবনাময় তরুণ নেতা হিসেবে মুসলিম লীগ সরকারের দমন পীড়ণ অগ্রাহ্য করে জনগণকে সংগঠিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পর নিজ জেলা যশোরে চলে আসেন এবং আইন ব্যবসার পাশাপাশি মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।[৫]

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ভাষা নিয়ে রাজনীতি শুরু করে। যশোরে ছাত্রদের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হলেও ঐ আন্দোলনে গণসম্পৃক্ততা ছিল অভাবনীয়। ভাষা আন্দোলনে যশোরের মূলকেন্দ্র ছিল ঐতিহ্যবাহী মাইকেল মধুসূদন কলেজের (প্রতিষ্ঠিত ১৯৪১) পুরনো ভবনটি, যা এখনো জীর্ণ ও ভগ্নদশায় কালের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এ ভবনের উত্তর দিকে অবস্থিত হলটিতেই (যেটি এল ভি মিটার লেকচার হল বলে পরিচিত ছিল) রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান (১৮৯৬-১৯৫১) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবির বিরোধিতা করার সঙ্গে সঙ্গে যশোরের ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ২৭ মতান্তরে ২৮ ফেব্রুয়ারি এলভি লেকচার হলে এক ছাত্রসভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ মার্চ কলেজে পূর্ণ ধর্মঘট

পালিত হয়।[৬] এসময় গণপরিষদের সিদ্ধান্ত এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগের বাংলা ভাষা বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, বিভিন্ন ছাত্রাবাসে গঠিত কমিটি এবং তমদ্দুন মজলিশের যৌথ উদ্যোগে ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ফজলুল হক হলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের একটি সভা আহবান করা হয়। ভাষা আন্দোলনকে সুষ্ঠ সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্যে এই সভায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি সর্বদলীয় পরিষদ গঠিত হয়। শামসুল আলম এ পরিষদের আহবায়ক হিসেবে মনোনীত হন। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যে সাব কমিটি গঠিত হয় তার কয়েকটি বৈঠকে ১১ মার্চের ধর্মঘট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চের ধর্মঘট শুধুমাত্র ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণার প্রতিবাদে সারাদেশে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়।[৭]

ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য জায়গায় মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে এই ধর্মঘট পালিত হলেও যশোর ছিল সেদিনের আর একটি ব্যতিক্রম। যশোরে গঠিত সংগ্রাম পরিষদে ছিল দেবীপদ চট্টোপাধ্যায় মানিক, অশোক ঘোষ, সুনীল রায় ও কাজী আবদুর রকীব।[৮] যশোরের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের প্রধান ভূমিকা ছিল যদিও এ পর্বে রাজনৈতিক নেতাদের পরোক্ষ সমর্থন ছিল। তা সত্ত্বেও আন্দোলনের সর্বদলীয় ব্যাপক ভিত্তি নিশ্চিত করতে শহরের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল থেকে যেমন কংগ্রেস নেতা ডা. জীবন রতন ধর (১৮৮৯-১৯৬৩), আওয়ামী লীগ নেতা মশিউর রহমান, কমিউনিস্ট পার্টি নেতা অনন্ত মিত্র, মুসলিম লীগ নেতা আবদুল খালেক প্রমুখকে সংগ্রাম পরিষদে যুক্ত করা হয়।[৯] যশোর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন আলমগীর সিদ্দিকী (১৯২৬-১৯৭৭) এবং হামিদা রহমান (১৯২৭-২০০৫)। সভাপতি ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি ডা. জীবন রতন ধর (১৮৮৯-১৯৬৩) (পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের জেলমন্ত্রী নিযুক্ত হন)। পরিষদের সদস্যদের মধ্যে অ্যাডভোকেট হবিবুর রহমান, অনন্ত মিত্র (কমিউনিস্ট পার্টির নেতা), অ্যাডভোকেট আবদুল খালেক (যিনি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভায় শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত হন), মশিউর রহমান উল্লেখযোগ্য।[১০] ১১ মার্চ যশোরে মোমিন গার্লস স্কুল ব্যাতীত অন্যান্য প্রত্যেকটি স্কুল ও কলেজে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হিসেবে মশিউর রহমান ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১১] ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকেই মশিউর রহমান সোচ্চার ছিলেন। ১৯৪৮ সালে সংঘটিত বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচিতে এবং ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে তিনি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন।[১২]

ঢাকা থেকে কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ১১ মার্চের কর্মসূচির কথা যশোর শহরে পৌঁছে এবং তার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য যশোর জেলা সংগ্রাম পরিষদ কর্মসূচি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়। যশোর সোসালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি অফিসে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে মশিউর রহমান, আবদুল খালেক, ডা. জীবন রতন ধর, কমরেড অনন্ত মিত্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।[১৩] কিন্তু ১০ মার্চ তৎকালীন যশোর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ই এ নোমানী আন্দোলনের পরিস্থিতি বুঝতে পেরে শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন। এই পরিস্থিতিতে ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের যৌথ সভায় ছাত্ররা এবং কমিউনিস্ট পার্টির অনন্ত মিত্র ও লুৎফর রহমান ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে মত দেন। কিন্তু অ্যাডভোকেট মশিউর রহমান, ডা. জীবন রতন ধর প্রমুখ তার বিরোধিতা করেন এবং এক পর্যায়ে বৈঠক ত্যাগ করে

চলে যান। ১১ মার্চ শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা একে একে মিছিল করে এম.এম.কলেজে (মাইকেল মধুসূদন কলেজ) এসে পৌঁছতে শুরু করে। এরপর শুরু হয় যৌথ বিশাল মিছিল। স্কুল কলেজের ছাত্রীরাও এদিন হামিদা রহমানের নেতৃত্বে এই মিছিলে অংশ নেয়। এই সময় মিছিলকারীদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, মোমিন গার্লস স্কুল (বর্তমান সরকারি বালিকা বিদ্যালয়) ও যশোর পি.টি.আই স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের ধর্মঘট ও মিছিলে যোগ দিতে বাঁধা দিচ্ছে। এসময় পুরো মিছিলটি সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সকল ছাত্রছাত্রী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে অংশ নেয়। মিছিলটি শহর ঘুরে জিলা স্কুলের দিক থেকে বার লাইব্রেরির সামনে দিয়ে আসার সাথে সাথে আইনজীবীরা এই মিছিলে অংশ নেয়। মশিউর রহমান 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই স্লোগান দিয়ে মিছিলের আগে এসে দাঁড়ান। তাকে দেখে আরও অনেক আইনজীবীও উপস্থিত জনসাধারণের মিছিলে যোগ দেন। মশিউর রহমান মিছিলে যোগ দেওয়ার সাথে সাথে মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতা করতালির মাধ্যমে তাকে অভিনন্দন জানান।[১৪] ১১ মার্চের ছাত্র-জনতার ঐ মিছিল তৎকালীন সময়ের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মিছিলটি প্রায় এক মাইল দীর্ঘ হয়েছিল যা রাষ্ট্রভাষার প্রতি যশোরের মানুষের স্বত:স্ফুর্ত সমর্থনেরই বহি:প্রকাশ। পুলিশ মিছিলটিকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করেনি যদিও পুলিশ গাড়িতে করে মিছিল অনুসরণ করছিল। বেলা ১ টার সময় মিছিল ট্রেডিং ব্যাংক ময়দানে জনসভার স্থলে এসে শেষ হয়। জনসভা শুরু হওয়ার আগ মুহূর্তে নেতৃবৃন্দ গোপন সূত্রে খবর পান যে, মিটিং শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হবে। মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।[১৫] সকলের অংশগ্রহণে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ জনসভায় সভাপতি হিসেবে মশিউর রহমান বক্তৃতা প্রদান করেন।[১৬] যদিও মশিউর রহমান ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষপাতি ছিলেন তথাপিও পরিস্থিতি বিচারে তিনি এ জনসভায় আন্দোলনকারীদের পক্ষে বক্তৃতা করেন।[১৭] জনসভা শেষ হওয়ার সাথে সাথে পুলিশ সশস্ত্র অবস্থায় এলাকাটি ঘিরে ফেলে গ্রেফতার শুরু করে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধাচরণ ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষ অবলম্বন করায় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ঐদিন মশিউর রহমানকে গ্রেফতার করে।[১৮] তাছাড়া সি পি আই (Communist Party of India) এর ছাত্র সংগঠন 'স্টুডেন্ট ফেডারেশন' এর পক্ষ থেকেও যশোরে ধর্মঘট পালিত হয়, মশিউর রহমান তাতে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন।[১৯] সে সময় যশোরের অনেক রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা, মিথ্যা মামলা ও রাজনৈতিক গ্রেফতারের প্রতিবাদে তিনি ১৯৪৮ সালে স্থানীয় কারাগারে আমরণ অনশন শুরু করেন। দীর্ঘ প্রায় ২০ দিন এভাবে অনশন করার পর প্রশাসন তার দাবি মেনে নেয়। তখন কলকাতা থেকে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এসে মশিউর রহমানের অনশন ভাঙ্গান। কারাগার থেকে বের হওয়ার পর তিনি আরও উৎসাহ নিয়ে আইন ব্যবসার পাশাপাশি রাজনীতিতে সময় দেওয়া শুরু করেন। তখন পর্যন্ত বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার জায়গাটি থেকে মুসলিম লীগ একেবারে বিতাড়িত হয়নি।[২০] এ অবস্থা থেকে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবেই মশিউর রহমান ১৯৪৯ সালে সর্বকনিষ্ঠ অর্থাৎ মাত্র ৩২ বছর বয়সে যশোর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। কিন্তু বাঙালির প্রতি মুসলিম লীগ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি যতই প্রকট হতে থাকে, মশিউর রহমানের সাথেও মুসলিম

লীগের দ্বন্দ্ব ততই বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের সঙ্গে মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায় ১৯৪৯ সালেই যশোর জেলা পরিষদের পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেন।[২১]

১৯৪৯ সালে মশিউর রহমান 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে' যোগদান করেন এবং যশোরে দলটির সংগঠনে ভূমিকা রাখেন।[২২] মুসলিম লীগের অপশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলিম লীগের প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করেন।[২৩] এ সময় যশোরে আওয়ামী মুসলিম লীগের আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে আহবায়ক হিসেবে কে ছিলেন তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, ১৯৪৯ সালের আওয়ামী মুসলিম লীগের যশোর জেলা শাখার আহবায়ক ছিলেন শাহ মোহাম্মদ আবুল খায়ের (পীর সাহেব, খড়কী)। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, আহবায়ক ছিলেন অ্যাডভোকেট মোশাররফ হোসেন (১৯২৫-১৯৭৪)।[২৪] তবে আহবায়ক নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের নেতৃবৃন্দ আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেছিলেন সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।[২৫] এ প্রগতিশীল অংশে যারা ছিলেন তারা হলেন শাহ মোহাম্মদ আবুল খায়ের, অ্যাডভোকেট হবিবুর রহমান, অ্যাডভোকেট মোশাররফ হোসেন, অ্যাডভোকেট মশিউর রহমান, অ্যাডভোকেট রওশন আলী, আবদুল খালেক, অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।[২৬] এ সময় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে মশিউর রহমানের ব্যক্তিগত যোগাযোগ শুরু হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব মশিউর রহমানকে 'প্রিয় ভাই' সম্বোধন করে একটি পত্র প্রেরণ করেন। মশিউর রহমান নিজেও শেখ মুজিবকে যশোরের রাজনীতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। পত্রের মাধ্যমে শেখ মুজিব তাকে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যক্রম শুরু করার উপযুক্ততা সম্পর্কে অবগত করেন। শেখ মুজিব আরও উল্লেখ করেন যে, তৎকালীন ঢাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূলে থাকায় বিলম্ব না করে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে মতামত প্রদান করেন। তাছাড়া শেখ মুজিব উপযুক্ত সময় দেখে মওলানা ভাসানীসহ যশোরে সাংগঠনিক সফর করবেন বলে এ পত্রের মারফতে জানান। এ সময় মওলানা ভাসানীও সাংগঠনিক প্রয়োজনে মশিউর রহমানের প্রয়োজনীয়তা তথা তার সাংগঠনিক কার্যক্রম উপলব্ধি করে শেখ মুজিবকে মশিউর রহমানের সাথে যোগাযোগের কথা বলেন।[২৭] মশিউর রহমান নিজ সাংগঠনিক দক্ষতায় খুব অল্পসময়ের ব্যবধানে আওয়ামী মুসলিম লীগে নিজের অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হন।[২৮] ১৯৪৯ সালের ১৬ নভেম্বর মওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় সেখানে মশিউর রহমান যশোর অঞ্চল থেকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।[২৯] ১৯৫০ সালে বৃহত্তর যশোর জেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে শাহ মোহাম্মদ আবুল খায়ের (পীর সাহেব, খড়কী) ও অ্যাডভোকেট হবিবুর রহমান। এ কমিটিতে মশিউর রহমান আওয়ামী মুসলিম লীগের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া এ কমিটি গঠনের সময় তিনি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন এবং এসময় সংগঠনের প্রয়োজনে সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করেন।[৩০] ১৯৫২ সালে তিনি যশোর জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তরুণ আইনজীবী হিসেবে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। মুসলিম লীগ সরকারের সাথে মতপার্থক্যের কারণে এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের

প্রশ্নে বহুবার কারাবরণ করেছেন। এভাবে মশিউর রহমান বাঙালির সর্বজনীন জাতীয় রাজনীতির এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যশোর অঞ্চলের একজন আঞ্চলিক নেতা হিসেবে ভাষা আন্দোলনে সফল ভূমিকা পালন করেন।[৩১] মূলত ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে বাঙালি জাতীয়তাভিত্তিক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ধারা তৈরি হয় যা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আর এ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ধারায় মশিউর রহমান যশোরের একজন আঞ্চলিক নেতা হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মুসলিম লীগ সরকারের বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে দেয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাজনীতিতে বিশ্বাসী করে তোলে।[৩২] ভাষা আন্দোলন পরবর্তী রাজনীতিতে ঐক্যবদ্ধতার সুস্পষ্ট প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়। এ সময় বিদ্যমান বিভিন্ন দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ সভা সমাবেশ করে মুসলিম লীগ বিরোধী একটা জোট গঠনের তাগিদ অনুভব করে।[৩৩] এসময় মশিউর রহমান যশোরে সাংগঠনিক সফরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ লক্ষ্যে তিনি শেখ মুজিবকে পত্রের মাধ্যমে (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩) অবগত করেন। প্রেরিত পত্রে সোহ্‌রাওয়ার্দীর পূর্ব নির্ধারিত যশোর জেলার জনসভা বাতিল করায় তিনি অনুশোচনা করেন কারণ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সফরের সকল প্রস্তুতি তারা ইতিমধ্যে নিয়ে ফেলেছিলেন। যশোর অঞ্চলের নেতাকর্মীদের মধ্যে এ সফর সম্পর্কে ব্যাপক উৎসাহ বিরাজ করছিল। ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে যশোর জেলা বোর্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ থাকায় সোহ্‌রাওয়ার্দীর এই সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিতব্য আইনসভা নির্বাচনের সফলতা অনেকাংশে জেলা বোর্ড নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল। পরিস্থিতি বিবেচনা অর্থাৎ আসন্ন নির্বাচনের কথা ভেবে মশিউর রহমান শেখ মুজিবকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে শীঘ্রই যোগাযোগ করে অন্তত তিন দিনের জন্য যশোরে সাংগঠনিক সফর করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অত্র অঞ্চলে জয়লাভ করার লক্ষ্যে এবং দলীয় কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে সাংগঠনিক সভা অত্যন্ত জরুরি ছিল।[৩৪] তাছাড়া ১৫ আগস্ট ১৯৫৩ সালে পত্রের মাধ্যমে যশোর জেলা আওয়ামী লীগের দলীয় সংকটের কথা শেখ মুজিবকে অবগত করেন। আসন্ন নির্বাচন মার্চে অনুষ্ঠিত হবে এ কথা চিন্তা করে মশিউর রহমান উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন কারণ যশোর জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মো: ইকরামুল হক প্রকাশ্যে অত্র অঞ্চলে বামপন্থি দলের সঙ্গে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছিলো। যশোর জেলা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষ বামপন্থি কার্যক্রম সম্পর্কে খুবই বিরুদ্ধবাদী মনোভাব পোষণ করে। বামপন্থি কার্যক্রমের মাধ্যমে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই একটি অভিন্ন বিষয়ে যদি তাদের সাথে একযোগে কাজ করা যায় তাহলে দলত্যাগী নেতা যারা সর্বশেষ জেলা বোর্ড নির্বাচনে বিরোধিতা করেছিল তাদের ছাড়াই আসন্ন নির্বাচনে জয়লাভ করা যাবে। অবশ্য অনেক আঞ্চলিক সংগঠনের সাথে যৌথভাবে কাজ করার প্রস্তাব এসময় পাওয়া গিয়েছিল। আসন্ন নির্বাচনে জয়লাভ করার লক্ষ্যে অন্য সংগঠনের সাথে যৌথভাবে কাজ করার বিষয়টি খুবই জরুরী হয়ে ওঠে কারণ মশিউর রহমানের মতে বামপন্থিদের সাথে যৌথভাবে কাজ করলে জনগণের সমর্থন থাকবে না। এক্ষেত্রে শেখ মুজিবের মতামত জানতে তিনি উদগ্রীব ছিলেন। তাছাড়া তিনি এ বিষয়টি নিয়ে শেখ মুজিবকে যতদ্রুত সম্ভব মওলানা

ভাসানীর সাথে পরামর্শ করার অনুরোধ জানান।[৩৫] এভাবে আঞ্চলিক পর্যায়ে যৌথ রাজনীতি নিয়ে আলোচনা সমালোচনা চলতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)।[৩৬] *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় এ সম্পর্কে বলা হয়,

> "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে বিরোধী দলসমূহকে লইয়া ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করা হইয়াছে। অধিবেশনে লবণের উপর কেন্দ্রের সরকার আরোপিত ট্যাক্স প্রত্যাহার, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি, নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের মুক্তি ও কমনওয়েলথ-এর সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।"[৩৭]

১৯৫৩ সালের ১৬ নভেম্বর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে পার্টির পূর্ণ কমিটি গঠিত হয়। যশোর অঞ্চল থেকে মশিউর রহমানকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হয়।[৩৮] দলীয় অভ্যন্তরীণ যে কোন মনোমালিন্য বা কোন্দলে শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় মশিউর রহমানকে ভরসা করতেন। যশোর জেলার শীর্ষস্থানীয় কতিপয় নেতা মশিউর রহমানের সাংগঠনিক ভুল এবং অসৌজন্যমূলক আচরণের কথা সরাসরি উপস্থাপন করলেও শেখ মুজিব সেগুলোর বিরুদ্ধে কোন প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ না নিয়ে মশিউর রহমানের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতেন। এক্ষেত্রে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় কেন্দ্রীয় কমিটি এবং যশোর জেলা আওয়ামী লীগ কমিটি গঠনের সময় সবসময় মশিউর রহমানকে কমিটিতে যথাযোগ্য অবস্থানে নির্বাচিত করা হতো।[৩৯] তাছাড়া শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীও ব্যক্তিগতভাবে তাকে পছন্দ করতেন। আহবায়ক হিসেবে তিনি ১৯৫৩ সালের ২৯ জুলাই মশিউর রহমানকে অল পাকিস্তান জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত করেন।[৪০]

১৯৫৪ সালে তিনি যশোর জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এসময় তিনি যশোরে দলের সাংগঠনিক বিস্তার এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবগত করে শেখ মুজিবের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। যশোরে আওয়ামী মুসলিম লীগের অনুকূল রাজনৈতিক অবস্থান ছাড়াও ৩ জানুয়ারি ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলন সম্পর্কে শেখ মুজিবকে অবগত করেন। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব যশোর অঞ্চলে তাদের পক্ষে যে ব্যাপক জনসমর্থন তৈরি করছে সে সম্পর্কেও অবগত করেন। মশিউর রহমান তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শঙ্কা প্রকাশ করে তার অঞ্চল যশোরে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে তিন/চারটা সাংগঠনিক মিটিং আয়োজনের কথা বলেন। যশোর অঞ্চলে আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনীতি প্রসারের লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী, সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিবকে দ্রুত সাংগঠনিক সফরের অনুরোধ করেন। এ অঞ্চলে ফজলুল হকের ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকায় তাকেও সাংগঠনিক সফরে সাথে নিয়ে আসার জন্য বলেন। তাছাড়া মশিউর রহমান এ সময় দলীয় অর্থনৈতিক সংকটের

উল্লেখ করে কেন্দ্রীয়ভাবে তা সমাধানের অনুরোধ জানান। কারণ তার নির্বাচনী এলাকায় সাংগঠনিক ব্যয়ভার বহন করার মত নেতৃত্বের অভাব আছে বলে উল্লেখ করেন। এভাবে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সার্বক্ষণিক সাংগঠনিক যোগাযোগ এবং অত্র এলাকায় স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে যশোর অঞ্চলে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।[৪১] যশোর অঞ্চলের সামগ্রিক রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ এপ্রিল ১৯৫৪ সালে যশোরে (টাউন হল ময়দান) সাংগঠনিক মিটিং করেন। এ সময় তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হওয়ার আহবান জানান। শেখ মুজিব তার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, দেশ তৎকালীন সময়ে ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল যার মূল কারণ মুসলিম লীগ সরকারের অপশাসন। তাছাড়া তিনি ২১ দফা বাস্তবায়ন, জননিরাপত্তা আইন, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশসহ আওয়ামী মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়ার বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।[৪২] এ সময় মশিউর রহমানসহ স্থানীয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দলীয় কার্যক্রমে আরও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। এভাবেই আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই এ দলের রাজনীতির প্রতিটি পর্যায়ে তিনি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক দলে পরিণত করার জন্য অধিবেশন আহবান করা হয়। প্রথম অধিবেশনে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৭০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।[৪৩] মশিউর রহমান তার নিজ জেলা যশোরের প্রতিনিধি হিসেবে অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৫৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের কাউন্সিল অধিবেশনে প্রায় ৮০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে শেখ মুজিবুর রহমান উত্থাপিত কার্যনির্বাহী পরিষদ চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। এ কার্যনির্বাহী পরিষদে মশিউর রহমান সদস্য নির্বাচিত হন।[৪৪] পরবর্তীতে ১৯৫৭ সালের ১৪ জুন কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের ১৯৫৫ সালের ওয়ার্কিং কমিটিকে পুনর্বিন্যাস করা হলে এ কমিটিতেও মশিউর রহমান ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।[৪৫]

১৯৫৪ সালে ছাত্র-সমাজসহ সকল স্তরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তথা সর্বসাধারণ মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যুক্ত রাজনীতিতে ঐক্যবদ্ধ নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও শেষ পর্যন্ত শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন।[৪৬] ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মশিউর রহমান যশোর দক্ষিণ-পশ্চিম (ঝিকরগাছা) নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।[৪৭] এত বিপুল ভোটে তিনি নির্বাচিত হন যে বাকি ১৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর সকলেই জামানত হারান।[৪৮] তখন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার প্রদেশে নেতৃত্ব দেন আতাউর রহমান খান (১৯০৭-১৯৯১)। ১৯৫৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মশিউর রহমান আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বঙ্গীয় সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য নির্বাচিত হন।[৪৯] তিনি সেই মন্ত্রিসভার প্রচার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (১৯৫৬-৫৭), বিচার ও সংসদ বিষয়ক (১৯৫৭-৫৮) এবং রাজস্ব ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (১৯৫৮) মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেন। তাছাড়া আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী থাকাকালীন মশিউর রহমানের কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত।[৫০] এ সময় তিনি জাতীয় নীতি নির্ধারণ পর্যায়েও ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। ১০ মে ১৯৫৬ সালে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট পত্রের মাধ্যমে সংসদীয় দলের মিটিং এর নির্ধারিত তারিখ (১৬ মে

১৯৫৬ পরিবর্তন করে ১৯/২০ মে ১৯৫৬) পরিবর্তন করার কথা বলেছিলেন।[৫১] ১৯৫৭ সালের ১৪ মার্চ আওয়ামী লীগের ইতিহাসের একটি স্বর্ণোজ্জ্বল দিন বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে কারণ শাসন বিভাগ থেকে আলাদা সার্বভৌম বিচার ব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে বিচার বিভাগকে আলাদা করার বিল বিচারমন্ত্রী হিসেবে মশিউর রহমান উত্থাপন করেন।[৫২] এ সম্পর্কে *দৈনিক আজাদে* অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত খবর পরিবেশিত হয়। খবরে লেখা হয় যে,

> "বিচার বিভাগ হইতে শাসন বিভাগকে পৃথক করিয়া ন্যায়বিচারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য এতোদিন যে দাবি জানাইয়া আসা হইতেছে তদৃষ্টে গতকল্য বৃহস্পতিবার প্রদেশের বিচারমন্ত্রী মশিউর রহমান কর্তৃক পরিষদে আনীত সংশ্লিষ্ট বিলটি বিনা বাঁধায় গৃহীত হওয়ার পর উহা স্বীকৃতি পাইয়াছে। মন্ত্রী মহোদয় বিলটি গ্রহণের জন্য পরিষদকে অনুরোধ করিলে উহা বিনা বিরোধিতায় পাস হইয়া যায়।"[৫৩]

এভাবে মন্ত্রিসভার সদস্য থাকাকালীন মশিউর রহমান আওয়ামী লীগের একজন একনিষ্ঠ নেতা হিসেবে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে গেছেন।[৫৪] ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর সামরিক শাসক আইয়ুব খান বিভিন্ন নিপীড়নমূলক আইন প্রণয়ন করে গণগ্রেফতার শুরু করে। ১৯৫৯ সালের ৭ আগস্ট নির্বাচিত সংস্থাসমূহ (অযোগ্যতা) আদেশ EBDO (Election Bodies Disqualification Order, 1959) জারি করে এবং এ আদেশ বলে মশিউর রহমানকে অভিযুক্ত করা হয়।[৫৫] সামরিক নিপীড়নের এ পর্যায়ে মশিউর রহমান গ্রেফতার হন এবং প্রায় ছয় মাস বিনা বিচারে কারাভোগের পর জামিনে মুক্তিলাভ করেন।[৫৬] ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীনে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হলে মশিউর রহমান আওয়ামী লীগ পুনর্গঠনে তার অগ্রগামী হন।[৫৭]

মশিউর রহমানের এই রাজনৈতিক পথচলা অবশ্য সরল ছিলনা। ১৯৬৭ সালের ৩০ এপ্রিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক মোর্চা (পি.ডি.এম.) গঠিত হলে মশিউর রহমান আওয়ামী লীগ ছেড়ে তাতে যোগ দেন। পি.ডি.এম. কে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ দুইভাগে বিভক্ত হলে তিনি পি.ডি.এম. পন্থি আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি নিযুক্ত হন।[৫৮] ১৯৬৮ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সময় পি.ডি.এম.পন্থি আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে পুনরায় শেখ মুজিবের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করে মূল ধারার আওয়ামী লীগে ফিরে আসেন।[৫৯]

ষাটের দশকের শুরুতেই আইয়ুব বিরোধী স্বাধিকারের প্রশ্নে বাঙালি জাতি নতুন আন্দোলনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ওঠে। রাজধানী ঢাকার পাশাপাশি সেই আন্দোলন জেলা, মহকুমা, শহরগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে।[৬০] যশোরে চলমান এ আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যোগাতে ১৯৬২ সালের ১১ অক্টোবর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যশোর শহরে আগমন করেন এবং জনসভায় ভাষণ প্রদান করেন।[৬১] এ সময় সদর মহকুমার চলমান স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে মশিউর রহমান দিনরাত পরিশ্রম করেন।[৬২] তখন ঢাকার বাইরে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যাদের নিরলস শ্রম এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শত বাঁধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে দেশবাসীকে সেই আন্দোলনে শামিল করা সম্ভব হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রথম

সারিতে ছিলেন যশোরের আওয়ামী লীগ নেতা মশিউর রহমান। যশোর অঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় নেতা শুধু নয়, তিনি ছিলেন জাতীয় পর্যায়ের নেতা।[৬৩]

পাকিস্তানের রাজনীতির এক সন্ধিক্ষণে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা দাবি উপস্থাপন করেন। শেখ মুজিবুরের ছয়দফার সাথে ছাত্রসমাজ তাদের দাবি সম্বলিত ১১ দফার সংযোগ সাধন করেন।[৬৪] স্বাধিকার ভিত্তিক ছয়দফা ও ১১ দফার সমান্তরাল আন্দোলনে মশিউর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৬৫] বস্তুত ১৯৬৬ সালের ছয়দফা উত্থাপিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের গোড়াপত্তন এবং এর মাধ্যমেই রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সূচিত হয়। আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এমন এক সময়ে ছয়দফার দাবি উত্থাপন করেন যখন ছাত্র আন্দোলন ইতিমধ্যে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এর মধ্যে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ বাঙালির মোহভঙ্গের যাত্রাকে যেন আরো খানিকটা উস্কে দিয়েছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উপলব্ধি করতে পেরেছিল বাইরের হামলার মুখে তারা কতটা অরক্ষিত ও অসহায়। পাকিস্তান রাষ্ট্র ও পশ্চিম পাকিস্তানের মদদপুষ্ট এবং তাদের প্রতি অনুগত এক বিশাল সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কোন কাজেই আসবে না সেটা তারা বুঝে ফেলে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ হাতেনাতে তাদের অসহায়ত্বের প্রমাণ পায়।[৬৬] ছয়দফা আন্দোলনকে জনপ্রিয় তথা সর্বজনীন আন্দোলনে পরিণত করার জন্য শেখ মুজিবসহ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সভা-সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালের ১৫ এপ্রিল বেলা ১০টায় শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে মোটরযানে যশোর হতে খুলনা পৌঁছান। শেখ মুজিবের গাড়ি খুলনা পৌঁছালে লোয়ার যশোর রোডে অপেক্ষমান হাজার হাজার জনতা 'ছয়দফা মানতে হবে', 'স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে' ইত্যাদি ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। জনতার চাপে শেখ মুজিবের গাড়ী চলা অসম্ভব হলে গাড়ী থেকে নেমে প্রায় ১ মাইল জনতার সঙ্গে পদব্রজে গমন করেন।[৬৭] শেখ মুজিবুর রহমানের উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গ সফরের শেষ পর্যায়ে খুলনা মিউনিসিপ্যাল পার্কে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্তৃক ১৬ এপ্রিল বিকাল চারটায় এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।[৬৮]

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী শেখ মুজিব খুলনায় বিশাল সমাবেশে বক্তৃতা দানের পর সদলবলে ঢাকার পথে মোটরযোগে খুলনা ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা মশিউর রহমানের যশোরস্থ বাসভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন। গোয়ালন্দ-ঢাকাগামী প্রথম ফেরি ধরার জন্য শেখ মুজিব ১৭ এপ্রিল ভোর চারটার সময় সদলবলে মশিউর রহমানের বাসভবন থেকে রওয়ানা হন। মশিউর রহমানের বাসা থেকে বিশ গজ যাওয়ার পরই পুলিশ গাড়ির গতিরোধ করে। খুলনায় পোস্টিং জনৈক ডি আই বি সাবইন্সপেক্টর গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রদর্শন না করেই শেখ মুজিবকে যশোর কোতোয়ালী থানায় যাওয়ার অনুরোধ করে। এসময় শেখ মুজিব গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়া থানায় যেতে অস্বীকার করেন, তারপরও পুলিশ অফিসার গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রদর্শন করতে বিরত থাকেন। এ কথোপকথনের এক পর্যায়ে মশিউর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫) ও শেখ মুজিব (১৯২০-১৯৭৫) একযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রদর্শনের দাবি জানালে অফিসার দ্বিধাজড়িতভাবে পকেট থেকে ঢাকা হতে খুলনা পুলিশের নিকট রিকুইজিশন অর্ডার

(১৯৬৬ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকার রমনা থানায় রুজুকৃত ৮০ নং মামলার আসামী হিসেবে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। এর কারণ হিসেবে বলা হয় ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন শেষে স্থানীয় আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জনসভায় "রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আপত্তিকর" উক্তি করায় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে এ মামলা দায়ের করা হয়) বের করেন। উক্ত অর্ডারে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে নিকটস্থ কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করতে বলা হয়। এ অর্ডারে যশোর ডেপুটি কমিশনারের অনুমোদন না থাকায় শেখ মুজিব গ্রেফতারি পরোয়ানাকে অবৈধ বলে অগ্রাহ্য করে তবে বিশৃঙ্খলা করতে চান না বলে যশোর সদর (দক্ষিণ) মহকুমা হাকিম জনাব সোলায়মানের আদালতে যান। যশোরের সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন ৪৭(৫) ধারা বলে পুলিশ গ্রেফতার করে। আদালতে হাজির করার পর অ্যাডভোকেট মশিউর রহমানের নেতৃত্বে ১৫ জন আইনজীবী শেখ মুজিবের জামিনের আবেদন করেন। আদালত শেখ মুজিবুর রহমান এর জামিন মঞ্জুরির কথা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা আনন্দ উল্লাস শুরু করে। এরপর শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মিছিল করতে করতে মশিউর রহমানের বাড়িতে যান।

শেখ মুজিবের এই জামিন আবেদনে মশিউর রহমানসহ ১৫ জন আইনজীবী কাজ করলেও মশিউর রহমান আইনজীবীদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব দেন।[৬৯] মাননীয় মহকুমা হাকিম শেখ মুজিবুর রহমান ২১ এপ্রিলের পূর্বে ঢাকার প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এম এ মালেকের আদালতে আত্মসমর্পন করবেন এই শর্তে তাকে পাঁচ হাজার টাকায় জামিন ও সমপরিমাণ অর্থের মুচলেকায় মুক্তিদান করেন। মাননীয় ম্যাজিট্রেট তার নির্দেশে বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান একজন স্বীকৃত জননেতা এবং সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করে তার ধারণা জন্মেছে যে এক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুর করা যায়। আবেদনকারীর পক্ষে অ্যাডভোকেট মশিউর রহমান আদালতে বলেন যে, "আজ ঢাকার একটি মামলায় হাজিরা দেওয়ার জন্যই শেখ মুজিবুর রহমান যে ঢাকা যাচ্ছিলেন এই সংবাদ গতকাল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।" মশিউর রহমান আদালতে সংবাদপত্র হতে সংশ্লিষ্ট অংশটি পড়ে শোনান। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান একজন সাধারণ নাগরিক মাত্র নন, তিনি পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দলের স্বীকৃত নেতা। তার সফর ও কর্মসূচি সংবাদপত্রের মারফতে সাধারণের সামনে প্রকাশ করা হয়। পুলিশও তার সফরসূচির সংবাদ রাখে। এমতাবস্থায় পথিমধ্যে তাকে গ্রেফতার করা আইনসিদ্ধ নয়।[৭০] তার উক্ত গ্রেফতার সম্পর্কে পুলিশ সুপার যশোর ডি.এস. বি এম এ হোসেন, ঢাকার পুলিশ সুপার এস এ খসরু পি এস পি কে লেখা ২২০৫/৮০-৪৯ সংখ্যক স্মারকে লিখেন। উক্ত স্মারক থেকে বোঝা যায় যে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তাজউদ্দিন আহমেদ, মশিউর রহমান, মিজানুর রহমান চৌধুরী, জহুর আহমদ চৌধুরী, শফিউল্লাহ তাদের নেতাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেন। তার জামিন আবেদনের সময় বহু সংখ্যক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন।[৭১] ঢাকার এসডিও কোর্ট ১৯৬৬ সালের ২১ এপ্রিল তার জামিন বাতিল করলেও আইনজীবীদের তাৎক্ষণিক আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়রা জজ তার জামিন মঞ্জুর করেন।[৭২] পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল গ্রেফতার করেই যেন শেখ মুজিবকে কোন জামিন ছাড়াই ঢাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় মশিউর রহমান উক্ত আটকাদেশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেন এবং তারই প্রচেষ্টায় কোর্ট মশিউর

রহমানের সুন্দর বাচনভঙ্গী ও যুক্তিতর্কে মুগ্ধ হয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তি দেয়।[৭৩] সামরিক সরকারের আমলে শেখ মুজিবকে জামিন লাভ করানো মশিউর রহমানের এক বিরাট সাফল্য। জামিনে মুক্তির পর শেখ মুজিবুর রহমান মশিউর রহমানের বাসায় ছিলেন।[৭৪] তার বাসায় অবস্থান করার পর তিনি ঢাকায় ফিরে যান।[৭৫]

ছয়দফা আন্দোলন সমর্থন ও বেগবান করার জন্য মশিউর রহমান তার নিজ জেলা যশোরের বিভিন্ন অঞ্চলে সাংগঠনিক কর্মসূচি পরিচালনা করেন। সাংগঠনিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৬৬ সালের ১৩ মে যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানা আওয়ামী লীগের কর্মী সম্মেলন আহবান করেন। এ সম্মেলনে তিনি যশোর জেলা আওয়ামী লীগের কর্মীদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিষ্ঠার সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সম্মেলনে দেশবাসীর বর্তমান দাবিদাওয়ার যথার্থ বাস্তবায়ন, ছয়দফার প্রতি পূর্ণ জনসমর্থন এবং উক্ত দাবি আদায়ের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের জন্য কর্মীবৃন্দের সংকল্প থাকার ঘোষণা করা হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবি জানানো হয়। সম্মেলনে ৬ দফা দাবি সম্পর্কে মত যাচাইয়ের জন্য অবিলম্বে গণভোট দাবি, প্রদেশের ৭ লক্ষ বেকার বিড়ি শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল ২৫ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য টেন্ডুপাতা সরবরাহ অথবা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি ও বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সমগ্র প্রদেশে পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালু করার দাবি জানিয়ে কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৭৬] এছাড়াও তিনি যশোর জেলার সদর, চৌগাছা, শার্শা, মনিরামপুর, কেশবপুর থানাধীন বিভিন্ন অঞ্চলে ছয়দফার পক্ষে সাংগঠনিক কর্মসূচির আয়োজন করেন।[৭৭]

১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ সাল এই দুই বছর ছিল পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকাল। ১৯৬৬ সালে ছয়দফার মাধ্যমে যে স্বাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল ১৯৬৮ সালে তা স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে যে আন্দোলন ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তাকে কঠোর হস্তে দমন করার জন্য আইয়ুব খান (১৯০৭-১৯৭৪) 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' (১৯৬৮) নামে খ্যাত এক মামলা দায়ের করেন। বর্তমানে অনেক গবেষক এ মামলাকে সত্য মামলা হিসেবে বলতে চান কারণ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ভারতের সহযোগিতায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য সম্মিলিত বৈঠক হয়। সরকার প্রদত্ত মামলার বিবরণ সংবলিত অভিযোগে বিবৃত সভাগুলি ও কার্যাবলী ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মূলত করাচি, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় সংঘটিত হয়। মামলার অভিযোগে শেখ মুজিব সম্পর্কে বলা হয় তিনি ১৯৬৪ সালের ১৫-২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাঁচজনসহ আভিযুক্তের সঙ্গে প্রথম বৈঠক করেন করাচিতে এবং পরিকল্পিত সশস্ত্র বিপ্লব সংক্রান্ত বেশির ভাগ সভা ও কার্য করাচিতে সংঘটিত হয়। সে কারণে মামলার নামের আগে 'আগরতলা' শব্দটি সংযোজন অযৌক্তিক। তাছাড়া ছয়দফা আন্দোলনের কারণে যদি আগরতলা মামলা দায়ের করা হয় তাহলে তৎকালীন সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত সদস্যরা এবং সিএসপি অফিসারদের এই মামলায় জড়িত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। তাই এ মামলাকে পুরোপুরি যে উদ্দেশ্যমূলক এবং মিথ্যা মামলা ছিল সেটা বলা যায় না।[৭৮] শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান

আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে এ ‘ষড়যন্ত্র মামলা’ দায়ের করা হয়।[৭৯] পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে মশিউর রহমান অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করেন।[৮০] ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা’ পরিচালনার জন্য বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব (১৯৩০-১৯৭৫) এ সময় যশোর থেকে বিশেষ অনুরোধ করে মশিউর রহমানকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। মামলা পরিচালনায় তার প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা ছিল অসাধারণ। এই মামলার প্রয়োজনেই তিনি প্রায় এক বছর যশোর ও নিজের পেশাগত কাজকর্ম, ঘরসংসার ছেড়ে ঢাকায় অবস্থান করেছিলেন। আগরতলা মামলার শেষ দিন পর্যন্ত মশিউর রহমান মামলা পরিচালনায় যুক্ত ছিলেন।[৮১] এছাড়া তিনি একজন আইনজীবী হিসেবে বিভিন্ন সময়ে দলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের মামলা পরিচালনা করতেন এবং বেকসুর খালাসের ব্যাপারে আইনী লড়াই চালাতেন।[৮২]

‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা’কে কেন্দ্র করে সমগ্র বাংলাদেশ একক রাজনৈতিক ধারায় মিলিত হয়, যার প্রধান নেতৃত্বে ছিল ছাত্রসমাজ। পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের পতনের লক্ষ্যে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে যা ‘ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান’ নামে খ্যাত।[৮৩] এ আন্দোলনে যশোর অঞ্চলে মশিউর রহমান প্রধান নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন। গণঅভ্যুত্থানে তিনি আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে যশোর অঞ্চলে বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার।[৮৪] গণঅভ্যুত্থানের এ পর্যায়ে যশোর অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সকলকে চলমান আন্দোলনে শরিক হওয়ার আহবান জানান। ১৯৬৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর যশোর জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় ‘আলী মঞ্জিলে’ সদর মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা আবদুর রাজ্জাক চিশতির সভাপতিত্বে সদর মহকুমা আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের একটি বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মশিউর রহমান যশোর অঞ্চলে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কর্মসূচি ও তৎপরতা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন।[৮৫] এরপর ১৫ অক্টোবর ১৯৬৯ সালে ‘যশোর জেলা আওয়ামী লীগে’র সভাপতি জনাব হাজী নূরবক্সের সভাপতিত্বে কেশবপুর থানা আওয়ামী লীগের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মনিরামপুর বাজারের এ সম্মেলনে মশিউর রহমান দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। এভাবেই ভিন্ন ভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি গণঅভ্যুত্থানে সফল ভূমিকা পালন করেন।[৮৬]

গণআন্দোলনে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের পতন হলে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন। আন্দোলনের চাপে পাকিস্তানি শাসকগণ জাতীয় নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়।[৮৭] ১৯৭০ সালের এ নির্বাচনে যশোর-৩ নির্বাচনী এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মশিউর রহমান বিপুল ভোটে এম এল এ নির্বাচিত হন।[৮৮] পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নানা অজুহাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বিলম্ব করে। ইয়াহিয়া খান গণপরিষদের ৩ মার্চের পূর্ব ঘোষিত অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ সারাদেশে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। শেখ মুজিবুরের অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণায় যশোর অঞ্চল নতুনভাবে আন্দোলনমুখর হয়ে ওঠে। যশোরের প্রধান প্রধান শহরগুলো মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত হয়ে যায়। শহরের ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ সমবেত হয়। সমাবেশ শেষে বিক্ষুব্ধ মানুষের বিশাল মিছিল যখন শহর প্রদক্ষিণ করছিল ঠিক তখন সেনাবাহিনী

মিছিল লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে।[৮৯] চলমান মিছিল টেলিফোন ভবনের সামনে আসলে পুনরায় গুলি ছোড়া হয়। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে পাক সৈন্যরা যশোরের চারুবালা করকে (১৯৩০-১৯৭১) নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে।[৯০] তার মৃত্যুর খবর সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়লে সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। প্রায় বিশ হাজার মানুষের মিছিলে নেতৃত্ব দেন আওয়ামী লীগ ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।[৯১] অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে যশোরের জনগণ স্থানীয় সেনানিবাসে খাদ্যসহ সবধরণের সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এই আন্দোলনে যশোরে নেতৃত্ব দেন মশিউর রহমান।[৯২] অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে চারুবালা করের হত্যায় জনতার ক্ষোভ আরও তুঙ্গে উঠে।[৯৩] তারা চারুবালা করের মৃতদেহ নিয়ে শহরে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মিছিলে নামে যেখানে মশিউর রহমান নিজে নেতৃত্ব দেন। তারপর মশিউর রহমানের নেতৃত্বে মিছিলটি সার্কিট হাউজের কাছে পৌঁছালেই সার্কিট হাউজে অবস্থানরত সশস্ত্র সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে মিছিল থেকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এক পর্যায়ে মিছিলকারী জনতা সার্কিট হাউজে ঢুকে সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করে। সেই মুহূর্তে সেখানে সেনাবাহিনীর দায়িত্বে নিয়োজিত কর্ণেল তোফায়েল মিছিলের উপর গুলি চালাতে নির্দেশ দেয়। তখন মশিউর রহমান নিজের জীবনকে তুচ্ছ মনে করে এবং বহু অমূল্য প্রাণ যাতে নষ্ট হতে না পারে সেজন্য তিনি সার্কিট হাউজে উপস্থিত হয়ে সেনাবাহিনীকে গুলি চালানো থেকে নিবৃত্ত থাকার আহবান জানান এবং জনগণকে স্থানীয় ঈদগাহের দিকে সরিয়ে নিতে সক্ষম হন।[৯৪] এরপর চারুবালা করের শেষকৃত্য সম্পাদন শেষে মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় উপস্থিত সকলে পাক প্রশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করে।[৯৫]

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পরোক্ষ ঘোষণা প্রদান করে যুদ্ধের সকল কৌশল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেন। শেখ মুজিবের এ ভাষণ রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচার হওয়ার কথা থাকলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতায় তা প্রচার করা হয়নি। কিন্তু ৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে যথাসময়ে পৌঁছে যায় এবং সর্বসাধারণ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যশোরে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর মশিউর রহমানের নিকট ঢাকা হতে টেলিফোন মারফত খবর আসে যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।[৯৬] অতপর দ্রুত এ সংবাদ শহরের আনাচে কানাচে পৌঁছে যায়। শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণের পরেই মূলত যশোরবাসী সরাসরি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এসময় আওয়ামী লীগ নেতা মশিউর রহমান আন্দোলনকারীদের সংগঠিত এবং পরিকল্পিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেন, কিন্তু সাধারণ জনগণ এসময় উপদেশ অগ্রাহ্য করে সরাসরি অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে।[৯৭] ৭ মার্চের পরপরই যশোরে গঠিত হয় সংগ্রাম পরিষদ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।[৯৮] সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা মশিউর রহমান, রওশন আলী, মোশাররফ হোসেন, নুরুল ইসলাম, তবিবর রহমান সরদার (১৯৩২-২০১০), শাহ হাদিউজ্জামান, পীযুষ কান্তি প্রমুখ (১৯৪০-)। ৮ মার্চের পর সমগ্র যশোরে সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে জনগণকে প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, সভা সমাবেশ ও মিছিল নিয়মিত চলতে থাকে।[৯৯]

শেখ মুজিবের ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনে যশোর অঞ্চল সবসময়ই সক্রিয় ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ আন্দোলনরত ছাত্রজনতা যশোরের রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে যাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা অবাধে চলাচল না করতে পারে। এ দিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল যশোরের পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ (ই.পি.আর-বর্তমানে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড) এর হেড কোয়ার্টারে জওয়ানরা 'জয়বাংলা, বাংলার জয়' গান গেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে অভিবাদন গ্রহণ করে।[১০০] ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাক হানাদার বাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু করে। ইতিহাসের জঘন্যতম কালো অধ্যায়ে নিরস্ত্র বাঙালির উপর চালানো হয় নির্বিচারে গণহত্যা। রাজধানী ঢাকা থেকে মানবতা বিরোধী এই গণহত্যা শুরু হলেও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত যশোরে তাণ্ডব চালানো হয়।[১০১] এ দিন সন্ধ্যা থেকে মশিউর রহমান, রওশন আলী ও মোশাররফ হোসেনের বাড়িতে অসংখ্য ছাত্র-যুবক ও সাধারণ জনতা সমবেত হয়। পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তারা নেতৃবৃন্দের নির্দেশ শুনতে চায়। রাতে ঢাকা থেকে মশিউর রহমানের কাছে টেলিফোনে খবর আসে যে, তারা যেন অত্যন্ত সতর্ক থেকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন। এরূপ পরিস্থিতিতে যশোরের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ মশিউর রহমানের সাথে দেখা করেন এবং তাদের করণীয় কী তা জানতে চান। এ সময় মশিউর রহমান উপস্থিত নেতা কর্মীদের জানান যে, ইয়াহিয়া খানের সাথে বঙ্গবন্ধুর আলোচনায় সমাধানের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। মশিউর রহমান উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে সতর্ক থাকার আহবান জানান।[১০২] ২৫ মার্চ বিকালেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা থেকে যশোরে অবস্থানরত মশিউর রহমানকে ফোন করেন এবং পরিস্থিতি ভাল নয় বলে জানান। ২৫ মার্চ সন্ধ্যার দিকে মশিউর রহমান একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও পরে বাড়িতেই অবস্থান করেন। ২৫ মার্চ রাত ১১:৩০ মিনিটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যশোর সেনানিবাস থেকে যশোর শহরে প্রবেশ করে এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিরক্ষাবুথ তৈরি করে। সেনাবাহিনীর টহল দল যশোর শহরে টহল জোরদার করে। সমস্ত শহরে তখন স্বাধীন বাংলার পতাকা উড্ডীন ছিল। টহলরত সেনাবাহিনী স্বাধীন বাংলার পতাকাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে।[১০৩] ২৫ মার্চ রাত ১ টার দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গাড়ী নিয়ে এসে যশোরের সার্কিট হাউজ রোডে অবস্থিত মশিউর রহমানের পুরো বাড়িটি ঘিরে ফেলে। মশিউর রহমানের বাল্যবন্ধু ও ছাত্রী হামিদা রহমান (ভাষা সৈনিক) অসুস্থ মায়ের সাথে যশোর সদর হাসপাতালে অবস্থান করে ২৫ মার্চ রাতে যশোরের পরিস্থিতি এবং মশিউর রহমানের বাড়ির পরিস্থিতি বর্ণনা করেন এভাবে,

> "সেদিনের ঢাকায় ২৫ মার্চ রাতের ভয়ঙ্কর ঘটনার সংবাদ তখনও যশোরে যেয়ে পৌছায়নি। কিন্তু এদিকে গুলি খাওয়া পাখির মত লোকেরা হাসপাতালে আসতে আরম্ভ করেছে। রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশী করে গুলিতে আহত লোক হাসপাতালে আসতে আরম্ভ করল। রাত এগারটা বাজার কিছুক্ষণ পরে হাসপাতালের অফিস রুম থেকে আমার একটা ফোন রিসিভ করার জন্য ডাক এলো। ফোনটা ধরার পর ওপার থেকে কণ্ঠ ভেসে এলো, "বল তো এখন কি করি। শেখ সাহেব আমাদের পালিয়ে যেতে বলেছেন। কিন্তু বাড়ীতে বড় মেয়ে আছে, বউ আছে; তার উপর ঢাকা থেকে তোমাকেও নিয়ে এলাম, এখন তোমাদের

ছেড়ে যাই কি করে।" আমি বুঝতে পারলাম গলাটা জনাব মশিউর রহমানের। আমি উত্তরে বললাম, পরিস্থিতি মনে হচ্ছে ভয়ানক খারাপ, তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি পালিয়ে যাও। তিনি যশোরের প্রখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতা। তাকে ধরতে পারলে পাক আর্মি কখনও ছেড়ে দেবে না। ওপাশ থেকে রিসিভার এ উত্তর এলো, "তুমি পাগল নাকি এই অবস্থায় তোমাদের ফেলে আমি পালিয়ে যাব? এই কাপুরুষের মত কাজ আমার দ্বারা হবে না।" আবার তিনি ওপার থেকে ফোনে প্রশ্ন করলেন, আমার মনে হয় আমার বাড়ি মিলিটারিতে ঘেরাও করেছে। আমি হয়ত আর কথা বলতে পারব না। ওরা উপরে এসে গেছে। আমি তখনও ফোনে চিৎকার করে বলছি, "দোহাই তোমার তুমি পালিয়ে যাও একটুও দেরী করো না।" তৎক্ষণাৎ ফোনের লাইন কেটে গেল, আর সমস্ত হাসপাতালের আলোগুলো এক এক করে নিভে গেল। শহরের সমস্ত বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ হয়ে যায়।[১০৪]

মশিউর রহমানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় যশোর ক্যান্টনমেন্টে।[১০৫] যশোর ক্যান্টনমেন্টের একটি প্রাইমারি স্কুলে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। এসময় তার সঙ্গে ছিলেন ঝিকরগাছার এম পি অ্যাডভোকেট মঈনউদ্দিন মিয়াজী।[১০৬] গ্রেফতারের পরই মশিউর রহমানের উপর শুরু হয় নির্মম নির্যাতন। অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পাক বাহিনীর পাশবিক অত্যাচারে মুমূর্ষু অবস্থায় ফিরে এলেও মশিউর রহমান চরম নির্যাতনের শিকার হন।[১০৭] মশিউর রহমানের গ্রেফতারের সংবাদ ভোর হওয়ার আগেই শহরবাসীর কাছে পৌঁছে যায়। সর্বস্তরের জনগণ প্রিয় নেতার গ্রেফতারের সংবাদে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে।[১০৮] মশিউর রহমানকে একদিকে জীবন আর অন্যদিকে মৃত্যু এর যে কোন একটিকে বেছে নিতে বলা হয়েছিল। তিনি তখন যশোর-৩ নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চেয়েছিল তাকে দিয়ে পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতার পক্ষে এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেওয়াতে। পাকিস্তানিরা দেখাতে চেয়েছিল যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা তাদের সাথেই আছে। এই উদ্দেশ্যেই মশিউর রহমানের সামনে দেওয়া হয় একটি বিবৃতির কাগজ। তাকে বলা হয় এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে অথবা মরার জন্যে তৈরি হতে। মশিউর রহমান হানাদার বাহিনীর দেওয়া বিবৃতির কাগজটি টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য হাসিমুখে জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে নির্ভয়ে বীরের মতো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তার উপর প্রায় একমাস অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। সে সময় ক্যান্টনমেন্টে আরো যারা বন্দি ছিলেন তাদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বিবৃতি দিতে অস্বীকার করায় পাক সৈন্যরা তার শরীরের চামড়া ধারালো চাকু দিয়ে ছিলে ফেলেছিল।[১০৯] মশিউর রহমানের বাল্যবন্ধু ও ছাত্রী হামিদা রহমান (ভাষা সৈনিক) মশিউর রহমানের উপর পাক বাহিনীর নির্যাতনের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

"আমি যখন অ্যাডভোকেট মঈনউদ্দিন মিয়াজীর সাক্ষাৎকার নেয়; তখন তিনি আমাকে এই কথাগুলো জানান। তখন জানতে পারলাম ভীষণ অসুস্থ অবস্থায় তার মৃত্যুর আগের মুহূর্তগুলো কেটেছিল যশোর ক্যান্টনমেন্টে। বেদম প্রহারে প্রহারে তার শরীর ছিড়ে ও থেতলে গিয়েছিল, পুঁজ জমে শরীরটা ফুলে

উঠেছিল, সারাক্ষণ প্রচণ্ড জ্বরে কাহিল থাকতো। তার মধ্যেও নির্মম পাক সেনারা মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে প্যারেড করাতো। শেষের দিকে কোন খাবার দিলে তিনি খেতেন না। অসীম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তিনি মিয়াজীর কোলে মাথা রেখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। তার মৃতদেহ তার স্ত্রী ও সন্তানেরা দেখতে পায়নি। খুব সম্ভবত তার মৃত্যু হয়েছিল ২৪ এপ্রিল ১৯৭১ সাল। কোথাও তার দাফন হয়নি কোথাও তার জানাজাও হয়নি। এমনই নিষ্ঠুর ছিল তার নিয়তি।"[১১০]

নির্যাতনের এই মধ্যযুগীয় বর্বরতার মুখেও বিন্দুমাত্র আপোষ করেননি দেশপ্রেমিক মশিউর রহমান। এ সময় মশিউর রহমানের যশোরের বাড়িটি মর্টারের গোলায় ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তার গ্রামের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিহিংসামূলকভাবে মশিউর রহমানের চাচাতো ভাই মতিয়ার রহমানকে জীবন্তদগ্ধ করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সঠিক দিনক্ষণ জানা না গেলেও ধারণা করা হয় ১৯৭১ সালের ২৪ এপ্রিল পাক হানাদার বাহিনী স্বাধীনতার অকুতোভয় সৈনিক মশিউর রহমানকে হত্যা করে। তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি।[১১১] এভাবেই বাংলাদেশের সর্বজনীন ও সফল রাজনৈতিক ধারায় তথা মুক্তিযুদ্ধে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র শহীদ সাংসদ। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৬ ডিসেম্বর মশিউর রহমানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যশোর শহরের পৌর পার্কে একটি স্মৃতিফলক উম্মোচন করেন।[১১২] যশোরবাসী ২৩ এপ্রিল মশিউর রহমানের শহীদ হবার দিনটি শ্রদ্ধার সাথে পালন করে। তার তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের ২৩ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল নিম্নরূপ-

"বাংলাদেশের জনগণের জীবন মরণ সংগ্রামের পুরোভাগে কতিপয় অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে শহীদ মশিউর রহমান ছিলেন অগ্রসৈনিক। পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে আমরা একত্রে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছি, কিন্তু যশোর ক্যান্টনমেন্টে এক বেদনাদায়ক মৃত্যুবরণ থেকে বিচ্যুত হননি তিনি। স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ বাঙালি প্রাণ দিয়েছিল এর মধ্যে কারও অবদান কম নয়। বিপ্লবী শহীদ মশিউর রহমান তাদের মধ্যে একজন। তিনি দেশপ্রেমিক হিসেবে বাঙালি জাতির স্বার্থেই হাসিমুখে প্রাণ দান করেছিলেন। কাপুরুষের মত হাজার বছর বেঁচে থাকার চেয়ে বীরের মত ক্ষণকাল বেঁচে থাকাকেই তিনি শ্রেয় মনে করেন।"[১১৩]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে শহীদ মশিউর রহমানের অবদান চিরস্মরণীয়। তিনি ছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত এবং তার চালচলন ভারিক্কী ধরণের ছিল। মশিউর রহমান সবসময় স্বতন্ত্র চিন্তাচেতনায় জীবন যাপন করতেন। তিনি নিজে রক্ষণশীল জীবন যাপনে বিশ্বাস করলেও সর্বসাধারণের কল্যাণে সদা সজাগ থাকতেন।[১১৪] মশিউর রহমানের বহুমুখী রাজনৈতিক ভূমিকা মূল্যায়নে বলা যায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রতিটি পর্যায়ে তিনি একজন সফল আঞ্চলিক নেতা হিসেবে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন।[১১৫]

প্রান্তটীকা

১. আলী মো: আবু নাঈম ও ফাহিমা কানিজ লাভা (সম্পা.), *শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ২৫০
২. সাক্ষাৎকার, আলি কদর মোঃ সামছুজ্জামান (সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান, সিংহঝুলি ইউনিয়ন পরিষদ, চৌগাছা, যশোর), শহীদ মশিউর রহমানের ভাতিজা, ৭ পিটারসন রোড, যশোর, নিজ বাসভবন, ১৭ জুন ২০১৯। আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা.), *যশোর জেলার ইতিহাস*, দিগন্ত প্রচারণী লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৫৫৩
৩. আলী মো: আবু নাঈম ও ফাহিমা কানিজ লাভা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০
৪. হামিদা রহমান, *মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও শহীদ বুদ্ধিজীবী*, মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৪১। আলী মো: আবু নাঈম ও ফাহিমা কানিজ লাভা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০
৫. সাক্ষাৎকার, মাসকুর রহমান টুটুল (শহীদ মশিউর রহমানের ছোট পুত্র), ফোনালাপ, ১৭ জুন ২০১৯। আলী মো: আবু নাঈম ও ফাহিমা কানিজ লাভা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০
৬. আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৫১-১৫২
৭. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, *প্রথম খণ্ড*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, (প্রথম সংস্করণ ১৯৭০) পৃ. ৭০-৮২
৮. আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২
৯. আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ১৩৮

   ডা. জীবন রতন ধর (১৮৮৯-১৯৬৩) একজন কংগ্রেস সমর্থক রাজনীতিবিদ। ১৯১৯ সালে যশোর জেলা কংগ্রেস পার্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি টানা ১২ বছর যশোর শাখার সহ সভাপতি নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৫-১৯৪৮ সাল পর্যন্ত যশোর পৌরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। যশোরের ভাষা আন্দোলনে কংগ্রেস সদস্য হিসেবে যোগদান করেন এবং কারাবরণ করেন।

   কমিউনিস্ট নেতা **অনন্ত মিত্র** একজন ভাষা আন্দোলনকর্মী। যশোরে ১৯৪৮ সালে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে কমিউনিস্ট পার্টি নেতা হিসেবে অনন্ত মিত্র যোগদান করে। ১৯৪৮ সালের ১০ মার্চ যশোরে ঘোষিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মতামত প্রদান করে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিল থেকে অন্যান্য নেতাকর্মীদের সাথে তাকেও গ্রেফতার করা হয়। আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮। হামিদা রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

১০. আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬। হামিদা রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১। *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ১৬-১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

   আলমগীর সিদ্দিকী (১৯২৬-১৯৭৭) যশোর অঞ্চলে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। ছাত্রজীবনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে যোগদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ যশোরে ভাষা দিবস পালনে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে যশোরে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের শাখা যেখানে যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন আলমগীর সিদ্দিকী। তিনি ভাষা আন্দোলনের মিছিলে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে যশোরে পুলিশ-ছাত্রের সংঘর্ষে (১৩ মার্চ ১৯৪৮) গুলিবিদ্ধ হন। এরপর আলমগীর সিদ্দিকী ১৯৪৯ সালে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে 'আওয়ামী মুসলিম লীগে' যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে যোগদানের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপের যশোর জেলা সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির যশোর জেলা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন। রুকুনউদ্দৌলাহ, *মুক্তিযুদ্ধে যশোর*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৮। https://dhakamail.com/country/2114

   হামিদা রহমান (১৯২৭-২০০৫) যশোর জেলার কসবায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যশোর জেলার অন্যতম ভাষা সৈনিক। প্রথম জীবনে তিনি বামপন্থি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং গোপনে তৎকালীন সময়ে যশোরে চলমান বামপন্থি কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে *আজাদ পত্রিকা* 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু' নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এর প্রতিবাদ জানিয়ে মাইকেল মধুসূদন কলেজের ছাত্রী হামিদা রহমান '*স্বাধীনতা*' পত্রিকায় ১৯৪৭ সালের ১০ জুলাই সংখ্যায় 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে কাজী আবদুর রউফ যশোরে ভাষা আন্দোলন সংগঠন শুরু করলে হামিদা রহমান তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে যশোরে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের শাখা গঠিত হয় যেখানে একমাত্র নারী সদস্য হিসেবে যুগ্ম আহবায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ হরতাল পালনে যশোর মোমিন গার্লস স্কুলের (বর্তমান যশোর সরকারি মহিলা উচ্চবিদ্যালয়) শিক্ষকরা একমত পোষণ না করলে হামিদা রহমানের নেতৃত্বে একটি মিছিল স্কুলে পৌঁছায় এবং স্কুলের মেয়েরা মিছিলে অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে ১৩ মার্চ যশোর শহরে তার নেতৃত্বে মেয়েরা হরতাল পালন ও মিছিল করে। এভাবেই সংগ্রাম পরিষদের আহবায়কের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সমগ্র অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া হামিদা রহমান *দৈনিক বাংলা*, *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক আজাদ*,

দৈনিক সংবাদ, *সাপ্তাহিক বেগম* প্রভৃতি পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন এবং সাহিত্যিক হিসেবেও তার সুপরিচিতি রয়েছে। সুপা সাদিয়া, *বায়ান্নর ৫২ নারী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০-১৩৩। সাঈদা জামান, *বাংলাদেশের নারী চরিতাভিধান*, দি রয়েল পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৩০৬-৩০৭।

মুসলিম লীগ নেতা আবদুল খালেক মাগুরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ই তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন এবং পরবর্তীতে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ১৯৫৬-৫৮ সালে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা তথা সোহ্‌রাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভায় গণপূর্ত মন্ত্রী হিসেবে তিনি যোগদান করেন। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পূর্ব পর্যন্ত তিনি মন্ত্রিপরিষদে ছিলেন। তৎকালে এ অঞ্চলের উন্নয়নে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। জেলা কালেক্টরেট, মাগুরা অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০

১১. ভাষা আন্দোলন কর্মী হামিদা রহমান ও মজিদ খানের সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, *প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

১২. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, *তৃতীয় খণ্ড*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২৪২

১৩. আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭

১৪. হামিদা রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

১৫. আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯। আলী মোঃ আবু নাঈম ও ফাহিমা কানিজ লাভা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১

১৬. মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় মশিউর রহমানসহ সৈয়দ আফজাল হোসেন, এম.এম জিন্নাহ, আলমগির সিদ্দিকী, রঞ্জিত মিত্র, হামিদা রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা প্রদান করেন। শামসুর রহমান, "ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় যশোর", *বিচিত্রা*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

১৭. শামসুর রহমান, *প্রাগুক্ত*। মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৩৩-১৩৪

১৮. আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮-৯৯। হামিদা রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১।
মশিউর রহমান, এস.এম জিন্নাহ, রণজিৎ মিত্র, কাজী আবদুর রকিব, কমরেড অনন্ত মিত্র, রবিকুমার সাহা, হবিবুর রহমান, লুৎফর রহমান, আবদুর রাহাত, পবিত্র ধর, সৈয়দ আফজাল হোসেন প্রমুখ নেতাসহ ৫০ জন এদিন গ্রেফতার হন। হামিদা রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১।

১৯. তোফায়েল আহমেদ (সম্পা.), *যশোরের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*, তৃপ্তি বুক হাউজ, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৭-৩৮

২০. সাক্ষাৎকার, আলি কদর মোঃ সামছুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*। আলী মোঃ আবু নাঈম ও ফাহিমা কানিজ লাভা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১। হামিদা রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১-৪২

২১. তোফায়েল আহমেদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯। আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস ১ম খণ্ড*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২১১

২২. *যশোর গেজেট*, যশোর, সম্পাদক ও প্রকাশক মাসুদ পারভেজ, সংখ্যা-০১, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৬। আলী মোঃ আবু নাঈম ও ফাহিমা কানিজ লাভা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১

২৩. মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ উত্থান পর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৪০-৪১

২৪. সাক্ষাৎকার, আমিরুল ইসলাম রন্টু, ষাটের দশকের ছাত্র ইউনিয়ন নেতা, বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা, ছাতিয়ানতলা, যশোর সদর, যশোর, ১৫ মে ২০২০।
মোশাররফ হোসেন (১৯২৫-১৯৭৪) যশোর জেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম একজন নেতা। তিনি কলকাতার রিপন কলেজ থেকে আইন বিষয়ে পড়াশোনা শেষে যশোর জেলা বার-এ যোগদান করেন এবং একই সাথে রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলনের সময় তিনি যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং এই আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে যশোর সদর আসন থেকে প্রাদেশিক সদস্য পদে নির্বাচিত হন। তিনি আওয়ামী লীগের সদস্য হলেও ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির যশোর জেলা শাখার সভাপতি আলমগীর সিদ্দিকীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং স্ব স্ব অবস্থান থেকে স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেন। তিনি যশোর অঞ্চলের ছাত্রলীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের (নিউক্লিয়াস সেলভুক্ত) নেতৃত্বে ছিলেন। রুকুনউদ্দৌলাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮। *দৈনিক সমকাল*, ঢাকা, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১।
শাহ মোহাম্মদ আবুল খায়ের যশোরের খড়কী অঞ্চলের পীর হিসেবে পরিচিত। তার বাবার নাম আবদুল করিম। আবুল খায়েরের হাতেই যশোরে আওয়ামী মুসলিম লীগের গোড়াপত্তন হয়। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের যশোর শাখা গঠনে তিনি আহবায়ক ছিলেন। ১৯৫০ সালে বৃহত্তর যশোরে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হলে তিনি দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। সাক্ষাৎকার, আমিরুল ইসলাম রন্টু, *প্রাগুক্ত*। শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৩০। আলী মো: আবু নাঈম ও ফাহিমা কানিজ লাভা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১

২৫. রেহমান শামস, "প্রতিরোধ যুদ্ধে যশোর", *জনকণ্ঠ সাময়িকী*, ঢাকা, ১৪ মার্চ ১৯৯৭

২৬. মোঃ আনোয়ার হোসেন, *বৃহত্তর যশোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৪৪

অ্যাডভোকেট হবিবুর রহমান বৃহত্তর যশোর অঞ্চলের একজন বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতা। ১৯৪৮ সালে যশোরে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হলে এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ সালের ১০ মার্চ জারিকৃত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করার অপরাধে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে তিনিও গ্রেফতার হন। ১৯৪৯ সালে যশোর আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের শুরুতেই তিনি এ দলের সাথে যুক্ত হন। ১৯৫০ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের বৃহত্তর যশোর জেলা পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হলে হবিবুর রহমান সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। অত্র অঞ্চলে আওয়ামী মুসলিম লীগের দলীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। মো: আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪। শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০। তোফায়েল আহমেদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮

২৭. Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh), *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, vol-1, 1948-1950,* Hakkani Publishers, Dhaka, 2020, p. 270-271

২৮. মো: আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪। আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬। সাক্ষাৎকার, তবিবর রহমান সরদার, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, সাবেক এম পি এ এবং জাতীয় সংসদ সদস্য, ২ এপ্রিল ২০০৭, উদ্ধৃত মো: আনোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

২৯. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৯৭

৩০. সাক্ষাৎকার, আমিরুল ইসলাম রন্টু, *প্রাগুক্ত*। শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০। আলী মো: আবু নাঈম ও ফাহিমা কানিজ লাভা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১

৩১. *স্মৃতিচারণ-২০১৪*, শহীদ মশিউর রহমানের ৪৩তম মৃত্যু বার্ষিকীতে যশোর হতে প্রকাশিত পুস্তিকা, পৃ. ৬

৩২. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩-১৭।

৩৩. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস (১৯৪৯-১৯৭১)*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৩-৩৪

৩৪. Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister of GOB), *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, vol 3, 1953, ibid,* p. 90-91

৩৫. Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister of GOB), *ibid,* p. 344-345

৩৬. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩-৩৪

৩৭. *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ১৬ নভেম্বর ১৯৫৪

৩৮. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

৩৯. Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister of GOB), *ibid,* p. 273-274

৪০. *Ibid, vol-3,* p. 310-312

৪১. *Ibid, vol-4,* 1954-1957, p. 7-10

৪২. *Ibid,* p. 14-17

৪৩. মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭-৭৮

৪৪. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪

৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

৪৬. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, খোশরোজ কিতাব মহল লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৫৫-৫৭

৪৭. হামিদা রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

৪৮. সাক্ষাৎকার, আলি কদর মোঃ সামছুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*

৪৯. আলী মো: আবু নাঈম ও ফাহিমা কানিজ লাভা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১

৫০. সাক্ষাৎকার, মাসকুর রহমান টুটুল, *প্রাগুক্ত*

৫১. Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister of GOB), *ibid, vol-4,* p. 416

৫২. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫

৫৩. *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ১৫ মার্চ ১৯৫৭

৫৪. সাক্ষাৎকার, আলি কদর মোঃ সামছুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*

৫৫. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ১৫

৫৬. সাক্ষাৎকার, আলি কদর মোঃ সামছুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*। আলী মো: আবু নাঈম ও ফাহিমা কানিজ লাভা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১

৫৭. স্মৃতিচারণ-২০১৪, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২। আসাদুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫৩

৫৮. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬-৫৭

১৯৬৭ সালের ৩০ এপ্রিল এন ডি এফ নেতা আতাউর রহমানের বাসভবনে আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম এবং এনডিএফ প্রতিনিধিরা ৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে পিডিএম নামে ফ্রন্ট গঠন করেন। জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১২৩

৫৯. সাক্ষাৎকার, আলিকদর মোঃ সামছুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*। আলী মো: আবু নাঈম ও ফাহিমা কানিজ লাভা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১

৬০. সালাউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ.৮৫

৬১. রেহমান শামস্, *প্রাগুক্ত*

৬২. শ্রী তারাপদ দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

৬৩. *স্মৃতিচারণ-২০১৪*, *প্রাগুক্ত*

৬৪. সালাউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১-৫৪।

৬৫. সাক্ষাৎকার, আলি কদর মোঃ সামছুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*

৬৬. মাসুদ পারভেজ (সম্পা.) ও প্রকাশিত, *হৃদয়ের আঙিগনায় আমাদের চৌগাছা*, যশোর, ২০১৯, পৃ. ১০-১২

৬৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৯ এপ্রিল ১৯৬৬

৬৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৭ এপ্রিল ১৯৬৬

৬৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৯ এপ্রিল ১৯৬৬

শেখ মুজিবের এই জামিন আবেদনে মশিউর রহমানসহ ১৫ জন আইনজীবী কাজ করলেও মশিউর রহমান আইনজীবীদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট রওশন আলী, অ্যাডভোকেট আনোয়ার কাদের, অ্যাডভোকেট সৈয়দ মুকররম হোসেন ফারাজী, মোশাররফ হোসেন, মোক্তার, আব্দুল হক খান, ফজলুল করিম, এ এস গজনবী, সৈয়দ আলী, আলতাফ হোসেন, আবদুর রশীদ খান, শাহাদাৎ হোসেন, আরশাদ আলী। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৯ এপ্রিল ১৯৬৬

৭০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৯ এপ্রিল ১৯৬৬

৭১. *গোয়েন্দা নথি F/N 606-48 PF-Part-25*

৭২. মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবন ও রাজনীতি*, *প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ২০০৮, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৬

৭৩. *গোয়েন্দা নথি*, *F/N 606-48 P F-Part-25*

৭৪. সাক্ষাৎকার গ্রহণ, মাসকুর রহমান টুটুল, *প্রাগুক্ত*

৭৫. *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ১৯ এপ্রিল ১৯৬৬

৭৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৬ মে ১৯৬৬

৭৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৬৬। সাক্ষাৎকার, আলী কদর শামসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*। হামিদা রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

৭৮. কর্ণেল শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৯-১১

৭৯. সালাউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬

৮০. হামিদা রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়' বঙ্গবন্ধুর প্রধান কুশলী ছিলেন সালমান খান আর সঙ্গে ছিলেন অ্যাড. জহির উদ্দিন, অ্যাড. মজিবর রহমান, অ্যাড. কামরুদ্দিন আহমদ, অ্যাড. জুলমত আলী খান সহ আরো কয়েকজন। এ সকল আইনজীবীর সাথে মশিউর রহমান আগরতলা মামলা নিষ্পত্তিতে যৌথ প্রয়াস চালান। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

৮১. সাক্ষাৎকার, আলি কদর মোঃ সামছুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*। আলী মো: আবু নাঈম ও ফাহিমা কানিজ লাভা (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

৮২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ আগস্ট ১৯৬৯

৮৩. মো: মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫-২০৭

৮৪. *স্মৃতিচারণ-২০১৪*, শহীদ মশিউর রহমানের ৪৩তম মৃত্যু বার্ষিকীতে যশোর হতে প্রকাশিত পুস্তিকা, পৃ. ৬

৮৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ অক্টোবর ১৯৬৯

৮৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ অক্টোবর ১৯৬৯

৮৭. মো: মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০

৮৮. আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭

৮৯. সাক্ষাৎকার, মকসুদুল হক, মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ও তৎকালীন সময়ের ছাত্রলীগ নেতা, ৫ এপ্রিল ২০০৭ উদ্ধৃত আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২

৯০. সাক্ষাৎকার, তবিবর রহমান সরদার, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও ১৯৭০ নির্বাচনে নির্বাচিত এম পি এ, ২ এপ্রিল ২০০৭। মকসুদুল হক, নজরুল ইসলাম ঝর্না, মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ও তৎকালীন সময়ের ছাত্রলীগ নেতা, ৫ এপ্রিল ২০০৭ উদ্ধৃত আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২

পাকিস্তানের দুঃশাসন থেকে মুক্তির দাবিতে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ সকালে যশোর শহরের ঈদগাহ ময়দান থেকে মিছিল বের করেছিলো সাধারণ জনতা। এই মিছিলটি শহরের দড়াটানা চত্বর, কাপুড়িয়াপট্টি, চৌরাস্তা হয়ে রেল রোডে পৌঁছায়। পরবর্তীতে মিছিলটি শহরের ভোলাট্যাংক রোড, সার্কিট হাউজ হয়ে আবারও ঈদগাহে আসে। এ সময় শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে অসংখ্য মানুষ ঈদগাহে জড়ো হয়। পাকবাহিনী কর্তৃক টেলিফোন ভবন দখলের খবরে জনগণ একত্রিত হয়ে সেখানে এসে বিক্ষোভ করতে থাকে। টেলিফোন ভবনের ছাদে অবস্থানরত পাকসেনারা গুলি শুরু করে। ওই ভবনের পশ্চিম পাশের একটি বাড়িতে বসবাস করতেন নিঃসন্তান পূর্ণচন্দ্র কর ও তার স্ত্রী **চারুবালা কর**। গুলি চলাকালে বাড়ির ভেতরে ছিলেন চারুবালা। এ সময় পাক সেনাদের একটি গুলি ঘরের চাল ভেদ করে চারুবালার দেহে বিদ্ধ হলে তিনি নিহত হন। চারুবালার লাশ নীলগঞ্জ মহাশ্মশানে নিয়ে সৎকার করা হয়। *দৈনিক গ্রামের কাগজ* (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের স্থানীয় পত্রিকা), যশোর, ৩ মার্চ ২০২২। শাহানা পারভীন লাভলী, *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ নারী*, অনির্বাণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ৮০-৮৪

৯১. শ্রী তারাপদ দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

৯২. তোফায়েল আহমেদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

৯৩. শাহানা পারভীন লাভলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

৯৪. সাক্ষাৎকার, আলি কদর মোঃ সামছুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*

৯৫. শ্রী তারাপদ দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

৯৬. সাক্ষাৎকার, তবিবর রহমান সরদার, *প্রাগুক্ত*

৯৭. হামিদা রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

৯৮. হামিদা রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪। আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫

৯৯. মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, যশোরের প্রবীণ রাজনীতিবিদ **তবিবর রহমান সরদার (১৯৩২-২০১০)** যশোর জেলার শার্শায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাক-স্বাধীনতাকালে যশোরে আওয়ামী লীগের রাজনীতি প্রসারে সংগঠক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে যশোর জেলার শার্শা থানা নির্বাচনী অঞ্চল থেকে এম এল এ নির্বাচিত হন। তাছাড়া ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। রুকুনউদ্দৌলাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২। *দৈনিক ইনকিলাব*, ৩ এপ্রিল ২০১৯

শাহ হাদিউজ্জামান (১৯৩৯-২০১৭) যশোর জেলার অভয়নগর থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৮ সালে ছাত্র থাকাকালীন ছাত্র লীগের রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিলর ছিলেন। ১৯৭০ সালে অভয়নগর-বাঘারপাড়া আসন হতে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রথম প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধে যশোরে গঠিত সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা হিসেবে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং ছাত্র জনতাকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংগঠিত করতে থকেন। তাছাড়া তিনি ১৯৭১ সালে মুজিবনগরের বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারের গণপরিষদ সদস্য ছিলেন। ১৯৭২ সালে যশোর জেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক কমিটির সাধারণ সম্পাদক, ১৯৭৩ সালে জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক, ১৯৭৭-১৯৯৫ সাল পর্যন্ত যশোর জেলা কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতিসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। রুকুনউদ্দৌলাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪। *দৈনিক সমকাল*, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

পীযুষ কান্তি ভট্টাচার্য ১৯৪০ সালের ১ মার্চ যশোরের মনিরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। যশোর সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজে অধ্যয়নকালীন তিনি ছাত্র সংসদের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ৬ দফা বাস্তবায়ন করার জন্য যশোরের গণমানুষের কাছে আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দেন। তিনি ১৯৭৩ সালে যশোর-৭ আসনের সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা তাকে হত্যা করার জন্য হুলিয়া জারি করে। অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভারতে গিয়ে মুজিব নগর সরকারের শরণার্থীদের স্কুলে শিক্ষা দিতেন এবং দেশকে স্বাধীন করার জন্য ভারতে থেকে সংগঠক হিসেবে কাজ করেন।

https://m.banglanews24.com/national/news/bd/527296.details

নূরুল ইসলাম যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার ফুলসারায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদ্য যোগদানকৃত সৈনিক ছিলেন। ৮ নম্বর সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার খন্দকার নাজমুল হুদার (বীর বিক্রম) নেতৃত্বে ৯ আগস্ট বয়রা সাব-সেক্টরে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর নূরুল ইসলামসহ চারজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গুলিতে শহীদ হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তার সাহসিকতার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে বীর বিক্রম খেতাব প্রদান করে। জাহিদ রহমান, প্রধান নির্বাহী, মুক্তিযুদ্ধে মাগুরা গবেষণা কেন্দ্র এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, সেক্টর ৮। *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ৯ ডিসেম্বর, ২০১১

১০১.আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫-১৭১

১০২.তোফায়েল আহমেদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

১০৩.আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

১০৪.সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস্ ও অন্যান্য বাহিনী*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৭৮

১০৫.হামিদা রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১৬

১০৬.মাহবুব তালুকদার (সম্পা.), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর যশোর*, সরকারি মুদ্রনালয়, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৭১। মশিউর রহমানের সাথে অ্যাডভোকেট মঈনউদ্দিন মিয়াজী, সুধীর ঘোষ, কৃষ্ণ সাহা, বিশ্বনাথ, স্বপনসহ অনেকেই গ্রেফতার হন। মাহবুব তালুকদার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

১০৭.হামিদা রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

মঈনউদ্দিন মিয়াজী ঝিনাইদহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যয়নকালে ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং পরবর্তীতে পাবনা মহকুমা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ভাষা আন্দোলনে যশোর অঞ্চলে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৩ সালে শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে মশিউর রহমানের নেতৃত্বে যশোরে সক্রিয় রাজনীতি শুরু করেন। তাছাড়া ছয়দফা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচনে যশোর-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাক-আর্মী মশিউর রহমানের সাথে মঈনউদ্দিন মিয়াজীকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে তিনি মুক্ত হতে পেরেছিলেন। হামিদা রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২। https://bn.wikipedia.org/wiki/মঈনউদ্দিন_মিয়াজী

১০৮.শ্রী তারাপদ দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

১০৯.গালিব হরমুজ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, *যশোর খণ্ড*, বলাকা প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস্ যশোর, ২০০১, পৃ. ১০

১১০.আবু মো. দেলোয়ার হোসেন ও সাহিদা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আইনজীবী*, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ. ৭৮-৮০। শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি পাঠাগার কর্তৃক (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০

১১১. হামিদা রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৩

১১২.আবু মো. দেলোয়ার হোসেন ও সাহিদা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আইনজীবী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮-৮০। শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি পাঠাগার কর্তৃক সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩

১১৩. মাহবুব তালুকদার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১। মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, *তৃতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩

১১৪.*স্মৃতিচারণ-২০১৪*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

১১৫.হামিদা রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৩

১১৬.*স্মৃতিচারণ-২০১৪*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

৪.২ রওশন আলী (১৯২১-১৯৯৪)

যশোরের সর্বজনীন রাজনীতির অন্যতম নেতা রওশন আলী। তিনি ১৯২১ সালের ১৫ এপ্রিল যশোর সদর উপজেলার তেঘরিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পৈতৃক নিবাস যশোর শহরতলীর নওদা গ্রামে। তার পিতার নাম মান্দার আলী বিশ্বাস, মাতা খোদেজা বেগম। দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে রওশন আলী ছিলেন জ্যেষ্ঠ। গ্রামের প্রাইমারি স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি যশোর সম্মিলনী ইনস্টিটিউশন স্কুলে (প্রতিষ্ঠা ১৮৮৯) ভর্তি হন এবং ১৯৩৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করেন। রওশন আলী উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে অধ্যায়নের জন্য কলকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হন এবং এ কলেজ থেকে ১৯৪১ সালে আই.এ পাস করার পর তিনি গ্রাজুয়েশনও সম্পন্ন করেন। ১৯৫১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৫২ সালে জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যপদ লাভ করেন এবং আইন পেশায় নিয়োজিত হন। যশোরের দড়াটানায় অবস্থিত পারিবারিক বাস ভবন 'আলী মঞ্জিল' এর দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষ রওশন আলী চেম্বার হিসেবে ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যুক্ত হলে 'আলী মঞ্জিলে'র চেম্বার কক্ষ যশোর জেলা আওয়ামী লীগের অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হয়।[১] শেখ মুজিবুর রহমান ধারাবাহিক সাংগঠনিক সফরের অংশ হিসেবে ১৯৫২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর যশোর জেলায় সফর করেন। এই দিন টাউনহল ময়দানে অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম খানের সভাপতিত্বে দলীয় সভায় যোগদান করার পর শেখ মুজিবুর রহমান রওশন আলীর বাস ভবনের (আলী মঞ্জিল, দড়াটানা রোড, যশোর) দ্বিতীয় তলায় আওয়ামী মুসলিম লীগের দলীয় গোপন মিটিং করেন।[২]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের দলীয় চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যায়। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী পূর্ব বাংলার নেতা নেতৃত্ব আশা করেছিল নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার সফল বাস্তবায়ন হবে।[৩] কিন্তু মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে শাসন ও শোষণ চালাতে থাকে। মূলত মুসলিম লীগ উচ্চ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের মধ্যেই তরুণ প্রগতিশীল গ্রুপ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মতাদর্শী ভিত্তিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মুসলিম লীগের প্রগতিশীল তরুণ সম্প্রদায়ের সরাসরি প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সুসংগঠিত রাজনৈতিক সংগঠন 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনাক্রমে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের পেছনে এ দলের কর্মীর সাথে মুসলিম লীগ সরকারের শুধু মত দ্বৈততায় ছিল না বরং ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা করার পরিকল্পনাও তাদের ছিল।[৪] প্রতিষ্ঠাকালীন দলীয় নেতাকর্মী আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্মলগ্ন থেকেই সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করেন। দলের সভাপতি মওলানা ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬), সম্পাদক শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫), যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) সাংগঠনিক তৎপরতার অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। উপরিউক্ত নেতৃবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন জেলা সফর করে আওয়ামী মুসলিম লীগের জেলা, উপজেলা, মহকুমা শাখা গঠন করেন এবং

সকল স্তরের মানুষকে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদানের আহ্বান জানান। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আওয়ামী মুসলিম লীগের ১১টি জেলা শাখা, ১৮টি মহকুমা সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর ঢাকাসহ বড় ও মাঝারি শহরে ১৮টি জনসভা সংগঠিত হয়।[৫] সাংগঠনিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে যশোর মহকুমা শহরে জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং দলের মহকুমা শাখা গঠিত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫০ সালে শাহ মোহাম্মদ আবুল খায়ের ও অ্যাডভোকেট হবিবুর রহমানের নেতৃত্বে যশোর আওয়ামী মুসলিম লীগের জেলা কমিটি গঠন করা হয়।[৬] এ কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে শাহ মোহাম্মদ আবুল খায়ের (পীর সাহেব, খড়কী) ও অ্যাডভোকেট হবিবুর রহমান।[৭] যশোর জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের আহবায়ক নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের নেতৃবৃন্দ আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেছিলেন সে বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই।[৮] রওশন আলী এ প্রগতিশীল অংশের একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন।[৯] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন অ্যাডভোকেট মশিউর রহমান, অ্যাডভোকেট আবদুল খালেক ও অ্যাডভোকেট হবিবুর রহমানের সাথে থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর্যায়ে যশোরে নতুনভাবে ভাষা আন্দোলন সংগঠিত হয়। এ সময় রওশন আলী যশোরের ভাষা আন্দোলন কর্মী ও সংগঠকদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতেন। রওশন আলীর নিজ বাসভবনেও আন্দোলনের কর্মসূচি নির্ধারণে স্থানীয়ভাবে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। যশোরে আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনৈতিক গোড়াপত্তনের পর্বে রওশন আলী নিজেকে সংযুক্ত করেন। ১৯৫০ সালেই তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ধর্মনিরপেক্ষ তথা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী রওশন আলী আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদানের পর ১৯৫৫ সালে তিনি দলের জেলা আওয়ামী লীগ কমিটির সম্পাদক হন এবং ১৯৭২ সাল পর্যন্ত একই পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া, দীর্ঘদিন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে রওশন আলী আওয়ামী লীগ কর্মী হিসেবে মশিউর রহমানের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।[১০] ১৯৫৬-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত যশোর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এ সময় রওশন আলী রাজনীতির পাশাপাশি যশোর বার এ আইন ব্যবসা করতেন।[১১]

১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তখন থেকেই আওয়ামী লীগের দুই নেতা সোহ্‌রাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) ও মওলানা ভাসানীর (১৮৮০-১৯৭৬) মধ্যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়।[১২] ফলশ্রুতিতে আওয়ামী লীগের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুই গ্রুপ তৈরি হয়।[১৩] মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের ১৭ মার্চ টাঙ্গাইলের কাগমারীতে বসেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাসী মওলানা ভাসানী অলি আহাদের (১৯২৮-২০১২) মাধ্যমে তার পদত্যাগ পত্রটি *দৈনিক সংবাদ* এর সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর (১৯২২-১৯৮০) কাছে প্রেরণ করেন। মওলানা

ভাসানীর পদত্যাগের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য ১৯৫৭ সালের ৩০ মার্চ, ঢাকায় ৫৫ সিমসন রোড আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে। এখানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)। এ সভায় মওলানা ভাসানী তার পদত্যাগ পত্রটি *দৈনিক সংবাদের* সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর (১৯২২-১৯৮০) কাছে পাঠালেন কেন এ নিয়ে আলোচনা হয়। অলি আহাদকে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ থেকে বরখাস্তের বিরুদ্ধেও এই সভায় আলোচনা হয়। অলি আহাদের বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কের মুখে অলি আহাদের পক্ষ নিয়ে নয় জন সদস্য পদত্যাগ করেন।[১৪] এ অবস্থায় ১৯৫৭ সালের ২১ মে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যোগদানকারী সদস্যবৃন্দ মওলানা ভাসানী, অলি আহাদ এবং নয় নেতার পদত্যাগ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করে। এ সভা শেষে নয় নেতার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়।[১৫] পদত্যাগকৃত ৯ জন সদস্যের স্থলে নতুন ৯ জন সদস্য নির্বাচনের জন্য ১৯৫৭ সালের ২ জুন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। নব্যনির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে রওশন আলী অন্যতম একজন ছিলেন।

রওশন আলী নতুন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পূর্বেই যশোর আওয়ামী লীগের সম্পাদক ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে এ সময় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক পদ থেকে অনেকেই পদত্যাগ করতে থাকেন। এরূপ দলীয় সংকটের সময় নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করে রওশন আলী দলের পাশে দাঁড়ান।[১৬] ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ জুন আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের পর মওলানা ভাসানীর পদত্যাগের বিষয়টি সকলের মাঝে স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ ১০ ও ১১ জুন আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগকারী ৯ নেতা ও অন্যান্যদের নিয়ে মওলানা ভাসানী ইয়ার মোহাম্মদের (১৯২০-১৯৮১) বাসভবনে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হন। কয়েক দফা আলোচনা শেষে এখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, আওয়ামী লীগের পাল্টা একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হবে। ১৯৫৭ সালের ১৩ জুন ঢাকার সদরঘাটে 'শাবিস্তান হল'-এ (পূর্ব নাম পিকচার হাউজ) আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন হয়। এ অধিবেশনে মওলানা ভাসানীর স্বতন্ত্র দল গঠনের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। মওলানা ভাসানীসহ কার্যনির্বাহী কমিটির পদত্যাগকারী নয়জন সদস্য মিলে ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই ঢাকায় এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করেন। আওয়ামী লীগভুক্ত বামপন্থি নেতৃবৃন্দ, লুপ্ত হয়ে যাওয়া গণতন্ত্রী দলের সদস্যরা এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক কমিউনিস্ট নেতা এ সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নামক নতুন পার্টির জন্ম হয়।[১৭] মওলানা ভাসানী নতুন দল গঠন করায় আওয়ামী লীগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানের এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে রওশন আলী আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে কাজ করার পক্ষে মত প্রদান করেন। আওয়ামী লীগের এই সংকটকালীন সময়ে আওয়ামী লীগকে আরও কার্যকরী সংগঠনে রূপান্তরিত করার জন্য ১৯৫৭ সালের ১৪ জুন অনুষ্ঠিত (গুলিস্তান হল-এ) কাউন্সিল অধিবেশনে ১৯৫৫ সালের ওয়ার্কিং কমিটিকে পুনর্বিন্যাস করা হয়। আওয়ামী লীগের পুনর্বিন্যাসিত কমিটিতে রওশন আলী যশোর অঞ্চল থেকে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।[১৮]

১৯৫৭ সালে ওয়ার্কিং কমিটি পুনর্বিন্যাস করার পর শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় অনেকে ধারণা করেছিলেন আওয়ামী লীগ শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে টিকে থাকতে পারবে কি না। কারণ মফস্বল অঞ্চলে মওলানা ভাসানীর সমর্থকরা আওয়ামী লীগ ছেড়ে ভাসানীর পক্ষে যোগদান করেন। এ সময় আওয়ামী লীগের জেলা ও থানা কমিটিগুলো অকার্যকর হতে থাকে। আওয়ামী লীগের এ চরম সংকটের সময় শেখ মুজিবুর রহমান দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৭ সালের ২৯ জুলাই ধূপখোলা মাঠ থেকে শুরু করে তার সাংগঠনিক জনসভা। ১৯৫৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জেলা কাউন্সিল অধিবেশন সমাপ্ত করার জন্য তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন। এ সময় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকে থানায় থানায় 'স্বায়ত্তশাসনের জন্য দাবি' সপ্তাহ উদযাপন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চল সফর করেন। সাংগঠনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় দলীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৫৭ সালের ১ আগস্ট যশোরে জনসভা করেন।[১৯]

এ জনসভায় রওশন আলী যশোর আওয়ামী লীগের সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন এবং জনসভা সফল করার জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। এ সময় তিনি যশোরে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায়ও অসামান্য অবদান রাখেন। একজন দক্ষ আঞ্চলিক রাজনৈতিক হিসেবে তিনি যশোর অঞ্চলের রাজনীতিতে নিজের অবস্থান তৈরির পাশাপাশি বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আঞ্চলিক রাজনীতির একজন ধারক হিসেবে রওশন আলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[২০] রওশন আলী আওয়ামী লীগের ক্রান্তিকালীন সময়ে সবসময় দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সকল প্রকার সংকটে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন। আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার কর্মসূচি হিসেবে ১৯৬৪ সালের ৬ মার্চ আওয়ামী লীগের সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যে শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।[২১] আওয়ামী লীগে যোগদানের পর রওশন আলী খুব দ্রুত শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে সাংগঠনিক সফরে যশোরে গিয়ে দলীয় কর্মসূচি শেষে রওশন আলীর বাসায় যান এবং একসাথে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল খালেকের কবর (কারবালা) জিয়ারত করেন।[২২] রওশন আলী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এ আন্দোলনে তার সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন। এ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়। যশোর অঞ্চলের আওয়ামী লীগ সদস্য হিসেবে রওশন আলী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।[২৩]

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে ছয়দফা গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশনে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ নামে খ্যাত ছয়দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। ছয়দফার সংগ্রামকে বেগবান করার উদ্দেশ্যে এ সময় আওয়ামী লীগের নতুন কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল অধিবেশনে ছয়দফা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ছয়দফার ব্যাখ্যাসহ "আমাদের বাঁচার দাবি ছয়দফা" শিরোনামে পুস্তিকা তৃতীয় এবং নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[২৪] তাছাড়া ছয়দফা

দাবির যৌক্তিকতা জনগণের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠিত করেন। এক্ষেত্রে তিনি দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে সাংগঠনিক সফর করেন এবং আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দকে নতুনভাবে সংগঠিত করেন। যার ফলে অন্যান্য অঞ্চলের মতো যশোর অঞ্চলে আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি গঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগের রাজনীতি নতুনভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় ইনস্টিটিউটে আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[২৫] এ অধিবেশনে জনাব এম এ রশিদ সভাপতি এবং রওশন আলী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এসময় তিনি আওয়ামী লীগ পুনর্গঠনে দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন।[২৬]

পাকিস্তান সরকার ছয়দফাকে তাদের নতুন চ্যালেঞ্জ এবং হুমকি স্বরূপ গ্রহণ করতে থাকে। আইয়ুব সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো (১৯২৮-১৯৭৯) ছয়দফার বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিতে থাকেন। তেমনিভাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সরকারের সকল অপব্যাখ্যা এবং আচরণের যথোচিৎ জবাব দিতে থাকেন। এসময় সংগ্রামকে বেগবান করার লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালের ৪ এপ্রিল আওয়ামী লীগ নতুন ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করেন। নব্যগঠিত এ কমিটিতে যশোর অঞ্চল থেকে রওশন আলী সদস্য মনোনীত হন।[২৭] শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো ১৯৬৬ সালের ১৬ এপ্রিল যশোরে জনসভা করেন। এ জনসভায় রওশন আলী উপস্থিত ছিলেন।[২৮]

১৯৬৬ সালের ছয়দফার বাস্তবায়ন কর্মসূচিতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। রওশন আলী এসময় বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যশোরের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালের ১৩ মে যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানা আওয়ামী লীগের কর্মী সম্মেলনে রওশন আলী দেশে চলমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের করণীয় সম্পর্কে বিষদভাবে আলোচনা করেন। এ সম্মেলনে দেশবাসীর দাবি-দাওয়ার বাস্তবায়ন, ছয়দফা আন্দোলনে সকলের অংশগ্রহণ, রাজবন্দিদের মুক্তি, বিড়ি শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নের পথ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। তাছাড়া তৎকালীন খাদ্য পরিস্থিতির দ্রুত সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২৯] ছয়দফা আন্দোলনের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালের ১৬ এপ্রিল খুলনা মিউনিসিপ্যাল পার্কে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত জনসভায় যোগদান করেন।[৩০] খুলনায় বিশাল সমাবেশে বক্তৃতা শেষে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে যশোরে আওয়ামী লীগ নেতা মশিউর রহমানের বাসায় যান। মশিউর রহমানের বাসা থেকে রওয়ানা হওয়ার পর পথিমধ্যে পুলিশ গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রদর্শন না করেই শেখ মুজিবকে যশোর কোতোয়ালী থানায় যাওয়ার কথা বললে তিনি গ্রেফতারি পরোয়াণা ছাড়া থানায় যেতে আপত্তি জানান। এসময় শেখ মুজিব আইন শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাবনত যশোর সদর (দক্ষিণ) মহকুমা আদালতে হাজির হন। রওশন আলী সহ অন্যান্য আইনজীবীদের প্রচেষ্টায় জামিন আদেশ ঘোষণার পর শেখ মুজিব, রওশন আলী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আনন্দ মিছিল করতে করতে মশিউর রহমানের যশোর শহরের বাসায় গমন করেন। তৎকালীন যশোর আওয়ামী লীগের সম্পাদক অ্যাডভোকেট রওশন আলী শেখ মুজিবের জামিন আবেদন প্রক্রিয়ায় মশিউর রহমানের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করেন। মশিউর রহমানসহ ১৫ জন আইনজীবীর তাৎক্ষণিক আইনী দক্ষতায় শেখ মুজিবকে জামিনে মুক্তি লাভ করানো সম্ভব হয়েছিল।[৩১] তৎকালীন সময়ে যশোর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে মশিউর রহমান এবং রওশন আলী প্রথম সারির আইনজীবী ছিলেন। তাদের আইনী দক্ষতায় ও প্রজ্ঞায় দলীয় অনেক মামলার নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছিল। এ সময় ছয়দফায় অন্তর্ভূক্ত কর্মসূচির আলোকে আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে পরস্পর বিরোধী গ্রুপের সৃষ্টি হয়।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর (১৯০৫-১৯৮২) বাড়িতে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের সম্মেলনের পর মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী, আওয়ামী লীগের একাংশ এবং এন ডি এফ (National Democratic Front) এর একাংশ একটি সম্মিলিত বিরোধী মোর্চা গঠনের প্রয়াস চালাতে থাকে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলের শুরু থেকেই বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ ছয়দফা ছেড়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ করছিলেন। অবশ্য ১৯৬৬ সালের ২ মে, পি.ডি.এম (Pakistan Democratic Movement) নামে একটি মোর্চা গঠন করা হয়।[৩২] ১৯৬৬ সালের ১৩ আগস্ট আওয়ামী লীগের ছয়দফা বিরোধী গ্রুপটি রিকুইজিশন সভা আহ্বান করে। এ সভায় মাত্র ১৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।[৩৩] রিকুইজিশন সভায় অংশগ্রহণকারী ১৩ জন সদস্যের মধ্যে রওশন আলী একজন ছিলেন। শেখ মুজিবসহ বন্দি অন্যান্য নেতাদের মুক্তির ব্যাপারে এ সময় রওশন আলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৩৪]

রওশন আলীর ব্যক্তিগত স্বার্থ নয় বরং, তৎকালীন রাজনৈতিক ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের কারণেই পি.ডি. এম পন্থি রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬৬ সালের ১৯ আগস্ট ঢাকার পুরানা পল্টন অফিসে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ছয়দফা আন্দোলনের এ সংকটকালীন সময়ে আওয়ামী লীগ ছেড়ে যারা পি.ডি.এম এ যোগ দিচ্ছিলেন তাদের প্রতি ধিক্কার জানানো হয়। তাছাড়া আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির ১৪ জনকে দল থেকে কেন বহিষ্কার করা হবে না বলে কারণ দশানোর জন্য ১৫ দিনের নোটিশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বহিষ্কার সিদ্ধান্তের ১৪ জন সদস্যের মধ্যে রওশন আলীও ছিলেন। ১৯৬৬ সালের ১৯ আগস্ট ১৪ জন সদস্যকে বহিষ্কার করা হলে ১৯৬৭ সালের ২৩ আগস্ট আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৮৬) নতুন 'এডহক' কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে ছিল বহিষ্কার হওয়া নেতৃবৃন্দের পি.ডি.এম এ দলীয় অবস্থান আইন সিদ্ধ করা। পি.ডি.এম পন্থি কমিটিতে রওশন আলী সদস্য মনোনীত হন।[৩৫] ছয়দফা আন্দোলনের পক্ষ-বিপক্ষের প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তানে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক গ্রুপের সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের মতাদর্শগত ভিন্নতায় রওশন আলী ছয়দফা বিরোধী পি.ডি.এম পন্থি মতাদর্শে বিশ্বাসী হন। তবে রাজনৈতিক বাস্তবতায় তিনি আওয়ামী লীগের মূল রাজনীতিতে ফিরে আসেন এবং আমৃত্যু আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে ভূমিকা রাখেন।[৩৬]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি জনতার বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের ওপর গুলি চালালে এ.এম

আসাদুজ্জামান (১৯৪২-১৯৬৯) শহীদ হন। ২৪ জানুয়ারি সারাদেশে হরতাল আহ্বান করা হয়।[৩৭] ১৯৬৮ সালে ছাত্রদের দ্বারা এ আন্দোলন শুরু হলেও ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারিতে তা সাধারণ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পায় এবং গণআন্দোলনে রূপ নেয়। বৃহত্তর যশোর জেলায় এ গণঅভ্যুত্থানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা মূখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তাদের মধ্যে অ্যাডভোকেট রওশন আলী অন্যতম।[৩৮] গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যশোর জেলার বিভিন্ন স্থানে দলীয় সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সদর মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মওলানা আবদুর রাজ্জাক চিশতীর সভাপতিত্বে যশোর জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে মহকুমা আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের একটি বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় রওশন আলী দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে গণঅভ্যুত্থান চলাকালীন দলীয় নেতাকর্মীদের এ আন্দোলনে করণীয় সম্পর্কে সাংগঠনিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ও যশোর আওয়ামী লীগের দলীয় কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।[৩৯] সাংগঠনিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৬৯ সালের ১৫ অক্টোবর যশোর জেলার কেশবপুর থানা আওয়ামী লীগের কর্মী সম্মেলনে যোগদান করেন। জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি হাজী নূরবক্সের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মী সম্মেলনে তিনি বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যশোর জেলা আওয়ামী লীগ কর্মীদের করণীয় বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। এভাবে তিনি দলীয় কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজের অবস্থান তৈরি করতে পেরেছিলেন।[৪০] এ গণআন্দোলনের ব্যাপকতা উপলব্ধি করে আইয়ুব খান বিরোধী দলের সাথে আলোচনায় বসতে রাজী হন কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ ১৯৬৯ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান (১৯১৭-১৯৮০) ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ২৮ মার্চ ১৯৬৯ সালে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদানকালে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবরে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ও ২২ অক্টোবরের মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো নতুন করে চাঙ্গা হয়ে ওঠে।[৪১] এ সময় আওয়ামী লীগ জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল। মূলত শেখ মুজিবের সাংগঠনিক দক্ষতার কারণেই আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ও সাংগঠনিক ভিত্তি গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ১৯৭০ সালের ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভা থেকে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচার অভিযান উদ্বোধন করেন। শেখ মুজিবুর রহমানসহ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের পক্ষে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণা চালান। ফলে আওয়ামী লীগ মনোনীত সকল আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে যশোর-৫ (যশোর সদর ও বাঘারপাড়া) আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে রওশন আলী এম এন এ নির্বাচিত হন।[৪২] রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এবং দলীয় অবস্থানের কারণে তিনি এ নির্বাচনে জয় লাভ করেন।[৪৩]

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার অধিকার অর্জন করে। কিন্তু পশ্চিম

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে আলোচনার নামে সময়ক্ষেপন করতে থাকে। ১৯৭১ সালের মধ্য জানুয়ারিতে ইয়াহিয়া খান ঢাকা এসে তিনদিন ধরে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন ও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনা করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো ২৭ থেকে ২৯ জানুয়ারি ঢাকায় শেখ মুজিবের সাথে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং আলোচনা শেষে ছয়দফার কেবলমাত্র প্রথম ও ষষ্ঠ দফাদ্বয় মেনে নিতে সম্মত হন। ১৯৭১ সালের ১৪ জানুয়ারি ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছিলেন যে, সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসবে।[৪৪] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি দাবি জানান। কিন্তু ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ ১৯৭১ এক ঘোষণা জারির মাধ্যমে ৩ মার্চ (১৯৭১) অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণায় বলেন, সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা এমন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান দলটি এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ইচ্ছে নেই বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি আরো অজুহাত দেন যে, এর মধ্যে হিন্দুস্তান জড়িত হয়ে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং গোটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলেছে, সেজন্য তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ ১৯৭১ সারাদেশে হরতাল ডাকেন। ২ মার্চের হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত এবং কয়েকজন গুরুতর আহত হলে শেখ মুজিবুর রহমান ঐদিন সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিন্দা প্রকাশ করেন এবং ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ কর্মসূচি অনুযায়ী ৭ মার্চ বেলা ২ টায় রেসকোর্স মযদানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।[৪৫] ৭ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের (সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভায় শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান এবং ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায় সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধ।[৪৬]

শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণায় যশোরের প্রধান প্রধান শহরগুলো আন্দোলনমুখর হয়ে ওঠে। শহরের ঈদগাহ ময়দানে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে সমবেত হয়। সমাবেশ শেষে বিক্ষুব্ধ মানুষের বিশাল মিছিল লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করা হয়।[৪৭] চলমান মিছিল টেলিফোন ভবনের সামনে আসলে পুনরায় গুলি ছোড়া হয়। যশোরের অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে পাকসেনারা চারুবালা কর (১৯৩০-১৯৭১) নামে এক গৃহবধূকে গুলি করে হত্যা করে।[৪৮] তার মৃত্যুর সংবাদে সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। চারুবালা করের শেষকৃত্য সম্পাদন শেষে মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসভায় রওশন আলী উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত সকলে পাক প্রশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করে।[৪৯] ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ রেডিও টেলিভিশনে প্রচার করতে না দিলেও যথাসময়ে বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে পৌঁছে যায়। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা

অন্যান্য অঞ্চলের মত যশোরের শহর, গ্রামসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাই ৭ মার্চের পরপরই যশোরে গঠিত হয় সংগ্রাম পরিষদ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ। ৮ মার্চের পর সমগ্র যশোরে সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে জনগণকে প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, সভা সমাবেশ, মিছিল নিয়মিত চলতে থাকে।[৫০] এসময় যশোরে প্রায় প্রতিদিনই মিছিল, মিটিং, সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস। কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ এ দিনকে প্রজাতন্ত্র দিবসের পরিবর্তে প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।[৫১] এদিন যশোরে খান টিপু সুলতানের (১৯৫০-২০১৭) নেতৃত্বে যশোর মাইকেল মধুসূদন কলেজ থেকে ছাত্রলীগ ও সংগ্রাম পরিষদের মিছিলের সাথে আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ভাসানী-ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়নসহ স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষের সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন যশোর শহর মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত করে তোলে। তাছাড়া এদিন অ্যাডভোকেট রওশন আলী, অ্যাডভোকেট মঈনউদ্দিন মিয়াজী, অ্যাডভোকেট মোশাররফ হোসেন, এস.এম. জামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যশোর শহরে প্রতিবাদী মিছিল বের করা হয়।[৫২] মিছিলের পাশাপাশি এদিন যশোরের নিয়াজ পার্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-জনতার প্রথম কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় এবং স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত হয়।[৫৩]

রওশন আলী মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের সকল কর্মসূচিতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এ সময়ে স্বল্প পরিসরে আয়োজিত মিছিল, সভা-সমাবেশে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব প্রদান করেন। যশোরের প্রতিরোধ যুদ্ধ দেশের অনেক অঞ্চল থেকে বেশি বেগবান ছিল।[৫৪] এসময় রওশন আলীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পরিকল্পিতভাবে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু ৭ মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণায় সাধারণ জনগণ সরাসরি আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।[৫৫] তৎকালীন সময়ে যশোর অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী নেতৃত্ব ছিলেন রওশন আলী। যশোরের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় এবং দেশে অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপকভাবে শুরু হলে রওশন আলী ভারতে গমন করেন।[৫৬] এসময় পাকিস্তান আর্মি রওশন আলীর বাড়ি কামানের গোলায় ধ্বংস করে ফেলে।[৫৭] তিনি ভারতে অবস্থানকালীন সময়ে শরণার্থীদের দেখাশোনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। রওশন আলী ৮ নং সেক্টরের পলিটিক্যাল অ্যাডভাইজার ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ৩ সদস্য বিশিষ্ট অফিসার্স রিক্রুটমেন্ট কমিটির সদস্য ছিলেন।[৫৮] তিনি ছাড়া তার পরিবারের অনেক সদস্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তার বড় ছেলে অ্যাডভোকেট জেড এম ফিরোজ মুক্তিযুদ্ধে মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার মুজিব বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে ভিন্ন ভিন্ন যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সদ্যস্বাধীন দেশ সার্থকভাবে পরিচালনার জন্য সর্বজনীন কল্যাণকর একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি ড. কামাল হোসেনের (১৯৩৭-) নেতৃত্বে ৩৪ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়। রওশন আলী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত সংবিধান প্রণয়নের বিধি কমিটির সদস্য ছিলেন।

খসড়া সংবিধান প্রণয়নেও তার স্বতন্ত্র ভূমিকা ছিল। রওশন আলী গণপরিষদের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের চূড়ান্ত সংবিধানে স্বাক্ষরকারী ছিলেন।[৫৯] স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে ৭ মার্চ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩ টি আসন লাভ করে।[৬০] জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে রওশন আলী (যশোর-৩) অঞ্চল থেকে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে রওশন আলী যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি একটানা ১৯ বছর যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। যশোর জেলার আঞ্চলিক রাজনীতির পূর্ণতা প্রদানের পাশাপাশি তিনি যশোরের মানুষের সামগ্রিক কল্যাণে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেন।[৬১]

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করেন। শেখ মুজিব বাকশাল গঠন করার পর জাতীয় দলে যোগদানের জন্য দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। তার এই ঘোষণায় সারাদেশে তার সমর্থক নেতা-কর্মী বাকশালে যোগদান করেন।[৬২] যশোর অঞ্চল থেকে শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে রওশন আলী বাকশালে যোগদান করেন। শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালের ৬ জুন জারিকৃত এক ফরমান বলে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। শেখ মুজিব কর্তৃক গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে যশোর অঞ্চলের এম.পি হিসেবে রওশন আলীকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৬৩] বাকশালের গঠন কাঠামো অনুযায়ী ১৯৭৫ সালের ২৩ জুন সারাদেশকে ৬১ টি জেলায় বিভক্ত করা হয়। ১৬ জুলাই ১৯৭৫ সালে প্রত্যেক জেলায় একজন করে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। গভর্নরদের মধ্যে ছিল ৩৩ জন সংসদ সদস্য, ১৩ জন বেসামরিক অফিসার, একজন সামরিক অফিসার এবং বাকী ১৪ জনের মধ্যে ছিল জনসাধারণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যেমন-আইনজীবী, উপজাতীয় নেতা, প্রাক্তন এম.সি.এ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তি। রওশন আলী ৩৩ জন সংসদ সদস্যের একজন ছিলেন। এভাবে তিনি বাকশালে যশোর অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত হন।[৬৪] তার স্ত্রী লুৎফুননেছা আলী যশোর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি (১৯৭৮-১৯৮৫) হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

রওশন আলী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও ব্যাপক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি যশোর ইনস্টিটিউটের সদস্য ছিলেন। তাছাড়া এ প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২৪ বছর ধরে সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্বপালন করেন। যশোরে শিক্ষা বিস্তার ও খেলাধুলার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রওশন আলী যশোর জেলা পরিষদের সভাপতি, চিত্তরঞ্জন কটন মিলস, নারায়নগঞ্জ কোঅপারেটিভ জুট মিলস, পূর্ব পাকিস্তান কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকসহ বিভিন্ন কোম্পানির পরিচালক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ সমবায় ইউনিয়নের এবং যশোর সমবায় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাছাড়া যশোর অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের চেয়ারম্যান ছিলেন। রওশন আলীর সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৪২ সালে যশোরে মোমিননগর কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন স্থাপিত হয়। মূলত তাঁতী সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তিনি এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

তার নিরলস সেবার জন্য এই সমবায় প্রতিষ্ঠানটি শ্রেষ্ঠ সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮৫ সালে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক পায়। তিনি ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত মোমিননগর কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়নের সম্পাদক এবং ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রওশন আলী বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর পরিচালক (১৯৭২-১৯৭৫) থাকাকালে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ (যুক্তরাজ্য, জাপান, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, ইটালি, থাইল্যান্ড, ভারত) সফর করেন। খুলনা বিভাগের আঞ্চলিক স্কাউট কমিটি গঠিত হলে তিনিই সর্বপ্রথম খুলনার আঞ্চলিক কমিশনার নির্বাচিত হন।[৬৫] তিনি ১৯৮২, ১৯৮৩ এবং ১৯৮৬ সালে তিনবার যশোর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ছিলেন। এভাবে রওশন আলী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে দেশের উন্নয়ন তথা জনকল্যাণে কাজ করেছেন। যশোর অঞ্চলের বিভিন্নমূখী জনকল্যাণে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৪ সালে জাগরণী চক্র (স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক রওশন আলীকে যশোরের শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে পুরস্কার প্রদান করা হয়।[৬৬]

রওশন আলী যশোরের আঞ্চলিক রাজনীতির তথা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ একজন নেতা। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে যশোর অঞ্চল থেকে প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে জয় লাভ করেন। ১৯৮৫ সালে রওশন আলী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্য নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও গোলযোগপূর্ণ কয়েকটি ভোট কেন্দ্রে উপনির্বাচনে সুষ্ঠ পরিবেশ না থাকায় তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। ১৯৯১ সালের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে রওশন আলী যশোর বাসীর সর্বাত্মক সমর্থনে যশোর-৩ আসনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে এম পি নির্বাচিত হন। রওশন আলীর ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং দলীয় অবস্থানই তাকে যশোর অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় আঞ্চলিক নেতৃত্বে পরিণত করেছিল। ১৯৯৪ সালের ১৯ আগস্ট সংসদ সদস্য থাকাবস্থায় রওশন আলী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৬৭]

প্রান্তটীকা

১. সাক্ষাৎকার, অ্যাডভোকেট আবু সেলিম রানা (রওশন আলীর পুত্র) (কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, যশোর জেলা শাখা), সহকারী পি পি, দায়রা জজ আদালত, যশোর, নিজ বাসভবন, হাইকোর্ট মোড়, যশোর, ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৭ অক্টোবর ১৯৬৯

২. Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister Government of the People's Republic of Bangladesh), *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Vol-2 1951-1952,* Hakkani Publishers, Dhaka, 2020, p. 354-355

৩. অনুপম সেন, *বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সমাজ*, জ্ঞানগৃহ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৭

৪. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস (১৯৪৯-১৯৭১)*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৫-১৩

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২০

৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৩০

৭. সাক্ষাৎকার, আমিরুল ইসলাম রন্টু, ষাটের দশকের ছাত্র ইউনিয়ন নেতা, বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা, ছাতিয়ানতলা, যশোর সদর, যশোর, ১৫ ডিসেম্বর ২০২১

৮. রেহমান শামস, *'প্রতিরোধ যুদ্ধে যশোর'*, *জনকণ্ঠ সাময়িকী*, ঢাকা, ১৪ মার্চ ১৯৯৭

৯. সাক্ষাৎকার, তবিবর রহমান সরদার, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, সাবেক এম.পি.এ এবং জাতীয় সংসদ সদস্য, ২ এপ্রিল ২০০৭, উদ্ধৃত মোঃ আনোয়ার হোসেন, *বৃহত্তর যশোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৪৪

১০. সাক্ষাৎকার, অ্যাডভোকেট আবু সেলিম রানা, *প্রাগুক্ত*

১১. সাক্ষাৎকার, আমিরুল ইসলাম রন্টু, *প্রাগুক্ত*

১২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *প্রথম খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৬১২

১৩. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ২৬ জুলাই ১৯৫৭

১৪. *দৈনিক অবজারভার*, ঢাকা, ১৮ এপ্রিল ১৯৫৭। আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭-৮৯

১৫. *দৈনিক অবজারভার*, ঢাকা, ১৮ মার্চ ১৯৫৭

১৬. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯২

১৭. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১২

১৮. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯৩

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩

২০. সাক্ষাৎকার, আমিরুল ইসলাম রন্টু, *প্রাগুক্ত*

২১. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩-১২৪

২২. সাক্ষাৎকার, অ্যাডভোকেট আবু সেলিম রানা, *প্রাগুক্ত*

২৩. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩-১২৪

২৪. *গোয়েন্দা নথি*, *F/N 606-48 PF Part 25*

২৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৩-৩০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

২৬. ১৯৬৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি যশোর জেলা আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। যশোর ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত এ কাউন্সিল অধিবেশনে যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এম এ রশিদ। দায়িত্ব গ্রহণের পর অত্র অঞ্চলের আওয়ামী লীগ পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৩-৩০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

২৭. *গোয়েন্দা নথি*, *F/N 606-48 PF Part 25*

২৮. মযহারুল ইসলাম, *ভাষা আন্দোলন ও শেখ মুজিব*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৭৪

২৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৬ মে ১৯৬৬

৩০. *প্রাগুক্ত*, ঢাকা, ৩-১৭ এপ্রিল ১৯৬৬

৩১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১৯ এপ্রিল ১৯৬৬

৩২. *দৈনিক আবজারভার*, ঢাকা, ৩ মে ১৯৬৬

৩৩. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩-৫৪

সংবাদ সংস্থা এপিপি ১৯৬৬ সালের ১৩ আগস্ট আওয়ামী লীগের ছয়দফা বিরোধী রিকুইজিশন সভা সম্পর্কে প্রতিবেদন করে যে, "A requisitioned meeting of the East Pakistan Awami League Working Committee on Tuesday endorsed the Party's Central Working Committee resolution on the formation of

the Pakistan Democratic Movement subject to its rectification by the Awami League Council. The three day meeting was attended by 13 members out of 36 members. Working Committee on Tuesday called a meeting of the pro PDM section of the working committee giving authority to the acting General Secretary in calling the council meeting on 19th August next". *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩-৫৪

৩৪. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪-১৫৫। ১৫ আগস্ট ১৯৬৬ সালের রিকুইজিশন সভায় শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫), মিজানুর রহমান চৌধুরী (১৯২৮-২০০৬) এমএনএ, খন্দকার মোশতাক আহমেদ (১৯১৮-১৯৯৬), রফিকুল হোসেন (১৯৩৬-২০১৬) এবং তাজউদ্দিন আহমেদ (১৯২৫-১৯৭৫) সহ সকল রাজবন্দির মুক্তির দাবি করা হয়েছিল। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪-১৫৫

৩৫. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪-১৫৫

৩৬. সাক্ষাৎকার, অ্যাডভোকেট আবু সেলিম রানা, *প্রাগুক্ত*।

৩৭. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫

৩৮. মো আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫

৩৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৭ অক্টোবর ১৯৬৯

৪০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ অক্টোবর ১৯৬৯

৪১. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫

৪২. দিরাজুর রহমান খান, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস প্রথম খন্ড ১৯৪৯-১৯৭১*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩০৮-৩০৯

৪৩. সাক্ষাৎকার, মোঃ মনসুর আলী, সদস্য (১৯৯৭-২০০৬), চুড়ামনকাটি ইউনিয়ন পরিষদ, সদর যশোর, ২০ ডিসেম্বর ২০২১। সাক্ষাৎকার, অ্যাডভোকেট আবু সেলিম রানা, *প্রাগুক্ত*।

৪৪. Golam Morshed, "Pakistan 1970 Elections and the Liberation of Bangladesh: A political Analytical Analysis"; *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol. XI*, Rajshahi, 1988, p. 10

৪৫. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৯-৬৭৪

৪৬. *দি ডন*, ঢাকা, ৮ মার্চ ১৯৭১

৪৭. মোঃ আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২

৪৮. সাক্ষাৎকার, তবিবর রহমান সরদার, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, সাবেক এম পি এ এবং জাতীয় সংসদ সদস্য, ২ এপ্রিল ২০০৭, মকসুদুল হক, নজরুল ইসলাম ঝর্না, মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ও তৎকালীন সময়ের ছাত্রলীগ নেতা, ৫ এপ্রিল ২০০৭ উদ্ধৃত মোঃ আনোয়ার হোসেন, পৃ. ১৪৪

৪৯. শ্রী তারাপদ দাস, *মুক্তিযুদ্ধে যশোর*, পূবালী প্রিন্টিং প্রেস, যশোর, ২০০০, পৃ. ১০

৫০. যশোরে মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা মশিউর রহমান (১৯১৭-১৯৭১), মোশাররফ হোসেন (১৯২৫-১৯৭৪), তবিবর রহমান সরদার (১৯৩২-২০১০), নুরুল ইসলাম, শাহ হাদিউজ্জামান, পীযুষ কান্তি, রওশন আলী প্রমুখ। সাক্ষাৎকার, রবিউল আলম, মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার, যশোর সদর অঞ্চল, যশোর, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

৫১. Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*, UPL, Dhaka, 1988, p. 78

৫২. *দৈনিক গ্রামের কাগজ*, যশোর, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৪

খান টিপু সুলতান (১৯৫০-২০১৭) ১৯৬৬ সালে দশম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং যশোর শহর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ছাত্রলীগ নেতা হিসেবে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত যশোর জেলা ছাত্রলীগের সম্মেলনে তাকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এ সময় তিনি স্বৈরাচার বিরোধী প্রতিটি আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিলে টিপু সুলতান সকল শ্রেণির জনগণকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের আহবান জানান। এ সময় তিনি যশোর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ প্রতিরোধ দিবসে তার নেতৃত্বে পরিচালিত মিছিলে বিদ্যমান সকল দল ও সংগঠন অংশগ্রহণ করে। এভাবে তিনি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে তার অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন। রুকুনউদ্দৌলাহ, *মুক্তিযুদ্ধে যশোর*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৮।

৫৩. আমিরুল আলম খান (সম্পা.), *যশোর বিজয় স্মরণীকা*, ইম্পেরিয়াল প্রকাশনী, যশোর, ১৯৯১, পৃ. ১১

৫৪. আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫৭

৫৫. হামিদা রহমান, *মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও শহীদ বুদ্ধিজীবী*, মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৪

৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-২৮

৫৮. সাক্ষাৎকার, রবিউল আলম, *প্রাগুক্ত*
৫৯. সাক্ষাৎকার, অ্যাডভোকেট আবু সেলিম রানা, *প্রাগুক্ত*
৬০. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০১
৬১. মো আনোয়ার হোসেন, *বৃহত্তর যশোর জেলায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫-১৫৬
৬২. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০১-৩০২
৬৩. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৪৫১
৬৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬০-৪৬১
৬৫. সাক্ষাৎকার, অ্যাডভোকেট আবু সেলিম রানা, *প্রাগুক্ত*
৬৬. সাক্ষাৎকার, আজিজুর রহমান আরজু, ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, যশোর, ৫ মার্চ ২০২০
৬৭. সাক্ষাৎকার, অ্যাডভোকেট আবু সেলিম রানা, *প্রাগুক্ত*

পঞ্চম অধ্যায় : বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চল

৫.১ তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (১৯১১-১৯৬৯)

৫.২ সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)

৫.১ তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (১৯১১-১৯৬৯)

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সাংবাদিকতার অগ্রদূত তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার সম্পাদিত *ইত্তেফাক* পত্রিকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক গতিধারার প্রতিটি পর্যায়ে পথ নির্দেশকের ভূমিকা রেখেছে। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ধারায় আওয়ামী মুসলিম লীগ (১৯৪৯) প্রতিষ্ঠা পায়। এ রাজনৈতিক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সাংগঠনিক কার্যক্রম ও কর্মসূচি প্রকাশের প্রয়োজন থেকে *ইত্তেফাক* প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালীন সময়ে বিদ্যমান মুসলিম লীগের (১৯০৬) মুখপাত্র হিসেবে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকাকে (১৯৩৬) ব্যবহার করা হতো। মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক ধারা প্রবর্তনে আওয়ামী মুসলিম লীগের মুখপাত্র হিসেবে দৈনিক *ইত্তেফাক* গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বলা যায় *ইত্তেফাক* প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনীতির ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ধারায় পটপরিবর্তন সাধিত হয়। আর এই পটপরিবর্তনের ধারায় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া *ইত্তেফাকের* মাধ্যমে অতুলনীয় ভূমিকা রেখেছেন।[১] কারণ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মতধারা ও আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে সরাসরি জড়িয়ে পড়েন এবং বাস্তবমুখী লেখালেখির মাধ্যমে প্রতিটি আন্দোলনের পক্ষে গণজোয়ার তৈরি করতে পেরেছিলেন। যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন সফল হতে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ ও মতামত প্রয়োজন হয়। আর এ কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় *ইত্তেফাকের* মাধ্যমে। আওয়ামী লীগের সরাসরি সাংগঠনিক পদ গ্রহণ না করলেও তিনি সংস্কৃতি ও রাজনীতির মহান সেতুবন্ধন করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ক্ষেত্রে অভাবনীয় ভূমিকা রাখেন। মূলত ১৯৫৩ সালে মানিক মিয়া সাংবাদিকতা জীবন গ্রহণের পর থেকে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন কিন্তু রাজনীতি থেকে মুক্ত ছিলেন না। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথমে সোহ্রাওয়ার্দীর অনুসারী, পরে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধিকার আন্দোলনের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। যদিও সরাসরি তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেননি এবং দলীয় কোন পদ-পদবী গ্রহণ করেননি। মানিক মিয়া রাজনীতিকে দেখতেন গণমানুষের অংশগ্রহণে একটি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান রূপে। এমনকি শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মানিক মিয়াকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একটি পদ গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করেনি। তিনি দলীয় রাজনীতিকের ভূমিকায় অবস্থান না নিয়ে গণতান্ত্রিক জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[২] মানিক মিয়া তার রচিত *'পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর'* গ্রন্থে নিজের চিন্তাধারা ও ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি কোনো বিপ্লবী ছিলেন না, সক্রিয় রাজনীতি থেকেও তিনি বহুদিন যাবৎ বিশেষতঃ *দৈনিক ইত্তেফাকের* আত্মপ্রকাশের পর দূরে ছিলেন। তিনি তার চিন্তাশক্তি ও কর্মদক্ষতা সর্বোতভাবে *'ইত্তেফাকে'*র পিছনেই নিয়োজিত করেছিলেন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশবাসীর যতটুকু উপকার করা যায় তাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। সে দিক দিয়ে তিনি *ইত্তেফাক* পত্রিকাকে শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহ বা অর্থোপার্জনের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেননি। যে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে *ইত্তেফাক* প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, সে জনগণের অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করাই ছিল মানিক মিয়ার একমাত্র ধ্যান-ধারণা। তবে সবসময় তিনি ভুল-

ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে ছিলেন এমন ধারণা কখনও পোষণ করেননি। *ইত্তেফাকে*র মাধ্যমে গণমানুষের আশা-আকাঙ্খা, অভাব-অভিযোগ ও চিন্তাধারা প্রতিফলিত করতে গিয়ে কোথাও যদি তার ভুল হতো তিনি স্বীকার করতেন সেটা ছিল জ্ঞান-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা প্রসূত। প্রলোভন বা স্বার্থচিন্তা দ্বারা তিনি কমই প্ররোচিত হয়েছেন।[৩]

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার অন্তর্গত ভাণ্ডারিয়া গ্রামের এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মুসলেহউদ্দিন মিয়া। শৈশবেই মানিক মিয়ার মা মারা যান। গ্রামের পূর্ব ভাণ্ডারিয়া মডেল প্রাইমারি স্কুলে তার শিক্ষা জীবন শুরু হয় এবং প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষা শেষে তিনি ভাণ্ডারিয়া হাইস্কুলে ভর্তি হন। শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই নেতৃত্বদান এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা সহচর ও সহপাঠীদের মধ্যে ক্ষুদে নেতায় পরিণত করে। ভাণ্ডারিয়া হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (প্রতিষ্ঠা ১৮৫৭) অধীনে পিরোজপুর সরকারি হাইস্কুল থেকে ১৯৩১ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ (প্রতিষ্ঠা ১৮৮৯) থেকে ডিস্টিংশনসহ বি.এ পাশ করে পিরোজপুর মহকুমা হাকিমের আদালতে সহকারী হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন। এ চাকরি গ্রহণের মধ্যদিয়ে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার কর্মজীবন শুরু হয়।[৪]

১৯৪২ সালে পিরোজপুর কোর্টে কর্মরত থাকাবস্থায় তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর (১৮৯২-১৯৬৩) সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৯৪২ সালে পিরোজপুর সফর করেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীকে সংবর্ধনা দেওয়ার মানপত্রটি সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে ও তা পাঠ করে তরুণ মানিক মিয়া সোহ্‌রাওয়ার্দীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। পিরোজপুরের এই আঞ্চলিক সভাতে তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতে প্রথম মানিক মিয়ার সাথে শেখ মুজিবুরের পরিচয় হয়।[৫] এ সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য এমন,

> "১৯৪৩ সন। মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর বাস ভবনে কলকাতায় তার সাথে আমার পরিচয়। একই নেতার দুই শিষ্য, যেন একটি পিতার দুই সন্তান। বিগত পঁচিশ বছরের মধ্যে কোন দিনই আমরা বিচ্ছিন্ন হয়নি, কোন ঘটনা আমাদের মধ্যে বিভেদ টানতে পারেনি। নেতা মারা যাবার পরেও আমরা এক ও অভিন্ন ছিলাম। মানিক ভাইয়ের কথা আমি কোন দিনই ভুলতে পারব না।"[৬]

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মানিক মিয়ার বুদ্ধিমত্তা, কর্মদক্ষতা, চিন্তাধারা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হন। মানিক মিয়াও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর আদর্শ এবং ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হন। এভাবে দুইজনের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ক আমৃত্যু টিকে ছিলো। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় মানিক মিয়া কোর্টের চাকরি পরিত্যাগ করে তদানীন্তন বাংলা সরকারের জনসংযোগ বিভাগে বরিশাল জেলা সংযোগ অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি সোহ্‌রাওয়ার্দীর পরামর্শে সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেন এবং কলকাতায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস সেক্রেটারি পদে যোগ দেন। এখানে তিনি ১৯৪৬ সালের নির্বাচনকালে মুসলিম লীগের নির্বাচনী কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি

এ সময়ে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীসহ বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পান।[৭] এভাবেই উপমহাদেশের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা ও মতাদর্শের সাথে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার পরিচয় ঘটে। এক্ষেত্রে তিনি শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন।[৮] ১৯৪৬ সালে কলকাতা দাঙ্গার সময় সোহ্‌রাওয়ার্দীর পাশে থেকে যারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন তাদের মধ্যে মানিক মিয়া ছিলেন অন্যতম। এমনকি দেশ ভাগের পরও দাঙ্গা দমনে মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ও সোহ্‌রাওয়ার্দীর শান্তি মিশনে সোহ্‌রাওয়ার্দীর অনুগামী হিসেবে মানিক মিয়া এ কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে মুসলিম লীগের মওলানা তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৮৬), ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), শেখ মুজিবসহ (১৯২০-১৯৭৫) অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে সিলেটে গণভোটের (১৯৪৭ সালের ৭ ও ৮ জুলাই অনুষ্ঠিত) প্রচারণার কাজে তিনি অংশগ্রহণ করেন।[৯] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার আত্মজীবনীতে মানিক মিয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।[১০] ১৯৪৭ সালের ৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার আইন সভার জন্য নেতা নির্বাচনে সোহ্‌রাওয়ার্দীর পক্ষ অবলম্বন করে তফাজ্জল হোসেন মুসলিম লীগের খাজা নাজিমউদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪) গ্রুপের বিরাগভাজন হন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অফিস সেক্রেটারি পদে ইস্তফা দেন।[১১] এসময় তিনি একই মতাবলম্বী হিসেবে সোহ্‌রাওয়ার্দীর স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার পক্ষে ছিলেন।[১২]

কর্মজীবনের শুরু থেকেই মানিক মিয়া সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে কলকাতা থেকে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর উদ্যোগে আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৮-১৯৭৯) সম্পাদনায় *'দৈনিক ইত্তেহাদ'* প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে *'দৈনিক ইত্তেহাদ'* এর পরিচালনা পরিষদের সেক্রেটারি হিসেবে তফাজ্জল হোসেন যোগদান করেন। এই পত্রিকার মাধ্যমেই তার গণমাধ্যম জগতের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। মূলত *'দৈনিক ইত্তেহাদ'* পত্রিকার মাধ্যমে তফাজ্জল হোসেনের সাংবাদিকতার সাথে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। আর এখানেই তার রাজনৈতিক নিবন্ধ রচনার হাতেখড়ি। বাংলা তথা পাক ভারতের রাজনীতি সম্বন্ধে তার স্বচ্ছ জ্ঞান ছিল আর এ জ্ঞানই পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের শক্তিশালী নিবন্ধকার *'মোসাফির'*এর জন্ম দেয়।[১৩] *'দৈনিক ইত্তেহাদ'*-এ যোগদান প্রসঙ্গে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্তব্য করেছিলেন, "মানিক মিয়া সত্য মানিক ... সাংবাদিকতায় এর অভিজ্ঞতা নাই সত্য, কিন্তু অফিস ম্যানেজমেন্টে এর দক্ষতা দেখিয়া তোমরা মুগ্ধ হইবে।"[১৪] দেশবিভাগের পর তিনি *ইত্তেহাদ* পত্রিকাটিকে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেন কিন্তু ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের অসহযোগিতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। অত:পর কলকাতায় *'দৈনিক ইত্তেহাদ'* পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে তফাজ্জল হোসেন ঢাকায় চলে আসেন।[১৫]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে সামগ্রিক দিক থেকে শোষণ করতে শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্ববর্গ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই উপলব্ধি করতে পারে যে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ তাদের প্রাপ্য কোনো কর্তৃত্ব বা অধিকার ভোগ করতে দিবে না। পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র দল হিসেবে মুসলিম লীগ নতুনভাবে পুনর্গঠিত হয়। তাই মুসলিম লীগের বিরোধী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্ব

পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে। ১৯৪৯ সালে কিছুদিন পিরোজপুর অবস্থান করার পর মানিক মিয়া ঢাকা আসেন এবং স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনায় নিজেকে যুক্ত করেন। এসময় ঢাকার মোগলটুলীর দলীয় কার্যালয়ে অবস্থান করে একটি বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠনের তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে উল্লেখ আছে, "মানিক ভাই ঢাকা এসে পৌঁছেছেন প্রায় নিঃস্ব অবস্থায়। তিনিও এসে মোগলটুলীতে উঠেছেন।"[১৬] শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫), শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫), শওকত আলী (১৯১৮-১৯৭৫), তাজউদ্দিন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫), কামরুদ্দীন আহমদ (১৯১২-১৯৮২) প্রমুখ তরুণ ও উদীয়মান নেতা কর্মীদের সাথে মানিক মিয়ার পরিচয় ঘটে ১৯৪০ এর দশকের শেষে ঢাকাতে আসার পর।

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন মুসলিম লীগের বিরোধী প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটি গণতান্ত্রিক কর্মসূচি নিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে'র যাত্রা শুরু হয়।[১৭] এ সময় মানিক মিয়া এ দল গঠনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হন এবং তাত্ত্বিকভাবে এর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। বিরোধী দলের বিকাশকে বাঁধাগ্রস্ত করার জন্য পাকিস্তানি কৌশলের অংশ হিসেবে মানিক মিয়াকে কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। কিন্তু দেশপ্রেমিক মানিক মিয়া পাকিস্তানিদের সে উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সরকারি পদে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। এসময় অবশ্য তিনি নিজেও পত্রিকা প্রকাশ করার কথা চিন্তা করছিলেন।[১৮]

১৯৪৯ সালের ১৫ আগস্ট আওয়ামী মুসলিম লীগের মুখপাত্ররূপে ৭৭ নং মালিটোলা, ঢাকা থেকে '*সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*' প্রকাশিত হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) এই পত্রিকার আনুষ্ঠানিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১৯] *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* প্রকাশের পর এ পত্রিকার সাথে মানিক মিয়া যুক্ত হন। ১৯৫১ সালের ১৪ আগস্ট থেকে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া '*সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*' পত্রিকার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার দায়িত্ব গ্রহণের পর *ইত্তেফাক* পত্রিকা নবযাত্রা শুরু করে এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।[২০] *দৈনিক ইত্তেফাকে*র প্রতিষ্ঠা এবং তা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার সুক্ষ্ম কৌশল, নিরলস পরিশ্রম ও মানিক মিয়ার অসামান্য সাফল্যের কথা শেখ মুজিবুর রহমান তার উপর্যুক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মওলানা ভাসানী *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* পত্রিকা বের করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ প্রকাশিত হওয়ার পর আর্থিক সংকটে বন্ধ হয়ে যায়। এসময় মওলানা ভাসানী মানিক মিয়াকে পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব নিতে বলেন। তিনি প্রথমে আর্থিক সমস্যার কারণে অস্বীকৃতি জানালেও পরবর্তীতে দায়িত্ব নেন। মূলত শেখ মুজিবুর রহমানের সহযোগিতায় মানিক মিয়া *ইত্তেফাক* পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর ভিন্ন ভিন্ন উদ্যোগে অর্থের ব্যবস্থা করেন এবং নিজের সঞ্চয়ের অর্থও ব্যয় করেন। কিছুদিনের মধ্যে *ইত্তেফাক* পত্রিকাটা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[২১] 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠনকালে শেখ মুজিবুর রহমান জেলে থাকায় '*সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*' তার মুক্তির পক্ষে জনমত তৈরি করে।[২২] মুসলিম লীগের নির্যাতন, প্রদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুসলিম লীগ নেতাদের দু:শাসন এ পত্রিকার প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এ সময়ে 'মোসাফির' ছদ্মনামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় যে রাজনৈতিক কলামটি লিখতেন তখন তার শিরোনাম ছিল 'রাজনৈতিক

ধোকাবাজি’। এভাবে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন পরবর্তীকালে মানিক মিয়া মুসলিম লীগ সরকারের বিভিন্নমূখী অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। অর্থাৎ নব্যগঠিত সংগঠনে কোন দলীয় পদ গ্রহণ না করে পত্রিকায় তার নিজস্ব লেখনির মাধ্যমে তৎকালীন রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[২৩] তাছাড়া এ সময় তিনি আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ১৯৫১ সালের ২৮ মার্চ শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট জানিয়ে ব্যক্তিগত পত্র প্রেরণ করেন। ঢাকায় ১৪৪ ধারা বিদ্যমান থাকায় তিনি আঞ্চলিক পর্যায়ে দলীয় সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। মানিক মিয়া তাকে এপ্রিলের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা আসার জন্য অনুরোধ করেন।[২৪] শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীও তার কাছে ২২ এপ্রিল ১৯৫২ পত্র প্রেরণ করেন।[২৫] সাংগঠনিক বিষয়ে খোঁজখবর ছাড়াও মানিক মিয়া নেতা নেতৃত্বের সাথে ব্যক্তিগত ব্যাপারেও যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতেন। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫১ সালে শেখ মুজিব তার শারীরিক অবস্থা এবং সাংগঠনিক ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে মানিক মিয়ার কাছে ব্যক্তিগত পত্রপ্রেরণ করেন।[২৬] ৫ এপ্রিল ১৯৫২ সালে মানিক মিয়ার কাছে শেখ মুজিব তার গোপালগঞ্জের মামলা সম্পর্কে এবং ব্যক্তিগত অসুস্থতার কথাসহ ১৬ এপ্রিল ১৯৫২ সালে মানিক মিয়ার বাসায় অবস্থান করবেন বলে জানিয়ে দেন। শেখ মুজিবসহ দলীয় অনেক নেতাকর্মী মানিক মিয়ার বাসায় অবস্থান করতেন। সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত না থেকেও তিনি সর্ব পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সহযোগিতায় সক্রিয় থাকতেন।[২৭]

দেশভাগের পর সর্বপ্রথম প্রকাশ্য বিপত্তি তৈরি হয় ভাষা প্রশ্নে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদান করায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ভাষা আন্দোলনে তার পত্রিকার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনকালে যে সকল পত্রিকা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে মানিক মিয়া সম্পাদিত *‘সাপ্তাহিক ইত্তেফাক’* ছিল অন্যতম। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা ও ভাষা শহীদদের ব্যাপারে *‘সাপ্তাহিক ইত্তেফাক’* সোচ্চার ও বলিষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিতে শহীদ ও আহতদের ছবি দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। মানিক মিয়া তার পত্রিকায় ‘বিচার চাই’ শিরোনামে ১৯৫২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি একটি কালজয়ী সম্পাদকীয় প্রকাশ করেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিচারের দাবিতে এটাই ছিল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম সম্পাদকীয়।[২৮] সমগ্র বাঙালি *ইত্তেফাকের* এই লেখনীর ফলে ঐক্যবদ্ধ হয়। তাছাড়া মানিক মিয়া ‘মোসাফির’ নামে কলাম লিখে সমগ্র জাতিকে উজ্জীবিত করেন। এ সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের প্রেরিত সংবাদ *ইত্তেফাকে* প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ১৯৫২ সালের ৪ জুন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক (আওয়ামী মুসলিম লীগ) শেখ মুজিব ৩ জুন ১৯৫২ ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলন এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচিত বহুমূখী বিষয় সম্পর্কে মানিক মিয়াকে জানান। শেখ মুজিবের পাঠানো সংবাদ এবং নির্দেশনা তিনি *ইত্তেফাকে* প্রকাশ করেন।[২৯] জুন ১৯৫২ সালে লাহোরে অবস্থান করার সময় শেখ মুজিব মানিক

মিয়াকে পত্রের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার অগ্রগতি জানান এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সামগ্রিক খোঁজখবর নেন।[৩০]

মানিক মিয়া ১৯৫২ সালে চীনের পিকিং-এ অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে চীন সফর করেন। এ সম্মেলনে শেখ মুজিব বাংলায় বক্তৃতা করলে মানিক মিয়া তাকে অভিনন্দন জানান।[৩১] ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সহযোগিতায় *'দৈনিক ইত্তেফাক'* প্রকাশ করেন। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে *'দৈনিক ইত্তেফাকের'* প্রকাশনা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যুক্তফ্রন্ট গঠনকালে মানিক মিয়া নিজে এ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিলেন। যুক্তফ্রন্ট গঠন নিয়ে প্রথম দিকে দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। এ সময়কার নেতৃত্বের মধ্যে (শেখ মুজিবুর রহমান, মানিক মিয়া, আতাউর রহমান খান, ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী) রাজনৈতিক মতাদর্শ ও মতপার্থক্য প্রকট আকারে দেখা দেয় যা পরবর্তী রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের আওয়ামী লীগে যোগদান এবং স্বতন্ত্র দল গঠন নিয়ে মত পার্থক্য তৈরি হয়। শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম থেকেই যুক্তফ্রন্টের বিপক্ষে ছিলেন কারণ তার বিশ্বাস ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ একাই নির্বাচনে জয়লাভ করবে। কিন্তু তিনি কুষ্টিয়ার জনসভায় ব্যস্ত থাকায় তার অনুপস্থিতিতেই যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে মওলানা ভাসানীর কাছে প্রশ্ন করায় তিনি মানিক মিয়া ও আতাউর রহমানের কথা বলেন। এ সম্পর্কে *'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'* তে উল্লেখ আছে যে, তিনি মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করতে গেলে ভাসানী, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব ফিরে না আসা পর্যন্ত যুক্তফ্রন্টে দস্তখত করতে আপত্তি জানান। কিন্তু আতাউর রহমান ও মানিক মিয়া শেখ মুজিবের মতামতের বিষয়ে দায়িত্ব নেন যার কারণে মওলানা ভাসানী দস্তখত করতে বাধ্য হন। এসময় শেখ মুজিব বেশ ক্ষোভের সাথে বলেছিলেন যে,

> "... যা করেছেন ভালই করেছেন, আমি আর কি করব! আর যখন আতাউর রহমান সাহেব ও মানিক ভাই আমার ভার নিয়েছেন দাবি করে, তখন তাদের কথা আমি ফেলি বা কেমন করে! এতে দেশের যদি মঙ্গল হয় ভাল। আর যদি ক্ষতি হয় আপনারাই দায়ী হবেন, আমি তো পার্টির সেক্রেটারি ছাড়া আর কিছু না! আপনারা নেতা, যখন যুক্তফ্রন্ট করেছেন–এখন যাতে তা ভালভাবে চলে তার বন্দোবস্ত করুন।"[৩২]

১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার নানা অজুহাতে নির্বাচন বিলম্বিত করতে থাকে। অবশেষে সরকার ১৯৫৩ সালে নির্বাচন সংক্রান্ত ধারা সংশোধন করে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের দিন ধার্য করে। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য এ অঞ্চলের সমমনা চারটি দল 'যুক্তফ্রন্ট' নামে নির্বাচনী জোট গঠন করে।[৩৩] এ নির্বাচনে *ইত্তেফাক* পত্রিকা যুক্তফ্রন্টকে জোরালোভাবে সমর্থন জোগায়। মানিক মিয়া *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় তার কলামটির নাম দেন 'রাজনৈতিক মঞ্চ' এবং 'মোসাফির' ছদ্মনামে নিয়মিত লিখতেন। এই ছদ্মনামে তার লেখা জনমত তৈরিতে এমনভাবে সক্ষম হয় যে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের চরম ভরাডুবি

ঘটে। মানিক মিয়া যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনকালে নমিনেশন বোর্ড গঠন এবং যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা প্রণয়নের কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৪ এর সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার প্রচার করে এবং যুক্তফ্রন্টের মৌলিক দাবিগুলোকে গণমুখী করে *ইত্তেফাক*। মূলত যুক্তফ্রন্টের ইশতেহারকে নিয়ে পশ্চিমা শাসনের একটি বিরোধী শক্তির আবির্ভাবের জন্য ব্যাপক জনমত তৈরি করে *ইত্তেফাক*, যা পশ্চিম পাকিস্তানিদের পরাজয়কে অনিবার্য করে তোলে। মানিক মিয়ার *দৈনিক ইত্তেফাক* অচিরেই যুক্তফ্রন্টের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[৩৪] তিনি এ নির্বাচনকালে নেতৃবৃন্দের সাথে কখনো কখনো নির্বাচনী প্রচারণায়ও অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনকালে নেপথ্যে থেকে তিনি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালের ৩০ মে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২ক ধারা প্রয়োগ করে পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয় এবং সাময়িকভাবে *ইত্তেফাক* পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করা হয়।[৩৫] যখন যুক্তফ্রন্টের প্রধান দুই শরিক আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির মধ্যে চরম বিরোধ এবং যে বিরোধের সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রের সেনা সমর্থন নির্ভর মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব পাকিস্তানে আবার তাদের দুঃশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিল, মানিক মিয়া তখন এই বিরোধ মিটিয়ে দুই গ্রুপকে কাছাকাছি রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।[৩৬] যুক্তফ্রন্টের বিরোধ মিমাংসার সময় মানিক মিয়া সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এ বিরোধ মীমাংসার জন্য শেখ মুজিব ঢাকায় এসে আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ ও মানিক মিয়াকে নিয়ে বৈঠকে বসেন এবং তাদের সাথে উল্লিখিত সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ ব্যাপারে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মতামত এবং রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও কথা বলেন। তারা দীর্ঘক্ষণ যুক্তফ্রন্টের সমস্যা নিয়ে আলোচনার পর ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব দেওয়া হবে কিনা এ বিষয়েও মতবিনিময় করেন।[৩৭]

আওয়ামী লীগের ঐক্য ও অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেও মানিক মিয়ার অতুলনীয় ভূমিকা ছিল। ১৯৫৬ সালে ১২ সেপ্টেম্বর সোহ্‌রাওয়ার্দী কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তখন থেকেই আওয়ামী লীগের দুই নেতা সোহ্‌রাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়।[৩৮] এরই প্রেক্ষিতে ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইল জেলার কাগমারীতে একটি সম্মেলন আহবান করেন।[৩৯] এ কাউন্সিল অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রসঙ্গে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক করে মওলানা ভাসানী সকল ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য নীতি কার্যকর না হলে পূর্ব পাকিস্তান 'আসসালামু আলাইকুম' বলবেন এ কথা ঘোষণা করেন।[৪০] সম্মেলনে মার্কিনঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি বিরোধী প্রস্তাব পাস করাতে ব্যর্থ হলে আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। এভাবে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি প্রশ্নে মওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মধ্যে বিরোধ প্রকাশ্য রূপ লাভ করে।[৪১] এসময় মানিক মিয়া সোহ্‌রাওয়ার্দীর পক্ষ অবলম্বন করেন। কাগমারী সম্মেলনে মানিক মিয়া আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সদস্য ছিলেন। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যখন দলের বামপন্থি অংশ দল থেকে পদত্যাগ করেন তখন (১৭ জুন ১৯৫৭) এক ঘোষণায় মওলানা ভাসানী ২৫-২৬ জুলাই ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন আহবান করেন। ২৫ জুলাই ঢাকার তৎকালীন 'রূপমহল' সিনেমা হল-এ মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়। এ

সম্মেলনে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও মাহমুদুল হক ওসমানীকে সাধারণ সম্পাদক করে 'পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (ন্যাপ) গঠন করা হয়।[৪২] এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব সংকট দেখা দিয়েছিল। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর ভাষায়, "মুজিব মিয়া ও মানিক মিয়া যদি আওয়ামী লীগকে সমর্থন না দিতেন তাহলে আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব থাকতো না।"[৪৩] ১৯৫৭-৫৮ সালে দুই বছরের জন্য মানিক মিয়া পি আই এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৪৪]

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা (১৮৯৯-১৯৬৯) পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন। ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান (১৯০৭-১৯৭৪) ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে নিজে ক্ষমতা দখল করেন। জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে নানামুখী প্রতিক্রিয়াশীল আইন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকেন।[৪৫] এ সময় *দৈনিক ইত্তেফাক* ও মানিক মিয়া গণতন্ত্র, সংবাদপত্র ও বাক স্বাধীনতার পক্ষে লেখনী ধারণ করে সামরিক সরকারের রোষাণলে পড়েন।[৪৬] ১৯৫৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সামরিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে প্রথমবার মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। এ ব্যাপারে মানিক মিয়া তার অনুভূতির কথা লেখেন এভাবে,

> "আমাকে সামরিক অইনের ২৪ রেগুলেশন মতে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই অপরাধে শাস্তির মেয়াদ ১৪ বছর। আমার মাথায় যেন বাজ পড়িল। জীবনে এই আমার প্রথম গ্রেফতার। সামরিক আইনে গ্রেফতার।"[৪৭]

গ্রেফতার হলেও তিনি প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৯৬০ সালে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ এর (১৯৩০-২০২২) নেতৃত্বে গঠিত শাসনতান্ত্রিক কমিশনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও প্রত্যাশিত গণতন্ত্রের রূপরেখা সম্পর্কে জোরালো অভিমত পোষণ করেন।[৪৮] ১৯৬১ সালে ঢাকায় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনে সরকার ও স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক বিরোধিতা শুরু হলে মানিক মিয়া তার *ইত্তেফাক* পত্রিকার মাধ্যমে জন্মশতবার্ষিকী পালনের পক্ষে ভূমিকা পালন করেন।[৪৯] ১৯৬১ সালে ঢাকায় 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও মানিক মিয়ার প্রেরণা ও অবদান রয়েছে।[৫০] ১৯৬২ সালে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী গ্রেফতার হলে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। সারাদেশে ছাত্র আন্দোলনের সংবাদ, খবরাখবর ইত্যাদি বিষয় প্রচারে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার *দৈনিক ইত্তেফাক* এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাই সরকার ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ *দৈনিক ইত্তেফাকে* মুদ্রিত সকল সংবাদের উপর প্রি-সেনসরশীপ করে যা ১২ ফেব্রুয়ারি ৬২ পর্যন্ত বলবৎ থাকে। মানিক মিয়া এ আন্দোলনকে সমর্থন জোগালে জননিরাপত্তা আইনে অন্যান্যদের সাথে ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ সালে তাকেও গ্রেফতার করা হয় এবং একই বছর ১৪ আগস্ট তিনি মুক্তি লাভ করেন।[৫১] ১৯৬২ সালে গ্রেফতারের পর শেখ মুজিব ও মানিক মিয়াকে একই কক্ষে রাখায় দুজনে পারস্পরিক মত বিনিময়ের সুযোগ পান। এসময় তারা দেশের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। মানিক মিয়ার সাথে আলোচনার সময় শেখ মুজিব তার নীতির প্রতি অবিচলতা দেখে মুগ্ধ ও প্রভাবিত হন। তাছাড়া এসময় শেখ মুজিব বুঝতে পারেন যে, তার প্রতি মানিক মিয়ার প্রাগাঢ় আস্থা ছিল। তৎকালীন সময়ে অনেকেই তাদের মধ্যকার এই সম্পর্কের কথা জানতেন না।[৫২]

১৯৬২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' গঠিত হলে মানিক মিয়া সমর্থন প্রদান করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউটের পাকিস্তান শাখার সভাপতি এবং 'পাকিস্তান প্রেস কোর্ট অব অনার' সংস্থার সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের কর্মকাণ্ডের সমালোচনার জন্য ১৯৬৩ সালে মানিক মিয়াকে আবারও গ্রেফতার করা হয় এবং এ সময় *দৈনিক ইত্তেফাকের* প্রকাশনা নিষিদ্ধ এবং নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৫৩] এর ফলে তার প্রতিষ্ঠিত অন্য দুটি পত্রিকা *'ঢাকা টাইমস'* ও *'পূর্বাণী'* বন্ধ হয়ে যায়।[৫৪] পরবর্তীতে গণআন্দোলনের মুখে সরকার *ইত্তেফাকের* উপর বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ফলে ১৯৬৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে পত্রিকাটি আবার প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর মানিক মিয়ার রাজনৈতিক দীক্ষা গুরু শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মৃত্যুবরণ করলে তিনি রাজনৈতিকভাবে অভিভাবক হারা হয়ে পড়েন। তার মৃত্যুতে *ইত্তেফাক* একটি বৃহদাকার ও সমৃদ্ধ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে মানিক মিয়া তাকে সর্বতভাবে সহযোগিতা করেন। পারিবারিকভাবে অনেক সমস্যাগ্রস্থ থেকেও তিনি শেখ মুজিবের পাশে থেকেছেন। দলীয় স্বার্থে, রাজনৈতিক প্রয়োজনে নিজ পরিবারকে তার গ্রামের বাড়ি পিরোজপুরে রেখে তিনি ঢাকায় থাকতেন। মানিক মিয়ার করাচিতে একটা ভালো চাকুরির সুযোগ আসলে তিনি শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে চাকুরি করার ব্যাপারে মতামত চান। এসময় শেখ মুজিব বলেন, "মানিক ভাই, আপনিও আমাদের জেলে রেখে চলে যাবেন? আমাদের দেখবারও কেউ বোধহয় থাকবে না।"[৫৫] শেখ মুজিব জানতেন মানিক মিয়া পরিবার নিয়ে খুব সমস্যায় আছেন তবুও রাজনৈতিক প্রয়োজনে মানিক মিয়ার মতো ব্যক্তির ভূমিকার কথা চিন্তা করে এ কথা বলেন। শেখ মুজিবের এমন কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মানিক মিয়া সিদ্ধান্ত নেন যে, তখনকার বিরূপ পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কথা বিবেচনা করে তিনি করাচি চাকরি করতে যাবেন না।[৫৬]

উপমহাদেশের দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাকে মানবিকবোধে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৬৪ সালে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক সংঘাত শুরু হলে তিনি দাঙ্গা প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। *ইত্তেফাক* অফিসে মানিক মিয়ার সভাপতিত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। তার দেওয়া ব্যানার হেডিং 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাড়াও' *ইত্তেফাক* সহ অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি নিজ উদ্যোগে অনেক বুদ্ধিজীবীকে দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকা থেকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধকালে অন্যান্য সম্পাদক ও সাংবাদিকের সাথে মানিক মিয়া পশ্চিম পাকিস্তান সফর করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের অরক্ষিত সীমান্ত ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন।[৫৭]

পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন ও আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে লাহোরে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি 'বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ' নামে খ্যাত ছয়দফা দাবি ঘোষণা করেন।[৫৮] লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সম্মেলনে যোগদানের জন্য 'নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' সভাপতি নসরুল্লাহ খান (১৯১৬-২০০৩) শেখ মুজিবকে সম্মেলনে যোগদানে আহবান করলে প্রথমে তিনি রাজি হননি। পরবর্তীতে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে লাহোরে গমন করেন।

এই প্রসঙ্গে মানিক মিয়া শেখ মুজিবকে বলেছিলেন, "মুজিবর মিয়া, যদি যেতেই হয়, আপনিই যান। আর আপনার মনে এতকাল যে কথাগুলো আছে, সেগুলো লিখে নিয়ে যান। ওরা শুনুক না শুনুক, এতে কাজ হবে।"[৫৯] ছয়দফা দাবি ঘোষণার পর মানিক মিয়া এর সমর্থনে শক্তিশালী লেখনি শুরু করেন। তার পত্রিকা *ইত্তেফাক* বাঙালির জাতীয় মুক্তির সনদ এই ছয় দফার বড় প্রচারপত্র হিসেবে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৬ সালে ফেব্রুয়ারিতে ছয় দফা ঘোষণার পর থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত অর্থাৎ শেখ মুজিব গ্রেফতার (৮ মে, ১৯৬৬) হওয়ার আগ পর্যন্ত সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে জনসভা করেন। অন্যদিকে মানিক মিয়া ছয়দফা সম্পর্কিত সকল সংবাদ *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রচারের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে জনপ্রিয় করে তোলেন।[৬০] মানিক মিয়া ছয় দফাকে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙালির একমাত্র দাবি উল্লেখ করে ২৬ এপ্রিল *দৈনিক ইত্তেফাকের* 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে লিখেন,

> "শেখ মুজিবের উপর যে আচরণ করা হইতেছে তাকে আমরা নির্যাতনমূলক বলিয়া গণ্য করি। অতএব মুজিবসহ আজ যারা ছয়দফাকে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের এবং প্রকৃত জাতীয় সংহতি গড়িয়া তোলার উৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন তারা কোন অপবাদে বা নির্যাতনে পশ্চাৎপদ হইবেন না ইহায় আমাদের বিশ্বাস। এই দাবি যে ব্যক্তি বিশেষের দাবি নয়-ইহা গোটা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনের কথা তার প্রমাণও পাওয়া যায় ছয় দফার প্রতি জনসমর্থনের দিকে লক্ষ্য দিলে।"[৬১]

মানিক মিয়া তার *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় সংবাদ প্রতিবেদনে বিশেষ নিবন্ধ ও সম্পাদকীয় এর মাধ্যমে ছয়দফার পক্ষে এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা অব্যাহত রাখেন। ছয়দফা আন্দোলন সমর্থন করায় ১৯৬৬ সালের ১৫ জুন মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৬ জুন পাকিস্তানের দেশরক্ষা আইনের ৫২ নং ধারার ২ উপধারা প্রয়োগ করে *ইত্তেফাক* পত্রিকা ও ছাপাখানা নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৬২] হাইকোর্টের বিচারপতি বদরুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকীর (১৯১৫-১৯৯১) নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ সামরিক আইনে *দৈনিক ইত্তেফাক* এর ছাপাখানা বাজেয়াপ্তকে অবৈধ ঘোষণা করলেও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খান (১৮৯৯-১৯৭১) হাইকোর্টের রায়কে অগ্রাহ্য করে পুনরায় সামরিক আইনের আরেক ধারায় *ইত্তেফাকের* ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করেন।[৬৩] পরবর্তীতে গণআন্দোলনের মুখে পত্রিকা ও প্রেস মুক্ত হয় এবং *ইত্তেফাক* পত্রিকা পুনরায় প্রকাশ হতে থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ের আন্দোলনে মানিক মিয়া তার পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করেন।[৬৪]

বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামের ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে ধরা হয়। যখন ছয়দফা পাকিস্তানি রাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় তখন শেখ মুজিবুর রহমান জেলে থাকাবস্থায়ই পাকিস্তান সরকার তাকে প্রধান অভিযুক্ত করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে, যার সরকারি নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'। এ রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার অভিযোগে বলা হয় কয়েক বছর আগে থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের সহযোগিতায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।[৬৫] তৎকালীন পরিস্থিতি অনুযায়ী এ মামলাটিকে ষড়যন্ত্র মামলা বলা হলেও বর্তমানে অনেক গবেষক আগরতলা মামলাকে সত্য মামলা বলে চিহ্নিত

করেন।[৬৬] আগরতলা মামলার বিচার শুরু (১৯ জুন ১৯৬৮) হওয়ার পর থেকে গণঅসন্তোষ বাড়তে থাকে এবং পূর্ব পাকিস্তানে রাজনীতির অঙ্গন উত্তপ্ত হতে থাকে। ১৯৬৮ সালে এ মামলা প্রকাশিত হলে অভিযুক্ত আসামীদের পক্ষে ব্যাপক গণআন্দোলনের সূচনা হয়। ঢাকাসহ সারাদেশে প্রচণ্ড গণআন্দোলন এবং *ইত্তেফাকের* জোরালো ভূমিকার ফলে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এক ঘোষণায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়। এ মামলার প্রধান আসামী শেখ মুজিবুরকে নিঃস্বার্থ মুক্তি দিয়ে ঢাকায় অবস্থিত সেনাবাহিনীর চৌদ্দ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মোজাফফর উদ্দিনের নির্দেশে ব্রিগেডিয়ার রাও ফরমান আলী (১৯২৩-২০০৪) (পরে মেজর জেনারেল) ঢাকা সেনানিবাসের কারাগার থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে নিজে গাড়ি চালিয়ে ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়িতে পৌঁছে দেন।[৬৭] কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ১১ দফার প্রতি তার সমর্থন ব্যক্ত করেন। ছাত্রদের ১১ দফা কর্মসূচির মধ্যে তার ছয়দফা বিদ্যমান থাকায় ১১ দফা ভিত্তিক আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ নেয়।[৬৮] 'উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের' সময়ও *দৈনিক ইত্তেফাক* বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে।[৬৯] ১৯৬৬ সালে তৃতীয়বার গ্রেফতারের পর প্রায় দশমাস কারাগারে আটক থাকার পর ১৯৬৭ সালের ২৯ মার্চ অসুস্থ মানিক মিয়াকে ঢাকা পুলিশ হাসপাতাল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি পেলেও মানিক মিয়া আর পুরোপুরি সুস্থ হতে পারেননি। দীর্ঘ সংগ্রাম এবং কর্মব্যস্ততায় তার শরীর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ শরীর নিয়েই ১৯৬৯ সালের ২৬ মে প্রতিষ্ঠানিক কাজে পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি গমন করেন এবং ১৯৬৯ সালের ১ জুন রাওয়ালপিন্ডিতে ৫৭ বছর বয়সে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ইন্তেকাল করেন।[৭০] তিনি ছিলেন উদার গণতন্ত্রের ধারক। সাংবাদিকতার মাধ্যমে মানুষের মুক্তির পথ রচনার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি বারবার পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রোষাণলে পড়েছিলেন। তার সম্পাদিত পত্রিকা *ইত্তেফাকের* উপরও নেমে এসেছিল নানা বিধিনিষেধ। শোষণ, বঞ্চনা ও রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষে মানিক মিয়ার কলম ছিল সদা সোচ্চার। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসনামলের রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহকে উপজীব্য করে তিনি যেসব যুগোপযোগী সাহসী লেখা লিখেছিলেন তা অতুলনীয়। বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে মানিক মিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত-এ সত্য তার লিখিত কলামগুলো পাঠ করলেই স্পষ্ট হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও *দৈনিক ইত্তেফাকের* ভূমিকা মূল্যায়ন করে বলেন,

> "পাকিস্তানের বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের জন্য *ইত্তেফাক* যা করেছে তা কোনো খবরই দাবি করতে পারে না। এদেশ থেকে বিরুদ্ধ রাজনীতি মুছে যেত যদি মানিক মিয়া এবং *ইত্তেফাক* না থাকতো। একথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। ১৯৫৮ সালে মার্শাল ল' জারি হওয়ার পর থেকে হাজার রকমের ঝুকি লইয়াও তিনি এদেশের মানুষের মনের কথা তুলে ধরেছেন"।[৭১]

তার লেখা কলাম 'মোসাফির' এর মাধ্যমে দেশে গণআন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। ষাটের দশকে তার লেখা পড়েই ছাত্ররা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা পেয়েছিল এবং রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠেছিল, যা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক

পটপরিবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি দিক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মানিক মিয়ার অবদান মূল্যায়ন করে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন,

> "স্বাধীনতা সংগ্রামে মানিক ভাই'র অবদানের কাহিনি অনেকেরই অজানা। পক্ষান্তরে আমার ব্যক্তিগত জীবনে মানিক ভাই'র প্রভাব যে কত গভীর তা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়। সেই পরিচয়ের পর থেকে সারাটা জীবন আমরা দু'ভাই একসাথে জনগণের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম করেছি। সে সংগ্রাম সাধনার পথের বাঁকে বাঁকে একে যে অন্যের প্রতি কোনদিন মান-অভিমান করিনি, তা নয়। তবে তা ছিল ক্ষণিকের বিভ্রমের মতো। একটা বিষয়ে আমরা উভয় একমত ছিলাম এবং তা হলো, বাংলার স্বাধীনতা ভিন্ন বাঙালির মুক্তি নেই, এ বিষয়ে আমাদের মাঝে কোনো দ্বিধাদ্বন্দের অবকাশ ছিল না। আর ছিল না বলেই নানা প্রতিঘাতের মধ্যেও দু'জন দুই ফ্রন্টে কাজ করেছি। আমি কাজ করেছি মাঠে-ময়দানে আর মানিক ভাই তার ক্ষুরধার লেখনীর সাহায্যে"।[৭২]

যে কারণে অবিভক্ত বাংলার মূখ্যমন্ত্রী (১৯৪৬-৪৭) হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে পূর্ব বাংলার অন্যতম 'political thinker' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৭৩] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়কে সমাহিত করার পর তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করেন এভাবে, "বাংলার ইতিহাসের একটা অধ্যায়কে আজ কবরে রেখে দিলাম। আমার লিডার শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পরেও নিজেকে এতটা অসহায় মনে হয়নি। আজ নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছে।"[৭৪] তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মৃত্যুবরণ করলেও তার প্রতিষ্ঠিত *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী *ইত্তেফাকের* কার্যালয় পুড়িয়ে দেয়। তারপরও স্বাধীনতার পক্ষে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতেও *দৈনিক ইত্তেফাক* ছাপা হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালে ১৭ জুন *ইত্তেফাক* পত্রিকাকে জাতীয়করণ করা হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ২৪ আগস্ট মানিক মিয়ার দুই পুত্র মইনুল হোসেন (১৯৪০-) ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (১৯৪৪-) মালিকানা ফিরে পান। তারপর থেকে *দৈনিক ইত্তেফাক* স্বীয় বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ হতে থাকে। বর্তমানে তাসমিমা হোসেন (১৯৫১-) দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ব্যক্তিগত অবদানের দিক থেকে মানিক মিয়া আঞ্চলিক রাজনীতিতে আবদ্ধ থাকেননি। তিনি পত্রিকা *ইত্তেফাকের* মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের পক্ষে রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া উত্থাপন করেছেন। এভাবেই রাজনীতিতে তার সংশ্লিষ্টতা এবং জাতীয় পর্যায়ে মানিক মিয়ার রাজনৈতিক অবস্থান তৈরি হয়েছে। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া পদধারী নীতির রাজনীতি না করেও পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে পটপরিবর্তনের প্রক্রিয়া চালু রেখেছিলেন তা মূল্যায়নে তিনি একজন সফল রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমতুল্য।

প্রান্তটীকা

১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১ জুন ২০১২
২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১ জুন ২০১৮
৩. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর*, শিখা প্রকাশনী, ২০০৭, ঢাকা, পৃ. ৩-৫
৪. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১ এ-ঐ
৫. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধু মানিক মিয়া সম্পর্ক*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ৯-১০
৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *'আমাদের মানিক ভাই'*, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৯ জুন ১৯৬৯। মানিক মিয়ার স্নেহসুলভ আচরণের কথা উল্লেখ করে শেখ মুজিব বলেন, "...বর্ষার মেঘরাজির ন্যায় তার অপার স্নেহ সর্বক্ষণ আমাকে ঘিরে থাকত। বিশাল বারিধির ন্যায় তার প্রশান্ত বিপুল বক্ষে আমার ঠাঁই হয়েছিল। কোনো ষড়যন্ত্র, কানকথা, নিন্দাবাক্য সেখান থেকে আমাকে দূরে ঠেলে দিতে পারেনি। আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল আবেগ মিশ্রিত, হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতির রসে সিক্ত।"
৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১ জুন ২০১৬
৮. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃ. এ-৩
৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ২০১৬
১০. শেখ মুজিবুর রহমান এর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থে* লেখেন যে, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় সিলেট আসামের সাথে নাকি নতুন দেশ ভারতের সাথে নাকি পূর্ব পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হবে এ প্রশ্নে ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে সরকারি ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। গণভোটে পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে রায় হলে সিলেট পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হয়। শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫-৭৬।
১১. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃ. এ-ও
১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০-৩২
১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-২২। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ছিলেন বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভীক সাংবাদিক। সংসদীয় গণতন্ত্র ও পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি *ইত্তেফাকের* 'রাজনৈতিক হালচাল' ও পরবর্তী সময়ে 'মঞ্চে নেপথ্যে' উপসম্পাদকীয় কলামে "মোসাফির" ছদ্মনামে নিয়মিত রাজনৈতিক নিবন্ধ লিখতেন। এই লেখনীর মাধ্যমেই তিনি 'মোসাফির' নামক ছদ্মনামের অধিকারি হন। মোঃ হাফিজুর রহমান, *বাংলাপিডিয়া*
১৪. তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-২৩
১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২৩
১৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯
১৭. মহিউদ্দিন আহমদ, *আওয়ামী লীগ উত্থান পর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৪৮
১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১ জুন ২০১৬
১৯. মোঃ এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৪১
২০. মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫
২১. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
২২. *Government of East Bengal, Home Poll, F/N, 606-48PE, Part-3*
২৩. মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮
২৪. Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister of Government of the People's Republic of Bangladesh), *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, vol-2, 1951-1952,* Hakkani Publishers, Dhaka, 2020, p. 40-41
২৫. Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister of GOB), *ibid,* p. 181
২৬. *Ibid,* p. 79
২৭. *Ibid,* p. 146, 155
২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১ জুন ২০১৬
২৯. Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister of GOB), *ibid,* p. 225-228
৩০. *Ibid,* p. 233-236
৩১. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১-২২৩
৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১-২৫২

৩৩. সালাহউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৫২-৫৪
৩৪. এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫-৯৯। এম আর আখতার মুকুল, *চল্লিশ থেকে একাত্তর*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪৩
৩৫. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫-৫৮
৩৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১ জুন ২০১৬
৩৭. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৭-৮৮। অলি আহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১
৩৮. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ২৬ জুলাই ১৯৫৭
৩৯. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৬১২।
৪০. মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭-৮৮
৪১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১২
৪২. মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১
৪৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১ জুন ২০১৬
৪৪. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯
৪৫. Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka, 1986, p. 168-169
৪৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৩০ অক্টোবর ১৯৫৮
৪৭. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-২০
৪৮. **বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ (১৯৩০-২০২২)** নেত্রকোনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে গোপালগঞ্জ ও নাটোরে চাকুরীর পর ১৯৬০ সালে তাকে বিচার বিভাগে বদলী করা হয়। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ হাইকোর্টে বিচারক পদে পদায়ন করা হয়। পরবর্তীতে হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৯০ সালে ১৪ জানুয়ারি তাকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ মনোনীত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কাজী এবাদুল হক এবং হেলাল উদ্দিন আহমদ, *বাংলাপিডিয়া*।
৪৯. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-২০
৫০. সংস্কৃতি চর্চায় দেশীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালে 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাকিস্তানি সামরিক শাসনের কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যে রবীন্দ্র শতবর্ষ উৎসব পালনে সংস্কৃতি সচেতন মানুষ একত্রিত হয়ে এই সংগঠন গড়ে তোলেন। বিচারপতি মাহাবুব মর্শেদ, গোবিন্দ চন্দ্র দেব, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রমুখসহ ঢাকার সাংস্কৃতিক কর্মী মিলে নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়াসে একত্রিত হয়েছিলেন। ছায়নট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ থেকে শুরু করে বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত সাংস্কৃতিক পথপরিক্রমায় গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়েছে। মোহাম্মদ আবদুল হাই, *বাংলাপিডিয়া*
৫১. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-২০
৫২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১ জুন ১৯৭২
৫৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪-৭৫।
৫৪. *'ঢাকা টাইমস'* ও *'পূর্বাণী'* মানিক মিয়া সম্পাদিত দুটি দৈনিক পত্রিকা। ১৯৬৩ সালে পত্রিকা দুটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়।
৫৫. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪-৭৫।
৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০-৭৫
৫৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১ জুন ২০১২
৫৮. Shyamali Ghosh, *The Awami League 1949-1971,* Academic Publishers, Dhaka, 1990. শ্যামলী ঘোষ, *আওয়ামী লীগ* ১৯৪৯-৭১, (অনুবাদ, হাবীব উল আলম) ইউ পি এল, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১১৫-১১৮
৫৯. মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২
৬০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৬৬
৬১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৬ এপ্রিল ১৯৬৬
৬২. এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯
৬৩. **বিচারপতি বদরুদ্দীন আহমদ সিদ্দিক (১৯১৫-১৯৯১)** গাজীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে ছাত্রাবস্থায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করে সোহ্রাওয়ার্দীর জুনিয়র হিসেবে আইন পেশায় যুক্ত হন। দেশ বিভাগের পর ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৫৭ সালে তাকে পূর্ব

পাকিস্তানের অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। বদরুদ্দীন আহমদ ১৯৬০ সালে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৭ সালের ১৬ নভেম্বর তাকে পূর্ব পাকিস্তানের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত করা হয়। লায়লা রাশিদা সিদ্দিকী, *বাংলাপিডিয়া*

৬৪. এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯

৬৫. মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জীবন ও রাজনীতি, প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৪২-৩৪৬

৬৬. কর্ণেল শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৫-১৬

৬৭. তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১(খ)। মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০।

রাও ফরমান আলী (১৯২৩-২০০৪) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ব্রিগেডিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। সামরিক পুলিশ এবং শীর্ষ সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন ও তদারকি করতেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সংঘটিত গণহত্যার প্রধান অভিযুক্তদের অন্যতম। তাছাড়া বুদ্ধিজীবী হত্যায় মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন। রাও ফরমান আলী (অনুবাদ-শাহ আহমদ রেজা), *বাংলাদেশের জন্ম*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৭

৬৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

৬৯. এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০

৭০. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১ (খ-গ)

৭১. শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৯৬

৭২. মইনুল হোসেন (সম্পা.), *অবিস্মরণীয় মানিক মিয়া*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩

৭৩. Mohammad H.R. Talukdar edited, *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, The University Press Ltd. Dhaka, 1987, p. 117, 144

৭৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১ জুন ২০১২।

৫.২ সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)

বিংশ শতাব্দীর বাংলার নারী জাগরণ ও আন্দোলন সংগ্রামের বিচিত্র ইতিহাসের সঙ্গে সুফিয়া কামালের নাম গভীরভাবে জড়িত। সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০ জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদের মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু পৈতৃক নিবাস কুমিল্লার শিলাউর গ্রামে। তার বাবার নাম সৈয়দ আবদুল বারী এবং মাতার নাম নবাবজাদী সৈয়দা সাবেরা খাতুন। সুফিয়া কামালের বয়স যখন সাত বছর তখন তার বাবা (ইসমে আজম জপ করতে গিয়ে সুফি মতাবলম্বী হয়ে চিরতরে গৃহত্যাগ করেন) নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তার মা, পুত্র ও কন্যাসহ পিত্রালয় শায়েস্তাবাদে চলে আসেন। তিনি মাতুলালয়ের প্রচুর বিলাস-বৈভব ও কঠোর রক্ষণশীল পরিবেশে লালিত হন। তৎকালীন মুসলিম পরিবারে মেয়েদের জন্য অনেক কিছুই নিষিদ্ধ ছিল। সুফিয়া কামাল নিজ দক্ষতায় এই কঠোর সীমাবদ্ধ পরিবেশের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসেন। সুফিয়া কামাল প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা পাননি তবে তার মামার নিজস্ব লাইব্রেরি থাকায় মায়ের সাহায্যে পড়াশোনা করেন। মামার বাড়িতে উর্দুভাষায় কথা বলার চল থাকলেও মায়ের কাছ থেকে বাংলা শিখেছিলেন।[১] পারিবারিক পরিবেশই সুফিয়া কামালের জীবনে বড় পরিবর্তন নিয়ে আসে। খুব অল্পবয়স থেকেই তৎকালীন সময়ের স্বদেশী আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব তার ওপর পড়ে। বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত সহ (১৮৫৬-১৯২৩) অনেক স্বদেশী আন্দোলনের ব্যক্তিত্বের ভূমিকার কথা সুফিয়া কামালের লেখায় পাওয়া যায়।[২]

১৯২৩ সালে মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সাথে সুফিয়া কামালের বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি স্বামীর সাথে বরিশালে চলে আসেন। এসময় বিপ্লবী অশ্বিনী কুমার দত্তের ভাই সরল কুমার দত্ত *তরুন* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সুফিয়া কামালের স্বামীও এ পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন। *তরুন* পত্রিকায় সুফিয়া কামালের প্রথম লেখা ('সৈনিক বধু'-১৯২৩) প্রকাশিত হওয়ায় তার পরিবারে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।[৩] ১৯২৫ সালে সুফিয়া কামালের রাজনৈতিক জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৯২৫ সালে অবিভক্ত ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) বরিশালে আসলে সুফিয়া কামাল নিজে চরকায় সুতা কেটে গান্ধীজীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে গবেষণা অভিসন্দর্ভের একজন আঞ্চলিক নেতৃত্ব হিসেবে সুফিকা কামাল বিবেচ্য।[৪]

কলকাতায় গমনের মাধ্যমে সুফিয়া কামালের জীবনে নতুন যুগের সূচনা হয়। কলকাতায় এসে সাহিত্য সমাজে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এ সাহিত্য সমাজে পরিচিত হওয়ার পেছনে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ও *সওগাত* (১৯১৮) সাম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের (১৮৮৮-১৯৯৪) অনন্য অবদান ছিল। কাজী নজরুল ইসলাম সুফিয়া কামালকে নাসিরউদ্দিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এই পরিচয়ের মাধ্যমে তার কবি প্রতিভার ব্যাপক বিকাশ সম্ভব হয়।[৫] ১৯২৯ সালে সুফিয়া কামাল বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) প্রতিষ্ঠিত মুসলিম মহিলা সংগঠন 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলাম' (১৯১৬) এ যোগদান করেন। বেগম রোকেয়ার সামাজিক আদর্শ দ্বারা তিনি আজীবন প্রভাবিত ছিলেন। তাছাড়া ১৯৩১ সালে সুফিয়া কামাল মুসলিম মহিলাদের মধ্যে প্রথম 'ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন' এর সদস্য

নির্বাচিত হন।[৬] ১৯৩২ স্যালে সুফিয়া কামালের স্বামী নেহাল হোসেন যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। এসময় পারিবারিক অসহযোগিতা সহ্য করতে না পেরে আত্মপ্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। এসময় তিনি (১৯৩৩-১৯৪১ পর্যন্ত) কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে (১৮৭৬) শিক্ষকতায় যোগদান করেন। এই স্কুলেই প্রাবন্ধিক আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) এবং কবি জসিমউদ্দিন (১৯০৩-১৯৭৬) এর সাথে তার পরিচয় হয়। সুফিয়া কামাল স্কুলে শিক্ষাকতার পাশাপাশি জোরালোভাবে সাহিত্যচর্চা করেন। এসময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে একটি কবিতার মাধ্যমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ (*সাঁঝের মায়া*-১৯৩৮) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উপহার পাঠালে তার কাছ থেকে আর্শিবাদ পত্র লাভ করেন।[৭] এর মাধ্যমেই সুফিয়া কামালের কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৯ সালে আত্মীয়-স্বজনদের ইচ্ছায় চট্টগ্রামের লেখক, অনুবাদক কামাল উদ্দিনের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এবং সুফিয়া কামাল নামে পরিচিত হন। স্বামীর উৎসাহ ও সমর্থনে তিনি সমাজকর্ম ও জনসেবা শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে বরিশালের 'মাতৃমঙ্গল' সেবা সদনের কাজ দিয়ে সুফিয়া কামালের সমাজসেবী কর্মজীবনের শুরু হয়।[৮]

১৯৪৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে।[৯] দাঙ্গা পীড়িতদের সাহায্যের ক্ষেত্রে সুফিয়া কামাল সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে (১৯৩৯) আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা করেন।[১০] ১৯৪৭ সালে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন *'সাপ্তাহিক বেগম'* পত্রিকা প্রকাশ করলে সুফিয়া কামাল এ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি স্বপরিবারে ঢাকায় বসবাস শুরু করেন।[১১] ঢাকায় স্থায়ীভাবে বাস করতে এসে তিনি একেবারে ভিন্ন ধারার রাজনৈতিক আদর্শে আকৃষ্ট হন এবং বিপ্লবী ধারার নারী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাসী বিপ্লবী ধারার নারী নেত্রী ও সংগঠকরা তাকে পূর্ব পাকিস্তানের নারী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আকুল আহবান জানাতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দমন নীতির প্রতিবাদে জনগণের পক্ষে দাড়ানোর মতো গুটি কয়েক নারী নেত্রীর মধ্যে সুফিয়া কামাল সর্বজন সমর্থিত ছিলেন। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের শ্রেণি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতি সুফিয়া কামালের কুণ্ঠাহীন একাত্মতাবোধ তাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে যুক্ত করেছে এই আন্দোলনে। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের উদ্যোগে পরিচালিত 'মহিলা সমিতি'র সভানেত্রীর দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়।[১২]

১৯৪৮ সাল থেকেই মূলত তার রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয়। নিবেদিতা নাগ (১৯১৮-২০১৩), যুঁইফুল রায় (১৯১৬-১৯৯৭) ও অন্যান্য কমিউনিস্ট নারীদের আহবানে ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে তাকে সভানেত্রী করে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি' গঠিত হয়।[১৩] সুফিয়া কামাল ধার্মিক ছিলেন কিন্তু মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান সরকারের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তা এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের অসারতা ও ভ্রান্তি সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই ধর্মের মুখোশের আড়ালে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতির ওপর যে জাতিগত নিপীড়ন চালায়, বাঙালির ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপর একের পর এক যে আক্রমণ চালায় এবং নয়া ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ধারায় পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের প্রক্রিয়া শুরু করে, তার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির সংগ্রামে সুফিয়া কামাল

পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে যেমন, ১৯৫৩ সালে সিলেটের চা বাগানের নারী শ্রমিকদের কম বেতন ও শারীরিক নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদ, ১৯৫৫ সালে লবন ও তেলের দাম বৃদ্ধিতে মন্ত্রী আতাউর রহমানকে ঘেরাও আন্দোলন, ১৯৬৩ সালের ৫ অক্টোবর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যের বৃদ্ধির প্রতিবাদে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা বিকাশে মূল্যবান অবদান রাখেন।[১৪]

১৯৪৯ সালে সুফিয়া কামালের যুগ্ম সম্পাদনায় *সুলতানা* পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।[১৫] ঢাকায় বসবাস শুরু করার পর সমকালীন কবি সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক, বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতাকর্মী, নারী সংগঠক অনেকের সাথেই আলাপ পরিচয় ও হৃদ্যতা গড়ে ওঠে।[১৬] এসময় সুফিয়া কামাল শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) ও অন্যান্যদের নিয়ে সামাজিক কার্যক্রম শুরু করেন।[১৭] ১৯৪৮ সালের পর ধীরে ধীরে কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) প্রগতিশীল 'শিখা' গোষ্ঠী সাহিত্য চক্রের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এমনিভাবে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল আদর্শ, চেতনা ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিকাশের আন্দোলন ও সংগঠনগুলোর সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন।[১৮]

১৯৫০ সালে ঢাকায় প্রচণ্ড আকারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায় যা ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য মূখ্যসচিব পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যসচিব আজিজ আহমেদের সাথে একটি বৈঠকের জন্য ঢাকায় আসেন। ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০ টায় আলোচনার মধ্যে রক্তমাখা এক নারীকে হাজির করানো হয় এবং বলা হয় কলকাতায় তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে সচিবালয়ের কর্মচারীরা কর্মবিরতি দিয়ে মিছিল নিয়ে ঢাকার নবাবপুরের দিকে অগ্রসর হয় এবং ভিক্টোরিয়া পার্কে (বর্তমানে বাহাদুর শাহ পার্ক) গিয়ে শেষ হয়।[১৯] দুপুর ১ টার দিকে মিছিল এবং বক্তব্য প্রদান শেষে মুসলিমরা হিন্দু বাড়ি-ঘর ও দোকানপাট-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুট করার পর আগুন ধরিয়ে দেয়। মাত্র সাত ঘণ্টার বীভৎস হত্যা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ফলে ৫০,০০০ হিন্দু বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে।[২০] তাজউদ্দিন আহমেদ দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ঢাকার নবাবপুর, সদরঘাট, পাটুয়াটুলি, ইসলামপুর, দিগবাজার, ইংলিশ রোড, বংশাল, চকবাজার ঘুরে দেখেন এবং হিন্দুদের উপর মুসলিমদের চালানো অমানবিক বর্বর নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের কথা স্বীকার করে নেন।[২১] ঢাকায় দাঙ্গা শুরু হওয়ার প্রথম দুইদিনের মধ্যে কমপক্ষে ২০০ জন হিন্দুকে পুড়িয়ে মারা হয়। তাছাড়া ৮০,০০০ হাজার হিন্দুদের মধ্যে ৫০,০০০ হাজার হিন্দু ভয়ে ঢাকা থেকে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে চলে যায়।[২২] দাঙ্গার বিরুদ্ধে লীলা রায়ের (১৯০০-১৯৭০) নেতৃত্বে বেগম সুফিয়া কামাল ও 'ওয়ারি মহিলা সমিতি'র মহিলারা ত্রাণ কার্যের পাশাপাশি প্রচণ্ড প্রতিরোধ ও আন্দোলন করেন। ঘোড়ার গাড়িতে এবং কখনও পায়ে হেঁটে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে, নারায়ণগঞ্জে, বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে দলে দলে গিয়ে তারা দাঙ্গা প্রতিরোধ করতেন। এসব কাজের মধ্য দিয়ে মহিলারা সংগঠিত হতে থাকে।[২৩]

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সর্বজনীন রাজনীতির অন্যতম উদাহরণ হলো ভাষা আন্দোলন। বাঙালি সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলনে বাংলার নারী সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২৪] ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪) পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার ঘোষণা প্রদান করলে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে

এবং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন প্রসারিত হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির বিয়োগান্তক ঘটনার মাধ্যমে এ আন্দোলন সর্বজনীনতা লাভ করে।[২৫] ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার প্রতিবাদে বাংলার সর্বস্তরের নারীরা রাস্তায় নেমে আসে এবং আন্দোলনে শরিক হয়। বিশেষ করে ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলে গুলি বর্ষণের খবর বাংলার মহিলা সমাজের ওপর চরম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সুফিয়া কামাল, বেগম কাজী মোতাহের হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), নুরজাহান মুরশিদ (১৯২৪-২০০৩), লায়লা সামাদ (১৯২৮-১৯৮৯) প্রমুখের নেতৃত্বে মহিলারা সমবেত হয়ে বিক্ষোভ করেন ও একটি নিন্দা প্রস্তাব নেন।[২৬] সুফিয়া কামাল ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলের মহিলাদের সংগঠিত করে মিছিলের আয়োজনসহ মিছিলে নেতৃত্ব প্রদান করতেন।[২৭] এসময় সরকারি দমননীতি উপেক্ষা করে সুফিয়া কামাল, কামরুন্নাহার লাইলী (১৯৩৭-১৯৮৪), হালিমা খাতুন (১৯৩২-২০১৮), নূরজাহান মুরশিদ, আফসারী খানম প্রমুখ পাড়ায় পাড়ায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' এর লিফলেট বিলি করা, মহিলাদের সভা করা, মহিলাদের মধ্যে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক বক্তব্য পৌঁছানো ইত্যাদি কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[২৮] ভাষা আন্দোলনকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে নারী আন্দোলনের সূচনাকাল চললেও দীর্ঘ সময় ধরে যেসব নারী নেত্রী পূর্ব পাকিস্তানে নারী শিক্ষা প্রসারে, নারী সমাজকে সংগঠিত করে বিদ্যমান আন্দোলনে যুক্ত করেছিলেন এর মধ্যে সুফিয়া কামাল সবসময় অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন।[২৯] তাছাড়া সুফিয়া কামাল ছাত্রী নেত্রীদের নিয়ে তার বাসায় সভা করতেন এবং ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতেন। সুফিয়া কামাল ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণসহ সামগ্রিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[৩০]

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় *বেগম* পত্রিকা (১৯৫০) ও বেগম ক্লাব (১৯৫৪) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ক্লাবের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নারী জাগরণ, শিক্ষা, সমাজসেবা ও নারী প্রগতির জন্য আগ্রহী মহিলারা সম্মিলিত কর্মসূচি নিতে পেরেছিলেন যাকে বিশ শতকের ঐক্যবদ্ধ নারী আন্দোলনের সূত্রপাত হিসেবে গণ্য করা হয়। সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে জনগণের নানাবিধ অধিকার প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে এবং নারীর অধিকার অর্জনের দাবিতে নারী সমাজ নানা সংগঠন গড়ে তুলে আন্দোলন করছিলেন। যে কারণে মুসলিম সরকারি ধারার সঙ্গে গণমুখী ধারার নারী আন্দোলনের আদর্শগত ব্যবধান বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে সুফিয়া কামালের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।[৩১] *বেগম পত্রিকার* প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সুফিয়া কামাল এ পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[৩২] ১৯৫৪ সালে 'ওয়ারি মহিলা সমিতি'র প্রতিষ্ঠা এবং এর প্রথম সভানেত্রী ছিলেন সুফিয়া কামাল। এভাবে তিনি বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের মাধ্যমে মহিলাদেরকে সংগঠিত এবং সচেতন করে তোলেন।[৩৩] ১৯৫৫ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে লবন ও তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের সংগঠনের মহিলারা রাস্তায় মন্ত্রী আতাউর রহমানকে (১৯০৭-১৯৯১) ঘেরাও করেন। উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তানে সেবারই প্রথম মহিলারা প্রকাশ্যে রাজপথে ঘেরাও আন্দোলন করেন।[৩৪] যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিজয় সাফল্যে মুসলিম লীগ সরকার শঙ্কিত হয়ে ওঠে। স্বৈরাচারী পন্থায় এই গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করার জন্য আদমজী পাটকলসহ অন্যান্য কারখানায় বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি দাঙ্গা বাঁধিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তানে আইন শৃঙ্খলার দারুণ অবনতি ঘটেছে'-এই পরিকল্পিত

অজুহাত দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ৯২ (ক) ধারা জারি করে গভর্নরের শাসন ঘোষণা করে। যুক্তফ্রন্ট সরকার ঘোষিত ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ৯২ (ক) ধারা দিয়ে বাতিল করা হয়।[৩৫] পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘটে ছাত্রীরাও যোগ দেন এবং নারী সমাজ তা সমর্থন করে। ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ছাত্রীদের মিছিল বের হয়। এসময় ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীরাও গ্রেফতার হয়। সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে নারী সমাজ ছাত্রীদের প্রতি সমর্থন জানান।[৩৬]

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ এবং তার সাহিত্য কর্ম নিয়ে যখন নতুন চক্রান্ত শুরু করে তখন নারী সমাজ যৌথভাবে এগিয়ে আসে। ১৯৬৭ সালের ২২ জুন বাজেট অধিবেশনে রাজশাহী থেকে নির্বাচিত বিরোধীদলীয় সদস্য মজিবর রহমান চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন (১৮৯৮-১৯৭৭) মন্তব্য করেন যে, পাকিস্তানি আদর্শের সঙ্গে না মিললে রেডিও, টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হবে।[৩৭] তার রবীন্দ্র বিদ্বেষী বক্তৃতায় বুদ্বিজীবী মহলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জাতীয় সংসদে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ বিরূপ মন্তব্যের নিন্দা জানিয়ে ১৯৬৭ সালের ২৫ জুন ১৮ জন বুদ্ধিজীবী বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় যে,

> '... সরকারি মাধ্যম হতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত আমরা অত্যন্ত দু:খজনক বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তার সংগীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও ভিন্নতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানিদের সাংস্কৃতিক সত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারি নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।'[৩৮]

সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে ঢাকা প্রেসক্লাবে (১৯৫৪) প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৩৯] পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আন্দোলনে ভীত সামরিক শাসকগোষ্ঠী সরকারি কর্মচারীদের ওপর চাপিয়ে দিল এই নিষেধাজ্ঞা যে, তারা নিজেরা বা তাদের পরিবারের কেউ সরকার বিরোধী কোন প্রচারে বা আন্দোলনে যোগ দিলে তাদের চাকরি চলে যাবে। সর্বত্র সরকারি দমননীতির চাপে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে যখন ভয়ভীতি, রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকার চেষ্টা, তখনো কবি সুফিয়া কামাল সব বাঁধা তুচ্ছ করে সর্বাগ্রে এগিয়ে গেছেন সকল আন্দোলনে, মিছিলে, যদিও তার স্বামী জনাব কামালউদ্দিন আহমদ ছিলেন সরকারি কর্মচারী। নানাভাবে তার পরিবারের ওপর দমননীতি নেমে এসেছিল। ছেলেমেয়ে-স্বামী এবং তার ওপর নানা হয়রানি, তদন্ত ইত্যাদি চলতেই থাকে। কিন্তু তিনি অটল থাকেন তার সংগ্রামে এবং তার স্বামী ও পরিবার থেকে তিনি কোন বাঁধা পাননি বরং পেয়েছেন সমর্থন।[৪০] সুফিয়া কামাল জন মানুষের কল্যাণে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। পাশাপাশি তিনি তার সাহিত্য কর্মও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। তৎকালিন সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করেছেন। ১৯৫৬ সালে সুফিয়া কামাল এর বাসভবনের (তারাবাগ, ঢাকা) আঙ্গিনায় অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় শিশু সংগঠন 'কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালে তার নেতৃত্বে ঢাকায় 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত স্মৃতি কমিটি' গঠন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রীনিবাসের নাম 'রোকেয়া হল' করার প্রস্তাব পেশ করা হয়।[৪১]

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মীর্জা (১৮৯৯-১৯৬৯) পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান ইস্কান্দার মীর্জাকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করে প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে।[৪২] ফলে ১৯৬০ সাল থেকে 'গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি' (১৯৫০), 'ওয়ারি মহিলা সমিতি' (১৯৪৮), 'শিশুরক্ষা সমিতি', 'শিশু কল্যাণ পরিষদ', 'ইসলামিক মহিলা মিশন', আপওয়া (অল পাকিস্তান উইমেন্স এ্যাসোসিয়েশন) প্রমুখ নারী সংগঠনগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে।[৪৩] পাকিস্তান আমলে নারীর আইনগত অধিকার ও পরিবারে নারীর অবস্থান উন্নত করার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপে সুফিয়া কামাল সক্রিয় নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। 'পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ'-এ ১৯৫৩ সালে বঙ্গীয় মুসলিম বিবাহ আইন ও তালাক রেজিস্ট্রেশন বিলের সংশোধনী নিয়ে আলোচনা চলাকালীন সময়ে শামসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪), বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম আনোয়ারা খাতুন (১৯১৯-১৯৮৮), দৌলতুন্নেসা খাতুন (১৯২২-১৯৯৭) প্রমুখ নারী নেত্রী আইন পরিষদে গমন করেন। এ সময় আইন বিষয়ক আলোচনায় বলা হয় প্রয়োজনে স্ত্রী সরাসরি স্বামীকে তালাক দিতে পারবে, সেই আইন সংশোধন করে স্বামী যাতে তার বিরোধিতা করতে পারে সেজন্য দুই মাসের নোটিশ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। এই বিল উপস্থাপনের প্রস্তাব করলে তৎক্ষণাৎভাবে উপস্থিত মহিলা নেতৃবৃন্দের জোরালো প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে বিলটি স্থগিত করা হয়।[৪৪] তাছাড়া বিবাহ ও পারিবারিক আইন কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনায় ১৯৬০ সালের ১২ অক্টোবর অপরাহ্নে ঢাকার 'বেগম ক্লাবে' স্থানীয় মহিলা প্রতিষ্ঠানসমূহের এক যুক্তসভা অনুষ্ঠিত হয়। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রথমেই সুফিয়া কামাল বহু বিবাহের সামাজিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "সমাজে বহু বিবাহের অনুমতি থাকায় পুরুষ তার ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশিমত বহু বিবাহ করে থাকেন। এতে পরিবারে যে অশান্তির সৃষ্টি হয় তা বিশেষ দুঃখজনক।" তিনি আরও বলেন যে, সমাজে বহু বিবাহের অনুমতি থাকলেও পুরুষেরা একাধিক স্ত্রীর এবং ছেলেমেয়েদের প্রতি উদাসীন থাকেন। এজন্য বহু পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। পুরুষের দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয় এবং সেই স্ত্রীর গর্ভজাত ছেলেমেয়েদের ভরণ-পোষণের কোন ব্যবস্থা করা হয় না। সুফিয়া কামাল ইসলামী শরীয়তের বিধানের উল্লেখ করে বলেন যে, শরীয়তে মেয়েদের বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে যে অধিকার আছে প্রায় ক্ষেত্রেই তা কাবিনের চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয় না, ফলে অনেক সময় মেয়েদের দুর্বিষহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এসকল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য তিনি সকল মা-বাবা ও অভিভাবকদের মেয়েদের বিবাহের সময় অধিকার সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হওয়ার অনুরোধ জানান।[৪৫] এভাবেই সুফিয়া কামাল বঙ্গীয় মুসলিম বিবাহ আইন ও তালাক রেজিস্ট্রেশন বিলের সংশোধনীর প্রতিবাদ জানান। বিবাহ ও পারিবারিক আইন কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনায় জনমত গঠনের সময় শামসুন নাহার মাহমুদ, দৌলতুন্নেসা খাতুন, আনোয়ারা খাতুনের সাথে কাজ করেছেন। মহিলা প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনী আইন সংশোধনীর প্রতিবাদে মহিলা সম্মেলনের উদ্যোগে নূরজাহান মুরশিদ (১৯২৪-২০০৩), লায়লা সামাদ (১৯২৮-১৯৮৯), ড. হালিমা খাতুন (১৯৩২-২০১৮) প্রমুখের সাথে সুফিয়া কামাল সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সভা (১৯৬৩ সালের ৫ অক্টোবর), শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পুনর্বিবেচনার দাবিতে

সুফিয়া কামাল বিবৃতি প্রদান করেন। এ সময় বেগম রোকেয়া আনোয়ার, বেগম হাজেরা মাহমুদ (পাকিস্তানি বামপন্থি রাজনীতিবিদ মাহমুদ আলীর স্ত্রী), নুরজাহান মুরশিদ, আমেনা বেগম (১৯২৫-১৯৮৯), বেগম কামরুন্নাহার লাইলী (১৯৩৭-১৯৮৪), বদরুন্নেসা আহমদ (১৯২০-১৯৭৪), জোবেদা খানম (১৯০১-১৯৮৬), লুলু বিলকিস বানু, বেগম আয়শা হারুন প্রমুখ নারী নেত্রী সুফিয়া কামালের সাথে ছিলেন। পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালি সংস্কৃতির ওপর দমন নীতির অঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্র সংগীতকে নিষিদ্ধ করলে তার বিরুদ্ধে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন' পরিচালনা করেন।[৪৬]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের নারী সমাজের আন্দোলনের ফলে মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ সালে প্রণীত হয়। প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ও ধর্মান্ধ নেতারা ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনকে পবিত্র কোরআনের পরিপন্থি বলে আখ্যায়িত করেন এবং এর তীব্র বিরোধিতা করেন।[৪৭] নারী সমাজ প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের ভূমিকার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে 'আপওয়া' (All Pakistan Women's Association), শিশু রক্ষা সমিতি, নারিন্দা মহিলা সমিতি, ওয়ারি মহিলা সমিতি, গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি, বেগম ক্লাব ও অন্যান্য সংগঠনের মহিলারা প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৯৬৩ সালের ৫ অক্টোবর বেগম ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। ছাত্রী নেত্রী মতিয়া চৌধুরী (১৯৪২-) (বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেত্রী) মহিলাদের দাবি সমর্থন করে বিবৃতি প্রদান করেন। নারী সমাজের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় পরিষদে কোন সংশোধনী ছাড়াই পারিবারিক আইন ১৯৬১ গৃহীত হয়।[৪৮] ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে সংবিধান প্রণয়ন করেন (১ মার্চ) এবং ৮ জুন থেকে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন।[৪৯] নতুন সংবিধানে নারীর অধিকার সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন না হলেও নারী সমাজ সংগঠিত কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। রাজনৈতিক দমন নীতি থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের নারী সমাজ প্রকাশ্য রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। তবে নানাবিধ সামাজিক সংস্কার মূলক কর্মকাণ্ডে পূর্ব পকিস্তানের নেতৃস্থানীয় মহিলারা যুক্ত হতে শুরু করেন। ১৯৬২ সালের হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পুনর্বিবেচনা ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের চাহিদার সাথে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গতি বিধানের জন্য ঢাকার ৮ জন নেতৃস্থানীয় মহিলা সরকারের নিকট আবেদন জানিয়ে বিবৃতি দেন। সুফিয়া কামাল বিবৃতিদানকারীদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন।[৫০] এ সময় সুফিয়া কামাল 'সামাজিক দুর্নীতি মূলোচ্ছেদ কমিশনে' যুক্ত সদস্যের একজন সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া ১৯৬৪ সালে সরকারি ষড়যন্ত্রে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক সান্‌জিদা খাতুন (১৯৩৩–), অধ্যাপক রোকেয়া রহমান (১৯২৫-২০০০) সহ আরও অনেকে পাড়ায় পাড়ায় সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।[৫১] সুফিয়া কামাল দেশের সকল প্রতিকূল পরিবেশে নারী নেত্রীদের নিয়ে উদ্যোগী ভূমিকায় ছিলেন। সামরিক সরকারের শাসনামলে সুফিয়া কামাল প্রকাশ্যে ব্যাপক কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি আয়োজন করতে না পারলেও আঞ্চলিক পর্যায়ের নারীদের সামরিক সরকারের শোষণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত তথা সচেতন করতে পেরেছিলেন। একজন আঞ্চলিক নারী নেত্রী হিসেবে অধিকাংশ সময় ঢাকা কেন্দ্রীক কর্মী হয়ে বেগম সুফিয়া কামাল অনেকটা সফল

হয়েছিলেন। কোন রাজনৈতিক দলের কোন সাংগঠনিক পদধারী না হয়েও সুফিয়া কামাল নারীদেরকে রাজনীতি সচেতন করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে পটপরিবর্তন সাধন করেন।[৫২]

১৯৬৪ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ-১৯৬৪ সালের জুলাই এ গঠিত) মিস ফাতেমা জিন্নাহকে (১৮৯৩-১৯৬৭) প্রার্থী মনোনয়ন করে। এসময় সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রচার চালানো হয় যে, রাষ্ট্রপ্রধান পদে মহিলার নির্বাচন শরিয়ত সম্মত নয়। অন্যদিকে আইয়ুব বিরোধী মোর্চায় প্রতিক্রিয়াশীল জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম প্রভৃতি সংগঠন নারী সমাজের স্বার্থকে উপেক্ষিত করে।[৫৩] সম্মিলিত বিরোধী দলের ৯ দফা বিশিষ্ট নির্বাচনী ঘোষণার ৮ নম্বর ধারা (ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, ইসলামী বিধানাবলীর বাস্তবায়ন এবং শরিয়তের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য 'পারিবারিক আইন-১৯৬১' বাতিল করতে হবে) নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নারী সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন নারী সংগঠনের (আপওয়া, শিশুরক্ষা সমিতি, নারিন্দা মহিলা সমিতি, পুরানা পল্টন লেডিস ক্লাব, ওয়ারি মহিলা সমিতি, পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংসদ, বেগম ক্লাব, লেডিস ক্লাব প্রভৃতি) উদ্যোগে ৮ নম্বর ধারা প্রত্যাহারের দাবিতে নারী সমাজ সর্বত্র সভা ও প্রতিবাদ মিছিল করে।[৫৪] বেগম সুফিয়া কামাল, দৌলতুন্নেসা খাতুন, তুবা খানম, রোকেয়া রহমান কবীর, কামরুন্নাহার লাইলী, রাইসা হারুন, লায়লা সামাদ প্রমুখ মহিলা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, দেশের স্বার্থান্বেষী একশ্রেণির লোক ধর্ম ও শরীয়তের নামে মহিলা সমাজকে রক্ষণশীল জীবনযাত্রার সাথে আবদ্ধ করার পরিকল্পনা করছে। নারী সমাজ এ চেষ্টা প্রতিহত করার ঘোষণা দেন। ফাতেমা জিন্নাহ ঢাকায় নির্বাচনী প্রচার সফরে আসলে স্মারকলিপিসহ নারী নেতৃবৃন্দ তার সাথে দেখা করেন এবং প্রতিবাদী মিছিলের আয়োজন করেন। মহিলা প্রতিনিধি দলকে ফতেমা জিন্নাহ এ বিষয়ে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ করেন। এসময় সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে বিদ্যমান মহিলা সংগঠনের প্রায় ১৫ জন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বিরোধী নেতাদের সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন। নারী নেতৃবৃন্দ বিরোধী দলের নয় দফা নির্বাচনী কর্মসূচির আট নং দফাটি অগণতান্ত্রিক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। নারী সমাজের দীর্ঘ সংগ্রামের পর অর্জিত অধিকার বাতিল করার দাবি জানিয়ে বিরোধী দল চরম অন্যায় করেছে বলে তারা নিন্দা জানায়। তারা আরও উল্লেখ করেন যে, সংশ্লিষ্ট ধারাটি প্রত্যাহার করা না হলে নারী সমাজ বিরোধী দলকে নির্বাচনে সমর্থন দিবে না এবং সকল স্তরের মহিলারা সমবেত আন্দোলনে একীভূত হবে।[৫৫] নারী সমাজের সংগ্রামী প্রতিরোধের মুখে আওয়ামী লীগ (১৯৪৯) ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (১৯৫৭) ৮ নম্বর ধারার সঙ্গে তাদের দ্বিমত জানিয়ে বিবৃতি দেন।[৫৬] সুফিয়া কামাল পাকিস্তান সরকারের আমলে দমন নিপীড়নের কারণে বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠা আন্দোলন ও নারী অধিকার বিষয়ক কর্মকাণ্ডে বিভিন্নভাবে সংগঠিত হয়েছেন, অন্যদের সংগঠিত করেছেন এবং নারী আন্দোলনের একটা ধারাকে চলমান রেখেছেন। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সুসংগঠিত নারী আন্দোলনের কাঠামো গড়ে ওঠা খুবই কঠিন ছিল। সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো বিদ্যমান কোন সংগঠনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এসময় সরকার বিরোধী প্রতিবাদ কর্মসূচি মোকাবেলার জন্য সারাদেশে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক নেতাকর্মী, সমাজকর্মী ও ছাত্রদের

গণগ্রেফতার শুরু করে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকায় স্বাভাবিকভাবেই নারী অধিকার নিয়ে আন্দোলনও নিষিদ্ধ ছিল। এসময় নির্বাচন বিধিতে সরকারি কর্মচারীর স্ত্রী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার ক্ষেত্রে অযোগ্য থাকায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে যায়। তাছাড়া সরকারি কর্মচারীর স্ত্রী সরকার বিরোধী আন্দোলন করলে স্বামীর উপর দমন নীতি চাপিয়ে দেওয়ার কারণেও অনেক উৎসাহী নারী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতেন না। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মহল বেশিরভাগ সময় উদাসীন ছিলেন। তাছাড়া তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংগঠিত নারী আন্দোলন গড়ে তোলার অনুকূলে ছিল না। গ্রাম এবং শহরের নারী সমাজের দাবি-দাওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পার্থক্য ছিল। গ্রাম বাংলার নারী সমাজ পশ্চাৎপদ অবস্থায়, শিক্ষার অভাব ও অর্থনৈতিক কষ্টে থাকায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেনি। আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতার কারণে সর্বজনীন নারী আন্দোলন গড়ে ওঠেনি।[৫৭] পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের নারী সমাজ নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করতে ব্যাপক আগ্রহী ছিল। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের নারী নেতৃবৃন্দ আভিজাত্যপূর্ণ মতাদর্শী হওয়ায় দুই প্রদেশে সমন্বিত নারী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে নারী সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সব সময়ই বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নারীর ক্ষমতায়নে ধর্মীয় যুক্তি ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে তাদের স্বার্থ উদ্ধার করেছে। সকল বাঁধা মোকাবেলা করে নারী সমাজ এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় গ্রহণ করে। নারী সমাজের এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আন্দোলনে সুফিয়া কামাল নেতৃত্বের ভূমিকা রাখেন।[৫৮] সেই আন্দোলন যত দুর্বল, অসংগঠিত এবং বিক্ষিপ্তভাবেই গড়ে উঠুক না কেন, সুফিয়া কামালের কর্মকাণ্ডে সার্বিকভাবে একটা নিজস্ব ধারাবাহিকতা ছিলো। তিনি রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেননি কিন্তু তার নেতৃত্বে নারী আন্দোলন ও অন্যান্য জাতীয় আন্দোলনের যে রাজনৈতিক রূপরেখা ঘটেছে তা যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি তত্ত্বগত ক্ষেত্রে বিশেষ উদাহরণ।[৫৯] পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন তথা অধিকার আদায়ের রাজনৈতিক ধারায় নারী সমাজকে সংশ্লিষ্ট করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন ধারা সৃষ্টি করেন।[৬০]

আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিবাদে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে গণআন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৭ সালে যখন পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসকের দমননীতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছিল তখন সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে নারী সমাজ অংশগ্রহণ করতে থাকে।[৬১] গণঅভ্যুত্থানের প্রতিটি পর্যায়ে বাংলার নারী সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জাতীয় স্বাধিকার আন্দোলনের মূল ধারায় নারী আন্দোলনের সম্পৃক্ততার বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন সুফিয়া কামাল। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জরুরি আইন প্রত্যাহার, দমননীতি বন্ধ ও রাজবন্দির মুক্তিসহ বিভিন্ন দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে দেশব্যাপী চলতে থাকা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি নারী সমাজের বৃহত্তর আন্দোলনের অব্যাহত ধারায় তিনি সক্রিয় ছিলেন।[৬২] ১৯৬৯ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকা শহরে ছাত্রীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে আসাদ (১৯৪২-১৯৬৯) (ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) শহীদ হন। এ হত্যার প্রতিবাদে ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে ২২ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে বিরাট শোক মিছিল সারা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে।[৬৩] ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ বেগম

সুফিয়া কামালের বাস ভবনে নেতৃস্থানীয় মহিলাদের সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভা শেষে একটি শোক মিছিলের প্রস্তাব নেওয়া হয়। সে প্রস্তাব অনুযায়ী নারীরা সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে একটি মশাল মিছিল নিয়ে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে।[৬৪]

তাছাড়া এ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০ টায় শহীদ মিনার থেকে প্রায় আড়াই হাজার নারীর উদ্যোগে শোক মিছিল বের হয়ে হাইকোর্টের সামনে দিয়ে নওয়াবপুর হয়ে বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে শেষ হয়।[৬৫] তারা ১১ দফা দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ছাত্র হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন।[৬৬] কোন রাজনৈতিক দলের পদধারী সদস্য না হলেও জাতীয় প্রয়োজনে এ সময় সুফিয়া কামাল ছাত্র-সমাজের ১১ দফা দাবির প্রতি সমর্থন করেন এবং নারী সমাজকে এ আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। এভাবে তিনি সৃষ্ট পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ ও বিদ্যমান অন্যান্য সংগঠনের দলীয় কর্মসূচিতে সমর্থন করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় নিজেকে সংশ্লিষ্ট করেন।[৬৭] ১৯৬৮ সালের শেষ দিক থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে এক অভূতপূর্ব গণজাগরণের সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ বিশেষত ছাত্রলীগ (১৯৪৮), ছাত্র ইউনিয়ন (১৯৫২) ঢাকায় আন্দোলন সৃষ্টির কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এসময় আন্দোলন দমনে সরকারি দমননীতি চরম আকার ধারণ করে।[৬৮] এ দমননীতির স্বীকার হন বেগম মতিয়া চৌধুরী। তাকে গ্রেফতার করে দুই বছর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। দীর্ঘদিন কারাগারে থাকায় মতিয়া চৌধুরী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার মুক্তির জন্য এসময় ৪২ জন নেতৃস্থানীয় মহিলা বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিকারীদের মধ্যে সুফিয়া কামাল অন্যতম একজন ছিলেন।[৬৯] এছাড়া সুফিয়া কামাল রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলনে এ সময় সাহসী ভূমিকা পালন করেন।[৭০]

১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ছাত্র আন্দোলনের প্রয়োজনে নারী সমাজের সমর্থন সৃষ্টির জন্য ছাত্রীদের মধ্য থেকে বিভিন্ন মহিলা নেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের পটভূমিতে ‘পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। এই সংগ্রাম পরিষদের সভানেত্রী ছিলেন সুফিয়া কামাল।[৭১] ‘মহিলা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করে সুফিয়া কামাল সারাদেশে সর্বস্তরের ও দলমত নির্বিশেষে সকল নারী সমাজকে মানবতার মুক্তিতে একযোগে জাতি গঠনের কাজে এগিয়ে আসতে আহবান জানিয়েছিলেন।[৭২] ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক বসে। বৈঠকে শেখ মুজিব ছয় দফা ও এগারো দফা দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কিছু সংখ্যক নেতার ছয়দফা ও এগারো দফার বিরোধিতার কারণে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। ১৯৬৯ সালের ২৩ মার্চ সন্ধ্যায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী আর সর্বস্তরের নারী পুরুষের মশাল মিছিলে যোগ দেন সুফিয়া কামাল। ২৫ মার্চ আইয়ুব খান (১৯০৭-১৯৭৪) সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় গ্রহণ করেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নতুন এক সামরিক শাসনের স্বীকার হয়। এ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে নারীরাও সক্রিয় ছিল। ১৯৬৯ সালের ৭ ডিসেম্বর পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীরা সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। এ সময় গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হবার জন্য ১৮ জন নারী সকল বিরোধী দলের প্রতি আহবান জানান। সুফিয়া কামাল আহবানকারীদের অন্যতম একজন ছিলেন।[৭৩] বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ছাত্র

সংগঠনের সচেতন নারীরা তার নেতৃত্বে সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম পরিষদের নারী আন্দোলনের কাজ অব্যাহতভাবে চলার পর সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় কাজ করার লক্ষ্যে ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে মালেকা বেগমকে (১৯৪৪–) সাধারণ সম্পাদক করে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ'।[৭৪] এই সংগঠনের উদ্যোগে দেশে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা ও মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে গণভোটে সরাসরি নির্বাচন করা, রাজবন্দিদের মুক্তি, মহিলা শ্রমিকদের সমমজুরি, পর্যাপ্ত সংখ্যায় মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা, শিশু হাসপাতাল স্থাপন, খাদ্যে ভেজাল বন্ধ করা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানো ও নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিসহ নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তোলা হয়েছিল। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাসের পর সুফিয়া কামাল ও ড. সুলতানা জামানের (১৯৩২-২০২০) উদ্যোগে মহিলা পরিষদ ও অন্যান্য মহিলা সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা করে।[৭৫]

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে গ্রাম বাংলার নারী সমাজ অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল। *সুফিয়া কামাল স্মারক গ্রন্থে* মালেকা খান ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সুফিয়া কামালের সমর্থনের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন,

> "৭০-এর নির্বাচনে তিনি আমাদের শিখিয়ে দিলেন বাঙালির প্রতীক নৌকা। নৌকাতে ভোট দিলেই বাঙালি জিতবে। এই অতি সহজ কথা স্মরণ রাখতে পরামর্শ দিলেন। নৌকাতে ভোট দেয়ার জন্য অতি সাদাসিধা আবেদন ছিল তার।"[৭৬]

পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভোটের রায় মেনে না নেওয়ায় শুরু হয় গণআন্দোলন। এ সময় সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে মহিলা পরিষদ সারা দেশের মহিলাদের সংগঠিত করে সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান।[৭৭] মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে সুফিয়া কামাল আঞ্চলিকভাবে মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজকে আহবান করেন এবং সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। ১৯৭০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের এক বর্ধিত সভায় সুফিয়া কামাল সভানেত্রী হিসেবে দেশের গণ-সংগ্রামের আলোচনাকালে গণ-সংগ্রামে নারীসমাজকে যুক্ত হওয়ার আহবান জানান এবং এ সংগ্রামের সাথে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের সংহতি প্রকাশ করার ঘোষণা দেন।[৭৮] ১৯৭০ সালের ৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভানেত্রীর বক্তৃতায় সুফিয়া কামাল দেশের সংগ্রামের বিষয়ে উল্লেখ করেন যে, প্রত্যেক পরিবারের স্বামী, ছেলে, ভাই, বোনেরা মুক্তির সংগ্রামে যুক্ত আছেন। দেশের মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও নারী সমাজের প্রতি দমন নীতি চালানো হচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে তিনি নারী সমাজকে সর্বাত্মকভাবে আন্দোলনে সহযোগিতা করার কথা বলেন এবং ৭ মার্চ সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিতব্য জনসভায় সকলকে যোগ দেওয়ার আহবান জানান।[৭৯] ১৯৭১ সালের ২০ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে স্থানীয় জে এম সেন হলে অনুষ্ঠিত মহিলা সমাবেশে ভাষণদানকালে পরিষদের সভানেত্রী ও প্রধান অতিথি হিসেবে সুফিয়া কামাল ঘোষণা করেন,

"আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করছি, এই সংগ্রাম আমরা চালাব এবং স্বাধীন বাংলাদেশ অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। বর্তমান সংগ্রামে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মহিলাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য সভা-শোভাযাত্রা করাই যথেষ্ঠ নয়, সেজন্য সাহস, মানসিক প্রস্তুতি এবং প্রেরণা থাকা প্রয়োজন।"[৮০]

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ থেকে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলের (ধানমন্ডি, হাজারিবাগ, গুলবাগ, আজিমপুর, সেন্ট্রাল রোড, নয়া পল্টন, জিগাতলা, রায়ের বাজার, পলাশী, সেগুন বাগিচা) সকল শ্রেণির মহিলা সমাজ সংগঠিত হয়ে কুচকাওয়াজ, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ নিয়ে ২৩ মার্চ বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত মহিলা সমাবেশে সমবেত হয়ে এদিন তারা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করে। বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে সমাবেশে মহিলা পরিষদের সম্পাদিকা মালেকা বেগম শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।[৮১] এসময় তিনি নারী জাতিকে সকল বাঁধা পেরিয়ে বৃহত্তর সংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং ট্রেনিং গ্রহণের আহবান জানান।[৮২] মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সুফিয়া কামাল ঢাকার বাইরে নারায়নগঞ্জ, বরিশাল, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর, সিলেট, দিনাজপুর, বগুড়া, কুমিল্লা, চট্রগ্রামসহ প্রায় সব জেলায় পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনের শাখা স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবীণ ও নবীন নারী নেতৃবৃন্দের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার পরিবেশ গড়ে তোলেন। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সর্বজনীন আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধের সময় সুফিয়া কামাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে মহিলাদেরকে গণআন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য সংগঠিত ও সচেতন করতে পেরেছিলেন। এ ক্ষেত্রে সুফিয়া কামাল একজন উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক নেতৃত্ব হিসেবে মূল্যায়নযোগ্য।[৮৩]

সুফিয়া কামালের সংগঠিত আঞ্চলিক কর্মকাণ্ডের ফলে মহিলারা শহরে শহরে সমাবেশ করে লাঠি হাতে কুচকাওয়াজ করে এবং স্বামী সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য প্রেরণা দেয়।[৮৪] ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পাক হানাদার বাহিনী সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের (১৯২০-১৯৭৫) নেতৃত্বে স্বাধীনতার লক্ষ্যে অসহযোগ আন্দোলন তথা সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধে গ্রাম বাংলার লাখ লাখ পরিবারের নারীরা অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়। সুফিয়া কামাল মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় তার ঢাকার ধানমণ্ডির বাসায় অবস্থান করেন। তার বাড়ি এবং তার গতিবিধির ওপর পাক বাহিনীর কড়া নজর ছিল। তার বাসা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তথ্য আদান-প্রদানের 'অঘোষিত কেন্দ্র' হিসেবে পরিচিত ছিল। শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৭-১৯৭১) তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। ভারতে গমনের পূর্বে সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে সুলতানা কামাল এবং সাঈদা কামালও ঢাকা শহরে বিভিন্ন ধরণের তথ্য সরবরাহের কাজ করতেন।[৮৫] সুফিয়া কামাল তার বাসায় অবরুদ্ধ থেকেও মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করতেন।[৮৬] ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে ঢাকায় প্রতিরোধের ভিত্তিগুলো গড়ে উঠতে থাকে। অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন (১৯৩৩-১৯৭১), অধ্যাপক জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬), অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬-২০২০), অধ্যাপক মুনতাসির মামুন (১৯৫১-) প্রমুখের চেষ্টায় মুক্তিযোদ্ধাদের এবং শহীদ পরিবারের সাহায্য করার জন্য একটি গ্রুপ তৈরি হয়।[৮৭] এ গ্রুপকে সুফিয়া কামাল বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন। তার (ঢাকার ধানমন্ডি) এলাকায় যারা অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন তারা তাদের রেশন

কার্ডগুলো সুফিয়া কামালকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সুফিয়া কামাল সেসব কার্ড দিয়ে চাল আটা তেল তুলে রাখতেন। অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদ প্রায় সময় রিকশাওয়ালার বেশে পেছন দেয়াল দিয়ে টপকে লোকচক্ষু এড়িয়ে সেইসব খাদ্য মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিয়ে যেতেন।[৮৮] এসময় সুফিয়া কামালের জীবন সংশয় বিষয়ে খবর বিদেশের প্রচার মাধ্যমে (আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত *হেরাল্ড ট্রিবিউন* পত্রিকা, আকাশবাণী কলকাতা) প্রচারিত হয়েছিল। পাকিস্তানি সামরিক সরকার নিজেদের সংকট বুঝে ১৯৭১ সালের ৩ মে সুফিয়া কামালকে বাধ্য করেছিল ঢাকা বেতার থেকে নিজ মুখে বলতে যে, সুফিয়া কামাল বেঁচে আছেন।[৮৯] সুফিয়া কামাল এসময় সোভিয়েত-পাকিস্তান মৈত্রী সমিতির চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে তৎকালীন রাষ্ট্রদূত জনাব নবিকভ সুফিয়া কামালকে বিশেষ বিমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।[৯০] মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে তিনিই মূলত মহিলাদের নিয়ে সমাবেশ করতেন এবং মিছিলের নেতৃত্ব প্রদান করতেন।[৯১] বাংলাদেশের মেয়েরা কলকাতার গোবরা ক্যাম্পে আওয়ামী লীগ নেত্রী সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছিলেন।[৯২] অসংখ্য মেয়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে ও হাসপাতালে চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার মহান কাজ করেছেন। এদের মধ্যে সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে সুলতানা কামাল (১৯৫০-) ও সাঈদা কামাল (১৯৫২-) অন্যতম ছিলেন। তদানিন্তন সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের (১৯৩৭-১৯৭৫) উদ্যোগে দিল্লী থেকে হাসপাতালের জন্য একটি তহবিল অনুমোদিত হয় এবং বিশ্রামগঞ্জে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ হাসপাতালে বেগম সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে এক সাথে নার্স হিসেবে কাজ শুরু করেন। তাদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক নার্সিং প্রশিক্ষণ ছিল না তবুও অদম্য ইচ্ছা শক্তি ও সাহস নিয়ে কাজ চালিয়ে গেছেন।[৯৩] মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের নারী সমাজের সঙ্গে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সকল সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়াও ইউরোপ, আমেরিকা, ব্রিটেনের নারী সমাজের সঙ্গে সংহতিমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।[৯৪] ঢাকাস্থ বিদেশী মিশনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা বেগম সুফিয়া কামালের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। সুফিয়া কামালও দায়িত্বপ্রাপ্ত শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র পৌঁছে দিতেন।[৯৫] এই সূত্রেই বাংলাদেশের মহিলা পরিষদ পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক মহিলা ফেডারেশনের সদস্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকার শহীদ মিনারে সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।[৯৬]

স্বাধীনতার পরেও সুফিয়া কামাল বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। বংলাদেশ মহিলা পুনর্বাসন বোর্ড (১৯৭২), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (১৯৭৩) ও দুঃস্থ পুনর্বাসন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।[৯৭] দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই যুদ্ধাহত মহিলাদের পুনর্বাসনে দিনরাত পরিশ্রম করতে থাকেন। সরকারি-বেসরকারি সকল সংগঠন ও ব্যক্তির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে এ কাজে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেন। আশ্রয়হীন, পরিচয়হীন মহিলাদের পুনর্বাসনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারি কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে তদানীন্তন সাংসদ বেগম বদরুন্নেসা আহমদের সহযোগিতায় যাত্রা শুরু করে। এ সংস্থার তত্ত্বাবধায়নে অসংখ্য যুদ্ধাহত নারীকে পুনর্বাসন করা হয়। ৭ জানুয়ারিতেই তদানীন্তন ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী জনাব এ.এইচ.এম

কামরুজ্জামানের (১৯২৬-১৯৭৫) দপ্তরে তার সভাপতিত্বে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে গঠিত সংস্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ মহিলাদের পুনর্বাসনের কাজ করার জন্য সরকারের পক্ষে সমাজকল্যাণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় থেকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বারো সদস্যের কমিটিতে সুফিয়া কামালকে সভাপতি করা হয়।[৯৮] তাছাড়া ছায়ানটসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। সুফিয়া কামাল ছিলেন মানবতাবাদী ও আসাম্প্রদায়িক ব্যাক্তিত্ব। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি সবসময় নেতৃত্বে ছিলেন। এদেশের অবহেলিত নির্যাতিত, শোষিত নারী সমাজকে বদ্ধতার শিকল ভেঙ্গে প্রগতির পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সুফিয়া কামাল সমাজে মুক্তচিন্তা প্রসারের জন্য, সমাজের অন্ধ কুসংস্কার, প্রচলিত ধ্যান ধারণা ও কূপমণ্ডুকতা দূর করে উদার ও যুক্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তার জীবনের সর্বাংশ ব্যয় করেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বপরিবারে বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর আবার প্রতিবাদীরূপে ফিরে আসেন চিরপ্রতিবাদী নারী সুফিয়া কামাল। ১৯৮৮ সালে তিনি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সময় জাতির চরম সংকটময় মুহূর্তে তার সাহসী পদক্ষেপ প্রগতিশীল আন্দোলনকে সোচ্চার রেখেছিল। ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের সময় কারফিউ এর মধ্যেও তিনি মৌন মিছিলে নেতৃত্ব দেন। আমৃত্যু তিনি লড়েছেন প্রগতিশীল রাজনীতির বিশ্বাসের চেতনায়।[৯৯] আবার সাহিত্য সাধনায় অনন্য কবিত্বের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে অন্যন্য অবদানের জন্য সুফিয়া কামাল অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। তিনি দেশি-বিদেশী পঞ্চাশটির অধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), লেখিকা পুরস্কার (১৯৭০), একুশে পদক (১৯৭৬), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৭৭) এবং নারী শিক্ষা, নারী অধিকার ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ অবদান রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় সম্মাননা বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬) লাভ করেন।[১০০] বাংলার নারী জাগরণ ও আন্দোলনের মহান নেত্রী সুফিয়া কামাল ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর ৮৯ বছর বয়সে ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলাদেশী নারীদের মধ্যে তাকেই প্রথম পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

প্রান্তটীকা

১. সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনা পরিষদ, *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪৯-৫১। ফরিদা আখতার (সম্পা.), *শত বছরে বাংলাদেশের নারী*, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৬। মেহেরুন্নেসা মেরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা*, *১ম খণ্ড*, ন্যাশনাল পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৩৫

২. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পা.), *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৪১

৩. সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ, *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭।
অশ্বিনী কুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) আধুনিক বরিশালের নির্মাতা। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ভারত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন। সাধনা, নিষ্ঠা, মানবপ্রেম ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি ছিলেন একজন পথ প্রদর্শক। অশ্বিনী কুমার দত্ত ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি বরিশাল জেলার পটুয়াখালী মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৬ জানুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ৮

৪. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৭। *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭

৫. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২

৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪০-৩৪২

৭. *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০-৭১

৮. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

৯. *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭২

১০. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১১২। *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭২

১১. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

১২. *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭২-৭৪

১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৬-৪৩৭
নিবেদিতা নাগ (১৯১৮-২০১৩) নারায়ণগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলজীবন থেকেই বামপন্থি রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি ঢাকা জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন। এসময় কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে কাজ করতে গিয়ে আশালতা সেন, লীলা নাগ, মণিকুন্তলা, যুঁইফুল রাই ও সুফিয়া কামালের সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়। ১৯৪৩ সালে কমরেড নেপাল নাগকে বিবাহ করেন এবং স্বামীর সঙ্গে দলীয় কর্মকাণ্ডে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪৮ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাছাড়া ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্ব থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সার্বক্ষণিক সদস্য হিসেবে ভাষা আন্দোলনের পোস্টার, আন্দোলনের ইশতেহার বিলি করা, মিছিল করা প্রভৃতি কাজে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ভারতে অবস্থান করায় সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে না পারলেও কলকাতায় নিবেদিতা নাগের বাড়ি বাংলাদেশের বামপন্থি মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার হত। লেখক হিসেবেও নিবেদিতা নাগের লেখা কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ হতো। শাহানা পারভীন লাভলী, *বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে নারী*, শামস পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০২২, পৃ. ১৫১-১৫৬

১৪. *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৬-৪৩৭। মালেকা বেগম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৪১।
১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। যখন বিশ্বে উপনিবেশবাদ বিলুপ্তির পথে এমন সময় পশ্চিম পাকিস্তানে উপনিবেশবাদ (Decolonizaiton) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঔপনিবেশিক শাসন পূর্বসূরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষা বেশি ধারালো ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে নয়া ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ধারা ছিল মূলত আধুনিক ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ধারা যেখানে দেশীয় শিল্পকে ধ্বংস, পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা, শিল্পের বাজার রক্ষার ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট নীতি, পশ্চিম পাকিস্তানে বৈদেশিক মুদ্রার একচেটিয়া ব্যবহার ইত্যাদি অর্থনৈতিক শোষণমূলক বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত ছিল। D.R. Mankekar, *Pak Colonialism in East Bengal*, Somaiya Publications, New Delhi, 1971, p. 16-18

১৫. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১২৪

১৬. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২-৩৪৩

১৭. **শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪)** ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তি আন্দোলনে একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসন সংস্কার আইন প্রণয়ন করার পর নারীদের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের কলকাতা শাখার পক্ষ থেকে ভোটাধিকার আন্দোলন শুরু করলে মেয়েদের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৩৯ সালে তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ১৯৩৯ সালে লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং শামসুন নাহার মাহমুদকে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। ১৯৪৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের পত্নী অল পাকিস্তান উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন (আপওয়া) প্রতিষ্ঠা করলে এ সংগঠনের পূর্ব পাকিস্তান শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন শামসুন নাহার মাহমুদ। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট

হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। দেশভাগের পর বেগম ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এর সভানেত্রী মনোনীত হন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক সংস্থা, সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০-৩৬

১৮. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২-৩৪৩

১৯. Tathagata Roy, *My People Uprooted*, Ratna Prakashan, Kolkata, 2002, p. 363

২০. Kali Prasad Mukhopadhyay, *Partition, Bengal and After: The Great Tragedy of India*, New Delhi, Reference Press, 2007, p. 30

২১. A. J. Kamra, *Prolonged Partition and its Pogroms: Testimonies on Violence against Hindus in East Bengal 1946-64*, Voice of India, New Delhi, 2000, p. 74-75

২২. https://bn.m.wikipedia.org>wiki

২৩. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০। *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০। সোনিয়া নিশাত আমিন (সম্পা.), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২০৪

২৪. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮

২৫. বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৩০৩-৪৩৭

২৬. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১। বেগম কাজী মোতাহের হোসেন একজন ভাষা আন্দোলনকর্মী। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলে গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে সুফিয়া কামালের সাথে প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

২৭. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

২৮. মালেকা বেগম কর্তৃক গৃহীত কবি সুফিয়া কামালের সাক্ষাৎকার, জুন ১৯৮৭, উদ্ধৃত মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২

২৯. *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪

৩০. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৩

৩১. *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫

৩২. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২-৩৩

৩৩. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

৩৪. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩

৩৫. খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১৪৫-১৪৬

৩৬. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯-৪০

৩৭. *পাকিস্তান অবজারভার*, ঢাকা, ২৩-২৮ জুন ১৯৬৭। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৫ জুন ১৯৬৭

৩৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৫ জুন ১৯৬৭। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদাতাগণ ছিলেন- বেগম সুফিয়া কামাল, ড. নীলিমা ইব্রাহীম (১৯২১-২০০২), ড. মুহম্মদ কুদরত-ই-খোদা (১৯০০-১৯৭৭), ড. কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), শিল্পী জয়নুল আবেদীন (১৯১৪-১৯৭৬), এম.এ. বারী, অধাপক মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯), অধাপক মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), ড. খান সরওয়ার মুরশিদ (১৯২৪-২০১২), কবি সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫), অধাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-১৯৭১), ড. আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯), কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), কবি হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), কবি ফজল শাহাবুদ্দিন (১৯৩৬-২০১৪), ড. আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-২০২০), অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম (১৯৩৪-২০২১), ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

৩৯. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৭৫

৪০. মতিয়া চৌধুরী ও বজলুর রহমানের সাক্ষাৎকার, ১৯৮৯ উদ্ধৃত, মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০

৪১. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

৪২. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০-১৫১।

৪৩. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫। *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ২৩ এপ্রিল ১৯৬১

৪৪. *বেগম পত্রিকা*, ঢাকা, ১৯৫৩ উদ্ধৃত মালেকা বেগম (সম্পা.), *রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬

৪৫. *বেগম পত্রিকা*, ঢাকা, ১৯৬০ উদ্ধৃত মালেকা বেগম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮

৪৬. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৪

৪৭. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮

৪৮. *সাপ্তাহিক বেগম*, ঢাকা, ১২ অক্টোবর ১৯৬৩

৪৯. *দি পাকিস্তান অবজারভার*, ঢাকা, ১২-১৫ জুলাই ১৯৬২

৫০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৬ আগস্ট ১৯৬২। ঢাকার আটজন বিশিষ্ট মহিলা (বেগম রোকেয়া আনোয়ার, বেগম সুফিয়া কামাল, বেগম হাজেরা মাহমুদ, বেগম নূরজাহান মুরশিদ, আমিনা বেগম, বেগম কামরুন্নাহার লাইলী, বেগম আয়শা হারুন

এবং বেগম বদরুন্নেসা আহমদ) দেশের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান। সাংবাদিকদের নিকট প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে তারা বলেছেন যে, "শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবিত সংস্কারে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বজনীন না করে সীমাবদ্ধ রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।" *বেগম*, ঢাকা, ১৯৬২

৫১. **অধ্যাপক সন্‌জিদা খাতুন (১৯৩৩–)** বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম এক ব্যক্তিত্ব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকা কালে তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানটে'র (১৯৬১) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার পক্ষ্যে দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা ৪ এপ্রিল ২০২২। জেবউননেছা (সম্পা.), *আলোকিত নারীদের স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ*, প্রান্ত প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৩৮-১৩৯

রোকেয়া রহমান (১৯২৫-২০০০) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের ফরিদপুরে। ১৯৫৯ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি ভারতে মুসলিম রাজনীতি নিয়ে গবেষণা করেন। নারী আন্দোলন কর্মীদের সাথে তার সবসময় যোগাযোগ ছিল। সাঈদা জামান, *বাংলাদেশের নারী চরিতাভিধান*, দি রয়েল পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২২২

৫২. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬-১১৮

৫৩. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩-১৫৪

৫৪. মালেকা বেগম কর্তৃক গৃহীত কবি সুফিয়া কামালের সাক্ষাৎকার, জুন ১৯৮৭, উদ্ধৃত মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩-১৫৪

৫৫. মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪

তুবা খানম (১৯৩৪-) সাতক্ষীরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতায় বসবাসকালীন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে তিনি সেবিকা পেশা গ্রহণে মনস্থির করেন। ১৯৪৯ সালে নার্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য লন্ডনে গমন করেন। ১৯৫২ সালে দেশে এসে 'ম্যাটারর্নিটি সেন্টার ও চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টার' হাসপাতালে যোগদান করেন। এ সময় তিনি মহিলা সংগঠনের (গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি, ওয়ারি মহিলা সমিতি, শিশু রক্ষা সমিতি) সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং নারী নেত্রীদের সাথে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করেন। ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০-১২৩

৫৬. *সাপ্তাহিক বেগম*, ঢাকা, ১২ অক্টোবর ১৯৬৪

৫৭. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫৫

৫৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬-১৫৫

৫৯. *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬

৬০. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫

৬১. *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬

৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭

৬৩. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯

৬৪. রোকেয়া কবীর, মুজিব মেহদী, *মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৬২

৬৫. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯

৬৬. সুপা সাদিয়া, *'৭১ এর একাত্তর নারী*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৪৫

৬৭. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি ১৯৬৯

৬৮. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

৬৯. *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

৭০. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫

৭১. মোহীত উল আলম, আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেনের সম্পাদনায়, *মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা* ১৯৭১, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৮১

৭২. *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে গঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের ৮ এপ্রিল সুফিয়া কামালের উদ্যোগে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সকল সদস্য সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে ঢাকা শহরে অবরুদ্ধ বাঙালি নারীদের ওপর পাকিস্তানি সেনা ও অফিসারদের পাশবিক নির্যাতনের বিভিন্ন আলোকচিত্র ও বিবরণের নিদর্শন হিসেবে '*To the Conscience of People*' নামে মহিলা পরিষদ একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। তদানুসারে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ সংগঠনের পরিবর্তিত নাম হয় 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ'। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কর্মধারা পরিচালনার মূলনীতি হচ্ছে নারী সমাজের উন্নয়ন, মুক্তি ও দেশের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে একাত্মতা। এই সংগঠনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে: নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠা, নীতি নির্ধারণে নারীর সমতা ও উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানে মধ্যস্থতা করা এবং লবিং করা ও অ্যাডভোকেসি এজেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া। নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *বাংলাপিডিয়া*

৭৩. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, *মুক্তিমঞ্চে নারী*, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৩

৭৪. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০-১৬১। *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭। রোকেয়া কবীর, মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

৭৫. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পা.), *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, *১ম খণ্ড*, বাংলাদেশ নারী প্রগতিসংঘ, ঢাকা, পৃ. ১৭৪, পৃ. ২৪৪।

সুলতানা সারওয়াত আরা জামান (১৯৩২-২০২০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে ১৯৭৫ সালে যোগদান করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়া তিনি আজীবন মানবকল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে রোকেয়া পদকে ভূষিত করেন। https://bn.wikipedia.org/wiki/সুলতানা সারওয়াত আরা জামান

৭৬. *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১

৭৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৭ মার্চ ১৯৬৯। রোকেয়া কবীর, মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

৭৮. মালেকা বেগম (সম্পা.), *রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

৭৯. *বেগম পত্রিকা*, ঢাকা, ৭ মার্চ ১৯৭০ উদ্ধৃত মালেকা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

৮০. বেগম মুশতারী শাফী, *স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন* উদ্ধৃত মালেকা বেগম সম্পাদিত, *রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

৮১. মালেকা বেগম (সম্পা.), *রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

৮২. আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিনগুলি ঃ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৫৭

৮৩. মালেকা বেগম, *একাত্তরের নারী*, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০০১, পৃ. ৪১-৪২

৮৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৭ মার্চ ১৯৬৯

৮৫. রোকেয়া কবীর, মুজিব মেহদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০-১৫১

৮৬. সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরি*, জ্ঞান প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৭৭-৮০

৮৭. **অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন (১৯৩৩-১৯৭১)** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক হিসেবে ১৯৫৮ সালে যোগদান করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য না হলেও জাতীয় ইস্যুতে সবসময় সোচ্চার ছিলেন। তিনি আহত মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসাসহ সামগ্রিক সহযোগিতার জন্য গোপনে অর্থ সংগ্রহ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সামগ্রি দিয়ে সহযোগিতা করতেন। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মহসীন হলে আবাসিক শিক্ষক ভবন থেকে স্বাধীনতা বিরোধী সদস্যরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। আবদুল মমিন চৌধুরী, *বাংলাপিডিয়া*

অধ্যাপক জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬) পেশায় একজন চিত্রশিল্পী। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের (১৯৪৮) প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার আগ্রহ ও পরিকল্পনায় ১৯৭৫ সালে সোনারগাঁও এ লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা পায়। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*

অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬-২০২০) চাঁদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদানের মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু করেন। সাহিত্যিক হিসেবে বাল্যকাল থেকেই তার সুপরিচিতি তৈরি হয়। *যায়যায়দিন*, ঢাকা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১

অধ্যাপক মুনতাসির মামুন (১৯৫১-) জন্ম ঢাকায় কিন্তু তার পৈতৃক নিবাস চাঁদপুর জেলায়। ছাত্রজীবনে জড়িত ছিলেন ছাত্র আন্দোলনে এবং ১৯৬৯ সাল থেকে বর্তমান সময় অংশগ্রহণ করেছেন ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও গণআন্দোলনে। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত আছেন। তিনি একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। মুনতাসির মামুনের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২২০। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ*, *প্রথম খণ্ড*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, লেখক পরিচিতি অংশ।

৮৮. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯

৮৯. সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭-৮০

৯০. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪১

৯১. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

৯২. সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২-১১০

৯৩. জেবউননেছা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০-১৪১

৯৪. সুফিয়া কামাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০৭

৯৫. মোহীত উল আলম, আবু মো. দেলোয়ার হোসেনের সম্পাদনায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬

৯৬. সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০৭

৯৭. **বাংলাদেশ মহিলা পুনর্বাসন বোর্ড ১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতনের স্বীকার বীরাঙ্গনা নারীদের সামগ্রিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে গঠন করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সংস্থাটির নাম পরিবর্তন করে 'জাতীয় মহিলা সংস্থা' নামকরণ করা হয়। বর্তমানে এটি নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংস্থা। *The Daily Star*, Dhaka, 10 December 2014

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা : ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে কুমিল্লা মডেলের দ্বি-স্তর সমবায় কাঠামোকে জাতীয় পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' (আই আর ডি পি) কে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা' নামে সরকারি উন্নয়ন সংস্থায় পরিণত করা হয়। দশ মাস এ নামে কার্যক্রম চালানোর পর আবার এ সংস্থাকে পূর্বের নামে নামকরণ করা হয়। http://www.brdb.gov.bd/ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা

দুঃস্থ পুনর্বাসন সংস্থা : মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অসহায় দুঃস্থ মানুষের সামগ্রিক সহযোগিতা ও পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সালে 'দুঃস্থ পুনর্বাসন সংস্থা' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮-৪৯

৯৮. *সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮-৪৯

৯৯. সুপা সাদিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৬

১০০. ফরিদা আখতার (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

ষষ্ঠ অধ্যায় : অন্যান্য অঞ্চল (রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম)

রাজশাহী অঞ্চল

আবু নছর মোহাম্মদ গাজিউল হক (১৯২৯-২০০৯) নোয়াখালি জেলায় জন্মগ্রহণ করলেও বগুড়াতে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। স্কুলজীবন থেকেই প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগ বগুড়া জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক হন এবং এ বছরই 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ' কুষ্টিয়া জেলা শাখার সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পরিচয় হয়। ১৯৪৮ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের বগুড়া জেলা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে প্রতিবাদ মিছিলে তিনি নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাছাড়া ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং এ সভা থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থানে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১] পরবর্তীতে তিনি আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা এবং ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। লেখালেখিতেও গাজিউল হকের সমান দক্ষতা ছিল। ২০০০ সালে গাজীউল হককে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। ২০০৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪ তম সমাবর্তন-এ তাকে সম্মান সূচক 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি প্রদান করা হয়।[২]

আবদুল মতিন (১৯২৬-২০১৪) সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনার চরস্থ উমরপুর ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালে তার নেতৃত্বের গুণাবলী প্রকাশিত হয় এবং এরই প্রেক্ষাপটে ১৯৫০ সালে গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক মনোনীত হয়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন। ভাষা আন্দোলনে অসামান্য অবদানের জন্য 'ভাষা মতিন' হিসেবে সর্বজন পরিচিত ছিলেন।[৩] ১৯৫৪ সালে পাবনা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক মনোনীত হন। মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালে ন্যাপ গঠন করলে তিনি এ দলে যোগদান করেন।[৪] পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে অন্যান্য বাম নেতৃত্বের সঙ্গে সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯৯২ সালে গঠিত 'বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি' গঠনে সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং ২০০৯ সালে হায়দার আকবর খান রনোর নেতৃত্বে এ দল পুনর্গঠিত হলে তিনি এ দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন।[৫] ২০০১ সালে তিনি একুশে পদকে ভূষিত হন।[৬]

হাজী মোহাম্মদ দানেশ (১৯০০-১৯৮৬) দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গীভূত সংগঠন কৃষক সংগঠন কৃষক সমিতির সাথে যুক্ত হন। উত্তরবঙ্গে কৃষক আন্দোলন সংগঠনসহ 'তেভাগা আন্দোলনে' (১৯৪৩) নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি ১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন কিন্তু তেভাগা আন্দোলনে সংশ্লিষ্টতার কারণে তাকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়। হাজী দানেশ ১৯৫২ সালে গণতন্ত্রী দল নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তার দল যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে যোগ দেয় এবং তিনি নিজে দিনাজপুর থেকে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালে তার দল বিলুপ্ত করে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'তে (ন্যাপ) যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে ন্যাপের পূর্ব পাকিস্তান শাখার

সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৬৫ সালে এ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে ন্যাপ থেকে পদত্যাগ করেন এবং মুজিবনগরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতে শুরু করেন। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক পার্টি'তে (বাকশাল) যোগদান করেন। ১৯৮০ সালে 'গণতান্ত্রিক পার্টি' নামে নতুন দল গঠন করেন। ১৯৮৬ সালে তার এ দলসহ তিনি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের 'জাতীয় পার্টি'র সাথে একীভূত হন। তবে হাজী দানেশ তেভাগা আন্দোলনের নেতা হিসেবেই অধিক পরিচিত।[৭]

আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৮৬) ১৯০০ সালের ২৭ নভেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন এবং লাহোরস্থ এরশাদ ইসলামী কলেজে তর্কবাগীশ উপাধী লাভ করেন। আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ১৯৩৬ সালে মুসলীম লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে সিরাজগঞ্জ আসন থেকে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় মুসলিম লীগ ত্যাগ করে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়েই আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদ এবং ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫৭-১৯৬৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আওয়ামী লীগের ক্রান্তিকালীন সময়ে তিনি সভাপতি হিসেবে যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু উত্থাপিত ছয়দফা নিয়ে আওয়ামী লীগ দ্বিখণ্ডিত হলে (ছয় দফা পন্থি ও পি ডি এম পন্থি) পি ডি এম পন্থি (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান শাখা সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় পুন:রায় আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৬ সালে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ গণআজাদী লীগ গঠন করেন। ১৯৮৩ সালের ৩০ জানুয়ারি তার সভাপতিত্বে এরশাদ বিরোধী ১৫ দলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়। ১৯৮৬ সালে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ইন্তেকাল করেন।[৮]

খয়রাত হোসেন (১৯১১-১৯৭২) নীলফামারী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর ছিলেন। ১৯৪৬ সালে রংপুর জেলা থেকে মুসলিম লীগের মনোনয়নে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আসামে বাঙালি উচ্ছেদ বন্ধের আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রেফতার হন। খয়রাত হোসেন পাকিস্তান আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানে নেতা বাছাই করার জন্য কেন্দ্রীয় লীগ নির্বাচনের আয়োজন করেন। এ সময় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে কাজ করেন। তাছাড়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ভেঙ্গে দিয়ে 'এডহক' কমিটি গঠন করা হলে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একশত বারো জন কাউন্সিল সদস্যের দস্তখতে একটা রিক্যুইজিশন সভা আহবানের দাবি করা হয়। এ কাউন্সিল সদস্যের মধ্যে খয়রাত হোসেন ছিলেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত ১৫০ নম্বর মোগলটুলীর কর্মী সম্মেলনে খয়রাত হোসেন উপস্থিত ছিলেন। এ সম্মেলনে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে খয়রাত হোসেন, বেগম আনোয়ারা খাতুন, আলী আহমদ খান ও হাবিবুর রহমান চৌধুরী ওরফে ধনু মিয়া উপস্থিত থেকে

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে একমত হন। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর সরকারের দমন নিপীড়নে অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতা পদত্যাগ করলেও এসময় খয়রাত হোসেন আওয়ামী মুসলিম লীগের পক্ষেই ছিলেন। ১৯৫০ সালে তার উদ্যোগে নীলফামারী মহকুমায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা দবীর উদ্দীনের নেতৃত্বে মহকুমা আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নাজিমুদ্দিন সরকারের গণবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালে মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। ভাষা আন্দোলনের সময় মুসলিম লীগ সরকার আন্দোলনকারীদের গণগ্রেফতার ও নানাভাবে অত্যাচার শুরু করলে অন্যান্য নেতৃত্বের সাথে খয়রাত হোসেন মুসলিম লীগ দলের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে প্রতিবাদ শুরু করেন। ১৯৫২ সালে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি আইন পরিষদে ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের ওপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে 'ওয়াক আউট' করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার প্রতিবাদে পুলিশ ভাষা আন্দোলনকারীদের মিছিলের উপর গুলি বর্ষণ করে এবং গণগ্রেফতার শুরু করে। খয়রাত হোসেন এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে গ্রেফতার হন। এসময় শেখ মুজিবুর রহমান খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তির দাবির বিষয়ে কথা বলার জন্য দেখা করেন।[৯] ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে এবং নির্বাচন পরবর্তীকালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের নেতা নির্বাচনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া খয়রাত হোসেন নিজে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ আইনসভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে গঠিত কোয়ালিশন সরকারের কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও পশু পালন মন্ত্রী হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালে এন ডি এফ গঠিত হলে তিনি এর সদস্য হন এবং ১৯৬৬ সালে সম্পাদক নিযুক্ত হন। আজীবন তিনি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।[১০] ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় অবস্থান নেন এবং অত্র অঞ্চলের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃত্বের সাথে যৌথভাবে 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। তিনি ১৯৭২ সালে ইন্তেকাল করেন।[১১]

প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী (১৮৯৩-১৯৭৪) রাজশাহী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রাবস্থায়ই স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি 'অনুশীলন সমিতি'র সদস্য হিসেবে উত্তরবঙ্গে সংগঠক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় গ্রেফতার হন। ১৯৪৬ সালে পূর্ববঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। পূর্ববঙ্গ মন্ত্রিসভায় তিনি দুইবার জেল ও অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ভারতের কলকাতায় বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।[১২]

বেগম আজিজা ইদ্রিস ১৯২৬ সালে ঠাকুরগাঁও জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিসের সাথে বিবাহের পর তিনি ভারতের জলপাইগুড়িতে বসবাস শুরু করেন কিন্তু দেশভাগের পর তিনি রংপুরে চলে আসেন। ১৯৫১ সাল থেকে আজিজা ইদ্রিস ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। ভারতে থাকাবস্থায় তিনি ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের বিভিন্ন রকম সাহায্য সহযোগিতা করেন। স্বামীর অনুপ্রেরণায় তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে অনুষ্ঠিত 'কাগমারী সম্মেলনে' তার স্বামী সাংস্কৃতিক উপ-পরিষদের

আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় তিনিও এ সম্মেলনের সাথে যুক্ত হন। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (ন্যাপ) গঠিত হলে আজিজা ইদ্রিস ঢাকা মহানগর কমিটির কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এভাবেই শুরু হয় তার প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবন। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে প্রতিটা বাড়িতে গিয়ে প্রার্থী আনোয়ারা খাতুনের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণার কাজ করেন। ১৯৬৬ সালের 'ছয় দফা আন্দোলনে' সহযোগিতা করেন। তাছাড়া সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিটি আন্দোলনে মহিলা নেত্রীদের সাথে ছিলেন। বিশেষ করে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবসময় সরব ছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের তার বাড়ীতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধেও সংগঠক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯২-১৯৯৪ সাল পর্যন্ত শহীদ জননী জাহানারা ইমামের আন্দোলনে সহযোগী হিসেবে ছিলেন। আজিজা ইদ্রিস সাহিত্য রচনায়ও পারদর্শী ছিলেন। আজিজা ইদ্রিস দেশ ও জাতির কল্যাণে আজীবন সংগ্রাম করেছেন।[১৩]

এম মনসুর আলী (১৯১৯-১৯৭৫) ১৯১৯ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পাবনা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তৎকালীন মুসলিম লীগের গার্ড বাহিনীর পাবনা জেলা শাখার ক্যাপ্টেন ছিলেন বিধায় তিনি ক্যাপ্টেন মনসুর আলী নামে পরিচিত হন। মুসলিম লীগ ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ১৯৫১ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে' যোগদান করেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে আওয়ামী লীগের রাজনীতি শুরু করেন এবং আমৃত্যু এ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। আতাউর রহমান খানের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় পর্যায়ক্রমে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী, খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী, বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের পর্যায়ক্রমে অর্থ, শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া এম মনসুর আলী যোগাযোগ মন্ত্রী (১৯৭২-৭৪) এবং স্বরাষ্ট্র ও যোগাযোগ মন্ত্রী (১৯৭৪-৭৫) হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর জেলে বন্দি অবস্থায় সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্য কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।[১৪]

আবদুল মোত্তালেব মালিক (১৯০৩-১৯৭৭) চুয়াডাঙ্গা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতায় চক্ষু চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীতে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং ১৯৪৭ সালে নিখিল পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। এ এম মালিক ১৯৪০ ও ১৯৪৬ সালে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে তিনি পূর্ববাংলা প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও মৎস্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পরবর্তীতে পাকিস্তান, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, চীনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭১ সালের ৩১ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন।[১৫]

কাজী মুহাম্মদ ইদ্রিস (১৯০৬-১৯৭৫) রংপুর জেলার মুন্সি পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন সাংবাদিক তবে সাহিত্যিক হিসেবেও সুপরিচিতি রয়েছে। নারী অধিকার ও সমাজকর্মী কাজী আজিজা ইদ্রিস তার স্ত্রী এবং মুক্তিযোদ্ধা কাজী মিসবাহুন্নাহার তার কন্যা। দেশ বিভাগের পর প্রগতিশীল ছাত্র নেতৃত্বের সাথে তার যোগাযোগ ছিল। দেশ বিভাগ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যমান প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের করণীয় সম্পর্কে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ছাত্র নেতৃত্বের মিটিং এ তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে অনুষ্ঠিত 'কাগমারী সম্মেলনে' কাজী মুহাম্মদ ইদ্রিস সাংস্কৃতিক উপ-পরিষদের আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১৬]

আবু হোসেন সরকার (১৮৯৪-১৯৬৯) গাইবান্ধা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কংগ্রেস কর্মী হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দেন এবং ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনোনীত হন। এরপর তিনি পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালে সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' গঠনের সময় আবু হোসেন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[১৭]

সিলেট অঞ্চল

বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রাজনীতিবিদ ও লেখক হিসেবে সমধিক পরিচিত। তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। বিশেষ করে বাংলার কংগ্রেস নেতা হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও বিপিন চন্দ্র পাল চরমপন্থি বিপ্লবী কংগ্রেস নেতা হিসেবে বাংলার মানুষের পক্ষে কাজ করেছেন। তাছাড়া তিনি ১৯০১ সালের ১২ আগস্ট *নিউ ইন্ডিয়া* নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন যেখানে তৎকালীন রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা থাকতো।[১৮]

হাফেজ আতহার আলী (১৮৯১-১৯৭৬) সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের শুরুতেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় সিলেট গণভোটে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপনকারী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন তিনি।[১৯] ১৯৫২ সালে 'নেজামে ইসলাম পার্টি'র সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে তার নেতৃত্বে এ পার্টি প্রাদেশিক পরিষদে চারটি ও জাতীয় পরিষদে ছত্রিশটি আসন লাভ করে। ১৯৬৫ সালে আইয়ুব খান সরকার

তাকে গ্রেফতার করে। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ইসলাম প্রচার ও জনকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাছাড়া বহুমুখী জাতীয় আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন।[২০]

মাহমুদ আলী (১৯১৯-২০০৬) সিলেটের সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী মাহমুদ আলীকে তার দলের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত করেন এবং ১৯৪৬ সালে তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি মওলানা ভাসানীর সাথে থেকে আসাম সরকারের বাঙালি নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডের (লাইনপ্রথা, বাঙ্গাল খেদা) জোরালো প্রতিবাদ করেন। কৃষক-শ্রমিকের দাবি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবি প্রকাশের জন্য মাহমুদ আলী *সাপ্তাহিক নওবেলাল* নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে বামপন্থি মতাদর্শী নেতৃবৃন্দ তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুবলীগ গঠন করেন যার সভাপতি ছিলেন মাহমুদ আলী। ১৯৫২ সালের ৩১ ডিসেম্বর গণতন্ত্রী দল প্রতিষ্ঠা হলে এ দলে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে গণতন্ত্রী দলের প্রার্থী হয়ে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে জোট নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে মওলানা ভাসানীকে সমর্থন করেন। ১৯৫৭ সালে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (ন্যাপ) গঠিত হলে তিনি পূর্ব পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে মাহমুদ আলী 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' (এন ডি এফ) দলের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি বিদেশে পাকিস্তানের কুটনীতিক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।[২১]

আখলাকুর রহমান (১৯২১-১৯৯২) সুনামগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ববাংলা সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তার রাজনৈতিক তৎপরতার কারণে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন সরকারের রোষাণলে পড়েন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক থাকাবস্থায় ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। স্বাধীনতার পর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সাথে যুক্ত হন। তিনি একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে সমধিক পরিচিত।[২২]

তাসাদ্দুক আহমদ (১৯২৩-২০০১) সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কৈশর থেকেই তিনি শোষণমুক্ত শ্রেণি, বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি *দৈনিক পাকিস্তান* ও *দৈনিক সংবাদ* পত্রিকার প্রধান সংবাদদাতা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ পরবর্তী কর্মকাণ্ড নির্ধারণে তৎকালীন ছাত্র নেতাদের (শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ প্রমুখ) সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখতেন। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে তার ভূমিকার জন্য কারাবরণ করেন। তাছাড়া ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্তপর্বে তার কর্মকাণ্ডের কারণে তার বিরুদ্ধে তৎকালীন সরকার হুলিয়া জারি করে। ১৯৫৪ সালে লন্ডনে গমন করেন এবং বাঙালিদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সংগঠন গড়ে তোলেন। লন্ডনে বসবাসকালীন তিনি বাঙালিদের দাবিদাওয়া ও সমস্যাসমূহ ব্রিটিশ সরকারের কাছে উপস্থাপন করেন। তাসাদ্দুক আহমদ *ইস্টার্ন নিউজ* নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে *দেশের ডাক* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন যা ব্রিটেনে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকা ছিল। তিনি ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তিনি তহবিল ও বিশ্ব জনমত গঠনে অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন। ব্রিটেনে তার মালিকানাধীন গ্যাঞ্জেস রেস্টুরেন্ট ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অঘোষিত অফিস। ব্রিটেনে বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে তাসাদ্দুক আহমদের প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে। তার সামগ্রিক জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাকে 'মেম্বার অব ব্রিটিশ এম্পায়ার' (MBE) খেতাবে ভূষিত করেন।[২৩]

দেওয়ান ফরিদ গাজী (১৯২৪-২০১০) হবিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫১ সালে এ দলে যোগদান করেন এবং সিলেটে আওয়ামী লীগ রাজনীতির গোড়াপত্তন করেন। সিলেট অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন সংগঠনে নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন। ১৯৫৩ সালে সিলেট মহকুমা আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক এবং ১৯৫৭ সালে বৃহত্তর সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। সিলেট অঞ্চলে ছয় দফা আন্দোলন বিস্তারে তিনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সিলেট সদর আসন থেকে তিনি এম এন এ নির্বাচিত হন। ফরিদ গাজী মুক্তিযুদ্ধে চার ও পাঁচ নং সেক্টরে বেসামরিক উপদেষ্টা এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাউন্সিলরের সভাপতি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ১৯৭২ সালে তিনি বৃহত্তর সিলেট আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে তৎকালীন সিলেট-৮ (বর্তমান সিলেট-১) আসন থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।[২৪] শেখ মুজিবুর রহমানের তৃতীয় মন্ত্রিসভায় প্রথমে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী, পরবর্তীতে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। ১৯৯৬-২০০৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে হবিগঞ্জ-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।[২৫]

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (১৯৪৫-২০১৭) সুনামগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি কমিউনিস্ট রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী হয়ে জগন্নাথ হলের ভিপি পদে প্রার্থীতা করেন। ১৯৬৭ সালে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (ন্যাপ) দুই ধারায় বিভক্ত হলে তিনি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের নেতৃত্বাধীন দলে যোগদান করে। সিলেটের হাওড় অঞ্চলের 'জাল যার জলা তার' আন্দোলনে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত দীর্ঘদিন নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে তিনি সিলেট অঞ্চল থেকে ন্যাপ-এর প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাঁচ নম্বর সেক্টর কমান্ডার হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু এ দলের শীর্ষস্থানীয় বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[২৬]

বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল

অলি আহাদ (১৯২৮-২০১২) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়স থেকেই রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে ঢাকা কলেজ শাখা মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এসময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠনে অলি আহাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠন করা হলে ঢাকা জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের আহবায়ক নির্বাচিত হন। ভাষা আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে তিনি সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৯ সালের ১৯ এপ্রিল গঠিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র কর্মপরিষদে'র আহবায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সাহায্য সহযোগিতার জন্য ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ সালে 'ঢাকা শান্তি রিলিফ কমিটি' গঠন করেন এবং এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫১ সালের ২৭-২৮ মার্চ অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনে 'পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ' গঠিত হলে এ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অলি আহাদ। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গঠনেও তার অবদান রয়েছে। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি যে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় সেখানে তিনি সদস্য হিসেবে ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে অলি আহাদ জোরালো ভূমিকা পালন করেন। তার পরামর্শে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ঢাকায় প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৪৯ সালে স্বতন্ত্র আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দল 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হলে অলি আহাদ ১৯৫৩ সালের অক্টোবরে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে এ সংগঠনের প্রচার সম্পাদক ও ১৯৫৫ সালে সাংগঠনিক সম্পাদক মনোনীত হন। তিনি যুক্তফ্রন্ট গঠনে সক্রিয় বিরোধিতা করেন। ১৯৫৭ সালে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে দল থেকে বহিস্কৃত হলে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে (ন্যাপ) যোগদান করেন। সামরিক শাসনামলে গঠিত ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এন ডি এফ) গঠনেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৭০ সালে তিনি এ সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু একই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[২৭] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অনন্য অবদানের জন্য অলি আহাদকে ২০০৪ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করা হয়। তাছাড়া ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ২০০৭ সালে ধানমণ্ডির ৪ নম্বর সড়ক তার নাম অনুযায়ী নামকরণ করে।[২৮]

মোহাম্মদ তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭) নোয়াখালী (বর্তমান লক্ষীপুর) জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত সিলেট গণভোটে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন কর্মী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৭ সালে বাম রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন যখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম বামপন্থি ছাত্র সংগঠন 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনেও সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ' ও 'গণনাট্য' সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।[২৯] ভাষা আন্দোলনের শুরুতেই পোস্টার, নিবন্ধ ও লিফলেট তৈরি করতেন যে কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি গঠিত 'সর্বদলীয়

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে'র সদস্য ছিলেন।[৩০] ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশন' নামে শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (ন্যাপ) গঠিত হলে এ পার্টির সাথে যুক্ত হন এবং পরবর্তীতে তিনি ন্যাপ-এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালে শ্রেণি সংগ্রামের নামে তিনি সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় 'নকশাল' বাহিনী গঠন করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের নিয়ে নিজ অঞ্চল নোয়াখালী সদর পশ্চিমে মুক্তাঞ্চল গঠন করেন। স্বাধীনতার পর তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকায় তিনি আত্মগোপনে চলে যান এবং ১৯৭৬ সালে প্রকাশ্য রাজনীতিতে ফিরে আসেন। ১৯৭৯ সালে তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সালে মোহাম্মদ তোয়াহা মৃত্যুবরণ করেন।[৩১]

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। বাল্যকাল থেকে তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণ করতেন। ১৯৩৬ সালে ত্রিপুরা (বর্তমানে কুমিল্লা) জেলা বোর্ডের সদস্য এবং ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালে ভারত-ছাড় আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণ বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৩২] ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তিনি কংগ্রেস দলের প্রার্থী হয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের জন্য একই বছর ডিসেম্বরে তিনি গণপরিষদের সদস্য নিয়োজিত হন। ১৯৪৮ সালের ২৫ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের সকল কার্যক্রমে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষা অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভায় (১৯৫৬-১৯৫৮) স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৫ সালে রাজনীতি থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরে পাক বাহিনী তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।[৩৩]

মুজফ্ফর আহ্মদ (১৮৮৯-১৯৭৩) ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং বাংলায় এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নোয়াখালী জেলার সন্দীপে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে খেলাফত কমিটিতে যোগদানের মাধ্যমে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯২১ সাল থেকে তিনি মার্কসবাদ চর্চা ও মার্কসবাদী আন্দোলনের সাথে মার্কসবাদী রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। তারপর আস্তে আস্তে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। ভারতের কর্মজীবী শ্রেণির আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাথে কাজ করায় মুজফ্ফর আহ্মদ গ্রেফতার হন এবং পরবর্তীতে আত্মগোপনে থেকে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। ১৯৩৬ সালে 'সারা ভারত কৃষক সভা' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪০-১৯৪৩ সাল পর্যন্ত মুজফ্ফর আহ্মদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৩৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হলে তিনি মার্কসবাদী গ্রুপের সাথে যুক্ত হন। কর্মজীবী শ্রেণির আন্তর্জাতিকতার প্রতি তার অনুরাগ, গণতন্ত্রের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়, নারীর সমঅধিকারের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ তাকে একজন দৃঢ়চিত্তধারী

বিপ্লবী হিসেবে পরিণত করে। তার ষাট বছরের রাজনৈতিক জীবনে বায়ান্ন বছরই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ের উপর তার অসংখ্য প্রবন্ধ বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।[৩৪]

দেবেন সিকদার (১৯১৭-১৯৯৪) চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম কর্মী ছিলেন। ১৯৩৭ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চট্টগ্রাম জেলা শাখায় যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালে কমিউনিস্ট দল বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এ বিভক্তির সূত্র ধরেই ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে কমরেড দেবেন সিকদারের নেতৃত্বে 'পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হয়। তাছাড়া তার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ মজদুর পার্টি' গঠিত হয়। পরবর্তীতে বিপ্লবী ঐক্যের স্বার্থে তার এ দল এবং 'বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল' একীভূত করে নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল'।[৩৫] ১৯৬৬ সালের পর থেকেই চীনাপন্থি কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ভিন্ন ভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হতে শুরু করে। এ সময় আবুল বাশার দল থেকে বহিস্কৃত হন। অত:পর ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পাবনার জয়নগরে একটি সম্মেলনে আবুল বাশার (১৯৩৪-২০১০) ও দেবেন সিকদারের (১৯১৭-১৯৯৪) নেতৃত্বে 'পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হয়।[৩৬]

কাজী জাফর আহমদ (১৯৩৯-২০১৫) কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের একজন অন্যতম বামপন্থি নেতা। ১৯৫৫ সালে কাজী জাফর আহমদ সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট রাজনীতির মতাদর্শগত বিভক্তির প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন দুইভাগে বিভক্ত হয়। এসময় কাজী জাফর আহমদ চীনপন্থি নীতি অনুসরণ করেন। ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি শ্রমিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৭২-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'র সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জাফর আহমদ ১৯৭৪-১৯৮৬ সময়কালে ইউনাইটেড পিপলস পার্টি'র প্রথমে সাধারণ সম্পাদক ও পরবর্তীতে সভাপতি হিসেবে পার্টির সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৭৮ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তিনি জাতীয় পার্টির জন্মলগ্ন থেকেই (১৯৮৬-২০১৩) প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে তিনি জাতীয় পার্টি সরকারের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের অষ্টম প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও (১৯৮৯-১৯৯০) দায়িত্ব পালন করেন। কাজী জাফর আহমদ ১৯৮৬-১৯৯৬ পর্যন্ত পরপর তিনবার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।[৩৭] তিনি বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি (১৯৬৭-১৯৮৫) ছিলেন এবং শ্রমিক শ্রেণির উন্নয়নে আমৃত্যু কাজ করেছেন।[৩৮]

কামিনী কুমার দত্ত (১৮৭৮-১৯৫৯) কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। দেশ বিভাগপূর্বকালে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের সংবিধান রচনা কমিটিতে কাজ করেন। তাছাড়া তিনি দেশ ভাগের পর প্রথমে আইনমন্ত্রী ও পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৩৯]

ফজলুল কাদের চৌধুরী (১৯১৯-১৯৭৩) চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগ চট্টগ্রাম জেলা শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৮ সালে মুসলিম লীগ চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি মনোনীত হন এবং এ পদে থেকেই ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে এম এল এ নির্বাচিত হন। তিনি আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভায় কৃষি ও পূর্ত মন্ত্রী, শিক্ষা ও তথ্য এবং শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হন। ফজলুল কাদের চৌধুরী ১৯৬৬ সালে মুসলিম লীগ (কনভেনশন) থেকে বহিষ্কৃত হন। তিনি শেখ মুজিব উত্থাপিত ছয় দফার বিরোধিতা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনীর পক্ষে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।[৪০]

খোন্দকার মোশতাক আহমদ (১৯১৯-১৯৯৬) কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের (১৯৪৯ সালে) প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হয়ে কুমিল্লার নির্বাচনী অঞ্চল (দাউদকান্দি-হোমনা) থেকে এম এল এ নির্বাচিত হন। আওয়ামী যুব বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৯ সালে গঠিত গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের (ডাক) পূর্ব পাকিস্তান শাখার আহবায়ক ছিলেন। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে মোশতাক আহমদ গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদীয় মন্ত্রী ছিলেন। স্বাধীনতার পর গঠিত শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভায় বিদ্যুৎ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পরবর্তীতে বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ (বাকশাল) গঠিত হলে মোশতাক আহমদ এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত হন। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব স্বপরিবারে নিহত হলে তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেন। ৫ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ১৯৭৬ সালে 'ডেমোক্রেটিক লীগ' নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৪১]

আবদুল জব্বার খদ্দর ১৮৯৭ সালে নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকালে আবদুল জব্বার খদ্দর সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মত নোয়াখালীতে আবদুল জব্বার খদ্দর জেলা কমিটি গঠন করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসেবে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে* তার ভূমিকা ও রাজনৈতিক অবস্থানের বিষয়ে উল্লেখ আছে এভাবে, নোয়াখালীর আবদুল জব্বার খদ্দর প্রথম থেকেই আওয়ামী লীগ করছেন, তাকেও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মনোনয়ন থেকে বাদ দিতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেন। সমবায়, ব্যাংক ও ইন্সুরেন্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠায় একজন বিশিষ্ট সংগঠক ছিলেন।[৪২]

হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী (১৯০৬-১৯৬৬) ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র থাকাবস্থায় সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান রেঁনেসা সোসাইটি' প্রতিষ্ঠায় সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পান এবং একই বছর বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে ফেনীর পরশুরাম নির্বাচনী অঞ্চল থেকে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আন্দোলনে হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সালে অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলাকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অস্থায়ী সেক্রেটারি হিসেবে তিনি মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আহবান করে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা গঠনের পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় মহাত্মা গান্ধীর সাথে নোয়াখালী অঞ্চলে কাজ করেন এবং সিলেট গণভোট কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ গঠিত প্রথম মন্ত্রিসভায় তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৩ সালে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সাহিত্য চর্চা ও সমাজ সেবায় হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরীর সমান অবদান আছে।[৪৩]

নূরুল আমীন (১৮৯৩-১৯৭৪) ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করলেও তার পৈত্রিক নিবাস ময়মনসিংহ জেলার বাহাদুরপুর নামক স্থানে। মুসলিম লীগের ময়মনসিংহ জেলা শাখার সভাপতি হিসেবে নূরুল আমীনের রাজনৈতিক জীবনের উত্থান শুরু হয়। ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আন্দোলনে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯৪৮ সালে তিনি পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন এবং তৎপরবর্তী পাঁচ বছর একই পদে নিয়োজিত ছিলেন। নূরুল আমীন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত 'ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টে' যোগ দেন এবং আইয়ুব খানের স্বৈরাশাসন বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে গঠিত পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (পিডিএম) চেয়ারম্যান ছিলেন। নূরুল আমীন শেখ মুজিবুর রহমান পরিচালিত ছয়দফা আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। ১৯৬৯ সালে 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি' নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে দলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালে তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন।[৪৪]

রাশেদা আমিন (১৯৪৮-) : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলের নারীরা অংশগ্রহণ করেন। তবে অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধার অসামান্য অবদান স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও লিখিতভাবে তুলে ধরা হয়নি। এমনি একজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা রাশেদা আমিন। তিনি তৎকালীন ফরিদপুর বর্তমানে শরিয়তপুর জেলায় ১৯৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু বাবার কর্মস্থলের কারণে চট্টগ্রাম অঞ্চলে তার রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি। তার পিতার নাম মোহাম্মদ হাবিবউল্লা, মাতা রাজিয়া বেগম। স্কুলে থাকাবস্থায়ই তার ছাত্রলীগের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ছিল।

স্কুল জীবনে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জীবনী পড়ে রাশেদা আমিন মানসিকভাবে প্রস্তুত হন যে, সুযোগ হলে তিনি তার মত করে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন। ১৯৬৬ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন এবং চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। পারিবারিক সমর্থন তথা বড় বোনের (অধ্যাপিকা খালেদা খানম, প্রথম নারী হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ১৯৯৬-২০০০) রাজনৈতিক জীবন থেকে উৎসাহিত হয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। চট্টগ্রাম কলেজ থেকেই তিনি সরাসরি রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং এখানকার ছাত্রলীগের সহ সভাপতি ও ছাত্র-সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে ছয়দফা আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এ আন্দোলনের পক্ষে সারা বাংলাদেশে সাংগঠনিক সফর করেন। তৎকালীন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমেনা বেগম ছয়দফার পক্ষে প্রচারণার কাজে চট্টগ্রাম গেলে রাশেদা আমিন তার সাথে সকল সাংগঠনিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া এসময় চট্টগ্রাম মহিলা লীগ নেত্রীরা 'চট্টগ্রাম মহিলা লীগ' গঠনে কাজ করার জন্য তার সাথে যোগাযোগ করে। তিনি এসময় চট্টগ্রাম মহিলা আওয়ামী লীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কলেজে তার রাজনৈতিক জীবনের শুরু হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরই জাতীয় রাজনীতিতে সংযুক্ত হয়ে পড়েন। এসময় মেয়েদের মধ্যে যারা রাজনীতি করত বেশিরভাগই ছাত্র ইউনিয়ন করত কিন্তু তিনি ছাত্রলীগের হয়ে রাজনীতি করতেন। ১৯৬৭ সালে ছাত্রলীগের উদ্যোগে 'নিউক্লিয়াস' গঠন করা হলে তাকে এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামী করে মোট পয়ত্রিশ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। মামলার রায় হলে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসি হবে একথা ভেবে তিনি এ মামলা বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। তিনি উল্লেখ করেন আগরতলা মামলা সত্য ছিল। কারণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার সশস্ত্র পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল যেখানে সাহায্যকারী দেশ হিসেবে ভারত অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকাবস্থায় আইয়ুব বিরোধী তথা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্রদের এগারো দফাভিত্তিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০ সালে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এসময় তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত জনসভায় আওয়ামী লীগের স্বপক্ষে বক্তৃতা প্রদান করেন। বিশেষ করে এসব সভায় যোগদান করে ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সকল জনগণকে আওয়ামী লীগে ভোটদানে আহবান করেন। এ নির্বাচনের ফলাফলকে অগ্রাহ্য করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের দমন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে গণহত্যা শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সকল আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় সব ধরণের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা এখান থেকেই দেওয়া হতো। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্থান থেকে মিছিল এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে এসে জড়ো হয়। রাশেদা আমিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। তিনি ছাত্রসভায় মিছিল করে যোগ দেন এবং বক্তৃতা প্রদান করেন। এদিনই আ স ম আবদুর রব এর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করা হয়। রাশেদা আমিন এ পতাকা উত্তোলনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। এসময় মেয়েদেরকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তিনি কলা ভবনের পিছনে অনুষ্ঠিত গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগদান করে অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হল থেকে অন্যান্য ছাত্রী নেত্রীর সাথে রাশেদা আমিন মিছিল করতে করতে এ জনসভায় যোগদান করেন।

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ ছাত্রলীগের উদ্যোগে ঢাকার পল্টন ময়দানে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজাহান সিরাজ (১৯৪৩-২০২০) এ সভায় স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন। জনসভা শেষে রাশেদা আমিনসহ অন্যান্য নারী নেত্রী (শামসুন্নাহার ইকু, ফরিদা খানম, মমতাজ বেগম, ফোরকান বেগম) অস্ত্র কাঁধে নিয়ে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে 'মার্চ পাস্ট' করে চার নেতাকে অভিবাদন জানিয়ে ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়িতে বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানান। উল্লেখ্য, বর্তমানে স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে তাদের এই ঐতিহাসিক অভিবাদনের ছবি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এসময় মহিলাদের সশস্ত্র অংশগ্রহণ দেখে সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে উৎসাহ পায় এবং বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, দেশ এবার স্বাধীন হবে।

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে গোলটেবিল আলোচনা চালাতে থাকে। মূলত আলোচনার নামে সময়ক্ষেপন করতে থাকে এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্র আনার ব্যবস্থা করে। এসময় রাশেদা আমিনসহ তৎকালীন অন্যান্য নেত্রী মিলে বাক-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জনমত গঠন করতে থাকেন। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সভা-সমাবেশ, মিছিল, মিটিং করে আপামর জনসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আহবান করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বেলা ৩ টায় বায়তুল মোকাররম দলীয় নেতাকর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় রাশেদা আমিন বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৫ মার্চ কালো রাতে তিনি ধানমন্ডিতে চাচার বাসায় ছিলেন। অপারেশন সার্চ লাইটের পর অসংখ্য মানুষ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে চলে যায়। তাছাড়া যারা ঢাকায় ছিলেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে চলে যান। এসময় রাশেদা আমিন ঢাকার বাসায় অবরুদ্ধ থাকার পর দাদার বাড়ি শরীয়তপুরের কোয়ারপুর গ্রামে চলে যান এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। চাচার বাড়িতে বিবিসি খবর শুনতে গ্রামের অনেক মানুষ আসতো এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগদানে উৎসাহিত হতো। এসময় রাশেদা আমিনের চাচা হাফিজুর রহমান, আওয়ামী লীগ নেতা ফজল মাস্টার, সিরাজ সরদার এবং তিনি মিলে মুক্তি বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এসময়ই আগরতলা মামলার তিন নম্বর আসামী স্টুয়ার্ড মুজিব একদল মুক্তিযোদ্ধা ও বেশকিছু অস্ত্রসহ তাদের বাড়িতে আসেন। স্টুয়ার্ড মুজিব তাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে গ্রামের মানুষদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এরপরই তাদের বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এসময় রাশেদা আমিন ভারতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে স্টুয়ার্ড মুজিব দেশে অবস্থান জরুরি উল্লেখ করে দেশের ভেতর অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধে কাজ করার কথা বলেন। তাই এসময় তিনি গ্রামবাসীকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বোঝাতেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত করতেন।

তাদের গঠিত মুক্তিবাহিনী ছোটবড় বেশ কয়েকটি সফল অপারেশন চালায়। তারা গোপন সূত্রে খবর পেয়েছিল যে পাকিস্তানি আর্মি তাদের থানা পালং (বর্তমান নাম সদর থানা) আক্রমন করবে। এসময় তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারাই

আগে আক্রমণ করবে। পরেরদিন রাতে রাশেদা আমিনসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা একত্রিত হয়ে থানায় অপারেশন পরিচালনা করেন। এই সফল অপারেশনের সংবাদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়, ফলে দেশের সকল অঞ্চলের মানুষ তাদের সম্পর্কে জানতে পারেন। এ অপারেশনের সফলতায় তাদের মনোবল অনেকগুণে বেড়ে যায়। শরিয়তপুরের কাছেই মাদারীপুরে পাক আর্মির বড় একটি ক্যাম্প ছিল। তাদের অপারেশনের পরদিন প্রায় দেড়শত আর্মি রাশেদা আমিনদের নিয়ন্ত্রনাধীন ক্যাম্প আক্রমণ করতে আসে। তারা আগে থেকে আক্রমনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। আবার ঘন বর্ষাকাল থাকায় প্রকৃতিও তাদের পক্ষে ছিল। তাদের বাড়ির চারদিকে পানি থাকায় পাক আর্মি তাদের গ্রামের (কোয়ারপুর) বাজার পর্যন্ত লঞ্চ নিয়ে আসে এবং ডোমসার বাজার আগুনে পুড়িয়ে দেয় এবং ক্যাম্পের কোন ক্ষতি না করতে পেরে তারা ফিরে যায়। এরপর তারা নিকটস্থ আঙ্গারিয়া এলাকায় অপারেশন পরিচালনা করে শত্রুমুক্ত করেন। এরপর শত্রুমুক্ত আঙ্গারিয়ায় নারী সমাবেশের আয়োজন করেন। নারী মুক্তিযোদ্ধারা ও সাধারণ নারীরা নৌকায় মানচিত্র খচিত লাল সবুজ পতাকা উড়িয়ে নৌকা মিছিল করে এ সমাবেশে যোগ দিয়েছিল। এভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের নয়মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অসামান্য ভূমিকা রাখেন। রাশিদা আমীন শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখতেন এবং তার ধানমন্ডির বাসায় যাতায়াত করতেন। শেখ মুজিব আগরতলা মামলার আসামি হয়ে যখন কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন তখন তার ইচ্ছানুযায়ী চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা-নেত্রী মিলে শেখ হাসিনার (শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা ও বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) বিবাহত্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এ অনুষ্ঠানের আয়োজনে রাশেদা আমিন সরাসরি যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সকল মুক্তিযোদ্ধাকে দেশ গঠনে যার যার কাজে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের উন্নয়ন ও মহিলাদের জন্য সরাসরি কিছু করার ব্রত থেকে কোন রাজনৈতিক পদ-পদবী গ্রহণের অপেক্ষায় না থেকে নিজের পেশাগত জীবনে প্রবেশ করেন। তাই ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি যখন এ পেশায় আসেন তখন নারীদের জন্য এ পেশায় কাজ করা প্রায় অসম্ভবই ছিল কারণ তৎকালীন সময়ে মনে করা হত সাংবাদিকতা পুরুষের পেশা। সাংবাদিক হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (চীন, কানাডা, ভারত, জার্মানি, মালয়েশিয়া) প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সালে মহিলা সাংবাদিক ফোরাম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তীতে সভাপতি হিসেবে ২৮ বছর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি এ ফোরামের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। রাশেদা আমিন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পাননি তবুও সাহস নিয়ে এগিয়ে গেছেন মুক্তিযুদ্ধে। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য যে উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন তার সফল বাস্তবায়ন না দেখে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তবুও স্বপ্ন দেখেন কাঙ্খিত লক্ষ্যে দেশ এগিয়ে যাবে।[৪৫]

শাহেদ আলী পাটোয়ারি (১৮৯৯-১৯৫৮) ঃ শাহেদ আলী পাটোয়ারি চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৯ সালে এ কে ফজলুল হকের ‘কৃষক প্রজা পার্টি’তে যোগদানের মাধ্যমে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু। ১৯৫৫ সালের ৫ আগস্ট ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনে বেগম বদরুন্নেসা শাহেদ আলী পাটোয়ারির কাছে ১৭১/৯৯ ভোটে পরাজিত হন।

১৯৫৫ সালে ডেপুটি স্পিকার মনোনীত হওয়ার পর ১৯৫৮ সালে এক কলঙ্কজনক ঘটনার মাধ্যমে তিনি নিহত হন। ১৯৫৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'র (ন্যাপ) দলীয় সদস্য দেওয়ান মাহবুব আলী কর্তৃক স্পিকার আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব আইন পরিষদে পাস হয়। ফলে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ সালে শাহেদ আলীর সভাপতিত্বে আইন পরিষদের অধিবেশন পুনরায় শুরু হয়। নির্ধারিত এ অধিবেশনের শুরুতে সরকারি দল এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক বাক-বিতণ্ডা শুরু হয় এবং শেষে সরাসরি সংঘর্ষে পরিণত হয়। চলমান এ সংঘর্ষের এক পর্যায়ে শাহেদ আলী মাথায় মারাত্মকভাবে আঘাত পান। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ সালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।[৪৬]

আমেনা বেগম (১৯২৭-১৯৮৯) চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে ইডেন কলেজ, ঢাকা থেকে আই.এ পাস করেন। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হলে তিনি ১৯৫০ সালে এই ভিন্ন ধারার রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমেদ জেলে থাকাবস্থায় ১৯৬৬ সালের ২৭ জুলাই আমেনা বেগম আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের সংকটকালীন সময়ে আমেনা বেগম শক্ত হাতে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব ছয়দফা আন্দোলনের ডাক দিলে তিনি সক্রিয়ভাবে এ আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং ১৯৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলন সংগঠনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৬৯ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ স্থায়ীভাবে পেতে ব্যর্থ হলে দল থেকে পদত্যাগ করেন এবং আতাউর রহমান খানের জাতীয় লীগে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে এ দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৯ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। আমেনা বেগম আমৃত্যু জাতীয় লীগের রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ১৯৮৯ সালের ৭ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।[৪৭]

মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। মূলত ধর্ম প্রচার, সমাজ সংস্কারের আবেগ ও অভিজ্ঞতা থেকেই মওলানা ইসলামাবাদীর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। ১৮৯৯ সালে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন 'প্যান ইসলামবাদী'। কি করলে মুসলিম জাতি আবার হৃত গৌরব ফিরে পাবে সে চিন্তাই তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলার নির্যাতিত নিপীড়িত কৃষক সমাজের অধিকার নিশ্চিত করার আগ্রহই মওলানা ইসলামাবাদীকে কৃষকদের অধিকার আদায়ে আন্দোলনমুখী করেছিল। ১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা পার্টির টিকিটে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কংগ্রেস নীতির প্রতি আস্থা হারান এবং সুভাষ বসুর 'ফরওয়ার্ড ব্লক' এ যোগদান করেন। ১৯৪২ সালে তিনি ভারত ছাড় আন্দোলন এবং সুভাষ বসু গঠিত 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি বিরোধিতা করেন এবং পূর্ববঙ্গে না এসে তিনি কলকাতায় থেকে যান। পরবর্তীতে আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে চট্টগ্রামে বসবাস শুরু করেন।[৪৮]

খান সাহেব ওসমান আলী (১৯০০-১৯৭১) কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২০ সালে কলকাতার বেকার হোস্টেলে ছাত্র থাকাবস্থায় সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে আসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশংসিত *সবুজ বাংলা* পত্রিকার (১৯৩০ সালে প্রকাশিত) সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৪৪-১৯৪৫ সালে নারায়নগঞ্জ মুসলিম লীগে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে স্যার সলিমুল্লাহর পুত্র নবাব খাজা হাবিবুল্লাহকে পরাজিত করে এম এল এ নির্বাচিত হন। ভাষা আন্দোলনেও তার অসামান্য অবদান রয়েছে। তার বাড়ি 'বায়তুল আমান' থেকে ভাষা আন্দোলনের সময় সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভ পরিচালনা করতেন। ১৯৫২ সালে বায়তুল আমান থেকে খান সাহেব ওসমান আলীসহ পরিবারের ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনেও তার অবদান রয়েছে।[৪৯] তাছাড়া খান সাহেব ওসমান আলী স্বৈরাচার বিরোধী সকল আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালে ইন্তেকাল করেন।

প্রান্তটীকা

১. নাসিম আনোয়ার ও সুজাতা হক (সম্পা.), *আমাদের গাজীউল হক*, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ২৪১-২৪৭
২. শামীমা আক্তার, *বাংলাপিডিয়া*
৩. আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১০
৪. *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ৮ অক্টোবর ২০১৪
৫. জয়নাল আবেদীন, *উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদী ও বামধারার রাজনীতি, প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, বাংলা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২২১
৬. *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ৮ অক্টোবর ২০১৪
৭. মাহফুজুর রহমান সরকার, *বাংলাপিডিয়া*
৮. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা (১৯০৫-১৯৪৭)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৫৭-২৬৬
৯. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউপিএল, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭৭, ৯১, ৯৩, ১২০, ১৬৬, ২৩৮, ৩০৯
১০. এম আর মাহবুব, *যারা অমর ভাষা সংগ্রামী*, অনিন্দ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৫৫-১৫৬
১১. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯, ৩০৯
১২. তপন কুমার দে, *বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের জীবনকথা*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২০৫-২০৬
১৩. মেহেরুন্নেসা মেরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা, দ্বিতীয় খণ্ড*, ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৬-২০
১৪. রফিকুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধের বীর বাঙালীদের জীবনকথা*, বসুন্ধরা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩১-৩২
১৫. আবু জাফর, *বাংলাপিডিয়া*
১৬. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, দ্বিতীয় খণ্ড*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, (প্রথম সংস্করণ ১৯৭৫) পৃ. ২১
১৭. অঞ্জলি বসু (সম্পা.), *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ৪৩-৪৪
১৮. তাবেদার রসুল বকুল, *ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল: জীবন ও কর্ম*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২১৫
১৯. শাকের হোসাইন শিবলি, *একুশের মাওলানারা*, মাহফিল প্রকাশন, ঢাকা, ২০২১, পৃ. ২১৬
২০. https://bn.wikipedia.org/wiki/আতহার আলী। *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১২
২১. Ayesha Jalal, *The State of Martial Rule: The Origin of Pakistan's Political Economy of Defence, Vanguard Books, 1991,* p. 190. Nair Bhaskaran, *Politics in Bangladesh: A Study of Awami League 1949-58,* Northern Book Centre, 1990, p. 154
২২. সিমিন হোসেন রিমি, *তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরি ১৯৪৯-১৯৫০*, প্রতিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৫৮
২৩. তাসাদ্দুক আহমদ, *জীবন খাতার কুড়ানো পাতা*, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০২। মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়া, *বাংলাপিডিয়া*, *প্রাগুক্ত*। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৯৩
২৪. জাতীয় সংসদে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্যদের তালিকা, জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ সরকার
২৫. *The Financial Express*, Dhaka, 20 November 2010
২৬. দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নামের তালিকা, জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ সরকার
২৭. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৭
২৮. গাজী মো. মিজানুর রহমান, *বাংলাপিডিয়া*
২৯. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাপিডিয়া*
৩০. সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩১৮-৩১৯
৩১. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাপিডিয়া*
৩২. মুহম্মদ আবদুস সালাম, *বাংলাপিডিয়া*
৩৩. মিনার মনসুর, *ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত জীবনী গ্রন্থমালা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৬-৩৫
৩৪. মুজফ্ফর আহ্মদ, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২০-১৯২৯*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৯৭৭
৩৫. https:www.banglanews24.com/দেবেন সিকদার
৩৬. হায়দার আকবর খান রনো (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থিরা*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৯০-১৯১
৩৭. *দৈনিক যুগান্তর*, ঢাকা, ১ জুলাই ২০২২

৩৮. হায়দার আকবর খান রণো (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৬-৪৭৭। কাজী জাফর আহমদ, *আমার রাজনীতির ৬০ বছর জোয়ার-ভাটার কথন*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

৩৯. *Dhaka Tribune*, Dhaka, 31 July 2013

৪০. মুয়ায্যম হুসায়ন খান, *বাংলাপিডিয়া*

৪১. শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১০

৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০, ২৫৩, ৩০৬

৪৩. রফিকুল আকবর, *বাংলাপিডিয়া*

৪৪. মুয়ায্যম হুসায়ন খান, *বাংলাপিডিয়া*

৪৫. সাক্ষাৎকার, রাশেদা আমিন, সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ও প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা সাংবাদিক ফোরাম, ধানমন্ডি, ঢাকা, ১১ মার্চ ২০২২। কোয়ার স্বপ্নপুরী, ৭৬/৭৭ নর্থ রোড ধানমন্ডি, ঢাকা। *দৈনিক জনতা*, ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬। জাতীয় প্রেস ক্লাব, সদস্য চরিতাভিধান, পৃ. ১৫২। *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ২১ মার্চ ২০০০

৪৬. *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৫১৮-৫২০। *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ঢাকা, ৩০ আগস্ট ২০১৪

৪৭. মুয়ায্যম হোসেন খান, *বাংলাপিডিয়া*

৪৮. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা (১৯০৫-১৯৪৭)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৭২-১৭৯

৪৯. *দৈনিক যুগান্তর*, ঢাকা, ১৮ মার্চ ২০১৫। এম আর মাহাবুব, *যারা অমর ভাষা সংগ্রামে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫-১০৬

উপসংহার

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল মধ্যবর্তী প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনাবলী বাংলাদেশের ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই গবেষণার নির্ধারিত সময়কালে (১৯৪৭-১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তান ছিল ঘটে যাওয়া সকল রাজনৈতিক ঘটনার বিশেষ ক্ষেত্র। প্রদত্ত সময়কালের রাজনৈতিক বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচিত আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ব্যতিক্রমী ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। গবেষণা কর্মটিতে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ের উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মূলত যে সকল নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রধান প্রধান অনুসঙ্গ তথা আওয়ামী মুসলিম লীগ (প্রতিষ্ঠা ১৯৪৯), অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারক ভাষা আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৫২), যুক্ত রাজনীতির প্রচেষ্টা (১৯৫৪), স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলন (১৯৫৮-১৯৭০) তথা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছেন তাদের জীবন ও কর্ম আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। নির্বাচিত আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ যারা প্রত্যেকে পরবর্তী জীবনে জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্বে বিবেচ্য হয়েছেন তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রাথমিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আলোচনায় স্থান পেয়েছে। আলোচ্য আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের প্রায় প্রত্যেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির প্রধান পটপরিবর্তন আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সাথে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনায় ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান আন্দোলনে প্রদত্ত নেতৃবৃন্দের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। কাঙ্খিত পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরই রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা শীর্ষে ছিল কিন্তু দেশ বিভাগ পরবর্তী মুসলিম লীগ দল ও সরকার হিসেবে যে অপশাসন চালিয়েছিল এবং এরই প্রেক্ষাপটে মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে স্বতন্ত্র দলীয় কর্মসূচি নিয়ে মুসলিম লীগের পাল্টা প্রতিষ্ঠান 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' যাত্রা শুরু করে। এক্ষেত্রে ব্যাপক এই পটপরিবর্তনে সরাসরি যারা যুক্ত ছিলেন তাদের গৌরবময় ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য যোগ হয়েছে। এ দলের পটপরিবর্তনকারী ভূমিকায় দলীয় নেতাকর্মীদের অবস্থানও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের ভাঙ্গনে বামপন্থি আদর্শ কিভাবে সক্রিয়শীল হয়ে নতুন পটপরিবর্তনের সূচনা করেছে তা বামপন্থি রাজনীতির প্রাসঙ্গিক আলোচনায় যথাসম্ভব তুলে ধরা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট উত্তরণে দল হিসেবে আওয়ামী লীগ এবং দলভুক্ত ত্যাগী নেতাকর্মী স্বকীয় ভূমিকার মাধ্যমে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন তা প্রদত্ত আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এভাবে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি সফল পটপরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর শুরুতেই উর্দু ভাষা নিয়ে নতুন পটপরিবর্তনের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবি অর্থাৎ স্বতন্ত্র ভাষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূচনা হয়। ভাষা আন্দোলন কীভাবে একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সূচীত হয়ে

রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ তথা বহুমুখী রাজনৈতিক দল, মত ও পথের অনুসারী এ আন্দোলন পরিচালনা করেছে সেটির মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের পথনির্দেশকারী ভূমিকা সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণিকরণ দেখানো হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ভাষা আন্দোলন যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে তা ভাষা আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। ভাষার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি কিভাবে সর্বজনীনতা পেয়েছে বা রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা দেখানো হয়েছে। এ আন্দোলনে বাংলার নারী সমাজের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ তথা নারী রাজনীতির স্বরূপ উম্মোচন করা হয়েছে আলোচ্য নারী নেতৃত্বের রাজনৈতিক ভূমিকা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। মূলত ভাষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ অঞ্চলে রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি নতুন পটপরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শী দল এবং নেতৃত্বের যৌথ প্রয়াসে যুক্তফ্রন্ট নামক যে রাজনৈতিক জোট গঠন করা হয় এবং এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল তার গুরুত্ব তথ্য উপাত্তের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া নির্বাচনের ফলাফল অগ্রাহ্য করে গভর্নরের শাসন জারি এবং পরবর্তীতে সামরিক শাসন শুরু হলে প্রদত্ত নেতৃত্বের যৌথ রাজনীতির প্রচেষ্টা এবং সামরিক শাসন বিরোধী সর্বাত্মক আন্দোলনে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের স্ব স্ব ভূমিকা এবং রাজনৈতিক অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'আওয়ামী মুসলিম লীগে'র ম্যানিফেস্টোতে এবং যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ১৯ নং দফায় স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলা হয়। দেশ ভাগের শুরু থেকেই শুরু হওয়া প্রতিটি আন্দোলনে গবেষণা অভিসন্দর্ভে অন্তর্ভুক্ত আঞ্চলিক নেতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। যেহেতু ক্ষমতাসীনদের অত্যাচার বা শোষণ ক্রমেই বাড়ছিল সেহেতু পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলের নেতা-নেত্রী ক্রমেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরই প্রেক্ষাপটে ১৯৬০-এর দশকে শুরু করে 'স্বাধিকার আন্দোলন'। আওয়ামী লীগের কর্ণধর শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয় দফা ভিত্তিক যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং ছয় দফার ধারাবাহিকতায় যে গণআন্দোলন শুরু হয় তা বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরি হয়নি বরং তৎকালীন রাজনীতি বলা যায় একটি "fluid" (রাজনীতিতে অপ্রত্যাশিত পুন:পরিবর্তন) অবস্থায় ছিল। তৎকালীন নেতাকর্মীদের শক্তিশালী রাজনৈতিক আদর্শগত অবস্থান বা নীতিগত পর্যায় তৈরি হয়নি অর্থাৎ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা চলছিল। এ অবস্থা থেকে শক্তিশালী ভিন্ন কর্মসূচি ভিত্তিক একক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা পায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সুস্পষ্ট পক্ষ-বিপক্ষ ভিত্তিক স্থায়ী রাজনৈতিক ধারা তৈরি হয়। এ নির্বাচনে সকল স্তরের বাঙালি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধিকারের পক্ষে রায় দেয়। তবে এ নির্বাচনে 'আওয়ামী লীগ' পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬২ আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ভয়ানক অদূরদর্শী পদক্ষেপ নেয় এবং ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আক্রমণ করে। শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। দীর্ঘ ৯ মাস স্বশস্ত্র যুদ্ধ করে বাঙালিরা অর্জন করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

পাকিস্তান শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭১) বাঙালির প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত দাবি বা কর্মকাণ্ড তথাকথিত ইসলাম রক্ষার নামে দমন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উস্কানিদাতা হিসেবে হিন্দু সম্প্রদায়, কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ ও ভারতকে দায়ী করা হয়। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালির প্রকৃত আত্মপরিচয় সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পর্যায়ে এটি এ আঞ্চলের আঞ্চলিক বিজয় বলেই চিহ্নিত করা যায়। ১৯৪৭ থেকে আন্দোলন সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করতে এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব অবস্থান থেকে অবদান রেখেছেন। সে অবদানের মূল্যায়ন, কার্যকারিতা ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার একটি পর্যালোচনা করার প্রচেষ্টা এখানে করা হয়েছে।

প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সময়কালে (১৯৪৭-১৯৭১) প্রত্যেক আঞ্চলিক নেতা বা নেত্রীরা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে নিজের স্বতন্ত্র ভূমিকার মাধ্যমে স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করতে পেরেছিলেন। বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম আনোয়ারা খাতুন, বেগম বদরুন্নেসা আহমদ, বেগম নূরজাহান মুরশিদকে অন্তর্ভূক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন গবেষণা অভিসন্দর্ভের সময়কালে (১৯৪৭-১৯৭১) ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে তার ভূমিকা বিস্তারিতভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। একটি নতুন রাজনৈতিক আদর্শ ও দলের কর্ণধার হয়ে বাংলাদেশের স্থপতি হয়েছেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় একমাত্র নারী সংগঠক হিসেবে আনোয়ারা খাতুনের যুগান্তকারী ভূমিকা এ অধ্যায়ে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া পূর্ববাংলা আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে তার ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি পর্বে তথা ভাষা আন্দোলনে অগ্রগামী ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বেগম বদরুন্নেসা আহমদ ও নূরজাহান মুরশিদ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে সরাসরি রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেও নারী আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আবদ্ধ না থেকে নারী সমাজকে রাজনীতি সচেতন করে ভিন্ন ধারায় সমাজ ও রাজনীতিতে পটপরিবর্তন সম্ভব। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পর্যায় আলোচনায় মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের নেতা হিসেবে তার আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করা হয়েছে। মওলানা ভাসানীর হাতেই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজন অর্থাৎ তার সরাসরি উদ্যোগে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির গোড়াপত্তন হয়েছে। দেশ বিভাগ পরবর্তী প্রগতিশীল তারুণ্যের রাজনীতির ধারক হিসেবে শামসুল হকের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। তার রাজনৈতিক ভূমিকা আলোকপাত করতে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগের শক্ত রাজনৈতিক ভিত্তির মধ্য থেকে একটা ভিন্ন ধারার প্রগতিশীল গ্রুপ প্রতিষ্ঠায় তার ব্যতিক্রমী ভূমিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। বলা হয় তার সুযোগ্য নেতৃত্বেই তৎকালীন ছাত্রসমাজ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঐকমত্যে আসতে পেরেছিলেন। তাছাড়া শামসুল হক ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে শক্তিশালী দল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রকৃত পটপরিবর্তনের

সূচনা করেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলের সর্বসাধারণের নেতা আবুল মনসুর আহমদ। তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন আলোচনায় অত্র অঞ্চলের রাজনীতি এবং রাজনীতিতে তার স্বতন্ত্র অবস্থান বোঝা যায়। টাঙ্গাইল অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য নেতা হাতেম আলী খান। তার রাজনৈতিক জীবন আলোচনার মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের রাজনৈতিক চিত্র উঠে এসেছে। বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের মূল্যায়নে ভিন্নধর্মী দুইজন নেতৃত্বকে নির্বাচিত করা হয়েছে। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং বেগম সুফিয়া কামাল সরাসরি সাংগঠনিক পদবী গ্রহণ না করেও সাংস্কৃতিক ধারায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যোগ করেছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম অংশীদারিত্বের এ দুই নেতৃত্বের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বৃহত্তর যশোর অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনায় মশিউর রহমান ও রওশন আলী অত্র অঞ্চলের রাজনৈতিক অগ্রদূত হিসেবে গণ্য। যশোরের আওয়ামী লীগের গোড়াপত্তন এবং এ দলের সাংগঠনিক বিস্তার তাদের মাধ্যমেই সম্পাদন হয়েছে। তাছাড়া এ অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন সংগঠন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা তথা মুক্তিযুদ্ধে সার্বিক গতিশীলতা তাদের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। মশিউর রহমান এবং রওশন আলীর রাজনৈতিক ভূমিকা মূল্যায়নে এ অঞ্চলের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতির স্বরূপ চিহ্নিত করা সহজ হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভের শেষ অধ্যায়ে অন্যান্য অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করে আঞ্চলিক রাজনীতির পূর্ণতা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অভিসন্দর্ভের নির্ধারিত সময়কালের (১৯৪৭-১৯৭১) রাজনৈতিক ঘটনা বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে প্রসঙ্গত প্রায় প্রত্যেক আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সর্বপরি "পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন (১৯৪৭-১৯৭১) ঃ আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতির প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন হয়েছে। তাছাড়া আঞ্চলিক রাজনীতি সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের কর্মকাণ্ড ও দলীয় অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে।

তথ্যসূত্র

প্রাথমিক উৎস

গৃহীত সাক্ষাৎকার

অ্যাডভোকেট আবু সেলিম রানা (রওশন আলীর পুত্র) — কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, যশোর জেলা শাখা, সহকারী পি পি, দায়রা জজ আদালত, যশোর, নিজ বাসভবন, হাইকোর্ট মোড়, যশোর, ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০

আমিরুল ইসলাম রন্টু — ষাটের দশকের ছাত্র ইউনিয়ন নেতা, বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা, ১৫ মে ২০২০, ছাতিয়ানতলা, সদর, যশোর

আলি কদর মোঃ সামছুজ্জামান (শহীদ মশিউর রহমানের ভাতিজা) — সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান, সিংহঝুলি ইউনিয়ন পরিষদ, চৌগাছা, যশোর), ৭ পিটারসন রোড, যশোর, নিজ বাসভবন, ১৭ জুন ২০১৯

আজিজুর রহমান আরজু — ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, যশোর, ৫ মার্চ ২০২০

ইরফানুল বারী — মওলানা ভাসানী গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান সমন্বয়ক, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল, ১৫ মে ২০১৫

নাসরীন আহমাদ (বেগম বদরুন্নেসা আহমদের কন্যা) — প্রাক্তন অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ ও প্রাক্তন প্রো-উপাচার্য (২০১২-২০২০) (শিক্ষা), প্রো-উপাচার্যের (শিক্ষা) কার্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০

মাসকুর রহমান টুটুল (শহীদ মশিউর রহমানের ছোট পুত্র) — ফোনালাপ, ১৭ জুন ২০১৯

মোঃ দাউদ হোসেন — মুক্তিযোদ্ধা, যশোর অঞ্চল ও কর্মরত চেয়ারম্যান, ৭নং চুড়ামনকাটি ইউনিয়ন, যশোর সদর, ২২ মে ২০২২

রাশেদা আমিন — সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ও প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা সাংবাদিক ফোরাম, ধানমন্ডি, ঢাকা, ১১ মার্চ ২০২২। কোয়ার স্বপ্নপুরী, ৭৬/৭৭ নর্থ রোড ধানমন্ডি, ঢাকা

রবিউল আলম — মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার, যশোর সদর অঞ্চল, দৌলতদিহি, সদর, যশোর, ২২ মে ২০২২

খালেদা খানম — বাংলাদেশের প্রথম নারী হুইপ। সংরক্ষিত নারী আসন, জাতীয় সংসদ-১৯৯৬, নিজ বাসভবন, (স্মরণীকা) লালমাটিয়া, ঢাকা, ২৬ জানুয়ারি ২০২২

সাইফুল ইসলাম স্বপন (শামসুল হকের ভাতিজা) — শামসুল হক ফাউন্ডেশনের সভাপতি, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল, ২০ জানুয়ারি ২০১৯

জাহিদ খান (হাতেম আলী খানের নাতি) — কৃষক নেতা, বাংলাদেশ কৃষক সমিতি, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, টাঙ্গাইল

তাহমিনা খান (হাতেম আলী খানের নাতনী) — অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সরকারি সা'দত কলেজ, করোটিয়া, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, টাঙ্গাইল

জুলফিকার খান (হাতেম আলী খানের ভাতিজা) — ৫ এপ্রিল ২০১৫, টাঙ্গাইল

সরকারি প্রকাশনা

Debates of the Constituent Assembly of Pakistan, 1955-56, Government of East Pakistan Press, 1955-57, Vol 9, (National Archives of Bangladesh, Agargaon, Dhaka)

East Bengal Assembly Proceedings, Vol-1, No-1, 15 March 1948

Gazette of Pakistan, Extraordinary, 1954, Notification No. 51/2/54 Police I Karachi, May 30, 1954, Proclamation. (National Archives of Bangladesh, Agargaon, Dhaka)

Government of East Bengal Legislative Assembly Debates, Vols. 1-18, Dacca: Government of East Bengal Press, 1948-1952 (Central Library, University of Dhaka)
Government of East Bengal, *The East Bengal State Acquisiton and Tenancy Act, 1950*, East Bengal Government Press, Dacca. (Central Library, University of Dhaka)
Government of East Bengal, Home Poll, F/N, 606-48PE, Part-3 (National Archives of Bangladesh, Agargaon, Dhaka)
Govt. of East Bengal, *Home Poll F/N. 606-48 PF, Part-3* (Central Library, University of Dhaka)
Govt. of East Bengal, *Home Poll. F/N. 606-48 PF, Part-4* (Central Library, University of Dhaka)
Govt. of East Bengal, *Home Poll. F/N. 606-48 PF, Part-5* (Central Library, University of Dhaka)
Government of Pakistan, Report on the General Election in Pakistan, 1970-71, Vol. 1, Published by the Election Commision, 1972, (National Archives of Bangladesh, Agargaon, Dhaka)
Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh), *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 1948-63, vol-1-7, Hakkani Publisher's, Dhaka, 2020*
নুরুল ইসলাম খান (সম্পা.), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার টাংগাইল*, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯০
মাহবুব তালুকদার (সম্পা.), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর যশোর*, সরকারি মুদ্রনালয়, ঢাকা, ১৯৯৮
হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *প্রথম-দশম খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২

দৈনিক পত্রিকা

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা — ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭৬, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০
(জাতীয় আরকাইভস, আগারগাঁও, ঢাকা)
(কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
দৈনিক ইত্তেহাদ, ঢাকা — ১৯৪৭
(জাতীয় আরকাইভস, আগারগাঁও, ঢাকা)
দৈনিক নওবেলাল, ঢাকা — ১৯৫০
(জাতীয় আরকাইভস, আগারগাঁও, ঢাকা)
পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা — ১৯৫০, ১৯৬৭
(জাতীয় আরকাইভস, আগারগাঁও, ঢাকা)
দি পাকিস্তান অবজারভার, ঢাকা — ১৯৫১, ১৯৬২
(জাতীয় আরকাইভস, আগারগাঁও, ঢাকা)
দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা — ১৯৬৫, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭১
(কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
দৈনিক আজাদ, ঢাকা — ১৯৩৬, ১৯৫৪, ১৯৫৭, ১৯৬১
(জাতীয় আরকাইভস, আগারগাঁও, ঢাকা)
(কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
দৈনিক সংবাদ, ঢাকা — ১৯৫৭, ১৯৬৮, ১৯৬৯
(জাতীয় আরকাইভস, আগারগাঁও, ঢাকা)
(কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
দি মর্নিং নিউজ, ঢাকা — ১৯৬৬, ১৯৭০, ১৯৭১
(কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
বাংলাদেশ অবজারভার, ঢাকা — ১৯৬৯
(কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
The Times, London — ১৯৬৯
দ্যা ডন, ঢাকা — ১৯৭০
(কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

দৈনিক পূর্বদেশ, ঢাকা,	১৯৭১
(জাতীয় আরকাইভস, আগারগাঁও, ঢাকা)	
দৈনিক বার্তা, ঢাকা	১৯৭৬
(জাতীয় আরকাইভস, আগারগাঁও, ঢাকা)	
দৈনিক মিল্লাত, ঢাকা	১৯৯১
(কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	
দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা	১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯
(কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	
দৈনিক ভোরের কাগজ, ঢাকা	১৯৯৬, ১৯৯৯
(কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	
দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা	১৯৯৯
(কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, পত্রিকা শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	
দৈনিক আমার দেশ, ঢাকা	২০০৭
The Daily Star, Dhaka	২০১২
Dhaka Tribune, Dhaka	২০১৩
দৈনিক মানবজমিন, ঢাকা	২০২২
যশোর গেজেট, যশোর	২০১৯
সাপ্তাহিক বেগম, ঢাকা	১৯৬৩, ১৯৬৪
(জাতীয় আরকাইভস, আগারগাঁও, ঢাকা)	
সাপ্তাহিক সৈনিক, ঢাকা	১৯৪৯
(জাতীয় আরকাইভস, আগারগাঁও, ঢাকা)	
সাপ্তাহিক ইত্তেফাক, ঢাকা	১৯৫২
(জাতীয় আরকাইভস, আগারগাঁও, ঢাকা)	
সাপ্তাহিক জনতা, ঢাকা	১৯৬৪
(জাতীয় আরকাইভস, আগারগাঁও, ঢাকা)	
সাপ্তাহিক স্বরাজ, ঢাকা	১৯৭১
(জাতীয় আরকাইভস, আগারগাঁও, ঢাকা)	
সাপ্তাহিক হক কথা, টাঙ্গাইল	১৯৭২
(টাঙ্গাইল জেলা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি)	
সাপ্তাহিক ইনতিজার, টাঙ্গাইল	২০১৪
(টাঙ্গাইল জেলা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি)	

গবেষণা পত্রিকা:

ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ঢাকা

ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ঢাকা

বাংলা একাডেমি গবেষণা পত্রিকা, ঢাকা

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা

Asian Survey, University of California Press

Far Eastern Survey, University of California Press

আত্মজীবনী, জীবনী গ্রন্থ ও ডায়েরি

অলি আহাদ	*জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, খোশরোজ কিতাব মহল লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮২
আবুল মনসুর আহমদ	*আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১০ (১ম সংস্করণ, ১৯৬৯)
আবুল হাশিম	*আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, (অনুবাদ, শাহাবুদ্দীন মহম্মদ আলী), বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, চট্টগ্রাম-ঢাকা, ১৯৭৮
আব্দুল মতিন	*জীবন পথের বাঁকে বাঁকে*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩

আবদুল মতিন — *ভাষা ও একুশের আন্দোলন*, নন্দন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬
কাজী জাফর আহমদ — *আমার রাজনীতির ৬০ বছর জোয়ার-ভাটার কথন*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭
খোকা রায় — *সংগ্রামের তিনদশক (১৯৩৮-১৯৬৮)*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬
গাজীউল হক — *আমার দেখা আমার লেখা*, মেরী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০
তাসাদ্দুক আহমদ — *জীবন খাতার কুড়ানো পাতা*, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০২
নূরজাহান মুরশিদ — *আমার কিছু কথা*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪
মহিউদ্দিন আহমেদ — *আমার জীবন আমার রাজনীতি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ — *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২০-১৯২৯*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৯৭৭
মণি সিংহ — *জীবন সংগ্রাম*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩
শামসুজ্জোহা মানিক — *রাজনীতির পুনর্বিন্যাস*, বদ্বীপ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২
শেখ মুজিবুর রহমান — *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২
——————— — *কারাগারের রোজনামচা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭
শেখ রাজ্জাক আলী — *ডায়েরীর পাতা থেকে*, খুলনা, ২০১৭
সরদার ফজলুল করিম — *সেই সে কাল! কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০১
সুফিয়া কামাল — *একাত্তরের ডায়েরি*, জ্ঞান প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯
সিমিন হোসেন রিমি — *তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী ১৯৪৭-১৯৪৮*, প্রতিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯
——————— — *তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী ১৯৪৯-১৯৫০*, প্রতিভাস প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০
সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী — *স্মৃতিতে অম্লান ষাট-দশকের রাজনীতি*, নজমুন্নেসা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯১
হায়দার আনোয়ার খান জুনো — *আগুনঝরা সেই দিনগুলো*, ইনসাইট বুকস, ঢাকা, ২০১৬
হায়দার আকবর খান রনো — *শতাব্দী পেরিয়ে*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫

দ্বৈতয়িক উৎস

প্রকাশিত সাক্ষাৎকার

ভাষা আন্দোলন কর্মী হামিদা রহমান ও মজিদ খানের সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, *প্রথম খণ্ড*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, (প্রথম সংস্করণ ১৯৭০) ২০১২
মালেকা বেগম কর্তৃক গৃহীত নূরজাহান মুরশিদের সাক্ষাৎকার, ১৯৮৬ উদ্ধৃত মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১৩৮-১৩৯
মালেকা বেগম কর্তৃক গৃহীত মতিয়া চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, জুন ১৯৮৭ উদ্ধৃত মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*
মালেকা বেগম কর্তৃক গৃহীত সুফিয়া কামালের সাক্ষাৎকার, জুন ১৯৮৭ উদ্ধৃত মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*
রাশেদুর রহমান (সম্পা.) নারী ১৯৭১ : নির্যাতিত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫
সিরাজুল আলম খান, (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ১৯৬৩-১৯৬৫), ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী (সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ১৯৬৭-১৯৬৮) উদ্ধৃত মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩
সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি), ২০.০৯.১৯৬৯, আবুল কাসেম ফজলুল হক ও এম আর মাহবুব (সম্পা.) ও সংকলিত, *ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১৬

প্রকাশিত প্রবন্ধ (বাংলা):

আতাউর রহমান খান — "পাকিস্তানের অভ্যুদয় ও বিরোধী রাজনীতির সূত্রপাত", *ঈদ সংখ্যা বিচিত্রা*, ৬ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ১৯৭৭
আরিফা সুলতানা — "ঊনিশ শতকে বাংলার নারী শিক্ষা", *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, সংখ্যা ২৫-২৬, বর্ষ ১৪০৫-১৪০৬
কাজী জাফর আহমেদ — "বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন", *বিচিত্রা ঈদ সংখ্যা*, ষষ্ঠ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭
মো: আব্দুল কুদ্দুস সিকদার — "পূর্ব বাংলার বাম রাজনীতি: ১৯৫৪-৫৮", *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, সংখ্যা ৩৩-৩৪, ২০১২
মীজানুর রহমান শেলী — "ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তার বিকাশ", *ঈদ সংখ্যা বিচিত্রা*, ৬ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ১৯৭৭

মো: আনোয়ারুল ইসলাম — "১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়", *দি জার্নাল অব দি ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ*, রাজশাহী, ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ. ৯৩-১১১

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান — "ছয়দফা আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা", *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ২৩-২৪, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ১৯৯৬-১৯৯৮

মোহাম্মদ তোয়াহা — "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও যুব আন্দোলন", *বিচিত্রা*, ৯ সংখ্যা, ১৯৭৭

মাহবুব উল্লাহ — "ষাটের দশকের ছাত্রী রাজনীতি," *ঈদ সংখ্যা বিচিত্রা*, ঢাকা, ১৯৭৭

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান — ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে: পটভূমি ও প্রতিঘাত, *জার্নাল অব হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট*, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্বদ্যিালয়, সাভার, ঢাকা, ভলিউম. ৭

রাশেদ খান মেনন — "চৌষট্টির ছাত্র আন্দোলন", *ঈদসংখ্যা বিচিত্রা*, ৬ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ১৯৭৭

শাহানারা হোসেন — "উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা", *বাংলা একাডেমি*, ঢাকা, ২০১৪

শামসুর রহমান — "ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় যশোর", *বিচিত্রা*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

শাহ মোহাম্মদ রেজা — "মুসলিম লীগের ৮০ বছর", *বিচিত্রা*, ১৫ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ৩০ জানুয়ারি ১৯৮৭

প্রকাশিত প্রবন্ধ (ইংরেজি):

A.M.A Muhith — "1947 and 1971 in the Subcontinent: A Study in Parallels: The Second Partition of the Subcontinent," *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol. II,* Rajshahi, 1977.

Dr. Asha Islam Nayeem — "Women's Imancipation through Education in 19th Century Eastern Bengal: Private Enterprise or Government Agency?" *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, (Humanities), Vol. 60 No-1,* Dhaka, June 2015.

G. Morshed — "Pakistan's 1970 Election and the Liberation of Bangladesh: A Political Analysis", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol. XI,* Dhaka, 1988

M. Rashiduzzaman — "The Awami League in the Political Development of Pakistan", *Asian Survey Vol. X, No.7,* 1970.

Mujahid Sharif — "Pakistan: First General Election", *Asian Survey, Vol. XI,* 1971

Golam Morshed — "Pakistan 1970 Elections and the Liberation of Bangladesh: A Political Analysis." *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol XI,* Rajshahi, 1988

Harun-or-Rashid — The 1940 Lahore Resolution: Bengali Ideas of Statehood", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities) Vol. 39, No. 1,* Dhaka, June 1994

Marcus F. Franda — "Communism and Regional Politics in East Pakistan", *Asian Survey, Vol X, No. 7,* University of California Press, 1970

Richard L. Park — "East Bengal: Pakistan's Troubled Province," *Far Eastern Survey,* 1954

S.A Akanda — 'Was Parliamentary System of Government a Failure in Pakistan? A case study of a Constitutional Debate in Pakistan during Martial Law, 1958-62, *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol-VI,* Rajshahi, 1982-83

___________ — "The Working of the Ayub Constitution and the People of Bangladesh", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol. IV,* Rajshahi, 1979-80

গ্রন্থপঞ্জি: বাংলা

অমলেন্দু দে — *বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯১

———— — *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক*, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ভারত, ১৯৮৫

অঞ্জলি বসু (সম্পা.) — *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৬

অঞ্জলি বসু ও সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পা.) *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৩

অতুল চন্দ্র রায়, প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় *ভারতের ইতিহাস*, মৌলিক লাইব্রেরি, কলিকাতা, ২০০০

অনুপম সেন *বাংলাদেশঃ রাষ্ট্র ও সমাজ*, জ্ঞানগৃহ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

অজয় ভট্টাচার্য *নানকার বিদ্রোহ, প্রথম খণ্ড*, মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬

অলি আহাদ *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, খোশরোজ কিতাব মহল লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৭

আ.শ.ম. বাবর আলী *মুক্তিযুদ্ধে শত নারী*, জ্ঞান বিতরণী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০

আব্দুল হক *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ১৯৫৩-৯৩*, ইউ পি এল, ঢাকা, ১৯৯৬

আব্দুল ওয়াহেদ তরফদার *৭০ থেকে ৯০ : বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট*, পাণ্ডুলিপি, ঢাকা, ১৯৯১

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী *বাংলাদেশ সিভিল ও আর্মি ব্যুরোক্রেসির লড়াই*, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৯২

——————— বাংলাদেশের বামপন্থি রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা, জ্যোৎস্না পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৮

——————— *বাংলাদেশ কথা কয়*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১

আইয়ুব খান *ফ্রেন্ডস নট মাস্টারস: এ পলিটিক্যাল অটোবায়োগ্রাফি*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৮

আনু মাহ্‌মুদ *গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*, আকাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮

আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক *ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও তাৎপর্য*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১

আবু মো. দেলোয়ার হোসেন *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-১৯৪৭)*, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮

আবু মো. দেলোয়ার হোসেন ও সাহিদা বেগম *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আইনজীবী*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮

আবু আল সাঈদ *আওয়ামী লীগের ইতিহাস ১৯৪৯-১৯৭১*, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩

————— *আওয়ামী লীগের শাসনকাল ১৯৫৬-৫৮ এবং ১৯৭১-৭৫*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

————— *সাতচল্লিশের অখণ্ড বাংলা আন্দোলন: পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

————— *মুসলিম শাসনকাল ধর্মনিরপেক্ষতা ও বঙ্গবন্ধু ১২০৬-১৯৭৫*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

আবু জাফর মোহাম্মদ সাদেক *বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন-ইতিহাস ও সমীক্ষা*, চলন্তিকা বইঘর, ঢাকা, ১৯৮৭

আবুল হাশিম (অনুবাদ শাহাবুদ্দীন মহম্মদ আলী) *আমার জীবন ও বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭

আবুল কাশেম ফজলুল হক *মুক্তিসংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২

আবুল কাশেম (সম্পা.) *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও আওয়ামী লীগ: ঐতিহাসিক দলিল*, জাতীয় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০১

আবুল কালাম শামসুদ্দীন *অতীত দিনের স্মৃতি*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮৫

আবুল ফজল হক *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮

আবদুল হাই শিকদার *জানা অজানা মওলানা ভাসানী*, ফারহানা বুকস, ঢাকা, ২০০২

আমজাদ হোসেন *মওলানা ভাসানীর জীবন ও রাজনীতি*, পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

————— *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬

আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম (সম্পা.) *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬

আলী মোঃ আবু নাঈম ও ফাহিমা কানিজ লাভা (সম্পা.) *শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯

আশফাক হোসেন *বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা*, জে, কে, প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৪

আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা.) *যশোর জেলার ইতিহাস*, দিগন্ত প্রচারণী লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০

আহমদ রফিক *ভাষা আন্দোলন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯

আহসানুল্লাহ *অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন*, ঢাকা, ১৯৮৫

আয়শা খানম (সম্পা.) *মুক্তিযুদ্ধদিনের স্মৃতি*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ২০০১

আতিউর রহমান ও লেলিন আজাদ *ভাষা আন্দোলন: পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা

আতিউর রহমান *অসহযোগের দিনগুলি : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮

আতাউর রহমান খান — *স্বৈরাচারের দশ বছর: আইয়ুবি শাসনের চালচিত্র ১৯৫৮-১৯৬৯*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০২০

আনোয়ার হোসেন — *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৭১*, প্রগতিশীল প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৬

আরেফিন বাদল (সম্পা.) — *চাষী-মজুরের মওলানা ভাসানী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২২

ইয়াসমিন আহমেদ — *উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৮৭

ইমরান মাহফুজ (সম্পা.) — *কালের ধ্বনি দুর্লভ কথক আবুল মনসুর আহমদ*, কালের ধ্বনি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫

এ কে এম শাহনাওয়াজ (সম্পা.) — *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, সি বি ও পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৭

এ টি এম আতিকুর রহমান — *বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৯০৫-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫

এ.এস.এম সামছুল আরেফিন — *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৫

এ্যান্থনী মাসকারেনহাস — *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ* (অনু: রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী), পপুলার পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬

এম আর আখতার মুকুল — *চল্লিশ থেকে একাত্তর*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২

এম আর মাহবুব — *যারা অমর ভাষা সংগ্রামী*, অনিন্দ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২

এম এ বার্ণিক — *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০২০

এস.এ মালেক ও অন্যান্য (সম্পা.) — *ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু*, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৯

ওয়াকিল আহমদ — *বাংলার মুসলিম সভা-সমিতির ইতিহাস (১৮৫৫-১৯৪৭)*, ঢাকা, ২০০৪

ওবায়েদুল্লাহ মামুন — *ভাষা আন্দোলনে নারী*, ঢাকা, ১৯৯২

কামাল হোসেন (সম্পা.) — *নূরজাহান মুরশিদ স্মারক গ্রন্থ*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

কাজী সিরাজুল ইসলাম, আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ও মো: জাহিদ হোসেন (সম্পা.) — *বাংলাদেশ : প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বিবৃতি, বাণী, নির্দেশ ও সাক্ষাৎকার-শেখ মুজিবুর রহমান*, বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমি, ঢাকা

কর্নেল শওকত আলী — *সত্য মামলা আগরতলা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২

কামরুদ্দীন আহমেদ — *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৬

——————— — *পূর্ব বাংলার সামাজিক ইতিহাস*, পাইওনিয়ার প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৭

——————— — *বাংলায় মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, ১ম খণ্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৭৫

কামাল হোসেন — *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা ১৯৬৬-১৯৭১*, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪

মুহাম্মদ বাকের (সম্পা.) — *টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, জেলা পরিষদ, টাঙ্গাইল, ১৯৯৭

খান মাহবুব — *টাঙ্গাইল জেলা পরিচিতি*, পলল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস — *ভাসানী যখন ইউরোপে*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭

খোকা রায় — *সংগ্রামের তিন দশক*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬

গালিব হরমুজ — *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, যশোর খণ্ড, বলাকা প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস যশোর, ২০০১

গাজীউল হক ও এম আর আখতার মুকুল — *বাহান্নোর ভাষা আন্দোলন*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৩১

জগলুল আলম — *বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা ১৯৪৮-১৯৮৯*, বাঙ্গালা গবেষণা, ঢাকা, ১৯৯০

জয়ন্ত কুমার রায় — *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

জাহানারা ইমাম — *একাত্তরের দিনগুলো*, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭

জুলফিকার হায়দার — *সংগ্রামী ঐতিহ্যের জাগ্রত চেতনা কৃষক নেতা হাতেম আলী খান*, প্রাঙ্গন প্রকাশন, ময়মনসিংহ, ২০০৩

জুলফিকার হায়দার — *টাঙ্গাইলের রাজনীতি ও মুক্তিযুদ্ধ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৮

জেবউননেছা (সম্পা.) — *আলোকিত নারীদের স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ*, প্রান্ত প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২

জয়নাল আবেদীন — *উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদী ও বামধারার রাজনীতি*, *প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, বাংলা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

ডি.এফ. মুল্লা — *মুসলিম আইনের মূলনীতি* (শেখ মতলুব আহমদ অনুদিত) আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৭

তোফায়েল আহমেদ (সম্পা.) — *যশোরের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*, তৃপ্তি বুক হাউজ, ঢাকা, ২০০১

তপন কুমার দে — *মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬

——————— — *বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের জীবনকথা*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫

তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭

তাবেদার রসুল বকুল ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল: জীবন ও কর্ম, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩

তারিক আলী *পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ জান্তা না জনতা* (অনুবাদ মাহফুজ উল্লাহ), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭

তাহমিনা খান *পূর্ব বাংলায় রাজনীতির সাংগঠনিক বিকাশ (১৯৪৭-১৯৫৭)*, সুবর্ণ প্রকাশনী ঢাকা, ২০১৪

——————— *পাকিস্তানের প্রথম দশকে পূর্ব বাংলার রাজনীতি*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬

দিরাজুর রহমান খান *আওয়ামী লীগের ইতিহাস প্রথম খন্ড ১৯৪৯-১৯৭১*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০১২

ধনঞ্জয় রায় (সম্পা.) *তেভাগা আন্দোলন*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০০

নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ *মুক্তিমঞ্চে নারী*, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

নেহাল করিম *জাতীয়তাবাদ উন্মেষ ও বিকাশ*, কৃষ্ণচুড়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১

নুরুল আমিন *আবুল মনসুর আহমদ* (জীবনী গ্রন্থমালা), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭

নাজিমুদ্দীন মানিক *একাত্তুরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলো*, প্রিয় বুক সেন্টার, ঢাকা, ২০০৪

নাজমুল হক নান্নু *ইতিহাসের ধারায় মওলানা ভাসানী*, ঢাকা , ২০১১

নাসিম আনোয়ার ও সুজাতা হক (সম্পা.) *আমাদের গাজীউল হক*, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১

পান্না কায়সার *মুক্তিযুদ্ধ: আগে ও পরে*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১

প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম *প্রবন্ধ মঞ্জুষা*, স্ববিকাশ পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৯

ফয়েজ আহমদ *আগরতলা মামলা, শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪

ফকরুল আলম (সম্পা.) *বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা (২০২০-২০২২)*, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২২

ফরিদা আখতার (সম্পা.) *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯১

————————————— *শত বছরে বাংলাদেশের নারী*, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯৯

ফরিদা ইয়াসমিন *ভাষা আন্দোলন ও নারী*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫

ফোরকান বেগম *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তি সংগ্রামে নারী*, সুমী প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, ঢাকা, ১৯৯৮

বিভুরঞ্জন সরকার (সম্পা.) স্মারক গ্রন্থ *কৃষক নেতা হাতেম আলী খান*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

বিমলানন্দ শাসমল *ভারত কী করে ভাগ হলো*, ইউনিভার্সাল বুক সাপ্লাই, কলকাতা, ১৯৯১

বদরুন নাহার খান *মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান*, জয়বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৯

বদরুদ্দীন উমর *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২ (প্রথম সংস্করণ ১৯৭০)

———————— *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, দ্বিতীয় খণ্ড*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২ (প্রথম সংস্করণ ১৯৭৫)

———————— *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, তৃতীয় খণ্ড*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫ (প্রথম সংস্করণ ১৯৮৫)

———————— *বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি*, ঢাকা, শ্রাবণ প্রকাশনী, ১৯৯১

বশীর আল হেলাল *ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

বাংলা একাডেমি (সম্পা.) *একুশের সংকলন ৮০*, স্মৃতিচারণ বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮০

মওলানা ভাসানী *মাও সে তুঙ এর দেশে*, পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৫

মইনুল হোসেন (সম্পা.) *অবিস্মরণীয় মানিক মিয়া*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫

মযহারুল ইসলাম *ভাষা আন্দোলন ও শেখ মুজিব*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩

মেহেরুন্নেসা মেরী *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা প্রথম খণ্ড*, ন্যাশনাল পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০০০

———————— *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তিযোদ্ধা, দ্বিতীয় খণ্ড*, ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২

মো. মাহবুবর রহমান *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯

মো. লুৎফর রহমান (সম্পা.) *টাঙ্গাইল জেলার গুণীজন*, ছায়ানীড় প্রকাশনী, টাঙ্গাইল, ২০১০

মোনায়েম সরকার (সম্পা.) *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবন ও রাজনীতি প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ২০০৮

মোহাম্মদ হাননান *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির *স্বাধিকার আন্দোলন ও শামসুল হক*, শামসুল হক ফাউন্ডেশন, টাঙ্গাইল, ১৯৯২

মোহীত উল আলম, আবু মো. দেলোয়ার হোসেনের (সম্পা.) *মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা ১৯৭১*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০

মওদুদ আহমদ — *বাংলাদেশ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৬
মহসিন শস্ত্রপাণি (সম্পা.) স্মারক গ্রন্থ — *মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী*, পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪
মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক — *আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১
মালেকা বেগম — *বাংলার নারী আন্দোলন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ২০০২
——————— *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১
——————— *একাত্তরের নারী*, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০০১
মালেকা বেগম (সম্পা.) — *রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭
মাহমুদ কামাল — *টাঙ্গাইলের স্মরণীয় বারো মনীষী*, ঢাকা, ২০০৩
মফিদা বেগম — *আওয়ামী লীগ রাজনীতি নারী নেতৃত্ব ১৯৪৯-২০০৯*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০
মফিদুল হক — *আবুল হাশিম* (জীবনী গ্রন্থমালা), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯০
মহিউদ্দিন আহমদ — *আওয়ামী লীগ উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০*, প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬
মুহম্মদ আবদুর রহিম, আবদুল মমিন চৌধুরী, এ.বি.এম মাহমুদ, সিরাজুল ইসলাম — *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০৫
মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায় — *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫
মুনতাসীর মামুন — *আলবদর ১৯৭১*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩
——————— *তাজউদ্দিন আহমদ: এক তরুণের রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯
——————— *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ*, *প্রথম খণ্ড*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০
মুনতাসীর মামুন (সম্পা.) — *একাত্তরের বিজয়গাথা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২
——————— *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, *তৃতীয় খণ্ড*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ — *বাংলায় খেলাফত অসহযোগ আন্দোলন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯৬
——————— *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা (১৯০৫-১৯৪৭)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫
মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক — *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯৩
মো: আনোয়ার হোসেন — *বৃহত্তর যশোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০
মো: এমরান জাহান — *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮
——————— *আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস ফরাসি বিপ্লব থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৭৮৯-১৯৪৫*, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৪
মো: হযরত আলী সিকদার — *টাঙ্গাইলের অগ্নিপুরুষ শামসুল হক*, ফাল্গুনী, টাঙ্গাইল সমিতি, টাঙ্গাইল, ১৯৭৮
মো: হাবিবউল্লাহ্ বাহার — *টাঙ্গাইল জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯
——————— *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫
মিনার মনসুর — *ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত* (জীবনী গ্রন্থমালা), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬
মিজানুর রহমান চৌধুরী — *রাজনীতির তিনকাল*, হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০১
মিজানুর রহমান — *আবুল মনসুর আহমদের চিন্তাধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০০৮
মোরশেদ শফিউল হাসান — *ভাষা সংগ্রামী নাইমউদ্দিন আহমদ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭
——————— *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা ১৯৪৭-১৯৭০ দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭
মোহাম্মদ সেলিম — *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় আন্দোলন*, *সশস্ত্র সংগ্রাম ও স্বাধীনতা*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২২
মোহাম্মদ হাননান — *বাঙালির ইতিহাস*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮
মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান তালুকদার (সম্পা.) — *হুসেইন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর স্মৃতিকথা*, ঢাকা, ১৯৮৮
মোঃ ইদ্রিস আলী ইমন — ৭১'র যুদ্ধ কন্যা, তৃণলতা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮
যতীন সরকার — *পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩
রব্বানী চৌধুরী — *সিলেটের ইতিহাস সমগ্র*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২
রফিকুল ইসলাম (সম্পা.) — *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০০

———————	*আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১
রফিকুল ইসলাম	*বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬
—————	*মুক্তিযুদ্ধের বীর বাঙালীদের জীবনকথা*, বসুন্ধরা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫
রীতা ভৌমিক	*বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী*, মীরা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮
রতন লাল চক্রবর্তী	*সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬
রেজোয়ান সিদ্দিকী	*পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬
রাও ফরমান আলী (অনুবাদ-শাহ আহমদ রেজা)	*বাংলাদেশের জন্ম*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৭
রোকেয়া কবীর, মুজিব মেহদী	*মুক্তিযুদ্ধ ও নারী*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২
রুকুনউদ্দৌলাহ	*মুক্তিযুদ্ধে যশোর*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯
লে. ক. আবদুর রউফ	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার জীবন, প্যাপিরাস প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২
শাহানা পারভীন লাভলী	*মুক্তিযুদ্ধে শহীদ নারী*, অনির্বাণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২০
——————	*বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে নারী*, শামস পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০২২
শাহ আহমদ রেজা	*ভাসানী, কাগমারী সম্মেলন ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম*, গণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬
শেখ হাফিজুর রহমান	*বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট*, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮
শহীদ আশরাফ (সম্পা.)	*শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ*, ঢাকা, ১৯৭১
শ্রী তারাপদ দাস	*মুক্তিযুদ্ধে যশোর*, পূবালী প্রিন্টিং প্রেস, যশোর, ২০০০
শাকের হোসাইন শিবলি	*একুশের মাওলানারা*, মাহফিল প্রকাশন, ঢাকা, ২০২১
শাহরিয়ার কবির (সম্পা.)	*মওলানা ভাসানী রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৮
শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য (সম্পা.)	*ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫
শ্যামলী ঘোষ	*আওয়ামী লীগ, ১৯৪৯-১৯৭১*, (অনুবাদ: হাবীব উল আলম) ইউপিএল, ঢাকা, ২০০৭
শাহনাজ পারভীন	*বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭
—————	*মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩
শফিক ইমতিয়াজ	*টাঙ্গাইলের স্মরণীয় বারো মণীষী*, সাধারণ গ্রন্থাগার, টাঙ্গাইল, ২০০৩
সরদার ফজলুল করিম, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সেলিনা হোসেন, আনিসুজ্জামান ও সাঈদা জামান	*বাংলাদেশের নারী চরিতাভিধান*, দি রয়েল পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১
সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য (সম্পা.)	*সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, *১ম খণ্ড*, বাংলাদেশ নারী প্রগতিসংঘ, ঢাকা, ১৯৯২
————————	*সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, *২য় খণ্ড*, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯৯
সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পা.)	*নারীর ক্ষমতায়ন : রাজনীতি ও আন্দোলন*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩
সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম (সম্পা.)	*বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, ঢাকা, ১৯৯৭
সেলিনা হোসেন	*একাত্তরের ঢাকা*, আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৯
সৈয়দ আবুল মকসুদ	*মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪
——————	*মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪
————— (সম্পা.)	*আবুল হাশিম তাঁর জীবন ও সময়*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮
সৈয়দ আমীরুল ইসলাম ও কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.)	*বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি: ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কট*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯
সৈয়দ ইরফানুল বারী (সম্পা.)	*রবুবিয়াত মওলানা ভাসানীর শেষ কথা*, মুক্তি মাণবী প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ২০১৩
সৈয়দ মনসুর আহমদ (সম্পা.)	আবুল হাশিম তাঁর জীবন ও সময়, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮
সৈয়দা শায়েলা তায়েফ	*নির্বাচন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচন*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯
সত্যেন সেন	*সংগ্রামী কৃষক নেতা হাতেম আলী খান*, (পুস্তিকা) ঢাকা, (প্রকাশের তারিখ নেই)
সাইফুল ইসলাম	*স্বাধীনতা–ভাসানী-ভারত*, বর্তমান সময়, ঢাকা, ১৯৮৭
—————	*আসাম ও মওলানা ভাসানী এবং লাইন প্রথা-বাঙালখেদা*, বর্তমান সময়, ঢাকা, ২০০২
সাজেদ কামাল (সম্পা.)	*সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২
সাঈদ-উর রহমান	*পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩
সাঈদুর রহমান	*পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩

সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.)	*বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭
সালাহউদ্দীন আহমদ	*বাংলাদেশ: জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা গণতন্ত্র*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩
সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু (সম্পা.)	*সংসদ বাঙালি চরিতাবিধান*, *প্রথম খণ্ড*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৩
সুনীল কান্তি দে	*বঙ্গবন্ধু মানিক মিয়া সম্পর্ক*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০২১
সুপা সাদিয়া	*বায়ন্নর ৫২ নারী*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬
————	*'৭১ এর একাত্তর নারী*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪
————	*মুক্তিযুদ্ধে শত শহিদ বুদ্ধিজীবী*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০২০
সুকুমার বিশ্বাস	*মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস্ ও অন্যান্য বাহিনী*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯
সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনা পরিষদ	*সুফিয়া কামাল স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা, ২০১১
সোনিয়া নিশাত আমিন (সম্পা.)	*ঢাকা নগর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০
সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ	*বাংলাদেশ গড়লেন যারা*, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩
————————	*শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭
————————	*মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩
সিরাজুদ্দিন হোসেন	*ইতিহাস কথা কও*, দীপায়ন, ঢাকা, ১৯৭৪
সিরাজ সিকদার	*'রচনা সংকলন'*, *প্রথম খণ্ড*, চলন্তিকা বইঘর, ঢাকা, ১৯৮২
—————	*রচনা সমগ্র*, শ্রাবণী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯
সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.)	*বাংলাপিডিয়া*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৩
—————————	*বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, *প্রথম খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩
সিরাজুল ইসলাম	*বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, চয়নিকা, ঢাকা, ১৯৮৪
হোসেন উদ্‌দীন হোসেন	*বাংলার বিদ্রোহ (৬০০-১৯৪৭)*, বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯
হারুন-অর-রশিদ	*৭ই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব-ঐতিহ্য সম্পদ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০২১
——————	*বঙ্গীয় মুসলিম লীগ*, *পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮
——————	*মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৯
——————	*বাংলাদেশ: রাজনীতি*, *সরকার ও শাসন তান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০)*, নিউএজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১
——————	*আমাদের বাঁচার দাবী ছয় দফার ৫০ বছর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬
হায়দার আকবর খান রণো (সম্পা.)	*মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীরা*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮
হামিদা রহমান	*মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও শহীদ বুদ্ধিজীবী*, মুক্তধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪
হাসান আবদুল কাইয়ুম (সম্পা.)	*মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৮
ড. কামাল হোসেন	*স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা ১৯৬৬-১৯৭১*, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪

গ্রন্থপঞ্জি: ইংরেজি

A. B. Rajput	*Muslim League Yesterday and Today,* Lahore, Pakistan, 1948
---------------	*The Cabinet Mission, 1946*, Lion Press, Lahore, 1946
Abul Hashim	*In Retrospection*, Mowla Brothers, Dhaka, 1974
Abul Mansur Ahmed	*End of A Betrayal and Restoration of Lahore Resolation*, Khoshroz Kitab Mahal, Dhaka, 1975
A. J. Kamra	*Prolonged Partition and its Pogroms: Testimonies on Violence against Hindus in East Bengal 1946-64,* New Delhi, 2000
A. K. Choudhury	*The Independence of East Bengal: A Historical Process,* Jatiya Grantha Kendra, Dhaka
A. M. A Muhit	*Bangladesh Emergence of a Nation,* Bangladesh Books International Ltd. Dhaka, 1978

A.F. Salahuddin Ahmed	*Bangladesh Tradition and Transformation*, Dhaka University Press Ltd. Dhaka, 1987
ASM Abdur Rab	AK Fazlul Huq (Life Achievement), Barisal, 1966
Aminur Rahim	*Politics and National Formation in Bangladesh*, UPL, Dhaka, 1997.
Ayesha Jalal	*The State of Martial Rule: The Origin of Pakistan's Political Economy of Defence, Vanguard Books, 1991*
D.R. Mankekar	*Pak Colonialism in East Bengal*, Somaiya Publications, New Delhi, 1971
Dominique Lapierre & Larry Collins	*Freedom at Midnight*, William Collins, UK, 1975
G.W. Choudhury	*Constitutional Development in Pakistan*, Longman Group Ltd. London, 1969
Harun-or-Rashid	*The Foreshadowing of Bangladesh, Bengal Muslim League and Muslim Politics 1936-1947*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1987.
Humaira Momen	*A Study of Krishak Praja Party and the Election of 1937*, Sunny House, Dacca, 1972
Joya Chatterji	*Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1932–1947* , Cambridge University Press, India, 2002
Judith M. Brown	*Gandhi: Prisoner of Hope*, Oxford University Press, 1990
Judith M. Brown	*Nehru : A Political Life*, Yale University Press, 2003
Jyote Sen Gupta	*History of Freedom Movement in Bangladesh*, Calcutta, 1974
Kali Prasad Mukhopadhyay	*Partition, Bengal and After: The Great Tragedy of India*, New Delhi, Reference Press, 2007
Kamal Hossain	Bangladesh: Quest for Freedom and Justice, UPL, Dhaka, 2013
Kamruddin Ahmad	*A Socio Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh*. Inside Library, Dhaka, 1975
Kazi Ahmed Kamal	*Sheikh Mujibur Rahman and Politics in Pakistan*, Kazi Giashuddin Ahmed, Dhaka, 1970.
Keith Callard, Pakistan	*A Political Study, London Ruskin House*, George Allen & Urwin Ltd., London, 1958
Khalid Bin Sayeed	Pakistan: *The Formative Phase, Pakistan*, Publishing House, Karachi, 1968
---------------------	*The Political System of Pakistan*, Oxford University Press, London, 1967
Louis Fischer	*Gandhi: His Life and Message for the World*, HarperCollins, 1983
M. Rafiqul Islam	*The Bangladesh Liberation Movement, International Legal Implications*, UPL, Dhaka, 1987.
M.A. Hannan	*Mohammad Ali (Bogra): A Biographical Sketch*, M.S Huq Publishers, Dhaka, 1967
Mohammad H.R. Talukdar (Edited)	*Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, The University Press Ltd. Dhaka, 1987
Muhammad Ghulam Kabir	*Minority Politics in Bangladesh*, Vikash Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1980
Mushtaq Ahmad	*Government and Politics in Pakistan*, Pakistan Publishing House, Karachi, 1963
Muzaffer Ahmed Chaudhuri	*Government and Politics in Pakistan*, Puthighar Ltd. Kolkata

Nair Bhaskaran	*Politics in Bangladesh: A Study of Awami League 1949-58*, Northern Book Centre, Kolkata, 1990
Najma Chowdhury	*The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature, 1947-58*
Rangalal Sen	*Political Elites in Bangladesh*, Dhaka University Press Limited, Dhaka, 1986
Rehman Sobhan	*Untranquil Recollection: The Years of Fulfilment*, Sage Publication, New Delhi, 2016
Rounaq Jahan	*Pakistan: Failure in national integration*, UPL, Dhaka, 2001
S A Karim	*Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy*, U.P.L. Publications, Dhaka, 2009
Safdar Mohmud	*Pakistan Political Roots and Development, 1947-1999,* Oxford University Press, Karachi, 2004
Sarat Chandra Bose	*I Warned my Countrymen*, Netaji Research Bureau, Calcutta, 1968
Shila Sen	*Muslim Politics in Bengal 1937-47,* New Delhi, 1976
Shyamoli Ghosh	*The Awami League 1949-71,* Academic Publisher, Dhaka, 1990
Talukder Maniruzzaman	*The Politics of Development the Case of Pakistan (1947-1958),* Green Book House Ltd. Dhaka, 1971
Talukder Maniruzzaman	*Radical Politics and the Emergence of Bangladesh*, Bangladesh Books International Ltd., Dacca, 1975
Tathagata Roy	*My People Uprooted*, Ratna Prakashan, Kolkata, 2002
Talukder Maniruzzaman	*The Bangladesh Revolution and its Aftermath*, UPL, Dhaka, 1988

প্রকাশিত থিসিস:

Rana Razzaque	*Some Aspects of Bengali Muslim Social and Political Thought (1918-1947*, published Ph.D thesis, Dhaka University, 1997
মোস্তারী আহমেদ	*বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" এর ভূমিকা*, প্রকাশিত এমফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬
মো. এমরান জাহান	*বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশীয় সংবাদ পত্রের ভূমিকা (১৯৪৭-১৯৭১)*, প্রকাশিত পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, ২০০৪
মোহাম্মদ খায়রুল আহসান ছিদ্দিকী	*বাংলাদেশের রাজনীতি ১৯৫৩-১৯৬৬*, প্রকাশিত পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫
সুলতানা নিগার চৌধুরী	*বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী চিন্তা (১৯৪৭-১৯৭১)*, প্রকাশিত পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬

পরিশিষ্ট-১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের (১৯৭১) ঐতিহাসিক ভাষণ
(টেপ রেকর্ড থেকে লিপিবদ্ধ)

আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইরে রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাংলাদেশের করুণ ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস- এই রক্তের ইতিহাস মুমূর্ষ মানুষের করুণ আর্তনাদ- এদেশের করুণ ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খাঁ মার্শাল-ল জারী করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬-দফা আন্দোলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খাঁর পতনের পরে ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন- আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলায় নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করেছিলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিতে। তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসে প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো- এমনকি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনের মতেও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেবো।

ভুট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম- আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো- সবাই আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বর যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যে যাবে তাদের মেরে ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। আর হঠাৎ ১ তারিখ এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হোল।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হোল। দোষ দেওয়া হোল বাংলার মানুষের, দোষ দেওয়া হোল আমাকে। দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুণ। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোল। আমি বললাম, আমরা জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য, আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরীব-দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে - তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু- আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন আমি ১০ তারিখে রাউন্ডটেবিল কনফারেন্স ডাকবো।

আমি বলেছি, কিসের এসেমব্লি বসবে; কার সঙ্গে কথা বলবো? আপনারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবো? পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের উপর, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন। দায়ী আমরা!

২৫ তারিখ এসেমব্লি ডেকেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ১০ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে, এসেমব্লি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল-ল withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভেতর ঢুকতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে আমরা বসতে পারিনা।

আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশের কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুরগাড়ী, রেল চলবে- শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি ১টি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়। তোমাদের কাছে অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলী করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দূর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর ৭ দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হোল কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখুন শত্রু পিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই, বাঙালী, অ-বাঙালী তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারবে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।

এই দেশের মানুষকে খতম করবার চেষ্টা চলছে- বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন এবং আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি আরো রক্ত দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে তুলবো ইনশাআল্লা। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

উৎস্য: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৭০৩-৭০৫*

পরিশিষ্ট-২

১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা

দীর্ঘ নয় বৎসর ধরে ক্রমাগত সংগ্রাম করার পর এই সর্বপ্রথম আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে ও পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতা পেলো। এ-ক্ষমতা নিরংকুশ নয়, অন্যান্য পার্টির সহযোগিতা নিতে হয়েছে এ ক্ষমতা পেতে, তবু অনেকের মনে হতে পারে, আমরা বিরাট জয়লাভ করেছি, মন্ত্রীরা দেশ শাসন করুক, আমরা বাড়ীতে বিশ্রাম নেই।

যদি কারও এরূপ ধারণা হয়ে থাকে তবে তা সম্পূর্ণ ভুল। এ ভুল যত শিগগির ভাংগে ততই মঙ্গল। আপনারা মুসলিম লীগের ইতিহাস বিস্মৃত হবেন না। একদা মুসলিম লীগ ছিল পাক-ভারতের মুসলমানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান কায়েম হবার পর তার ক্ষমতা ও মান-মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। বস্তুত ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখে পাকিস্তান কায়েম হবার সময় পাকিস্তানে অন্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বই ছিল না। আমি নিজেত বটেই, আজ যারা এখানে সমবেত হয়েছেন তাদেরও অধিকাংশ মুসলিম লীগের সভ্য ছিলেন। জনসাধারণের অগাধ বিশ্বাস ছিল তখন মুসলিম লীগের উপর। পাকিস্তানকে শক্তিশালী, সুন্দর ও দুর্নীতি-কালোবাজারী প্রভৃতি সর্বপ্রকার কলুষ থেকে মুক্তি করার অপরিসীম আগ্রহ ও কর্মপন্থা সকল দেশের সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু মাত্র ৯টি বৎসর না যেতেই আজ মুসলিম লীগ জনসাধারণের মন থেকে ধুয়ে মুছে গেল। এত বড় একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এরূপ অবস্থা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বিগত সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের যে হার হয়েছে সে রূপ হার পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালে কোন ক্ষমতাসীন দলের হয়নি।

কেন এমন হলো? কেন মুসলিম লীগের এমন শোচনীয় মৃত্যু হলো? আওয়ামী লীগ কর্তৃক কেন্দ্রে ও প্রদেশে আংশিক ক্ষমতা অধিকারের পর বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মনে রাখতে হবে যে, অতন্দ্র দৃষ্টি এবং সর্বদা তীক্ষ্ণ প্রহরাধীন না রাখলে ক্ষমতা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু যত শিগগির ডেকে আনে তত শিগগির আর কিছুতে আনে না। বিরোধী দল হিসাবে দু'একটা ভুল করলে সর্বসাধারণ অনেক সময় ক্ষমা করে থাকে, কিন্তু ক্ষমতাসীন দল হিসাবে ভুল করলে সে ভুলের ক্ষমা নেই।

মুসলিম লীগ কি কি ভুল করেছিল তার একটি হিসাব নিলেই আমাদের পক্ষে সাবধান হওয়া সহজ হবে বলে নিম্নে আমার জ্ঞান বুদ্ধিমত মুসলিম লীগের ভুলগুলি একে একে বলছি ঃ

প্রথমতঃ ক্ষমতা তাদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছিল। তার প্রমাণ পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি লোকের মতামত না নিয়ে মুসলিম লীগ করাচীতে রাজধানী নিয়ে গেল, উর্দু রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা করল এবং সর্বোপরি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থ ও চাকরি বণ্টনে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে চললো।

দ্বিতীয়তঃ তারা ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনলেন। নিছক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে যার জন্ম সেই মুসলিম লীগের দোষত্রুটির ন্যায্য সমালোচনাকে তারা ইসলাম বিরোধিতা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করে জনমনে একটা ত্রাসের সঞ্চার করার প্রচেষ্টায় মত্ত হলো।

তৃতীয়তঃ মুসলিম লীগ নেতাদের অধিকাংশের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের অনুশাসন রক্ষিত হওয়ার নামমাত্র চিহ্ন পরিলক্ষিত না হলেও তারা রাজনৈতিক সভাসমিতিকে প্রধানতঃ ধর্মমূলক ওয়াজ-নসিহতের জলসায় পরিণত করলেন।

চতুর্থতঃ মুসলমানের আল্লাহ এক, ধর্ম এক, রসুল এক এবং কেতাব এক– এই যুক্তিতে রাজনৈতিক দলও হবে এক বলে প্রচার চালালেন তারা। একই যুক্তিতে তারা বলে যেতে লাগলেন বিরোধী দল মাত্রই রাষ্ট্রদ্রোহী।

পঞ্চমতঃ মুসলিম লীগের কর্ণধারগণ পাকিস্তানকে তাদের ব্যক্তিগত জমিদারী মনে করে নিজেদের ব্যাংক ব্যালেন্স এবং সম্পত্তি ইত্যাদির জন্য রাষ্ট্রের ধন ও সম্পদ নির্লজ্জ লুণ্ঠনে মত্ত হলেন। লীগের উপরের স্তরের লোকগণ চরম দুর্নীতি, চোরাকারবারি এবং স্বজনপ্রীতিতে গা ভাসিয়ে দিলেন, এ অবস্থা যখন সরকারী কর্মচারীগণের কাছে ধরা পড়লো তখন তাদেরও অনেকে পাকিস্তান লুণ্ঠনের কার্যে অবতীর্ণ হলেন (গোলাম মুহম্মদের জামাতা হোসেন মালিক ফ্রান্স থেকে ওয়াগন কেনার নামে কেন্দ্রীয় সরকারের ৪৬ লাখ টাকা ৭/৮ বৎসর ধরে ব্যক্তিগত তহবিলভুক্ত করে রেখেছেন)। পাকিস্তান হবার পর মুসলিম লীগের নেতা, উপনেতা ও সরকারী কর্মচারীদের অনেকেই আংগুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন। তাদের সম্পত্তি কিভাবে অর্জিত হলো যদি তার তদন্ত কোন দিন হয় তবে পাকিস্তান লুণ্ঠনের যে চিত্র জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়বে, তা অতীতের সমস্ত রাজনৈতিক অসততা, দুর্নীতি, ফেরেববাজি ও চুরিচামারিকে হার মানাবে।

ষষ্ঠতঃ পাকিস্তানের মালিক হওয়ামাত্র মুসলিম লীগ নেতাগণ নিজেদের ক্ষমতা ও যোগ্যতার সীমারেখা ভুলে গেলেন। একথা অস্বীকার করা চলে না যে, পাক-ভারত উপমহাদেশে থেকে ক্ষমতাচ্যুত হবার পর মুসলমানদের সমাজ জীবন গোমরাহী ও মূর্খতায় নিমজ্জিত হয়। সেই গোমরাহী ও মূর্খতা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা প্রচেষ্টা করতে থাকে মাত্র বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে। ভারতীয় মুসলমানদের সমাজ জীবনে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে থাকে মাত্র বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে। সে গড়া আজও শেষ হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে যদিও তা আজ অনেকটা সুদৃঢ়; কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তা আজও গড়েনি। মুসলিম লীগ নেতাগণ এই ঐতিহাসিক সত্য ভুলে গেলেন, তারা নিজেদের মনে করতে লাগলেন পরম ও চরম বিজ্ঞতার অধিকারী ও নির্ভুল। ফলে মূর্খতার সংগে অহমিকা বা ইংরেজীতে যাকে বলে এরোগেন্স, তার মিশ্রণ হলো। মূর্খ নিজের মূর্খতা স্বীকার করে কার্যে অবতীর্ণ হলে এবং অপরের গঠনমূলক উপদেশাদি গ্রহণে রাজী হলে তা তেমন দৃষ্টিকটু হয় না। কিন্তু মূর্খতা ও আত্মম্ভরিতার মিশ্রণ একেবারেই অসহ্য।

সপ্তমতঃ মুসলিম লীগ অর্থনীতিকে রাজনীতির সংগে মিশিয়ে ফেললেন। রাজনীতিতে অনেক সময় জনগণের ভাবালুতা কাজে লাগাতে হয়। কিন্তু অর্থনীতি বর্তমান জগতে বিজ্ঞানের একটি শাখা। সুতরাং ভাবালুতাভিত্তিক অর্থনীতি আধুনিক জগতে একেবারেই অচল। বাণিজ্যের মূল কথাই হলো লাভ-লোকসান। চরম শত্রুর সংগেও লাভ হলে ব্যবসা করতে হয়। কিন্তু লীগ কর্ণধাররা বাণিজ্যের মূলনীতি বিস্মৃত হয়ে ভারতের সংগে কায়কারবার প্রায় বন্ধ করে দিলেন। স্বাধীনতার পর ভারত পাকিস্তান থেকে ৪০ লাখ বেল পাট ও ১৫ লাখ বেল তুলা কিনত, কিন্তু আজ কেনে মাত্র দশ লাখ বেল পাট। ভারত পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করল, আমরা অবলম্বন করলাম "পাট উৎপাদন কমাও নীতি"। মুসলিম লীগ সরকার চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সংগে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে বহুকাল ইতস্ততঃ করেছে। এখানেই শেষ নয়, দুনিয়ার সব দেশ যখন মুদ্রার মূল্যমান কমিয়ে দেয় তখন এই একাউন্টেন্ট অর্থনীতি বিশারদরা পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্যমান পূর্ব হারেই রেখে দেন, কিন্তু এর থেকে যে লাভ হলো তার এতটুকুও দেশের জনসাধারণকে পাইয়ে দেবার কোন ব্যবস্থা করলেন না। এরা দেশের দুই অংশের মধ্যে স্বর্ণের দু'রকম মূল্য নির্ধারণ করে কার্যত পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বীকার করেও, নিজেদের স্বার্থোদ্ধার ও পূর্ব পাকিস্তানকে লুণ্ঠনের জন্যে উভয় পাকিস্তানকে এক অর্থনীতির জোয়ালে আবদ্ধ করে লাঙ্গল ধরলেন। এই অশ্রুতপূর্ব মূর্খতার ফলে আজ পাকিস্তানী অর্থনীতি বিপর্যস্ত; জনসাধারণ আজ অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন, পূর্ব পাকিস্তান আজ ভিখারীর দেশে পরিণত : অপর যে-কোন সভ্য দেশে রাষ্ট্র পরিচালকগণের মধ্যে মূর্খতা ও আত্মম্ভরিতার এরূপ একত্র সমাবেশ হলে দেশের লোকের বিচারে তাদের গুরুতর শাস্তি হতো।

অষ্টমতঃ ইংরেজ আমলের মাথাভারি শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করা দূরের কথা, মুসলীম লীগ তাকে পূর্বাপেক্ষাও মাথাভারি করতে প্রস্তুত হলেন। যে দেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয় এখন পর্যন্ত সম্ভবতঃ একশত টাকার উর্ধ্বে নয়, সেই দেশে বার্ষিক দু'তিন লাখ টাকা পর্যন্ত আয়ের পদ রাখার নজীর বর্তমান দুনিয়ায় নেই। গ্রেট বৃটেনের মত উন্নত দেশের প্রধানমন্ত্রীর বেতনের চাইতে বেশী এদেশের অনেকের মাসিক বেতন। পাকিস্তানের মত দরিদ্র দেশের বৈদেশিক দূতাবাস, ট্রেড কমিশন, ডেলিগেশন প্রভৃতির সংখ্যা কানাডা ও বৃটেনের মত উন্নত রাষ্ট্রের চাইতেও সম্ভবতঃ অনেক বেশী, অথচ অতি সহজেই একটি বৈদেশিক দূতাবাস থেকে অনেক ক্ষেত্রে একাধিক দেশে কাজ করতে পারে।

মোট কথা, মুসলিম লীগ মুখে ধর্মের জিগির এবং কার্যত দেশের জনসাধারণকে ইংরেজ আমল অপেক্ষাও দারিদ্র্যে নিমজ্জিত করে দেশকে ভিক্ষুকের দেশে পরিণত করার যে অদম্য উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় মত্ত হলো, তার নজীর কোন ইতিহাসে নেই। তাদের এই প্রচেষ্টার ফলে দেশ আজ দৈনন্দিন খরচের জন্য পরমুখাপেক্ষী। বিদেশের অর্থ সাহায্য ছাড়া আজ পাকিস্তান অচল। এজন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়ার মত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে দেশ।

বিরোধী দলের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের জন্যে সরকারী দলের মতই সমান প্রয়োজন বলে মনে করতে হবে। বিরোধী দলের 'শির কুচল' দেওয়ার কল্পনা পরিত্যাগ করতে হবে। বিরোধী দলের কারও দেশপ্রেমে সন্দেহ প্রকাশ করার নীতি বর্জন করতে হবে। মোট কথা, পূর্ণ পার্লামেন্টারী শাসন এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হবে আমাদের লক্ষ্যস্থল।

ইতিহাস সাক্ষী, কোন দেশের জনসাধারণ কোন কালেই ভুল করেনি। যারা বলেন যে, নিরক্ষরতা বা অজ্ঞতার জন্য জনসাধারণ ভুল করতে পারে, সুতরাং জনসাধারণের উপর পূর্ণ আস্থা রাখা যায় না, তাদের সংগে জনসাধারণের কোন পরিচয় নেই। সমবেতভাবে জনসাধারণ যদি ভুলই করত, তবে তারা পাকিস্তান আনতে পারত না। পূর্ব বাংলার বিগত সাধারণ নির্বাচনে জনতা যে অপূর্ব রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রমাণ দিয়েছে, তার তুলনা নেই।

এখন পর্যন্ত আমাদের অনেক কাজ বাকী। একুশ দফা ওয়াদার মূল দফা এবং আওয়ামী লীগ ম্যানিফেষ্টোরও প্রধান কথা হল পররাষ্ট্র, মুদ্রা এবং দেশরক্ষা বিভাগ ছাড়া আর সকল বিভাগের ভার প্রদেশকে দিতে হবে। কারণ যতদিন না পূর্ব পাকিস্তান তার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করার পূর্ণ ক্ষমতা পাচ্ছে, যতদিন না শিল্প ও বাণিজ্য, রেলওয়ে, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি বিভাগগুলির পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থানীয় সরকারের হাতে আসছে, যতদিন না পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক বিচারে দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইউনিট বলে স্বীকার করা হচ্ছে– ততদিন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সম্ভব নয়।

বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ আর একটি ওয়াদা। সমস্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের খেসারত দিতে হলে পূর্ব পাকিস্তানকে অন্ততঃ ৬০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপই দিতে হবে, টাকা দেওয়ার মতো ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নেই। যে টাকা জমিদার-তালুকদারদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেওয়ার ব্যবস্থা বর্তমান আইনে আছে, সে টাকা দ্বারা এদেশে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে কর্মক্ষম জমিদার-তালুকদারদের যোগ্যতামত নিয়োগ করা যেতে পারে। সংগত মনে হলে ঐ সকল শিল্পের কিছু শেয়ারও তাদের দেয়া যেতে পারে।

শিক্ষা–পূর্ব পাকিস্তানে ১৬% মাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার ওয়াদায় আমরা আবদ্ধ। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ হাজার এখন ৩০-৩৫ হাজার; হাইস্কুল ও হাই-মাদ্রাসা মিলে ছিল প্রায় ২ হাজার, এখন কাগজেপত্রেই মাত্র ১৪ শত। মধ্যে ইংরেজী ও জুনিয়র মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল প্রায় ২,৫০০, এখন নেই বললেই চলে। শিক্ষকের সমস্যা আরো গুরুতর– প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন সরকারী ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চেয়েও কম।

সামরিক বিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে আমরা বলেছি; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সামরিক বিভাগের নিয়োগ থেকে পূর্ব পাকিস্তানী যুবকরা চিরকালের জন্য বঞ্চিত থাকবে। সামরিক বিভাগের ২ লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে ৫% জনও পূর্ব পাকিস্তানী নয়। পাকিস্তান সরকার দেশরক্ষা খাতে বৎসরে রাজস্ব খাত থেকেই প্রায় সত্তর কোটি টাকা ব্যয় করেন, এছাড়া বৈদেশিক সাহয্য তো আছেই। এই টাকার পনেরো আনাই ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অথচ দেশ রক্ষার অধিকার সকলের সমান। জাপানী ও চীনাদের মত খর্বকায় ব্যক্তিরা যুদ্ধের উপযোগী হতে পারলে পূর্ব পাকিস্তানী যুবকরা সামরিক বিভাগের জন্য উপযোগী কেন হবে না তা বুঝে ওঠা কঠিন। আমরা সংখ্যাসাম্য মেনে নিয়েছি দেশের সকল ব্যাপারে সংখ্যাসাম্য ভোগ করব বলে– কেন্দ্রীয় সরকারের মোট খরচের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ থেকে বঞ্চিত হবার জন্যে নয়।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বর্গমাইলে প্রায় নয়শত লোক বাস করে; পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা এক শতেরও কম। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানে শত ইচ্ছা করলেও কৃষির খুব উন্নতি করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা হল পশ্চিম পাকিস্তানে যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যাপকভাবে শিল্পায়িত করা। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করার কার্যে এ পর্যন্ত চরম অবহেলা প্রদর্শন করে আসছেন। পশ্চিম পাকিস্তানে তারা সমস্ত ভারী শিল্প কেন্দ্রীভূত করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত এবং এখানকার ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির জন্য পূর্ব পাকিস্তানীদের কর্তৃত্বাধীন একটি বৃহদাকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজন। প্রাদেশিক সরকারের উদ্যোগেই এই শ্রেণীর একটি ব্যাংক অনতিবিলম্বে স্থাপিত হওয়া দরকার।

পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবসারত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর সদর অফিস করাচীতে করে অনেক ব্যবসায়ী ইনকামট্যাক্স ফাঁকি দেবার সুযোগ পাচ্ছে। অপর দিকে পূর্ব বাংলার ছোটখাটো শিল্প ও ব্যবসায়ের মালিকগণ একতরফা ইনকামট্যাক্সের চাপে নিষ্পিষ্ট হয়ে অনেকে কারবার গুটাতে বাধ্য হচ্ছে। এরূপ অবস্থার প্রতিকার দরকার। যাতে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প গড়ে ওঠে তজ্জন্য পূর্ব পাকিস্তানী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবে– প্রয়োজনমতো বিশেষ সুবিধাও দিতে হবে।

পাকিস্তানের গণতন্ত্রও পূর্ব পাকিস্তানের অনুকূল হ'ল না। ইহা সংশোধনের জন্য আওয়ামী লীগকে সক্রিয় হতে হবে।

আমলাদের বেতন ৪-৫ হাজার টাকা। এর প্রতিকারের জন্য আওয়ামী লীগকে আন্দোলন চালাতে হবে। এ আন্দোলন গণতন্ত্র কায়েমের আন্দোলন, শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের হাত থেকে জনগণের হাতে ক্ষমতা নেওয়ার আন্দোলন।

পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য– 'বিভেদ সৃষ্টি কর এবং শাসন কর'– শত শত বৎসরের এই সাম্রাজ্যবাদী নীতি এশিয়া, আফ্রিকার ব্যর্থ হউক–দুনিয়ার নিরবচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপনের পক্ষে প্রবল জনমত গড়ে উঠুক।*

উৎস্য: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৫-৫৯৮
*ভাষণটিকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে

পরিশিষ্ট-৩

কাগমারী সম্মেলনের মূল প্রচারপত্র

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর
উদ্যোগে

পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন

স্থান :—কাগমারী—সন্তোষ

৮ই হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী

মূল সভাপতি :— ডাঃ কাজী মোতাহার হোসেন

কর্মসূচী

প্রবন্ধ পাঠ :— আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মনীষিবৃন্দের বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান :— কবিগান, জারিগান, ভাটিয়ালী, মারফতী, মুর্শেদী, বিচ্ছেদ, ধুয়া, গণ সংগীত, পল্লীগীতি, যন্ত্রসংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান।

অংশ গ্রহণ করিবেন :—

রমেশ শীল, তসের আলী, মোছলেম, রামসিং, মজিদ মিয়া, সুখেন্দু চক্রবর্তী ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য জেলার
এবং
পশ্চিম পাকিস্তানের লব্ধ প্রতিষ্ঠ শিল্পীবৃন্দ।

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭, রবিবার

সকালের অধিবেশন :—প্রবন্ধ পাঠ

১। প্রফেসার হুমায়ুন কবীর—(to be announced)
২। জনাব শওকত ওসমান—আধুনিক বাংলা সাহিত্য
৩। জাপানের সাংস্কৃতিক জীবন— (to be announced)
৪। মাদাম আজুরী—'on the Art of Dance'
৫। ডাঃ এস, [illegible]—"উন্নত ধরনের কৃষির জন্য সরকারী ও অন্যান্য সাহায্যের ব্যবহার।"
৬। ডাঃ [illegible] খান [illegible]—"বিদেশ শস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা ও পন্থা।"
৭। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক—(to be announced)
৮। ডাঃ [illegible]—"পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি ব্যবস্থা।"
৯। ডাঃ [illegible] ইসলাম—"পাকিস্তানের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন।"
১০। জনাব বি, এস, আহসান—"পূর্ব পাকিস্তানের সেচ ব্যবস্থা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ।"
১১। ডাঃ আমজাদীন আহমদ—"on Heart Disease."
১২। ডাঃ এস, এম, নবী—পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে মেডিকেল এসোসিয়েশনের ভূমিকা।"
১৩। প্রিন্সিপাল [illegible]—"পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ।"

বিকাল :—দৃশ্য পরিদর্শন

সন্ধ্যা :—৬—৩০ মিঃ হইতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (বিস্তারিত বিবরণ যথাসময়ে ঘোষণা করা হইবে)

পাইওনিয়ার প্রেস—ঢাকা।

কাগমারি সম্মেলনের মূল প্রচারপত্র

উৎস্য: সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৪৯৮

পরিশিষ্ট-৪

মওলানা ভাসানীর পদত্যাগপত্র

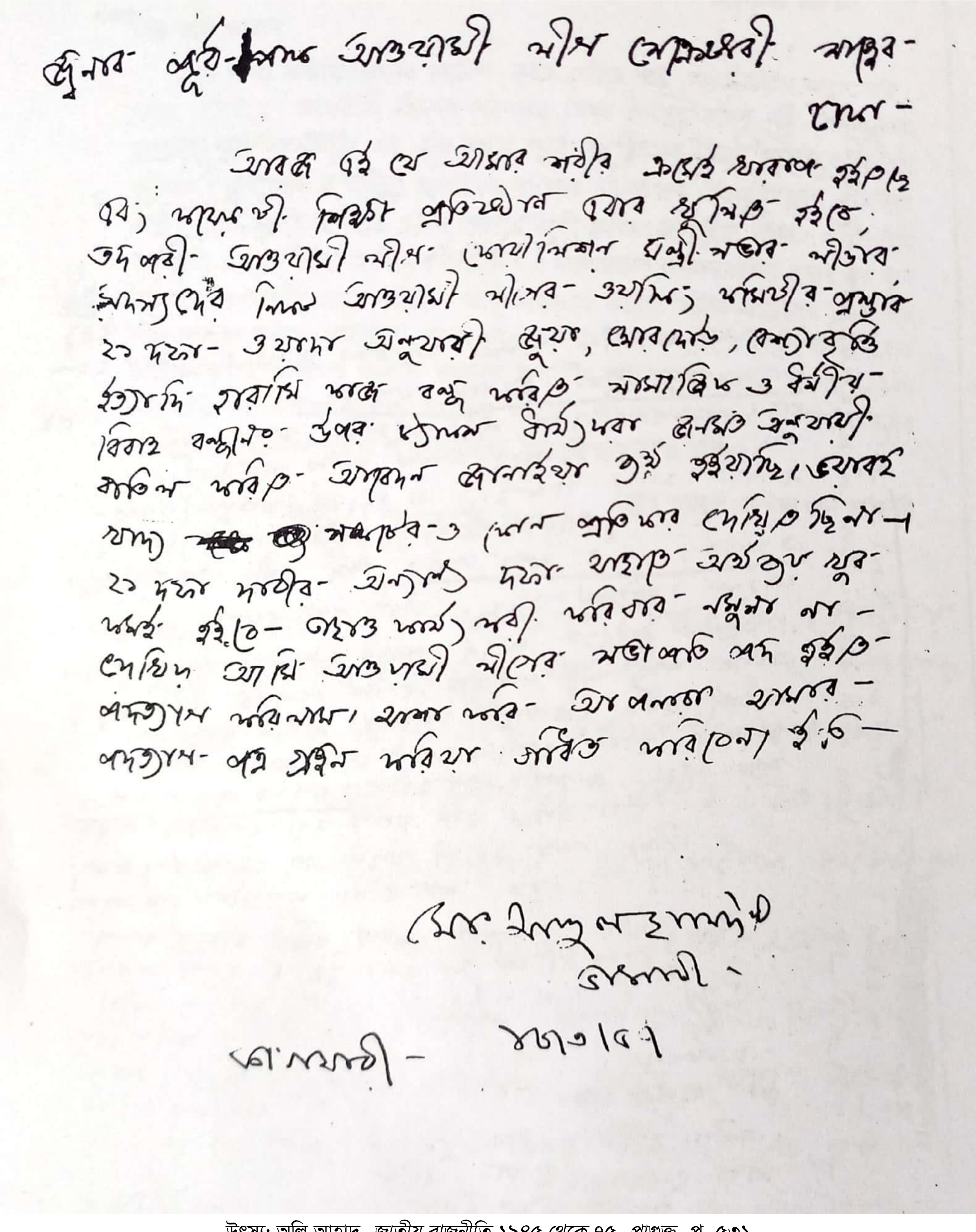

জনাব পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী সাহেব-
সমীপে -

আরজ এই যে আমার শরীর ক্রমেই খারাপ হইতেছে এবং, সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রতিষ্ঠান প্রচার ঘোষিত হইতে, তদুপরি আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার লীডার সদস্যদের নিকট আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব ২১ দফা ওয়াদা অনুযায়ী জুয়া, ঘোড়দৌড়, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি হারাম কাজ বন্ধ করিতে সামাজিক ও ধর্মীয় বিবাহ বন্ধনের উপর ইসলাম বিরোধী জনমত অনুযায়ী বাতিল করিতে আবেদন জানাইয়া ব্যর্থ হইয়াছি। যেহেতু যাহা সদস্যদের-ও কোন প্রতিকার দেখিতেছি না— ২১ দফা দাবীর অন্যান্য দফা যাহাতে অচিরেই পূর্ণ কার্য হইতে— সেইরূপ কার্য্যকরী করিবার লক্ষণ না— দেখিয়া আমি আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ হইতে পদত্যাগ করিলাম। আশা করি আপনারা আমার— পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন ইতি—

মোঃ আব্দুল হামিদ খান
ভাসানী

কাগমারী- ১৮/৩/৫৭

উৎস্য: অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩১

পরিশিষ্ট-৫

বিভিন্ন আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের প্রেরিত চিঠি

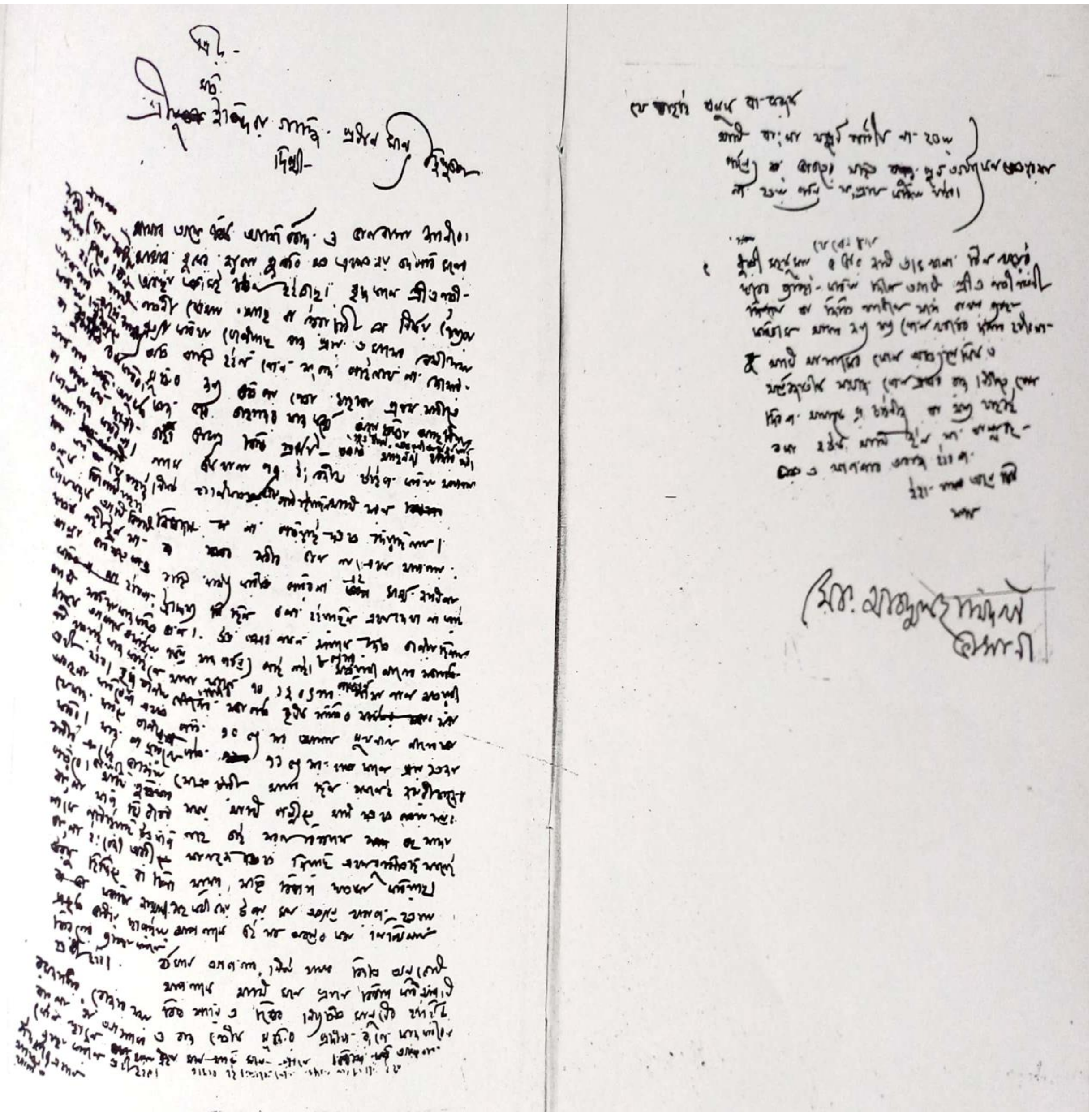

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে মওলানা ভাসানীর প্রেরিত চিঠি

উৎস্য: সাইফুল ইসলাম, *স্বাধীনতা ভাসানী ভারত*, বর্তমান সময়, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৫২-২৫৩

Sheikh Mujibur Rahman wrote a letter to Moshiur Rahman on 20.9.1949, which was intercepted at G.P.O, Dacca. Sheikh Mujibur Rahman advised Moshiur Rahman that he should start the work of AML as it was the high time.

Dacca, 21 September 1949

Copy of an English letter intercepted at G.P.O. Dacca. Dated 21.9.49.

From : Majibur, 9, Patlakhan Lane, Dacca, 20.9.49.

To : Mr. Moshiur Rahman, B.L. Ex- Chairman D.B., Jessore.

My dear Moshiur Bhai,

Received your letter. I think, you should start the work of Awami Muslim League. Maulana Sahib also told me to write to you. It is high time for us to start work. I think and feel that time is ripe now. The condition of Dacca is very very good. If we await there. People will finish us. I will inform you when I will be able to go to Jessore with Maulana Sahib. I hope you are O.K. though I know your condition.

Yours affly.
Sd/- Majibar.

SECRET 273

DISTRICT INTELLIGENCE BRANCH,
INTELLIGENCE BRANCH,

DACCA;
The 22nd Sept. 1949

Memo. No.

(*The secrecy of this interception may kindly be maintained.*)

1. From (with address) Mojibar Bhai jan 9. Patlakhan Lane, Dacca.
2. To (with address) Mr. Abul Hachem & Abdus Salee
3. Language of letter "Bengali" vill - Seramkandi Po. Patgali. Dt Faridpur
4. Date of letter Nil -
5. Postal Seal Out - going
6. Post office of interception G.P.O. Dacca.
7. Date of interception 22. 9. 49.
8. Name of officer who can prove the interception A.S.I. Abul Kasem
9. Whether photographed or not
10. Whether withheld or delivered Delivered
11. If delivered, whether copy kept or not copy kept.
12. Number and date of Government order authorising interception

মশিউর রহমানকে প্রেরিত শেখ মুজিবুর রহমানের লিখিত চিঠি (১৯৪৯)

উৎস্য: Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh), *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, vol-1, 1948-1950,* Hakkani Publishers, Dhaka, 2020, p. 271

Advocate M. Mashiur Rahman, Jessore wrote a letter to Sheikh Mujibur Rahman wherein he expressed great regret regarding the cancellation of tour program of H.S. Suhrawardy at Jessore. He also emphasized that his (H.S. Suhrawardy) and Sheikh Mujibur Rahman's presence was essential before the district board and assembly election. A letter from Abdul Hai, Secretary, District AML, Jessore sent to Sheikh Mujibur Rahman on the same issue.

Dacca, 25 February 1953

Secret

INTELLIGENCE BRANCH

7 Wise House.

DACCA;

Memo. No. The 25.2.1953.

(The secrecy of this interception may kindly be maintained.)

1.	From (with address)	:	M. Masihur Rahaman, B.L. Pleader, Judge Court, Jessore.
2.	To (with address)	:	Sk. Mujibur Rahaman, 71 Radhika Mohan Basak Lane, Dacca.
3.	Language of letter	:	English.
4.	Date of letter	:	22.2.53.
5.	Postal Seal	:	Illegible.
6.	Post office of interception	:	R.M.S. Dacca.
7.	Date of interception	:	24.2.53.
8.	Name of officer who can prove the interception	:	Md. Ibrahim A.S.I.
9.	Whether photographed or not	:	X
10.	Whether withheld or delivered	:	Delivered.
11.	If delivered, whether copy kept or not	:	Copy kept.
12.	Number and date of Government order authorizing interception	:	Casual.

Copy/translation forwarded to

Security Sec.

D.S.VI

For perusal please. M. Majibur Rahman, Pleader, Jessore writes this letter to Sheikh Majibur Rahman of Dacca expressing great regret knowing the cancellation of tour programme of Mr. Suhrawardy at Jessore and also with a request that his presence is essential before the next D.B. election as the Assembly election will depend much on it.

Sd/-25.2.53.

No. 3336 /606-48(1) Sec. dt. 4-3-53.

Side Note: *S.S. III Perusal pl. The letter has been delivered. Copy may be placed in PF of Sk. Mujibur Rahman & sent to Jessore for info & comment. Sd/-25/2*

Copy of an English letter dated 22.2.53 from M. Masihur Rahaman B.L. Pleader Judge Court, Jessore to Sk. Majibur Rahaman, 71 Radhika Mohan Basack Lane, Dacca.

My dear Mr. Rahaman.

Salam. I have received a telegram from Janab Suhrawardy Saheb intimating cancellation of his tour at Jessore. Perhaps you won't realise the inconvenience. I have been put in. Practically all arrangements were complete to accord him a proper reception. Much enthusiasm was created amongst the workers. You know that the D.B. election of this District will be held by the middle of the month of April. The presence of you and Suhrawardy Shaheb within the District is an absolute demand by us within the month of March if you desire success in this election. So I would request you to please contact him immediately and send me his town programme for at least three days.

It is needless to tell you that the result of this election will influence the result of the assembly election and as such we have got to take up this election with all seriousness if we mean to run the party. Hope you will please make necessary arrangement and intimate early. Hope this will find you in good health and sprit.

Yours affectionately

Sd/- M. Mashihur Rahaman.

Sk. Mujibur Rahaman Esq.

শেখ মুজিবুর রহমানকে পাঠানো মশিউর রহমানের চিঠি (১৯৫৩)

উৎস্য: Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister, GOB), *ibid, vol-3, 1953,* p. 89-90

Letter of Masihur Rahman, Secretary, District AML, Jessore, to Sheikh Mujibur Rahman in which he discussed about forthcoming election etc.

Dacca, 15 August 1953

Secret

Intelligence Branch

Dacca;

Memo. No. The 15.8.1953.

(The secrecy of this interception may kindly be maintained.)

1.	From (with address)	:	M. Masihur Rahman, Secy., District A.M. League, Jessore.
2.	To (with address)	:	Mujibar Rahman, Secy. E.P.A.M. League, 18, Karkunbari Lane, Dacca.
3.	Language of Letter	:	English.
4.	Date of letter	:	4.8.53.
5.	Postal Seal	:	Illegible .
6.	Post office of interception	:	G.P.O. Dacca.
7.	Date of interception	:	14.8.53.
8.	Name of officer who can prove the interception	:	S. Ahmed S.I.
9.	Whether photographed or not	:	No.
10.	Whether withheld or delivered	:	Delivered.
11.	If delivered, whether copy kept or not	:	Copy Kept.
12.	Number and date of Government order authorising interception	:	G.O. Expired.

—

Copy/ translation forwarded to

DS VI

Perusal pl. Secy. District A.M.L. Jessore writes this letter to Majibar Rahman Secy. E. P. A. M. L.

He reports that communist activity of one Ekramul Haq is hindering the work of the A.M.L.

Copy to DIB Jessore for favour of comment on this. DS III may like to see.

Sd/-15/8

Side note: As proposed. S.S. III may like to see. Sd/- 15/8, Sd/- 17/8/53 DSIII, 18/8

—

True copy of an English letter dt. 4.8.53. from Mr. Masihur Rahman, Secy. Dist. A. M. League, Jessore, addressed to Mujibar Rahman, Secy. E.P.A.M.L. 18, Karkunbari, Dacca.

Dear Mr. Rahman,

It appears that the election is almost certain to be held in March next. We, at Jessore in the meantime, facing new crisis in politics. Mr. Ekramul Huq, one of our members in the working committee of the Dist. Awami League, (a brother of Mr. A. Hai) has openly started working for the communist party. The sentiment of the people of this district and the neighboring ones is very much hostile towards communism and our touch with them will have an adverse effect on the organisation. If we make any common platform with them on any issue, and start working with them, I am confident, we shall be forsaken by our people who gave us unqualified support in the last D.B. election.

Some time we are receiving instructions from the provincial organisation to work jointly with other organisations. I don't know if you want us to join hands with them too. The issue is very vital at this moment particularly because the election is ahead of us. Our touch with the communist, in my opinion, will alienate the people's support against us. Pending your directive on the issue I have decided not to work with them whatever may be the occasion. Please consult with Jonab Bhashani and let me have your positive direction immediately, as the issue has created some sort of commotion.

Yours faithfully,

Sd:- M. Masihur Rahman.

Secy., Dist. A.M. League, Jessore.

শেখ মুজিবুর রহমানকে পাঠানো মশিউর রহমানের চিঠি (১৯৫৩)

উৎস্য: Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister, GOB), *ibid, vol-3, 1953,* p. 343-345

Letter from M. Mashiur Rahman, Secretary, District Awami Muslim League, Jessore to Sheikh Mujibur Rahman wherein he requested AML central leaders' tour program to Jessore in response to the Muslim League conference at Jessore attended by Nurul Amin[4].

Jessore, 16 January 1954

Secret

District Intelligence Branch

The 16.1.1954.

***Memo No**. 203/80-49 Int. (p. 811)*

(The secrecy of this interception may kindly be maintained.)

1.	From (with address)	:	*Mashiur Rahman.*
2.	To (with address)	:	*Mujibur Rahman, 18, Karkunbari Road, Dacca.*
3.	Language of letter	:	*English.*
4.	Date of letter	:	*5.1.54.*
5.	Postal Seal	:	*Nil.*
6.	Post office of interception	:	*Jessore Post Office.*
7.	Date of interception	:	*5.1.54.*
8.	Name of officer who can prove the interception	:	*S.I., A. Muktadir, D.I.O[5]. (4), D.I.B., Jessore.*

9. Whether photographed or not : *Not photographed.*

10. Whether withheld or delivered : *Delivered.*

11. If delivered, whether copy kept or not : *Copy kept.*

12. Number and date of Government order authorising interception : *Regular.*

–

Copy /translation forwarded to

(1) A. Hussain Esqr., Spl. Supdt. of Police, I.B., East Bengal, Dacca, for favour of his perusal.

Sd/-16.1.54
(M.B. Karim)
Supdt. of Police, D.I.B., Jessore.

–

Copy of an outgoing English letter dated 5.1.54 from Mashiur Rahman to Mojibur Rahman 18, Karkunbari, Road, Dacca, intercepted at Jessore Post office on 5.1.54.

– – –

M. Mashiur Rahman B.L.,
Secretary- District Awami Muslim League,
Member Working Committee
All Pakistan Jinnah Awami Muslim League
&
East Pakistan Awami Muslim League.

Jessore.
Date 5.1.54.

To
Mvi. Mojibur Rahman
Secy. E.P.A.M. League, Dacca.

My dear Mr. Rahman.

Salam. I have failed to attend the working committee meeting for very many reasons. Hitherto the position of the party was almost secure in this district but the

Muslim League[6] Conference on 3.1.54 which was attended by Janab Nurul Amin, Khan Abdul Quiyum, Maulana Shamsul Haq[7] and Saboor has created a tempo in their favour. Unless an effective check can be given immediately, I am afraid, it will act adversely against us.

This tempo can be cooled down only by holding 3/4 meetings within the district by the central and Provincial leaders immediately. I am therefore requesting you to please make tour programme immediately for this district. I have never before urged you so much. It is now for you to save us or leave us to lunch. Janab Maulana Bhashani Shahib, Janab Suhrawardy Shahib[8] and you must come together. Janab Fazlul Haq Shahib has tremendous mass popularity in this district. So it would be better if you can bring him too.

Now about finance. Just as Wahiduzzaman we have Ahmed Ali Sardar here. It is an impossible task to contest this man without financial help from the centre. We have no candidate, who can meet even the bare expense for this constituency. If you do not pay any attention to this constituency, in particular, the result may be fatal.

Please let me know immediately how much we can depend on you on all these matters.

Yours faithfully,
Sd/- M. Rahman.

শেখ মুজিবুর রহমানকে পাঠানো মশিউর রহমানের চিঠি (১৯৫৪)

উৎস্যঃ Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister, GOB), *ibid, vol-4, 1954-1957,* p. 7-10

Letter from advocate M. Masihur Rahman, Judge Court, Jessore to Sheikh Mujibur Rahman requesting to change the date of parliamentary party meeting.

Jessore, 10 May 1956

Secret

Intelligence Branch, Lalbagh

Dacca;
The 10th May 1956.

Memo No.

(*The secrecy of this interception may kindly be maintained.)*

1.	From (with address)	:	M. Masihur Rahman B.L. M.L.A. Pleader. Judge's Court, Jessore.
2.	To (with address)	:	Sk. Mujibur Rahman, M.L.A, MCA. Secy, E.P.A.L. 56, Simpson Rd. Dacca.
3.	Language of letter	:	English.
4.	Date of letter	:	7.5.56.
5.	Postal Seal	:	Jessore.
6.	Post office of interception	:	G.P.O., Dacca
7.	Date of interception	:	9.5.56.
8.	Name of officer who can prove the interception	:	Maung Maung A.S.I. I.B.
9.	Whether photographed or not	:	No
10.	Whether withheld or delivered	:	Delivered.
11.	If delivered, whether copy kept or not	:	Copy kept.
12.	Number and date of Government order authorising interception	:	G.O.

Copy/translation forwarded to

DS VI

M. Masihur Rahman, MLA Jessore writes this to Sk. Mujibur Rahman requesting him to change the date of their Parliamentary party meeting from 16th to 19th instant.

Sd/-
10/5/56

Side note: *Seen. Copy to PF. Sd/-14/5*

–

Copy of an English letter Dt. 7.5.56

From : M. Masihur Rahman B.L, M.L.A. Pleader, Judge's Court, Jessore.

To : Sk. Mujibur Rahman. M.L.A., M.C.A. Secy. East Pakistan Awami League, 56 Simpson Road, Sadarghat, Dacca.

My dear Mujibur Rahman,

Salam Now that the Session of the Assembly has been convened to be held on the 22nd . Meeting of our parliamentary party should be held on the 19th or 20th but not earlier. Because members from mofassil would not like to go so early as 16th when they have got to go again on the 22nd .

I therefore suggest that the meeting of our Parliamentary should commence from the 19th or 20th and not 16th, please consult Janab Ataur Rahman Saheb and if you agree announce the date through dailies. I intend to reach Dacca by the 19th or 20th.

Hope this finds you alright.

Yours sincerely,
Sd/- M. Masihur Rahman.

শেখ মুজিবুর রহমানকে পাঠানো মশিউর রহমানের চিঠি (১৯৫৬)

উৎস্য: Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister, GOB), *ibid*, p. 416-417

কেন্দ্রিয় কারাগার

ঢাকা

১২/৯

মানিক ভাই

আমার ছালাম নিবেন। আমার মনে হয় আপনারা সকলে আমার জন্য একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। চিন্তার কোন কারণ নাই। আমি জেল হাসপাতালে ভর্তি আছি। চিকিৎসার চেষ্টা খুবই হইতেছে। হাসপাতালে কিছুদিন থাকতে হবে বলে মনে হয় কারন শরীরের অবস্থা এখনও উন্নতির দিকে যায় নাই।

আতাউর রহমান সাহেব দেখা করতে এসেছিলেন। ফেডারেল কোর্ট করা যায় কিনা আর করিবে কিনা ? জনাব সুরাওয়ার্দ্দি সাহেবতো পিন্ডি মামলা নিয়া ব্যস্ত। কে মামলা পরিচালনা করবেন ? আপনি সুরাওয়ার্দ্দি সাহেবের কাছে চিঠি লেখে জানুন তিনি করতে পারবেন কিনা আর তাহা না হলে অন্য কাহাকে দিয়া মামলা করার কোন অর্থ হবে বলে আমার মনে হয় না । আপনারা বাহিরে আছেন। ছালাম সাহেব, আতাউর রহমান সাহেব ও অন্যান্য সকলের সাথে পরামর্শ করে যাহা ভাল বোঝেন তাহাই করিবেন । আমার কিছু বলার নাই। শুনে সুখী হবেন, সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়াছি, কারণ আর কতদিন বাবার পয়সা সর্বনাশ করা যায়। আর শরীরের অবস্থাও ভাল না কারন হঠাৎ ঢাকা জেলে আমার পর খুথুর সাথে পর পর তিন দিন কিছু রক্ত পড়ে তবে সে রক্ত সর্দ্দি শুকাইয়াও হোতে পারে আবার হাচি খুব বেশী হয় বলে অনেক সময় গলা ফেটেও রক্ত পড়তে পারে আর কাসের সাথেও হতে পারে তাই নিজের থেকেই হুসিয়ার হয়ে যাওয়া ভাল। কতকাল থাকতে হয় ঠিক তো নাই। X Ray করার কথা বলেছি তবে সরকারের কাজে সকল সময়ই খুব সময় লাগে। কবে X Ray করে বলা যায় না। তবে যাহাতে তাড়াতাড়ি হয় তাহার চেষ্টা করিব। ঢাকা জেলের সুপার সাহেব খুব ভাল ডাক্তার তাই শীঘ্রই ভাল হয়ে যাবো বলে আশা করি। চিন্তার কোনই কারণ নাই। জেলখানায়ও যদি মরতে হয় তবে মিথ্যার কাছে কোন দিন মাথা নত করবো না। আমি একলা জেলে থাকাতে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। কাজ করে যান খোদা নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। আমার জন্য কিছুই পাঠাবেন না। আমার কোন কিছুরই দরকার নাই। নূতন চীনের কিছু বই যদি পাওয়া যায় তবে আমাকে পাঠাবেন। চক্ষু পরিষ্কার পর আপনাকে খবর দিবো কারন চশমা কিনতে হইবে। নিজেই বন্দোবস্ত করে আপনার সাথে দেখা করতে চেষ্টা করিব। বন্ধুবান্ধবদের ভালবাসা দিবেন। ভাবিকে ছালাম দিবেন।

আপনার ছোটভাই

মুজিব।

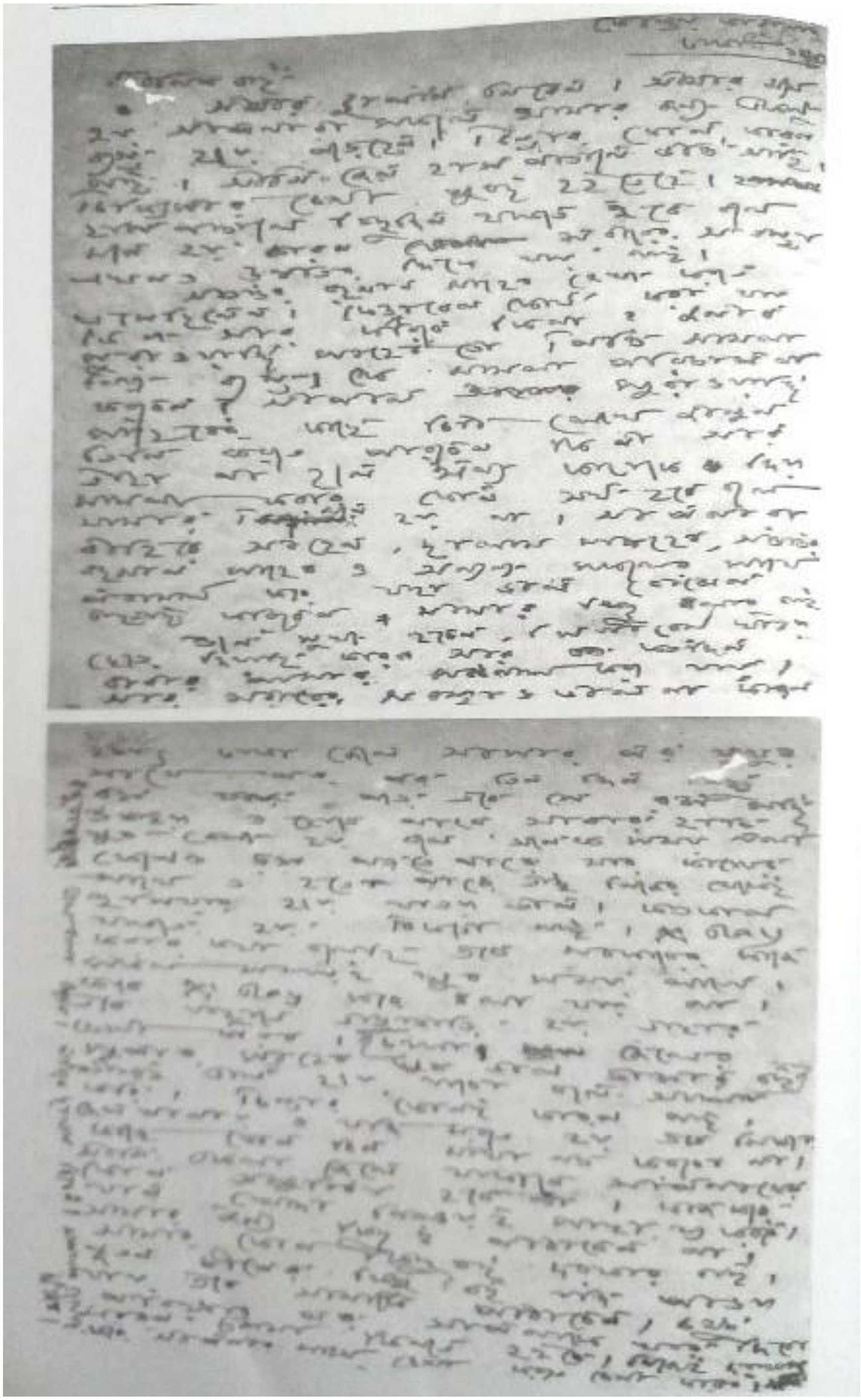

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে উদ্দেশ্য করে শেখ মুজিবুর রহমানের চিঠি (১৯৫১)

উৎস্য: Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister, GOB), *ibid,vol-2, 1951-1952,* p. 79-80

Zabed Monjil
Meo Road, Lahore
13.6.52.

মানিক ভাই,

আমার ভক্তিপূর্ণ ছালাম গ্রহণ করিবেন। করাচী থেকে আসার সময় আপনার ২ খানা চিঠি জনাব সুহরাওয়ার্দ্দি সাহেব আমাকে দেন। চিঠি পেতে দেরী হওয়ার কারণ শহিদ সাহেব ক্লিফটনের বাসা ছেড়ে ১৩ নম্বর কাচারী রোডে আসিয়াছেন। আপনার বিপদের কথা আমি অনুভব করতে পারি। কিন্তু কি করব ? আর এক বিপদে পড়িয়াছি। লাহোর এসেই টিকিট করতে যাই কিন্তু ২৪ তারিখের পূর্বে কোন টিকিট পাওয়া গেল না। সপ্তাহে মাত্র ২ বার এরোপ্লেন ঢাকা যায়, এত ভিড় যাহা কল্পনা করা যায় না। ২৪ তারিখ ঈদ, আর আমাকে সেই দিনই রওয়ানা হতে হবে। কি করব ভেবেছিলাম বাড়ী ঈদ করব তাহা আর এবার হল না। যাহা হউক, গরীবের আবার ঈদের কাজ কাজ কি ? জেল খানায় মওলানা সাহেব ও বন্ধু বান্ধবদের কি অবস্থায় দিন কাটছে বুঝতে পারছি না। দয়া করে আমাকে এই ঠিকানায় চিঠি দিবেন। সামছুল হুদা করাচী বা লাহোরে নাই। ফজলুল হক ও রউফের কোন সংবাদ পেয়েছেন কি ? প্রোফেসার সাহেবকে ও রফিককে অফিসে বসে কিছু কাজ করতে বলবেন। আমি জানি আপনার পক্ষে সম্ভব নহে। আতাউর রহমান সাহেব ও অন্যান্য সকলকে ছালাম দিবেন। কাজ কিছু করতে পেরেছি। পশ্চিম পাকিস্তানের লোকের ভুল অনেকটা ভাঙ্গাতে পেরেছি বলে মনে হয়। দোয়া করবেন, টাকা পয়সা নাই যে আবার করাচী যেয়ে তাড়াতাড়ি ঢাকা পৌঁছাব। Advertisement কিছু পাব তবে কয়েকদিন দেরী করতে হবে। আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। আপনার শরীরের প্রতি যত্ন নিবেন। মোটেই চিন্তা করিবেন না। খোদা হাফেজ।

আপনার ছোট ভাই
স্বাঃ মুজিব

My address
C/o Alhaju Abdur Rahim
Bar-at-Law,
Zabed Monjil
Meo Road, Lahore.

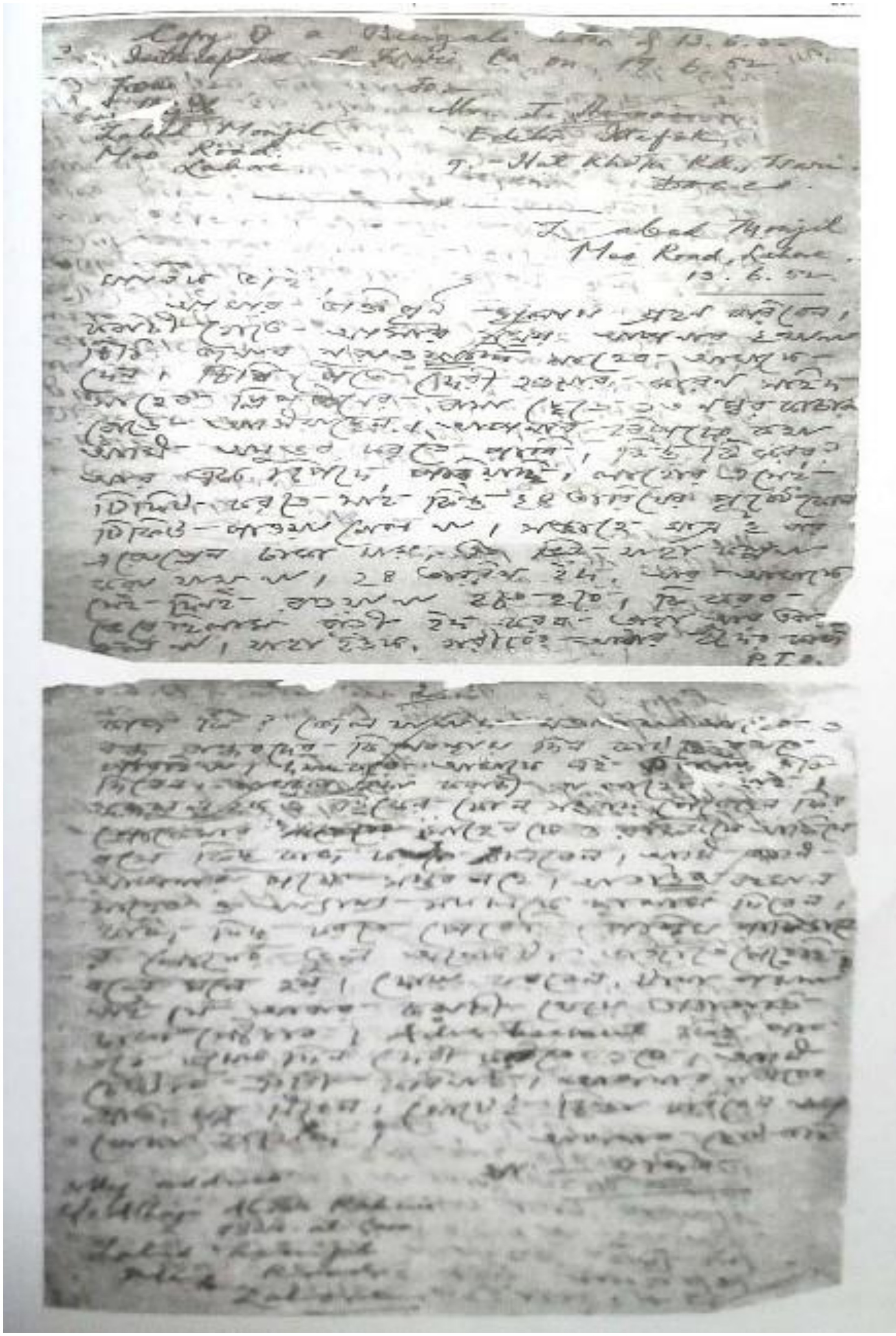

মানিক মিয়ার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বহস্তে লিখিত চিঠি (১৯৫২)

উৎস্য: Sheikh Hasina (Hon’ble Prime Minister, GOB), *ibid,vol-2*, *1951-1952*, p. 236-237

dt. 14.4.52.
Copy / translation forwarded to

D.S.VI.
Perusal pl.

Sk. Mujibar Rahman is starting for Dacca on 16.4. He will put up with Manik Miah in his Kamalapur house.

Copy may be placed on file copy to D.I.B. Dacca. O/C Watch may also pl note.

Copy forwarded to Addl. S.P. D.I.B. Dacca for information and necessary action.

Sd/-19.4
D.S.6.
for S.S.III, I.B.

Side Note: As proposed. S.S. III may pl. see. Sd/ - 10.4

–

Copy of an English letter dt. 6.4.52 intercepted at Wari P.O. on 10.4.52.

From : Mujib, Tungipara, Patgati, Faridpur.

To : Mr. T. Hussain. B.A., Editor, Ittefak, 9, Hatkhola Rd. DACCA.

–

Tungipara.
Patgati, Faridpur.
6.4.52

My dear Manik Bhai,

I have received your letter. I am improved some-extend. I require treatment. The date of judgment of Gopalganj case on the 15th April and I will start for Dacca on the 16th positively. I will stay with you. My health will not permit me to take meal in the Hotel.

I do not know what will happen in Gopalganj case. Any how I am prepared for any consequence Manik Bhai. I can not forget your love and affection. Please convey my Salam to Bhabi and friends. How are you?

Yours affectionately
Sd/ - Mujib

Side Note: We noticed that letter inviting Mujibur Rahman to come to Dacca & stay with him.

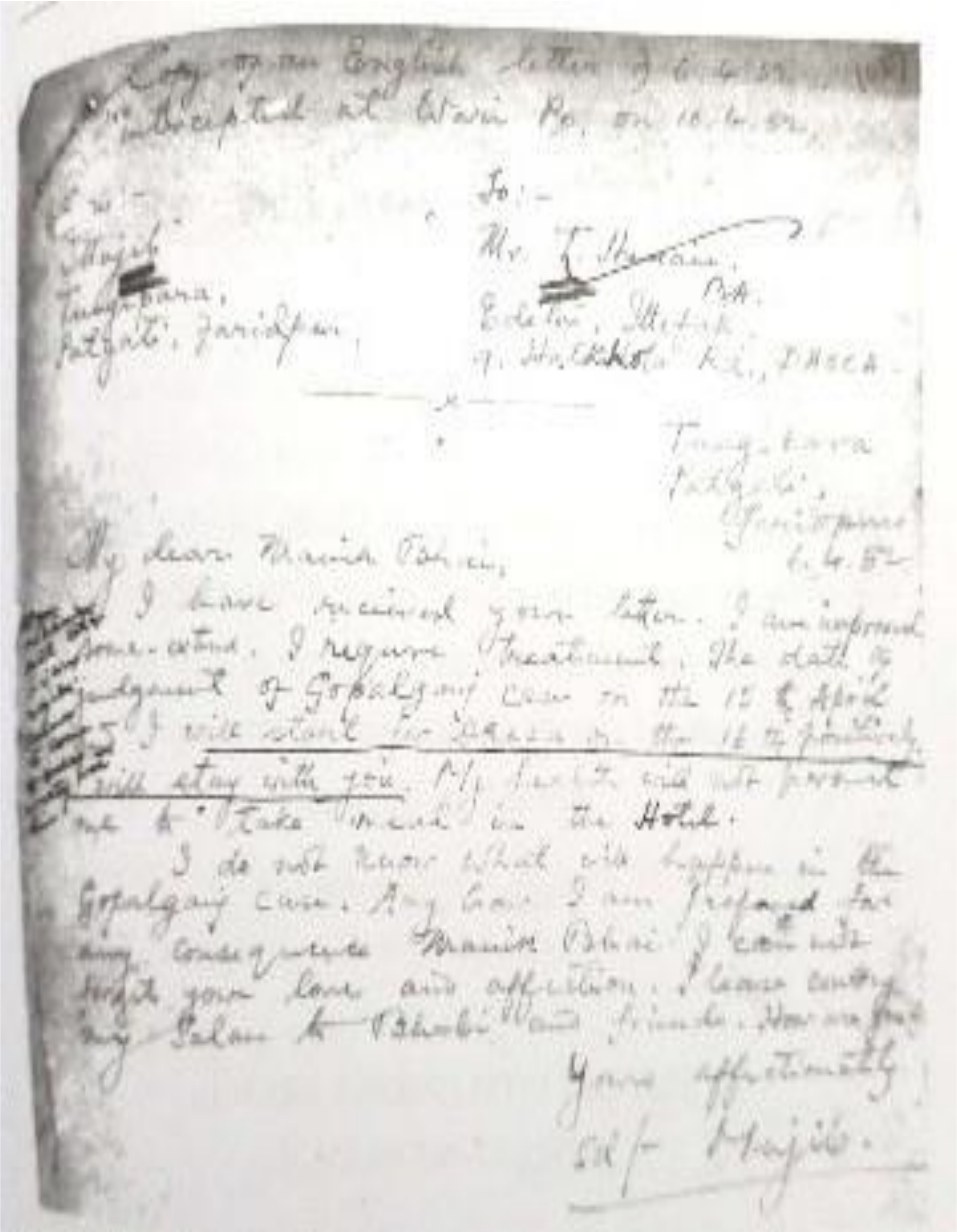

Copy of an English letter of 6.4.52 (intercepted at Wari PO on 10.4.52)

S/o:-
Mujib [redacted]
Tungipara,
Patgati, Faridpur.

To:-
Mr. T [redacted] Hossain, B.A.
Editor, Ittefaq
9, Hatkhola Rd., DACCA.

Tungipara
Patgati,
Faridpur
6.4.52

My dear Manik Bhai,

I have received your letter. I am improved some extent. I require treatment. The date of judgement of Gopalganj case on the 15th April. I will start for Dacca on the 16th positively will stay with you. My health will not permit me to take meal in the Hotel.

I do not know what will happen in the Gopalganj case. Any how I am prepared for any consequence. Manik Bhai I can not forget your love and affection. Please convey my Salam to Bhabi and friends. How are you?

Yours affectionately
Sd/- Mujib.

মানিক মিয়ার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বহস্তে লিখিত চিঠি (১৯৫২)

উৎস্য: Sheikh Hasina (Hon’ble Prime Minister, GOB), *ibid,vol-2, 1951-1952,* p. 256-257

Dy.S.P.

For favour of perusal. The writer is being fixed. Copy to I.B. for information.

Sd/- Md. Yunus.
D.I.O. (I)
7.2.55.

As above.
Sd/- A.J. Chaudhuri.
D.S.P[4]., D.I.B., Ctg.
7.2.55.

–

Sd/- Ahmadur Rahman Azmee

Copy of an English translation of a Bengali letter dated 4.2.55 intercepted at Chittagong G.P.O. on 5.2.55.

From : Badrunnessa Ahmad (1), Chittagong.

To : Shekh Majibur Rahman (2) M.L.A., 56 Simpson Road, Dacca.

Postal seal of issue: Nil.

Majib Bhai,

I am glad to receive your letter. You are right indeed. Do it once instead of doing several times. All can accept the change easily as Mr. Fazlul Huq (3) is known to all intelligentsia. No doubt the programme for the future will be decided though none could say who would survive and who wouldn't to the last.

I noticed in the paper that the meeting has been fixed for the 17th. It is an acute problem of going up the worldly affairs than the husband for the time being. I would proceed but postponed as advised by Advocate Ghani Saheb (4). As such I have decided to proceed on the 15th. I hope there will be no disadvantage for this. Is there any necessity of the female workers at present? You could approach to those who would support in favour of the no-confidence motion. However, don't think I am avoiding the responsibilities. I have heard from Ghani Sb. that there is no necessity for the above. I have signed the paper brought by Ghani Saheb instead of yours. Hope this will do. No more. Accept my adab. I expect to be present in time. The end.

Sd/- Badrunessa Ahmad.

শেখ মুজিবের কাছে প্রেরিত বদরুন্নেসা আহমদের চিঠি (১৯৫৫)

উৎস্য: Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister, GOB), *ibid, vol-4, 1954-1957, p. 230*

True Copy of a letter dt 29.4.55

From : Badru Nessa, Chittagong on 29.4.55

To : Mr. Majibur Rahaman M.L.A.

General Secy. Awami. M. League

56, Simpson Road

Sadarghat, Dacca.

Postal seal-Nil

মুজিব ভাই,

আবার কিছুটা বাধ্য হয়ে লিখতে হচ্ছে। আসবার দিন শুনলাম কামরুজ্জামানের কাছে যে, আমার নাম নাকি Submit করা হয়েছে Convention, তবে উনিও নাকি জানেন না সেই খবরটা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি। যদি সত্যি তা হয় তাহলে ফেরৎ ডাকে ২/১ লাইনে জানিয়ে দেবেন। ঢাকা যাবার জন্য বাইরে যাওয়াটা Cancel করে দেব, তা ছাড়া পুরান Constitution এর বইগুলি আর একবার ছাপিয়ে দিতে হবে। ইতি মধ্যে একটু কলকাতা যাওয়া প্রয়োজন ছিল, সেটা আপাততঃ বন্ধ করে দিতে হবে। চিঠিটা ৭/৮ দিন নিয়ে ঘুরলে হবে না- নিজে দিতে না পারলে বউকে বলবেন জানিয়ে দিতে। আশা করি কথাটার গুরুত্ব দিবেন।

America যাওয়া ঠিক আছে তো? দেখবেন ফাঁকি দেবেন না, আদাব রইল।

সই

বদরুন্নেসা আহাম্মদ

শেখ মুজিবের কাছে প্রেরিত বদরুন্নেসা আহমদের চিঠি (১৯৫৫)

উৎস্য: Sheikh Hasina (Hon’ble Prime Minister, GOB), *ibid, vol-4, 1954-1957, p. 257*

Copy of a Bengali letter dated 9/4/55.

মুজিব ভাই,

আপনার বেকসুর খালাস পাওয়া সংবাদ আনন্দিত হলাম। কিন্তু বেকসুর যারা Charge এর মধ্যে ফেলেছিল তাদের কি করেছেন? আমাদের দেশ বলেই অকারন এভাবে harass করা সাজে। এদের বুকের পাটা দেখে সত্যিই অবাক লাগে minister পর্য্যন্ত মানে না" যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ এর পেছনে থাকে কেন না তার বিরুদ্ধে উল্টো ঠুকে। যায় হোক আপনার মুক্তি পাওয়ায় আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

যাক্ সে কথা। আমরা কি Awami League এর কেউ নই? এতবড় একটা প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানের Parliament পর্য্যন্ত Capture করেছে তার কোন Organisation নাই সেকি ভাবা যায় ? এর চেয়ে আমাদের ছোট ছোট মহিলা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা আছে। Prime Minister এর সঙ্গে কি সব কথা বলেন। Partyর Working Committee তে কি Resolution নেওয়ায় হয় কিছুই আমরা জানতে পারি না। প্রতি কথা প্রতি member কে জানবার নয় সে আমিও জানি কিন্তু যে কথা জানবার সেটা তো আমাদের লিখিতভাবে জানাতে পারেন। ইত্তেফাকে যে কথা আজ বের হয় কালজে মিল্লাত তার Challenge করে সুতরাং আমারা কি করে বুজব ইত্তেফাক ঠিক- ইত্তেফাক তো কোনদিন বলেনি যে সেটা শুধু মাত্র Awami League এর paper.

আমাদের কাছে কেউ কোনদিন চাঁদা ও চায় না তাই বলে একসঙ্গে এক বছরের চাঁদা চেয়ে বসবেন না। ও দিতেও পারবনা কেননা M.L.A হয়ে এক পয়সা তো পেলাম না। শুনছি নাকি Budgetএ টাকা পাশ করা হয়েছে। সুতরাং মাইনা নাকি দিচ্ছে। অবশ্য আমি নিজে দেখিনি। তাই বলতে পারছিনা সঠিক খবর। ভাবছি একটা Case করলে কেমন হয় *...(missing from the original document due to page damage)* Speaker তো মাইনা আজও পাচ্ছে হক সাহেবের কৃপায় – সুতরাং House তো Continue করছে Constitution অনুযায়ী *...(missing from the original document due to page damage)* আপনি কি বলেন করব নাকি একটা Case? Challenging এ কেউ Politics করে বলে তো মনে হয় না। যা ২/১ জন আছে সবই K.S.P. জানাবেনতো আমাদের দলের কে আছে। একেবারে Dull হয়ে আছি এখানে। Committeeর মধ্যে কি আমাদের ঢোকাচ্ছেন না? তাহলে ঢাকা গিয়ে এসেও আরাম পাওয়া যায়।

আর না আদাব রইল। আমার Complain এর জবাব চাই- কেননা আপনি তার Secretary. ভাষানী সাহেব কবে আসবেন? যদি সত্যি সরওয়ার্দী এই Point এ resign দেয় তাহলে খুব ভাল হয়-ওরা সরওয়ার্দ্দীকে নিয়ে বড় গ্যাঁট হয়ে বসে আছে-ভাবছি Opposition তো আমাদের হাতের মুঠোয়, সালাম খানদের আর নেওয়া উচিত নয়-এই রকম কতক লোক থাকে বলে Partyর ও দেশের সর্ব্বনাশ হয় *...(missing from the original document due to page damage)* ওরই জন্য Partyর আজ এ Peculiar Position. "The Statesman" হঠাৎ Md. Ali বিয়ে নিয়ে পড়ল কেন? এক বছর পরে Open ceremonyর বা কি প্রয়োজন হল? এর মধ্যেও কি মাদারীর খেল আছে নাকি?

ইতি,

বদরুন্নেছা আহম্মদ.

শেখ মুজিবের কাছে প্রেরিত বদরুন্নেসা আহমদের চিঠি (১৯৫৫)

উৎস্য: Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister, GOB), *ibid*, *vol-4, 1954-1957, p. 249-250*

Copy of a Bengali letter dt. 23.2.55 intercepted at Ctg. GPO on

From : Badrun-Nesa Ahmed, Ctg.

To : Sheikh Mujibar Rahman, M.L.A.
56, Simpson Road (Awami League Office),
Sadarghat, Dacca.

Postal seal of issue: Nil.

মুজিব ভাই

শুধু ভেবেই চলছি জানি আমার সঙ্গে আপনাদের মতের মেল হবে না, কেননা আপনারা পাকা ঘুঘু আর আমি সম্পূর্ণ আনকোরা তাই স্বভাবতই মনটা Sentimental, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কোথায় যেন ভুল হচ্ছে, এ কথা জলের মত স্বচ্ছ যে আমরা এমন majority (!) পায়নি যা নিয়ে নির্ব্বিঘ্নে Cabinet Form করা যায়, অবশ্য এটা ঠিক Form করতে পারলে majority permit ইত্যাদির দৌলতে আপনিই হবে, কিন্তু কথা হচ্ছে Awami League কি Muslim league এর মত " আবু হোসেনী রাজত্ব করতে চায়? যদি না চাই তাহলে ওসব ঘোলাটে আর নোংড়া পথে না গিয়ে পরিস্কার পথ ধরাই ভাল। No Confidence motion এনে যদি আশানুরূপ result না হয় তাহলে দোষ আমাদের নয় দোষ সে সবের যারা মহম্মদ আলীর ভাওতায় পড়ল। আমার বিশ্বাস No Confidence এনে leader change করতে চেয়েছিলাম Party break করতে চাইনি কেননা Party break করার সাহস কারু নাই অন্যথায় গোটা ২১ দফা মিথ্যা হয়ে যায় আমি অনেকের কাছেই শুনেছি Shurawardy সাহেবের জন্যেই Awami league কে Strong হতে হবে কেন হতে হবে সে আমিও বুঝি কিন্তু সে কি সারা দেশের স্বার্থের বিনিময়ে? যারা ভোট দিয়াছিল বলুনত তারা কত আশা নিয়ে দিয়েছিল, তাদের সে আশা যৎসামান্য পূরণ করার পেছনেও চায় unity. 1946-47 যে unityর প্রয়োজন ছিল সে unityর প্রয়োজন যে আজও আছে, E. Pakistan neglected হয়ে আছে এপর্যন্ত তার কিছু উন্নতি করতে হলে যে চাই একতা সোরওয়ার্দ্দী সাহেব আজ না হোন কাল W. Pakistan এ .... *(missing from original document due to page damage)* এর সাথে সাথে strong হবেন তার জন্য .... *(missing from original document due to page damage)* Central হাতের খেসারত ...*(missing from original document due to page damage)* এই unity ভাঙ্গার পেছনে জয় যে তাদেরই হলো! তাইত বলছি রাম, শ্যাম যে Chief Minister হয় হোক। আপনার বা আমার কি? Awami league থেকে না নিতে চাইলে তারাই দেক না। নিজেদের লোক, এমন কি নান্না মিঞা, মোহন মিঞাকেও দেক, তাতেও আপত্তি করব না। আমরা চাই Parliamentary Govt. এবং চাই কাজ, গদীর লড়াইত করিনি। তারা মহাম্মদ আলি তথা Muslim League এর সাথে হাত মিলাইতে চাই, সেই তাদের দোষ সেটা হলোই তো স্বার্থের খাতিরে। তারা চাই Govt. সুতরাং সোজা পথ না ধরে টেরা পথ ধরেছে এও তাদের ভুল, তাদের সেইটা বুঝিয়ে দেন এবং তাদেরই একজনকে head করে unity বজায় রাখুন, এটা কি সত্যিই অসম্ভব? নিজের partyর pulse ছাড়া

দেশের pulse হাত দিয়ে দেখলে দেখবেন mass এর আজও Haq ...*(missing from the original document due to page damage)* উপর আছে শ্রদ্ধা কিন্তু শিক্ষিত দলের সব party উপর এসেছে অশ্রদ্ধা তাই যতদূর সম্ভব Political আলোচনা করেনা, ক্ষমতার লড়ায় করতে গিয়ে ...*(missing from the original document due to page damage)* আমাদের prestige যাবে নষ্ট হয়ে?

সেদিন working committeeর member এর কাছে বলছিলেন আমার নিজস্ব কোন মতামত নেই যার যা খুশী দিতে পারেন তবে এটা ঠিক আমার ...*(missing from the original document due to page damage)* কোন মহিলা নেই যেহেতু আমি officers wife কেন জানিনা এরা officers দের সন্দেহের চোখে দেখেন আমার মনে এদের চিন্তা ধারা আজও 1946 পর্যন্ত ঠেকে আছে British আমলের মনোবৃত্তি আজও ঘোচেনি তাই দেশে যারা Industry খুলছে তারা এবং যা আমাদেরই order execute করছে তারা দেশের ...*(missing from the original document due to page damage)* সুতরাং তাদের মতে আমার কোন rights নেই party করার। আমি এ দেশের citizen কি না তাই ...*(missing from the original document due to page damage)* জিজ্ঞাসা করে নেব। সে যাক, জানিনা আপনার ...*(missing from the original document due to page damage)* next move কি? যেখানে আতাউর রহমানের ...*(missing from the original document due to page damage)* ব্যক্তি আছে সেখানে আজও আমি ...*(missing from the original document due to page damage)* দেখি আর আপনার কথা ছেড়েই দিলাম...*(missing from the original document due to page damage)* Partyকে Short term এ চিন্তা না করে Long ...*(missing from the original document due to page damage)* এ যাবেন এই অনুরোধ করে রাখলাম। ...*(missing from the original document due to page damage)* বলবেন ঢাকটা একটু কম পেটায়, শুধু ...*(missing from the original document due to page damage)* চেচাইতেছেন, ওর চেচাঁনী ...*(missing from the original document due to page damage)*

সত্যিকার-Democracyর মাধ্যমে সত্যের জয় হবেই হবে অবশ্য যদি আমরা দেশকে Dictatorship বা Totalitarian-এ নিয়ে যায়। আমরা এ কথা নিশ্চয় মনে রাখবো যে Partyর জন্যে দেশয় নয় দেশের জন্য party.

মোট কথা শুধু মাত্র গদ্দীর জন্য party break করবেন না Democratic way তে আর একবার চেষ্টা করে দেখেন faith কার উপর? যার উপরে faith থাকবে আশা করি তাকেই মেনে নিতে বাধা নাই আমাদের কোন member এর চিঠির উত্তর দিতে না পারলে দেবেন না শুধু জানতে চাই আমার মত আপনার মতের সঙ্গে মেলে কিনা যদি না মেলে বুঝিয়ে দেবেন নিজে না দিতে পারলে অন্যকে দিয়ে বুঝাবেন। কামরুজ্জামান সাহেব আমার মত মেনে নিয়েছেন শুধু আপনারটা জানতে চাই।

আপনার গৃহিনীকে আদাব জানাবেন। তাঁর কাছে Training নেবেন কিভাবে স্থির হয়ে ভাবতে হয়। 'Demagogy' আর চলবেনা। জঞ্জাল আপনাদের ঘাড়ে পড়েছে, সুতরাং মাটির দিকে নজর রেখে ভবিষ্যতের ফসলের উপর খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। আরজ গুজার ইতি

Sd/- বদরুন্নেসা আহমদ

Recorded by me.
Sd/-S.I

শেখ মুজিবের কাছে প্রেরিত বদরুন্নেসা আহমদের চিঠি (১৯৫৫)

উৎস: Sheikh Hasina (Hon'ble Prime Minister, GOB), *ibid, vol-4, 1954-1957, p. 237-238*

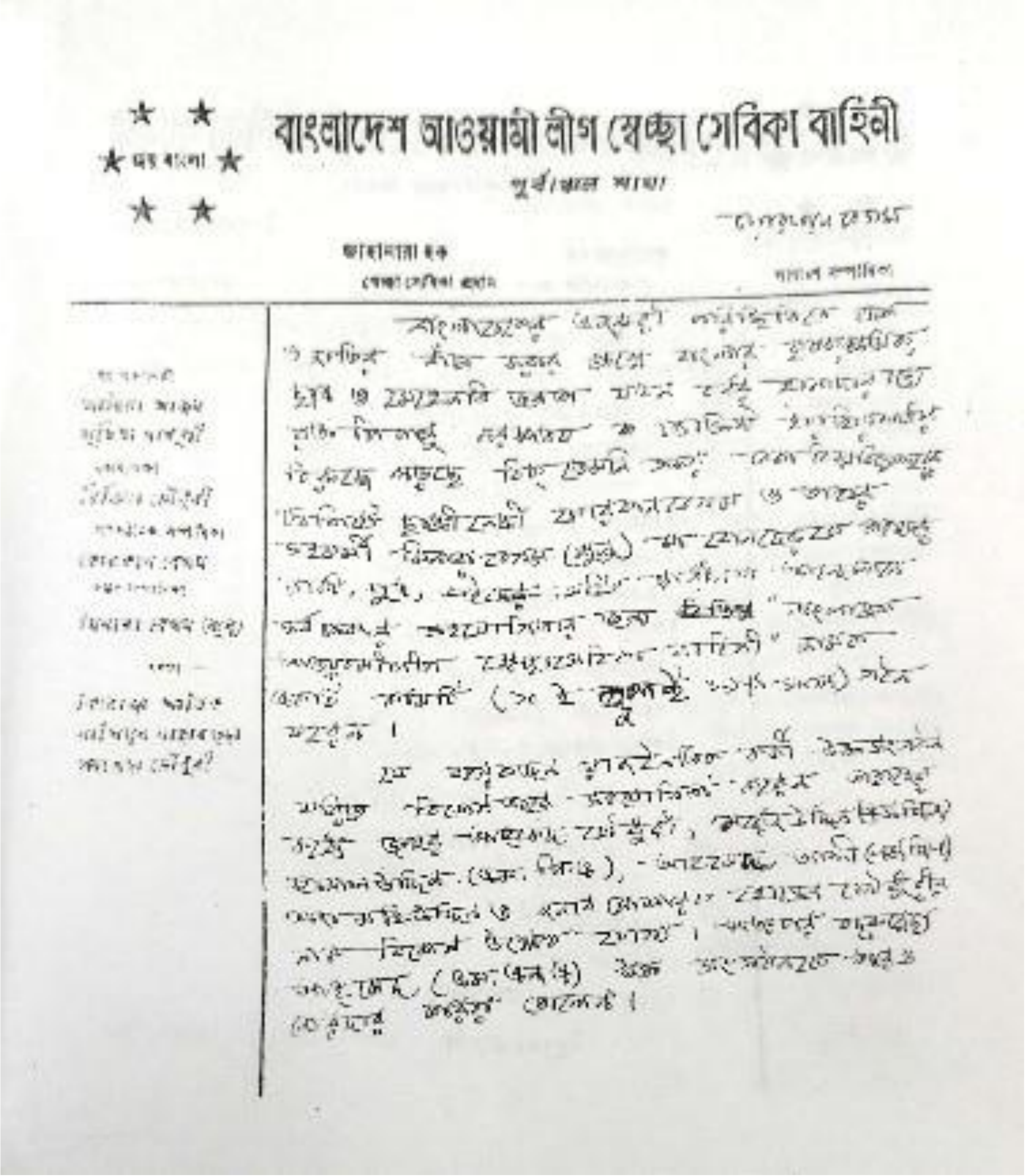

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছা সেবিকা বাহিনী

জয় বাংলা

পূর্বাঞ্চল শাখা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন (১০ জুলাই ১৯৭১)
উৎস্য: ফোরকান বেগম, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী*, সুমি প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ঢাকা, ১৯৯৮

পরিশিষ্ট-৬

পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর ঐতিহাসিক ঘোষণা-"স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান-জিন্দাবাদ"

পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি প্রধান, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সংগ্রামী জনগণের মহান নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী গতকাল শুক্রবার ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে 'সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মরণপণ সংগ্রামের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা' করিয়াছেন।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক যৌথ উদ্যোগে গৃহীত প্রতিবাদ দিবসের অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে আয়োজিত এই জনসভায় ভাষণ দানকালে তিনি জনগণকে সকল ভীরুতা-জড়তা ত্যাগ করে উক্ত সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

মওলানা ভাসানী বলেন, "সর্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের এই দাবী আইনসঙ্গত–এই সংগ্রামও আইনসঙ্গত। এটি নিছক হুমকির বা চাপ সৃষ্টির আন্দোলন নয়; স্বাধীন-সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের এই সংগ্রামের প্রতি এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার শান্তিকামী ও মুক্তিকামী জনগণের পূর্ণ নৈতিক সমর্থন থাকবে।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "আমাদের সংগ্রাম জীবন-মরণের সংগ্রাম। পূর্ব পাকিস্তানের ১৪ লক্ষ মানুষ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ দিয়েছে। আমাদের সংগ্রামের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হলে আরও ১৫/২০ লাখ লোক জীবন দিয়ে হয় অভীষ্ট সিদ্ধ করবো, না হয় মৃত্যুবরণ করবো।" মওলানা বলেন, 'জয় বাংলা' স্লোগান বন্ধ করার জন্য কোন সৈন্য দেওয়া হয় নাই। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান বললে যদি সৈন্য নিয়োগ করা হয়, তাহলে বিরাট ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।"

ইতিহাসের নজীরবিহীন প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলায় বিধ্বস্ত পূর্ব বাংলায় লক্ষ লক্ষ মৃতদেহের 'পরে দাঁড়িয়ে যারা নির্বাচনী প্রচারণার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে চলেছে তাদের সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন, 'তাঁদের ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে চাই না, তারা নিজেরাই বলুন যে তারা জনতার শত্রু না মিত্র।'

শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান

'পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রামে' শরিক হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান জানিয়ে নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, 'মুজিব, তুমি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামে যোগ দাও। যদি আমেরিকা ও ইয়াহিয়ার স্বার্থে কাজ কর তাহলে আওয়ামী লীগের কবর '৭০ সালে অনিবার্য।'

এই প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী আরও বলেন, 'যারা বলে নির্বাচনে শতকরা একশোটি আসনে জয়ী হয়ে প্রমাণ করবে জনতা তাদের পেছনে রয়েছে তাদের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নেই। দক্ষিণ ভিয়েতনামে দেশপ্রেমিক

গেরিলারা যখন লড়াই করেছে তখনও সংগ্রামের মুখে নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু তার দ্বারা এ কথা প্রমাণ হয়নি যে নির্বাচনে বিজয়ীরা জনগণের বন্ধু। বরং তারা সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারের তল্পীবাহক।'

বিদেশী সৈন্য হটাও

দুর্গত এলাকায় রিলিফ দেওয়ার নামে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিপুলসংখ্যক মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যের ঘাঁটি স্থাপন সম্পর্কে মওলানা ভাসানী বলেন, "আমেরিকা ও বৃটেন ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশ দুর্গত মানবতার সেবায় স্বেচ্ছাসেবক, সাহায্য দ্রব্য ও সাংবাদিক প্রেরণ করেছেন। শুধুমাত্র আমেরিকা ও বৃটিশরা কামান-বন্দুক নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় মানবতার সেবা করতে এসেছে। সশস্ত্র হয়ে সেবা করা যায় না– যুদ্ধ করা যায়।" তিনি পৃথিবীর জনগণের শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার লেজুড় বৃটেনের সেনাবাহিনীকে আগামী ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মাটি থেকে বিদায় নেওয়ার নির্দেশ দেন। অন্যথায় 'মার্কিন ও বৃটিশ দূতাবাস জ্বালিয়ে দেওয়া হবে' বলে তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

যুদ্ধ জননেতার বক্তৃতাকালে তিন লক্ষাধিক লোকের এই বিশাল জনসমুদ্র থেকে মাঝে মাঝে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ' 'ইঙ্গ-মার্কিন দস্যুরা বাংলা ছাড়', 'পূর্ব বাংলার নয়নমণি– মওলানা ভাসানী' প্রভৃতি শ্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল।

এই পর্যায়ে মওলানা ভাসানী বলেন, 'শুধু শ্লোগানে সংগ্রাম হয় না। হয় মরে যাব, নয়তো সার্বভৌমত্ব পাব এই কি আপনারা চান? বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করুন। যদি কোরবানী দিতে প্রস্তুত থাকেন তবে হাত তুলুন।' জনতা মুহুর্মুহু শ্লোগানের সাথে হাত তোলেন। মওলানা ভাসানী তখন নিজেই শ্লোগান দেন, 'নারায়ে তকবীর- আল্লাহু আকবর' 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান– জিন্দাবাদ'। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ থেকে তাদের প্রিয় নেতার শ্লোগানের প্রতিধ্বনি ভেসে আসে।

উক্ত জনসভায় আরও যারা ভাষণ দেন তাঁরা হলেন ন্যাশনাল লীগের সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান, পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সভাপতি পীর মোহসেন উদ্দীন, কৃষক-শ্রমিক পার্টি প্রধান জনাব এ,এস,এম, সোলায়মান ও পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মশিয়ুর রহমান।

সভাশেষে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে উপস্থিত জনতার এক বিরাট মিছিল বিভিন্ন শ্লোগান দিতে দিতে রাজধানীর সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

উৎস্য: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯০

পরিশিষ্ট-৭

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার 'মোসাফির' ছদ্মনামে *দৈনিক ইত্তেফাকে* প্রকাশিত উপসম্পাদকীয়

রাজনৈতিক মঞ্চ

মোসাফির

মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী অভিযান শুরু হইতে না হইতেই ক্ষমতাসীন মহল– এমনকি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পর্যন্ত বেসামাল হইয়া পড়িয়াছেন। ইতিপূর্বে কনভেনশন লীগের সেক্রেটারী জেনারেল কাম কেন্দ্রীয় প্রচার সচিব মিঃ ওয়াহিদ খান নির্বাচনী প্রচারকালে কাহারো প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ না চালাইবার যে আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাহা তাদের দলই ভঙ্গ করিলেন। মেসার্স ওয়াহিদুজ্জামান, হাসিমুদ্দিন প্রমুখ ইতিমধ্যেই মিস জিন্নাহর বিরুদ্ধে আবোল-তাবোল মন্তব্য করিয়াছেন। অবশেষে গত পরশু লাহোরে সাংবাদিক সম্মেলনে স্বয়ং আইয়ুব সাহেব মিস ফাতেমা জিন্নাহ এবং প্রতিটি বিরোধী দলের দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবের পক্ষে রাজনীতিকদের গালিগালাজ করা, তাদের দেশপ্রেমের উপর কটাক্ষ করা নূতন কিছু নয়। সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর উঠিতে বসিতে রাজনীতিকদের আদ্যশ্রাদ্ধ করাই ছিল শাসকমণ্ডলীর প্রধান কাজ। ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির হয়রানীমূলক মামলা মোকদ্দমা রুজু করা হয়; শত শত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে বিনা বিচারে জেলে আটক রাখা হয়; খামখেয়ালী 'এবডো' প্রয়োগ করিয়া পাঁচ সহস্রাধিক রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাকে রাজনীতি এবং নির্বাচনী পদের অযোগ্য করিয়া রাখা হয়। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে পাকিস্তানের সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করিয়া বিনা বিচারে সেলে আটক রাখা হয় এবং তার বিরুদ্ধে বৈদেশিক রাষ্ট্র হইতে অর্থ গ্রহণের মিথ্যা, নোংরা অভিযোগও করা হয়। তারপর ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব যখন কনভেনশন লীগের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন এক বক্তৃতায় তিনি বিরোধীদলীয় রাজনীতিকদের কেরায়া-কা টাট্টু (ভাড়াটিয়া খচ্চর) বলিয়া গালিগালাজ করেন। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও দেশবাসী ধারণা করিতে পারে নাই যে, তিনি কায়েদের ভগ্নী মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহর দেশপ্রেমের উপর কটাক্ষ করিতে পিছুপাও হইবেন না। লাহোরে তিনি তাহাই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কায়েদে আজমের ভগ্নী হইলেও মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহকে পাকিস্তানকে ধ্বংস করিতে দেওয়া হইবে না। এক্ষণে পরিস্থিতি এই দাঁড়াইয়াছে যে, তিনি এবং তার সঙ্গীসাথী কতিপয় মুখচেনা লোক ছাড়া সকলেই যেন পাকিস্তান ধ্বংস করিতে উদ্যত। মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহসহ সকল রাজনৈতিক দলই পাকিস্তান ধ্বংস করিতে চায়; তিনি একাই পাকিস্তান-দরদী, তিনি একাই পাকিস্তানের রক্ষক– তাঁর বক্তব্যের নির্গলিত অর্থ এই দাঁড়ায় না কি? বিরোধীদলীয় রাজনীতিকদের কথা বাদ দিলাম। মোহতারেমা মিস ফতেমা জিন্নাহও পাকিস্তানকে ধ্বংস করিতে চান এবং ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবই পাকিস্তানের একমাত্র রক্ষক– ইহা বিশ্বাস করা না করার ভার দেশবাসীর উপরই ন্যস্ত করা হইল।

ইহা বেসামাল মনের অভিব্যক্তি। আর ক্ষমতাসীন মহলের বেসামাল হইবার কারণও দেশবাসীর অবিদিত নাই। ২৯শে সেপ্টেম্বর 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের মধ্য দিয়া দেশবাসী ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে যে সুনির্দিষ্ট

রায় প্রদান করিয়াছে, তাতে তাদের বিচলিত বোধ না করিয়া উপায় নাই। বিরোধীদল সংগঠিত হইবার পরে- বিশেষতঃ মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহর মত দল-নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ সর্বজনমান্য নেত্রীর প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অবতীর্ণ হইবার পরে জনমতের যে প্লাবন সৃষ্টি হইয়াছে, তারই অভিব্যক্তি হিসাবে ২৯শে তারিখের সর্বত্র অভূতপূর্ব হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। মনকে অন্যভাবে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করা হইলেও জনমতের এই গতিধারা লক্ষ্য করিয়া ক্ষমতাসীন মহল ত্রাসিত ও হতোদ্যম। এই মুহূর্তে তাদের মানসিক ভারসাম্য হারান অস্বাভাবিক কিছু নয়। অতীতেও দেখা গিয়াছে যে কোন স্বার্থসর্বস্ব ক্ষমতাসীন দলের পতনের পূর্বাহ্নে তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যা' খুশি বলেন, যা' খুশি করেন। তাই, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক রাজনৈতিক দলগুলিকে গালিগালাজ করা, তাদেরকে 'বন্য বিড়াল' আখ্যায়িত করা- সর্বোপরি মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহর দেশপ্রেমের উপরও কটাক্ষ করা ভবিষ্যতে পরাজয়েরই লক্ষণ।

ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাকে সহজেই পরাজিত করিবার দম্ভোক্তি করিয়াছেন। জনমতের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে এই মুহূর্তে তার এই দাবী অশোভন ও অসময়োচিত। তিনি যদি নিজের জয় সম্পর্কে এতদূর স্থিরনিশ্চিত হন, তাহা হইলে মৌলিক গণতন্ত্রীদের মারপ্যাঁচ বাদ দিয়া তাঁকে প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে মিস জিন্নাহকে এই চ্যালেঞ্জ দিলেই তার দম্ভোক্তির সার্থকতা থাকিবে। অন্যথায়, গোটা দেশ যেখানে আজ একদিকে, সেখানে এই ধরনের দম্ভোক্তির অর্থ কি? ইহা কি মৌলিক গণতন্ত্রীদের উপর অবাঞ্ছিত প্রভাব বিস্তারের পূর্বাভাস নয়? কিন্তু ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলের ঐক্য এবং প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী দাঁড় করান সম্পর্কে এবং সর্বশেষ জামাতে ইসলামী বিরোধী দলে থাকিবে না এবং মিস জিন্নাহকে সমর্থন দিবে না বলিয়া অলীক প্রচার করিয়া যেভাবে নিরাশ হইয়াছেন, সেইরূপ আজিকার একটানা জনমতের প্রেক্ষিতে মৌলিক গণতন্ত্রীর উপর প্রভাব বিস্তারের স্বপ্নও অলীকে প্রমাণিত হইবে।

রাজনৈতিক দলের সমালোচনা অবাঞ্ছিত কিছু নয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক বিরোধীদলসমূহের আদর্শ ও কর্মপন্থার ভুল ব্যাখ্যা প্রদান- বিশেষতঃ তাদের দেশপ্রেমের উপর কটাক্ষ করা জনসাধারণ কোন কালেই সমর্থন করে নাই। বরং এই ধরনের সমালোচনা ও গালাগালিতে যারা লিপ্ত হইয়াছে, জনমত তাদের বিরুদ্ধে গিয়াছে এবং তাদের ভরাডুবি হইয়াছে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দল উঠিতে বসিতে তাদের দেশপ্রেমের উপর কটাক্ষ করিত, তাদেরকে বৈদেশিক এজেন্ট বলিয়া গালাগালি করা হইত। গণমনে তার কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবের তাহা না জানা থাকিলেও দেশবাসীর তাহা জানা আছে। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে যে ভাষায় গালাগালি করিয়াছেন, তাহা পরিতাপজনক। দেশবাসী বিরোধী দলকে যেমন চেনেন, তার দলকে তেমনি চেনেন।

আওয়ামী লীগ সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন, তার হেতু কি তা' আমরা কিছুটা আঁচ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন যে, আওয়ামী লীগ 'জাতীয়তাবাদে' বিশ্বাস করে, পাকিস্তান শক্তিশালী হউক এমনি ব্যবস্থাদিতে তাদের আস্থা নাই। তাঁর এই ধারণার মূলে কি রহিয়াছে, তা' ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছু কিছু জানা আছে। আমি আওয়ামী লীগ বা কোন দলের মুখপাত্র হিসাবে নয়, একজন সাংবাদিক এবং এই প্রদেশের একজন অধিবাসী হিসাবে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া নিয়া শুধু 'ইত্তেফাকে' এবং 'ঢাকা টাইমসে' লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধেই নয়, প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সহিতও সরাসরি একাধিকবার খোলাখুলি আলোচনা করিয়াছি। ১৯৬১ সালের ১৬ই আগস্ট ঢাকাতে সম্পাদকদের এক সভায় আমরা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারবিহীন, প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমরা পার্লামেন্টারী ধরনের শাসনতন্ত্র চাই, যাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান দেশের রাজনৈতিক শাসন-ব্যবস্থার সমান অংশ ও সমমর্যাদা ভোগ করিতে পারে। আর যদি প্রেসিডেন্সিয়াল ধরনের শাসন-ব্যবস্থাই তার (প্রেসিডেন্টের) একান্ত কাম্য হয়, তবে

সেখানে আর সংখ্যাসাম্যের প্রশ্ন থাকিবে না এবং প্রেসিডেন্টকে সরাসরি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমরা আরো উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই পর্যন্ত যে অবস্থা চলিয়া আসিতেছে, তাতে পদে পদে প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য নীতি অনুসৃত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলিয়াছিলাম যে, কেন্দ্রীয় চাকুরী-বাকুরীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের হিস্যা শতকরা ১৫ ভাগেরও কম; আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় দপ্তরে একজন পূর্ব পাকিস্তানী সেক্রেটারী নাই; যেখানে দেশরক্ষা বিভাগে কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা ৬৫/৭০ ভাগ ব্যয়িত হয়, সেখানেও পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা উল্লেখেরও অযোগ্য, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্প ক্ষেত্রে এক অংশের মুষ্টিমেয় লোকের একচেটিয়া প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের পুঁজির শতকরা ১০ ভাগও পূর্ব পাকিস্তানে গঠিত হয় নাই। তা'ছাড়া বৈদেশিক লোনেরও সিংহভাগ ব্যয়িত হইয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানে। ইহার পর আবার করাচী হইতে ফেডারেল রাজধানী অপসারণ করিবার কালে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের কথা বিবেচনা না করিয়াই পিণ্ডি ও ইসলামাবাদে ফেডারেল রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া জাতীয় সম্পদ হইতে তথায় শত শত কোটি টাকা ব্যয় করা হইতেছে। এমতাবস্থায় পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানীদের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্ততঃ তাঁদের সমান অধিকার রহিয়াছে এবং এই অধিকার প্রয়োগ করিয়া কালক্রমে তারা সকল বৈষম্য ও অবিচারের অবসান ঘটাইতে পারিবে। কিন্তু 'স্থিতিশীলতার' নাম করিয়া দেশে যদি এমনি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, যাতে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও এক ব্যক্তির হস্তে এবং একই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়, তবে পূর্ব পাকিস্তানীদের সেই সান্ত্বনার পথটুকুও রুদ্ধ হইবে।

আর অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য আমরা প্রস্তাব দিয়াছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতি ক্ষেত্রে—বিশেষতঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য অতঃপর পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রাসহ তাদের নিজস্ব সম্পদকে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন কার্যে নিয়োজিত করিবার সুযোগ দেওয়া হউক। বৈদেশিক কর্জ সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাব ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ বৈদেশিক লোক করিবে, সে তাহা সুদে-আসলে পরিশোধ করিবে। আমরা তখন মনে করিয়াছি যে, পূর্ব পাকিস্তানকে বৈষম্যের অভিশাপ হইতে সত্যিকারভাবে মুক্ত করিতে হইলে ইহাই ন্যূনতম কার্যকরী ব্যবস্থা। ইহার দ্বারা পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব বিপন্ন হইবার প্রশ্ন নাই; ইহার দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর হামলা করিবার প্রশ্ন নাই। বরং ইহা একটি উদার প্রস্তাব। কিন্তু যে মুষ্টিমেয় লোক দেশের গোটা সম্পদের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন, যারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মঙ্গলামঙ্গল উপেক্ষা করিয়া নিজেদের কর্তৃত্ব ও ভোগ-বিলাসকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন, যারা পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের মিল-কলে উৎপাদিত পণ্যের বাজার হিসাবে গণ্য করিতে চান, তারা এই প্রস্তাবকে বিকৃত করিবার চেষ্টা করিবেন জানি, কিন্তু আমাদের মনে কোন দুরভিসন্ধি নাই; বরং এ যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহাও ভুলিয়া গিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন বিধান করিয়া পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলকে একইভাবে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করাই আমাদের লক্ষ্য।

সহজভাবে চিন্তা করিলে 'বাঙালী জাতিত্ব বোধে' অপরাধের কিছু নাই। বাঙালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বেলুচ মিলিয়াই পাকিস্তান। বাঙালী নিজেকে পাঠান বলিয়া জাহির করিলে কিংবা পাঞ্জাবী মুখে বাঙালী বলিলে তদ্দারা জাতীয় সংহতি গড়িয়া উঠে না; বরং উহা মোনাফিকেরই নামান্তর। পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অংশবিশেষ। কিন্তু যে মাটি আমাদের ধারণ করিয়াছে, যে জলবায়ু সেবন করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি সেই মাটি, সেই দেশ, সেই মানুষকে ভুলিয়া কিংবা তার তরক্কীর প্রশ্ন বাদ দিয়া আমরা ভুয়া দেশপ্রেমিক সাজিতে চাই না। বাঙালীর পাকিস্তান সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। বন্দুক-কামান বা কোন ব্যক্তিবিশেষের 'শক্তিশালী' নেতৃত্বে পাকিস্তান অর্জিত হয় নাই। মানুষ নিয়া দেশ। আর পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ অধিবাসী বাস করে এই পূর্ব বাংলায়। তাঁদের প্রতি সুবিচার এবং তাদের ন্যায্য অংশ দাবী করিলে যদি বিকৃত অর্থে ইহাকে বাঙালী জাতিত্ব বলা হয়, তবে সেখানে আমরা নাচার। পাকিস্তানের সংহতির নামে মুষ্টিমেয় লোক তাদের ভাগ্য গড়িয়া তুলিবে, ইসলামাবাদের জৌলুস বৃদ্ধি পাইবে, আর আমরা তাকে গোটা পাকিস্তানের জৌলুস বলিয়া মানিয়া নিব, তাহা হইতে পারে না। আমরা দুনিয়াবাসীকে দেখাইয়াছি যে, পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও জাতীয় সংহতি এবং পাকিস্তানের তরক্কীর জন্য সংখ্যাসাম্য মানিয়া নিয়াছিল। যে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে 'বাঙালী জাতীয়তাবাদী' ভাবধারার এবং পাকিস্তানকে শক্তিশালী না করিবার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবের অবগতির জন্য উল্লেখ করা দরকার যে, তারাই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যাসাম্য নীতি সর্বাগ্রে মানিয়া নিয়াছিলেন। এবারেও আসন্ন নির্বাচনে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানীরা মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহর উপর অর্পণ করিয়াছেন। ইহার পরও আমাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে দুর্বল করিবার অভিযোগ আনয়ন করিলে তাকে উদ্দেশ্যমূলক ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে। মেষশাবককে ভক্ষণ করিতে হইলে অজুহাতের অন্ত কি! কিন্তু এই পথে কাহারও হালে পানি পাইবার উপায় নাই।

উৎস্য: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, *প্রথম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০৯

পরিশিষ্ট-৮

ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ

দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ

TEST PAPERS

ENGLISH-BENGALI

দিতে দিতে পূর্ব পাকিস্তান এমন রিক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে এখন আর দিবার মত তার কিছুই নাই

লাহোরে আপোষের প্রশ্নে শেখ মুজিবের জবাব

সংহতি জোরদারের জন্য উভয় অংশের স্বার্থ সুনিশ্চিত করার দাবী

গোল টেবিল বৈঠকে যে কোন বিষয় উত্থাপনের সুযোগ আছে

—শেখ মুজিব

সুযোগসন্ধানী ও দুষ্কৃতিকারীদের অরাজকতা সৃষ্টির বিরুদ্ধে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের কঠোর হুঁশিয়ারি

দীর রাজ্যে ছাত্র-পুলিস সংঘর্ষে অন্যূন ৩ জন নিহত

দুস্থ তহবিলের ২৭ লক্ষ টাকা অপব্যবহার?

গভর্ণরের বিরুদ্ধে সরকারদলীয় এম এন এ ওয়াহিদুজ্জামানের অভিযোগ

গণ-সাহায্য কমিটি

জনতার হাতে পাঁচজন 'কুখ্যাত অপরাধীর' মৃত্যু

এক ইউনিট বাতিল দাবী

বাহাত্তরের পরে নেতৃত্ব

প্রহরীর গুলীতে সিন্ধু শিল্প এলাকায় ১০ ব্যক্তি হতাহত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মৌন মিছিল

—"গণ-সাহায্য তহবিলে উদার হস্তে সাহায্য করুন"—

—শেখ মুজিবুর রহমান

ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সোহাগের মত সুন্দর চেহারায় ... কিসের ?

EMEX

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ৭ মার্চ ১৯৬৯

সংবাদ

SANGBAD

রাজধানীতে কারফিউ ঃ সেনাবাহিনী তলব

প্রদেশব্যাপী হরতাল, বিক্ষোভ ও মিছিল ঃ বিভিন্নস্থানে গুলীবর্ষণঃ ৮ জন নিহত

২০ জন বুলেট বিদ্ধ

যাঁরা শহীদ হইয়াছেন—

প্রেসনোট

ঢাকায় লক্ষাধিক ক্ষুব্ধ জনতার শব-শোভাযাত্রা ও জানাজা

ময়মনসিংহে ২জন নিহত

নারায়ণগঞ্জে হরতাল ও শোভাযাত্রা

আদমজী হইতে টঙ্গী পর্যন্ত সমস্ত কারখানায় পূর্ণ হরতাল ও বিক্ষোভ

কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার দ্বিধা করিবে না

'আমি হাজার ছেলে পেয়েছি'

বিরোধীদলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্যদের একযোগে পরিষদ কক্ষ বর্জন

বিশেষ ট্রাইবুনালের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় নাই

দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি ১৯৬৯

দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ৮ এপ্রিল ১৯৬৬

দৈনিক
ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ

পরিষদে যাওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারি, যদি—

আজ থেকে আমার নির্দেশ—

ঢাকা বেতার বন্ধ

জয় বাংলা

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ৮ মার্চ ১৯৭১

দৈনিক ইত্তেফাক

ইচ্ছানুযায়ী দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে

লাহোর সম্মেলনে যোগদানের কারণ ব্যাখ্যা প্রসংগে শেখ মুজিবর রহমান

লাহোর সম্মেলনের প্রশ্নে এনডিএফ-এর মনোভাব ব্যাখ্যা

মওলানা সাহেবের অবস্থা গুরুতর

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ

কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ

পার্টির চেয়ারম্যান পদে বঙ্গবন্ধু

দৈনিক বাংলা

জাতীয় রাজনৈতিক দল

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৭৫

সাপ্তাহিক মজলুম জনগণের মুখপত্র REGD NO.

ডিকার্স -এর জাম, জেলী, সস, স্কোয়াশ প্রভৃতি ব্যবহার করুন। ইহা স্বাদে ও উৎকর্ষতায় অতুলনীয়। আজও আমরাই নির্ভরযোগ্য বলিয়া থাকি।
ডিকার্স কর্পোরেশন
৮৮, জনায়েত বাজার, চট্টগ্রাম

ইত্তেফাক
THE ITTEFAK

প্রতিষ্ঠাতা: মওলানা আবদুল হামিদ খান (ভাষানী)

চতুর্থ বর্ষ ২৭শ সংখ্যা
ঢাকা—সোমবার, ১১ই ফাল্গুন, ১৩৫৯ সাল, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩
মূল্য:—পাকিস্তানে—/০ ভারতে—/১০ বার্ষিক—/০

২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবসে বিপুল সমাবেশে জালেমের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ

শোকাভিভূত ঢাকা নগরীতে অভূতপূর্ব্ব হরতাল, শোভাযাত্রা ও জনসভা

শহীদ দিবস। ২১শে ফেব্রুয়ারী শনিবার। রাজধানী ঢাকার প্রত্যেকটি দোকান পাট, বাস, রিক্সা, গাড়ীঘোড়া সবকিছু বন্ধ। সহস্র সহস্র ছাত্র, কর্মী গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে কালো ব্যাজ ধারণ করতঃ রাস্তায় টহল দিতেছে। বাজার বন্ধ। শহীদদের ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়া গোটা সহর যেন চরম ত্যাগ স্বীকার প্রস্তুত। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অপূর্ব প্রেরণা। স্কুল কলেজ বন্ধ। ভোরে ছাত্র জনসাধারণ যখন দলে দলে 'প্রভাত ফেরি' করিয়া শহীদদের মাজারে পুষ্পমাল্য প্রদান করিতে যাইতেছিল তখন সহরে এক করুণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সকলের চোখে পানি অথচ চোখমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে জীবন জিজ্ঞাসা, দৃঢ় প্রতীতি।

কর্মীরা জানিত দেশবাসী শহীদদের ভুলে নাই। শহীদদের স্মৃতি প্রত্যেকটী নর-নারী, ছাত্র-ছাত্রীর হৃদয় চিরদিনের জন্য অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। এই জনমতকে সুসংহত ও শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত করাই ছিল কর্মীদের কর্তব্য। আর কর্মীদের এই কর্তব্যবোধ ও কর্মপ্রেরণার সাথে জনতা দিয়াছে অভূতপূর্ব্ব সক্রিয় সাড়া। এই দিনের এই সফলতায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কবর রচনা করিয়াছে—

মওলানা ভাসানী আবার ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত

গত মঙ্গলবার (১৭ই ফেব্রুয়ারী) মওলানা আবদুল হামিদ খান (ভাসানী) সাহেবকে চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই সরকার পুনরায় ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

মওলানা ভাসানী

দুঃখের কথা, চিকিৎসারও কোন সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করেননা।

মওলানা সাহেব বলেন, [illegible] চিকিৎসার [illegible] ও [illegible] সরকারকেই [illegible] হইবে। [illegible] সম্পর্কে [illegible] ছিল। [illegible] সরকারের টিকা [illegible] সাহেবের [illegible] বেআইনী [illegible] ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ [illegible] 'অসাধুকে' মুক্তি [illegible] উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

[illegible]

'ইত্তেফাক', ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩

সাপ্তাহিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩

পরিশিষ্ট-৯

সুফিয়া কামাল রচনাসমগ্র

কাব্যগ্রন্থ [সম্পাদনা]

- *সাঁঝের মায়া* (১৯৩৮)
- *মায়া কাজল* (১৯৫১)
- *মন ও জীবন* (১৯৫৭)
- *প্রশস্তি ও প্রার্থনা* (১৯৫৮)
- *উদাত্ত পৃথিবী* (১৯৬৪)
- *দিওয়ান* (১৯৬৬)
- *অভিযাত্রিক* (১৯৬৯)
- *মৃত্তিকার ঘ্রাণ* (১৯৭০)
- *মোর জাদুদের সমাধি পরে* (১৯৭২)

গল্প [সম্পাদনা]

- *কেয়ার কাঁটা* (১৯৩৭)

ভ্রমনকাহিনী [সম্পাদনা]

- সোভিয়েতে দিনগুলি (১৯৬৮)

স্মৃতিকথা [সম্পাদনা]

- *একাত্তরের ডায়েরি* (১৯৮৯)

আত্মজীবনীমূলক রচনা [সম্পাদনা]

- *একালে আমাদের কাল* (১৯৮৮)

শিশুতোষ [সম্পাদনা]

- *ইতল বিতল* (১৯৬৫)
- *নওল কিশোরের দরবারে* (১৯৮১)

অনুবাদ [সম্পাদনা]

- *সাঁঝের মায়া - বলশেভনী সুমেকী* (রুশ) (১৯৮৪)

উৎস্যঃ Google

পরিশিষ্ট-১০

ছবি কথা বলে

শেখ মুজিবুর রহমান

আনোয়ারা খাতুন

বেগম বদরুন্নেসা আহমদ

নূরজাহান মুরশিদ

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

আবুল মনসুর আহমদ

অ্যাড. শহীদ মশিউর রহমান

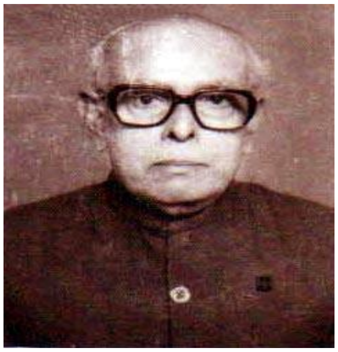

রওশন আলী

শামসুল হক

হাতেম আলী

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

সুফিয়া কামাল

সংগ্রহ: পারিবারিক সংগ্রহ ও Google

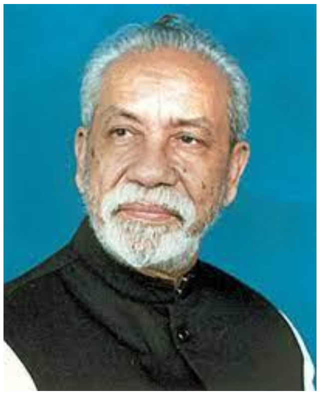

আবু নছর মোহাম্মদ গাজিউল হক

আবদুল মতিন

হাজী মোহাম্মদ দানেশ

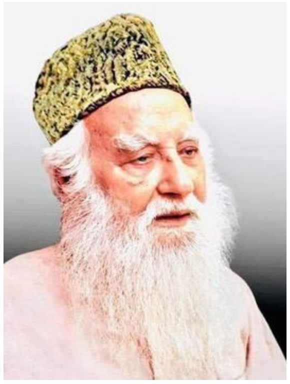

আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ

খয়রাত হোসেন

এম মনসুর আলী

আবদুল মোত্তালেব মালিক

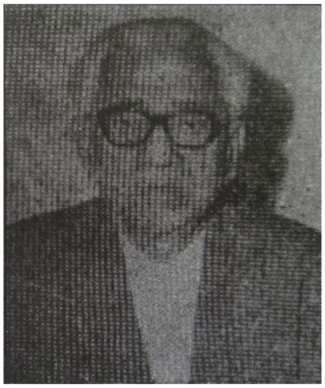

আবু হোসেন সরকার

বিপিন চন্দ্র পাল

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত

অলি আহাদ

মোহাম্মদ তোয়াহা

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

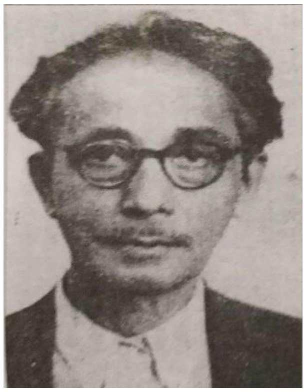

মুজফ্ফর আহ্মদ

কাজী জাফর আহমদ

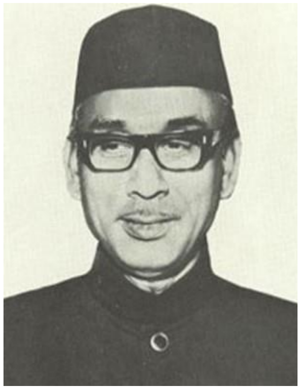

খোন্দকার মোশতাক আহমদ

হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী

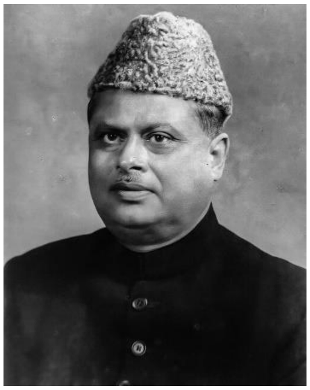

নূরুল আমীন

শাহেদ আলী পাটোয়ারি

মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী

খান সাহেব ওসমান আলী

রাশেদা আমিন

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন

বেগম আজিজা ইদ্রিস

সংগ্রহ: পারিবারিক সংগ্রহ ও Google

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ সালে মওলানা ভাসানীসহ প্রভাতফেরিতে শেখ মুজিব

সংগ্রহ: মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি*, *প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

ভাষা আন্দোলনে মিছিলরত আনোয়ারা খাতুন

সংগ্রহঃ Google

বক্তৃতারত বেগম বদরুন্নেসা আহমদ

সংগ্রহঃ ড. নাসরীন আহমাদ (বেগম বদরুন্নেসা আহমদের কন্যা)

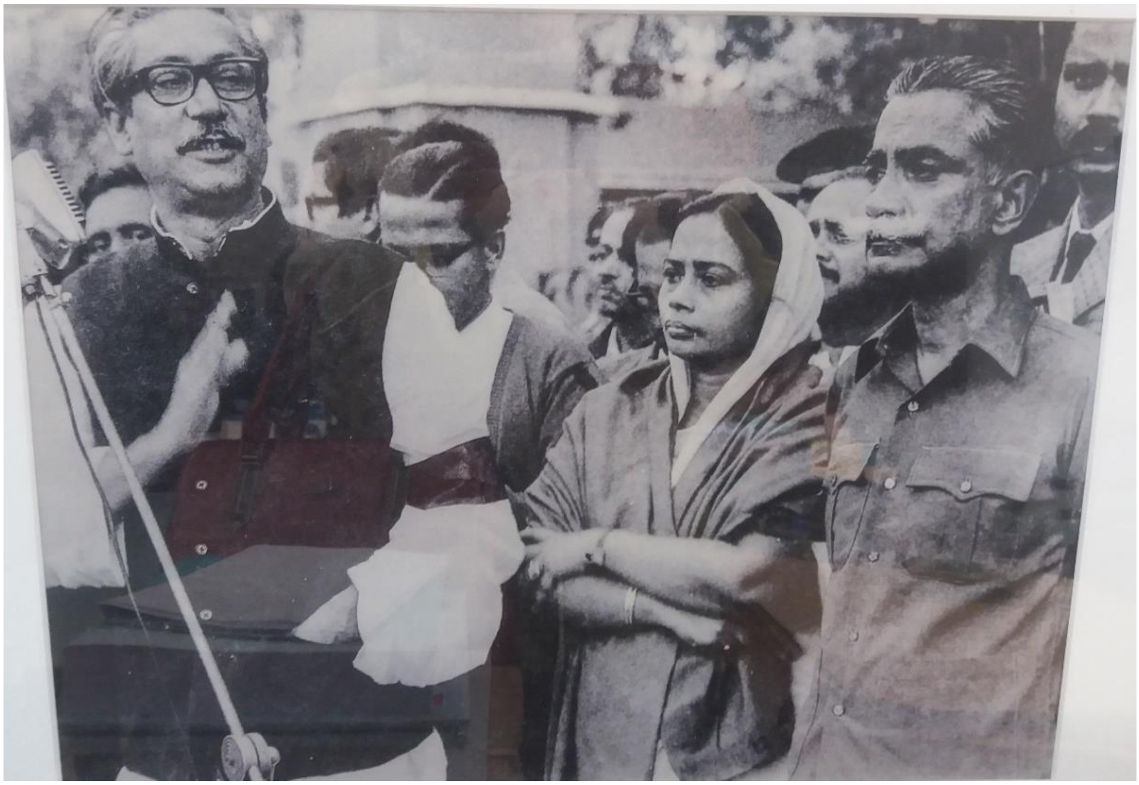

সাংগঠনিক আলোচনায় বেগম বদরুন্নেসা আহমদ (১৯৭০ সাল)
সংগ্রহ: ড. নাসরীন আহমাদ (বেগম বদরুন্নেসা আহমদের কন্যা)

শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বিশেষ মুহূর্তে ড. নাসরীন আহমাদ (বেগম বদরুন্নেসা আহমদের কন্যা) ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ
সংগ্রহ: ড. নাসরীন আহমাদ (বেগম বদরুন্নেসা আহমদের কন্যা)

বেগম বদরুন্নেসা আহমদ ও শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭৩ সাল)
সংগ্রহঃ ড. নাসরীন আহমাদ (বেগম বদরুন্নেসা আহমদের কন্যা)

মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক কার্যক্রমে বেগম বদরুন্নেসা আহমদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

সংগ্রহঃ ড. নাসরীন আহমাদ (বেগম বদরুন্নেসা আহমদের কন্যা)

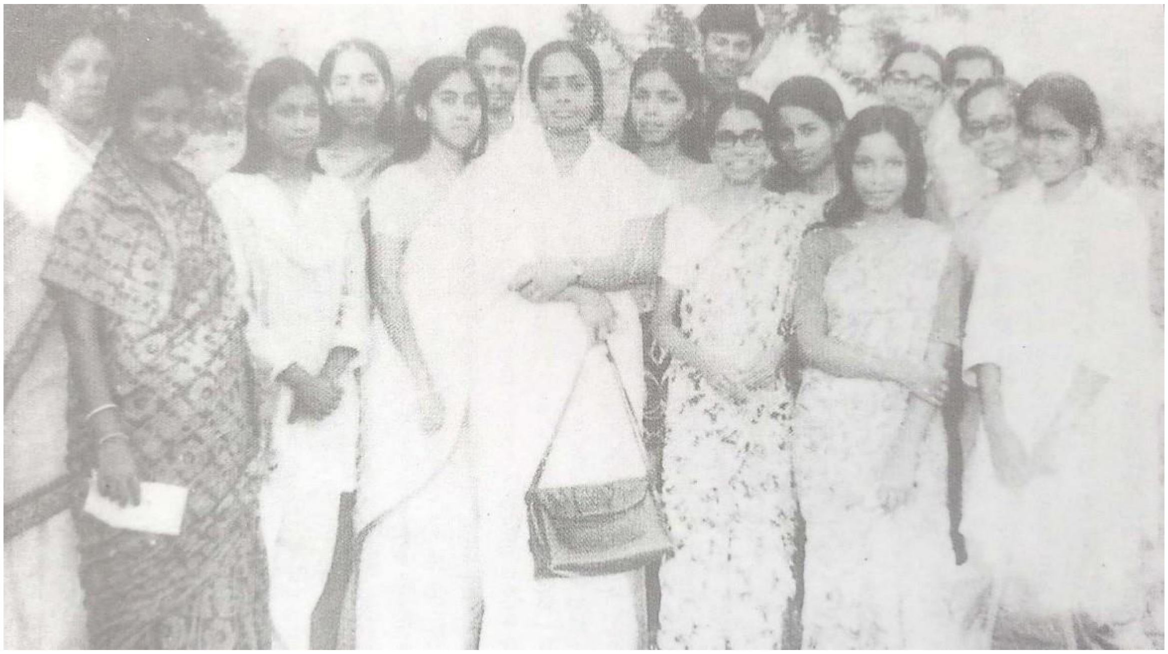

অক্টোবর ১৯৭১-এ বিশ্রামগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধা হসপিটাল পরিদর্শন শেষে কর্মরত নার্সদের সাথে হসপিটালের সামনে বেগম বদরুন্নেসা আহমদ

সংগ্রহ: ফোরকান বেগম, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী*, সুমি প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৪০

ছয়দফা আন্দোলনে নারী নেতৃবৃন্দ

সংগ্রহ: Google

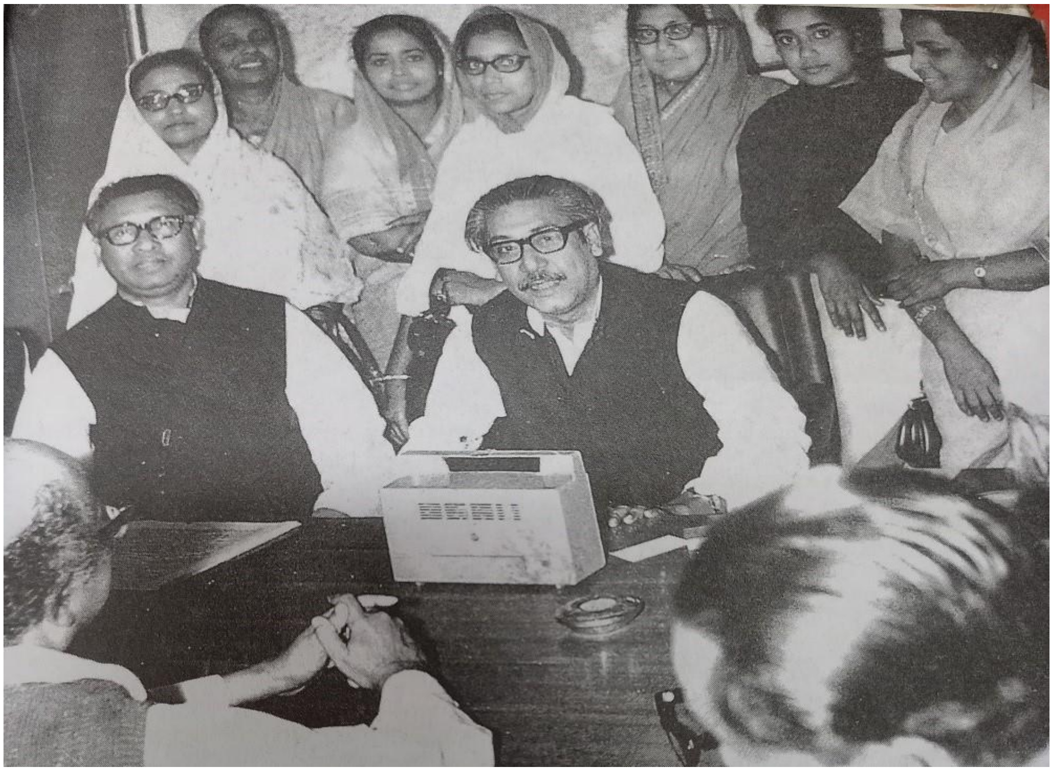

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল শুনছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ
উৎস্যঃ মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি*, *প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
সংগ্রহঃ Google

১৯৫৭ সালে ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে বক্তৃতারত মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
সংগ্রহঃ Google

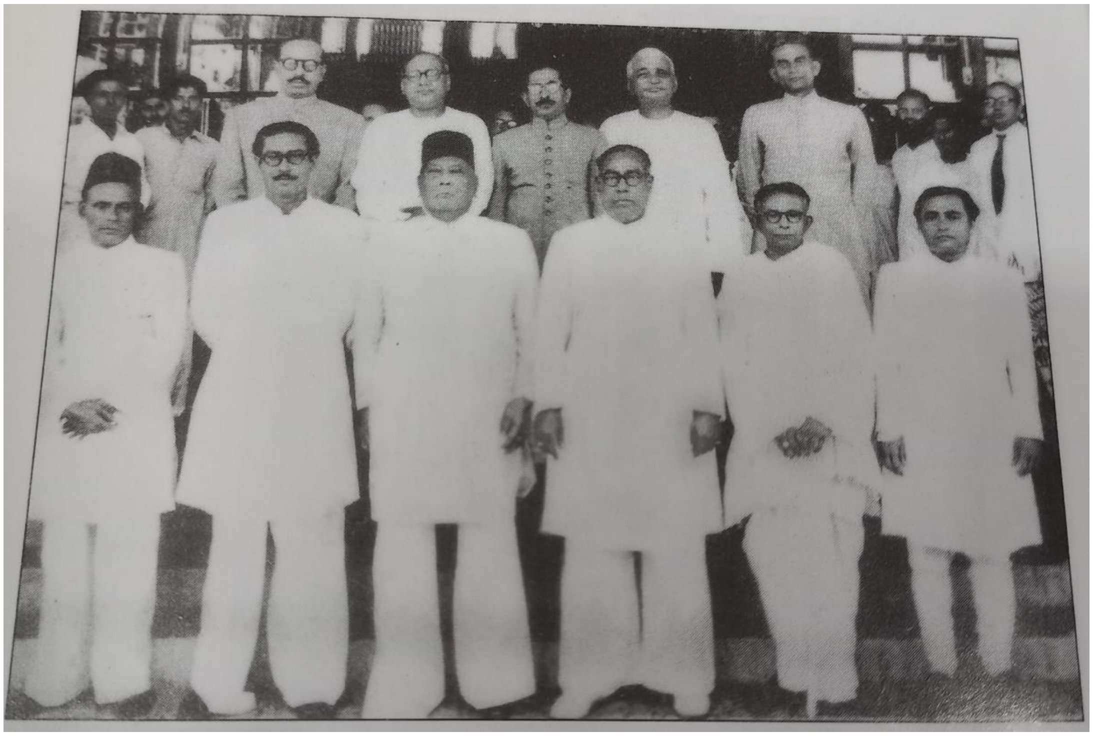

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাথে মশিউর রহমান (পিছনের সারিতে প্রথম)
উৎস্য: মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি*, *প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

বেগম বদরুন্নেসা আহমদ, সাজেদা চৌধুরী ও নূরজাহান মুরশিদসহ অন্যান্য নারী নেত্রী

সংগ্রহঃ Facebook

স্বশস্ত্র মিছিলরত রাশেদা আমিন, ফোরকান বেগম, মমতাজ-সহ আরও অনেকে, ২৩ মার্চ ১৯৭১

সংগ্রহঃ রাশেদা আমিন

The Dacca City Awami League women's branch presenting a bouquet to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on his being awarded Juliet Curie Peace Medal.

বঙ্গবন্ধুকে ফুলেল শুভেচ্ছায় রাশেদা আমিন

সংগ্রহ: রাশেদা আমিন

চট্টগ্রামে ওয়াজেদ মিয়া ও শেখ হাসিনার বিবাহোত্তর সংবর্ধনা

'আমি তো জেলে, পারলে তোমরা রিসেপশনের ব্যবস্থা কোরো'

ছবি : নূরুল ইসলামের সৌজন্যে

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ড. ওয়াজেদ মিয়া ও শেখ হাসিনার সঙ্গে চট্টগ্রামের তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা এমএ আজিজ, এমএ হান্নান, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মুরিদুল আলম, আবদুল্লাহ আল হারুন, নূরুল ইসলাম, এসএম জামালউদ্দিন, মিরসরাই আওয়ামী লীগ সভাপতি নূরুন্নবী, চন্দনাইশ আওয়ামী লীগ সভাপতি অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, তৎকালীন ছাত্রলীগ নেত্রী রাশেদা আমিনসহ অন্য নেতৃবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে। ছবির অনেকেই এখন আর বেঁচে নেই।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজনে রাশেদা আমিন

সংগ্রহ: রাশেদা আমিন

মওলানা ভাসানী, মুনীর চৌধুরী ও অন্যদের সাথে বঙ্গবন্ধু
সংগ্রহঃ মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি*, *প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯: আগরতলা মামলা থেকে মুক্তির পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাম থেকে মহিউদ্দিন আহমদ, মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব ও মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ
সংগ্রহঃ মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি*, *প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

বঙ্গবন্ধুসহ দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, পাশে দাঁড়ানো বাম থেকে তাজউদ্দিন আহমদ, সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেন প্রমুখ।
সংগ্রহ: মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি*, *প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে যশোর সদর আসনের সংসদ সদস্য এম রওশন আলীকে সমবায় চেক প্রদান করেন।
সংগ্রহ: অ্যাডভোকেট আবু সেলিম রানা (রওশন আলীর ছেলে)

পাক হানাদারদের মর্টারে আওয়ামী লীগ নেতা রওশন আলীর বাড়ির ধ্বংসাবশেষ ও অন্যান্য মৃতদেহের কঙ্কাল।

সংগ্রহ: অ্যাডভোকেট আবু সেলিম রানা (রওশন আলীর ছেলে)